রাসায়েল ও মাসায়েল

২য় খন্ড

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

রাসায়েল ও মাসায়েল

২য় খণ্ড

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

অনুবাদ

আবদুল মান্নান তালিব

আবদুল আযীয

সম্পাদনা

আবদুস শহীদ নাসিম

রাসায়েল ও মাসায়েল ২য় খণ্ড
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

অনুবাদ
আবদুল মান্নান তালিব
আবদুল আযীয

সম্পাদনা
আবদুস শহীদ নাসিম

শ. প্র. : ১৫
ISBN : 984-645-014-1

প্রকাশক
শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট
ঢাকা-১২১৭, ফোন : ৮৩১১২৯২

১ম মুদ্রণ : ১৯৯১
৬ষ্ঠ মুদ্রণ : জুন ২০০৯

মুদ্রণে
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট
ঢাকা-১২১৭, ফোন : ৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২

মূল্য : ২০০.০০ টাকা মাত্র

Rasail-O-Masail Vol. II by Sayyed Abul A'la Maudoodi, Translated by Abdul Mannan Talib & Abdul Aziz, Edited by Abdus Shaheed Naseem, Published by Shotabdi Prokashoni, 491/1 Moghbazar Wireless Railgate, Dhaka-1217, Phone: 8311292, Ist Edition : 1991, 6th Print : June 2009.

Prise : Tk. 200.00 Only.

ইসলামি জ্ঞান গবেষণার বিশ্ববরেণ্য বিশেষজ্ঞ ও পন্ডিত মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদ শহর থেকে ১৯৩২ সালে 'তরজমানুল কুরআন' নামে একটি মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করেন, যা অর্ধ শতাব্দীরও অধিককাল যাবত মানব জাতির কাছে ইসলামি জ্ঞান পরিবেশন করে আসছে। আজও সে পত্রিকাটি লাহোর থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

এ মাসিক পত্রিকায় তিনি ইসলামের বিপ্লবী চিন্তাধারা হৃদয়গ্রাহী ভাষা ও প্রকাশভংগীতে পরিবেশন করতে থাকেন, যার ফলে পাঠকবর্গের মধ্যে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করে। পাঠকদের পক্ষ থেকে উক্ত পত্রিকাটির মাধ্যমে তাঁর কাছে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করে তার উত্তর ও ব্যাখ্যা দাবি করা হয়। মাওলানা পত্রিকাটির মাধ্যমে সেসব প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দেন। এ প্রশ্নোত্তরের ধারাবাহিকতা তাঁর জীবদ্দশা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

এ প্রশ্নোত্তরগুলো 'রাসায়েল ও মাসায়েল' শিরোনামে প্রকাশিত হতে থাকে। রাসায়েল 'রিসালাহ' শব্দের বহুবচন যার অর্থ 'পত্রপত্রিকা' 'সাময়িকী' ইত্যাদি। 'মাসায়েল' 'মাস্য়ালা' শব্দের বহুবচন। অর্থ প্রশ্ন বা সমস্যা। মাওলানা তাঁর সম্পাদিত ও প্রকাশিত পত্রিকাটির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশ্ন ও সমস্যার জবাব দিয়েছেন এবং এ সবের জন্যে 'রাসায়েল ও মাসায়েল' শিরোনাম ব্যবহার করেছেন।

বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লোক তাঁর নিকট বিভিন্ন প্রশ্ন করেছেন। কেউ জ্ঞান লাভের জন্যে প্রশ্ন করেছেন, কেউ তাঁর প্রকাশিত বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে তাঁকে পত্র লিখেছেন। এসবের তিনি সুন্দর জবাব দিয়েছেন।

তাছাড়া প্রশ্নের ধরন ছিলো ভিন্ন। কুরআন, হাদিস, তাফসির, ফেকাহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন। রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন, সাধারণ জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রশ্ন এবং অন্যান্য বিষয়ের উপর প্রশ্ন। এসব প্রশ্নের সাথে বহু আধুনিক যুগ জিজ্ঞাসার "পান্ডিত্যপূর্ণ ও মনজয়কারী জবাব তিনি দিয়েছেন। এসব প্রশ্নোত্তর 'রাসায়েল ও মাসায়েল' শিরোনামে গ্রন্থাকারে কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। মাওলানার মনীষার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এ গ্রন্থের বংগানুবাদের নামকরণও আমরা করলাম 'রাসায়েল ও মাসায়েল'। গ্রন্থটি ইনশাআল্লাহ কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত হবে।

আমরা মনে করি আলেম সমাজ, কুরআন হাদিস ও ফেকাহশাস্ত্রের জ্ঞান পিপাসু, সাধারণ জনগোষ্ঠি এবং আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণী নির্বিশেষে সকলের জন্যে জ্ঞান আহরণের এ এক অমূল্য গ্রন্থ। তবে জ্ঞান লাভের জন্যে সুস্থ ও নিরপেক্ষ মনমানসিকতার যে প্রয়োজন সম্মানিত পাঠকবর্গ সেই মন নিয়েই গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করবেন বলে আশা করি। জবাবদাতার মূল চিন্তা ও ভাবধারাকে সামনে রেখেই প্রশ্নোত্তরগুলো বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। কোথাও কোনো ক্রটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে এবং তা আমাদের গোচরীভূত করলে আমরা তা সংশোধনের চেষ্টা করবো। জ্ঞান পিপাসু বাংলা ভাষীদের চির আকাঙ্খিত এ গ্রন্থখানি তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হচ্ছে বলে আল্লাহ তাআলার দরবারে কাতর প্রার্থনা, তিনি যেনো এ গ্রন্থখানি কবুল করেন এবং এতে প্রভূত বরকত দান করেন। তাহলেই আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

আব্বাস আলী খান
চেয়ারম্যান
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী ঢাকা
১৯৯১ ঈসায়ী

সূচিপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা

১

আয়াতের তাফসীর
ও
হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

কয়েকটি হাদীস সম্পর্কে আপত্তির জবাব

প্রশ্নঃ রসূলুল্লাহর (স) হাদীসকে আমি কোনো কট্টর আহলে হাদীসের চাইতে কম সম্মান করিনা। তাই হাদীস অস্বীকারকারীদের ফেত্‌না থেকে আত্মরক্ষার জন্যে আমি হামেশা আল্লাহর কাছে দোয়া করি। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কতিপয় হাদীস সম্পর্কে বারবার আমার মনে সন্দেহ দেখা দেয়। আশা করি আপনি ওগুলি সম্পর্কে আমার সন্দেহ পর্যালোচনা করে হাদীসগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে আমার পেরেশানী ও অস্থিরতা দূর করবেন। আমি আপনার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞ থাকবো।

নৈতিক দিক দিয়ে ত্রুটিপূর্ণ হাদীস

১. রসূলুল্লাহর (স) গোসল সম্পর্কে হযরত আয়েশাকে (রা) প্রশ্ন করা হলে জবাবে তিনি একটি পাত্র আনান এবং সামনে একটি পর্দা ঝুলিয়ে দিয়ে নিজের ভাই ও একজন গায়ের মাহরাম পুরুষের উপস্থিতিতে গোসল করেন। (বুখারী শরীফঃ প্রথম খন্ড ৩৯ পৃষ্ঠা)

২. 'মুতা বিয়ে' সম্পর্কে হযরত সাবরাতুল জাহানী (রা) বর্ণিত হাদীসও আপত্তিকর। তিনি বলেনঃ আমার জনৈক সাথীর সাথে আমি বনী আমেরের জনৈক মহিলার নিকট গেলাম এবং তাকে আমাদের খেদমত পেশ করলাম। (মুসলিমঃ তৃতীয় খন্ড ৪৪৩ পৃষ্ঠা)

৩. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স) ও হযরত আবু বকরের (রা) আমলে আমরা এক মুঠো আটার বিনিময়ে মেয়েদেরকে ব্যবহার করতাম। উমর (রা) তাঁর খিলাফত আমলে এ কাজ থেকে আমাদেরকে নিরস্ত করেন। (মুসনিমঃ তৃতীয় খন্ড ৪৪১ পৃষ্ঠা)

৪. হযরত জাবির (রা) বলেনঃ যিলহজ্জ মাসের পাঁচ তারিখে ইহ্‌রাম ভেঙে আমরা অত্যধিক সহবাস করলাম এবং পাঁচ তারিখের পর যখন আমরা আরাফাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলাম, তখন আমাদের পুরুষাংগ থেকে বীর্য টপকাচ্ছিল। (মুসলিমঃ তৃতীয় খন্ড ২৭৩ পৃষ্ঠা)

বুদ্ধি ও যুক্তি বিরোধী হাদীস

৫. হযরত আবুযার গিফারীকে (রা) রসূলুল্লাহ (স) সূর্য সম্পর্কে বলেনঃ সূর্য অস্তমিত হবার পর আরশের নীচে সিজ্‌দানত হয় এবং পূনর্বার উদিত হবার সকাল পর্যন্ত জন্যে অনুমতি চাইতে থাকে। (বুখারী শরীফঃ দ্বিতীয় খন্ড ৩৭ পৃষ্ঠা)

৬. হযরত আবু হুরাইরার (রা) বর্ণনা অনুযায়ী একবার জাহান্নাম আল্লাহর

নিকট নিঃশ্বাস আটকে যাবার অভিযোগ করে এবং নিঃশ্বাস নেবার অনুমতি চায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তুমি বছরে দু'বার নিঃশ্বাস নিতে পারো। এ থেকেই গ্রীষ্মকাল ও শীতকালের সৃষ্টি হয়েছে। (বুখারী শরীফঃ দ্বিতীয় খন্ড ১৪৩ পৃষ্ঠা)

৭. পুরুষের বীর্য হয় সাদা এবং নারীর বীর্য হয় হলুদ। বীর্যপাতের পর উভয়ের বীর্য মিশ্রিত হয়। এ মিশ্রিত পদার্থ যদি সাদাটে রংয়ের হয়, তাহলে পুত্র সন্তান জন্ম নেয়, অন্যথায় জন্ম হয় কন্যা সন্তান। (মুসলিম শরীফঃ প্রথম খন্ড ৪৬৮ পৃষ্ঠা)

৮. সংগম করার সময় নারীর পূর্বে পুরুষের বীর্যপাত হলে সন্তান পিতার মতো হয় অন্যথায় উভয়ের মতো হয়। (বুখারী শরীফঃ দ্বিতীয় খন্ড ১৪৯ পৃষ্ঠা)

নবীদের মর্যাদাহানীকর হাদীস

৯. হযরত আবু হুরাইরার (রা) বর্ণনা অনুযায়ী হযরত ইবরাহীমের (আ) খাত্না হয়েছিল ৮০ বছর বয়সে। (বুখারী শরীফঃ দ্বিতীয় খন্ড ১৫৫ পৃষ্ঠা)

১০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, একদিন হযরত সুলাইমান (আ) বললেনঃ আজ রাতে আমি আমার সকল স্ত্রীর সাথে, যাদের সংখ্যা একশো একজন বা নিরানব্বই জন সহবাস করবো এবং প্রত্যেক স্ত্রীর গর্ভে একজন করে ঘোড়সওয়ার জন্ম নেবে, তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এক ব্যক্তি বললো, অবশ্যি এই সংগে ইনশাআল্লাহও বলুন। কিন্তু হযরত সুলাইমান এ কথার কোনো তোয়াক্কা করলেননা। অতপর তিনি প্রত্যেক স্ত্রীর সাথে মিলিত হলেন; কিন্তু তন্মধ্যে একজন ছাড়া আর কেউ গর্ভবতী হলোনা। (বুখারী শরীফঃ দ্বিতীয় খন্ড ৯৩ পৃষ্ঠা)

১১. হযরত হুযাইফা (রা) বলেনঃ রসূলুল্লাহ (স) একটি আবর্জনাস্তুপের নিকট গেলেন এবং আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন। (বুখারী শরীফঃ প্রথম খন্ড ৩৬ পৃষ্ঠা)

১২. বুখারী শরীফে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের (যাঁকে কুরআন সত্যবাদী নবী বলে সম্বোধন করেছে) তিনটি মিথ্যা কথার উল্লেখ করা হয়েছে। এ তিনটি মিথ্যাও এমন মারাত্মক পর্যায়ের যে, তার কারণে কিয়ামতের দিন তিনি শাফায়াত করতেও লজ্জা অনুভব করবেন। (মুসলিম শরীফঃ প্রথম খন্ড ৩৭২ পৃষ্ঠা) এর মধ্যে দুটি ঘটনার উল্লেখ কুরআনে আছে। কিন্তু তৃতীয় ঘটনাটি অর্থাৎ হযরত ইবরহীমের একজন ব্যভিচারী বাদশাহর ভয়ে নিজের স্ত্রীকে বোন বলে পরিচয় দেবার ব্যাপারটির উল্লেখ কুরআনে নেই।

সুবিচারের বিপরীত বিবিধ হাদীস

১৩. উম্মে শরীক (রা) বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী (বুখারী শরীফঃ দ্বিতীয় খন্ড ৫০০ পৃষ্ঠা) রসূলুল্লাহ (স) গিরগিটি হত্যা করার হুকুম দিয়েছিলেন। কারণ হযরত ইবরাহীমকে (আ) যে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছিল গিরগিটি ফুৎকার দিয়ে তাকে প্রজ্বলিত করেছিল। প্রশ্ন হলো, একটি গিরগিটের ফুৎকারে আগুনকে প্রজ্বলিত করার শক্তি কোথেকে আসবে? উপরন্তু একটি গিরগিটির অপরাধে দুনিয়ার সমস্ত গিরগিটিকে শাস্তি দেয়া কোন্ ধরনের সুবিচার?

১৪. একটি বর্ণনা অনুযায়ী মহিলা, গাধা ও কুকুর সামনে দিয়ে চলে গেলে নামায ভেঙে যায়। (মুসলিম শরীফঃ দ্বিতীয় খন্ড ১১১ পৃষ্ঠা)

১৫. কোনো পানীয় দ্রব্যের মধ্যে মাছি পড়লে তাকে চুবানি দিয়ে বের করে আনো কারণ তার একটি পাখায় থাকে রোগ এবং অন্যটিতে থাকে ওষুধ। (বুখারী শরীফঃ দ্বিতীয় খন্ড ১১৪ পৃষ্ঠা)

উপরোক্ত হাদীসগুলোর অধিকাংশ বুখারী শরীফ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী বুখারী শরীফ হচ্ছে কুরআনের পর সবচাইতে নির্ভুল গ্রন্থ। 'কুরআনের পর সবচাইতে নির্ভুল গ্রন্থ' এ কথার অর্থ কি এই যে, কুরআনের ন্যায় বুখরী শরীফেরও প্রতিটি অক্ষর নির্ভুল ও অপরিবর্তনীয়? – মেহেরবানী করে এ কথাটিও পরিষ্কার করে দেবেন।

জবাবঃ আপনার প্রশ্নের জবাব দেবার পূর্বে একটি অভিযোগ করতে হচ্ছে। অর্থাৎ আপনি বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের খন্ড ও পৃষ্ঠার উল্লেখ করে সেখান থেকে উদ্ধৃত হাদীসসমূহের বরাত দিয়েছেন। অথচ দুনিয়ার বিভিন্ন প্রকাশনী হতে এই গ্রন্থ দুটি বিভিন্ন সাইজে বহুবার মুদ্রিত হয়েছে এবং আপনার নিকট এ দুটির যে সংস্করণ আছে অন্যের নিকটও যে তাই থাকবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। কাজেই এ ধরনের গ্রন্থের বরাত দেবার সময় অধ্যায়ের শিরোনাম উল্লেখ করা উচিত, যাতে সংশ্লিষ্ট হাদীসটিকে সহজে তালাশ করা যায়।

আপনার প্রশ্নগুলো দেখে মনে হয়, সম্ভবত আপনি নিজে ভালোভাবে ঐ কিতাব দুটি অধ্যয়ন করেননি এবং হাদীস 'অস্বীকারকারীরা' ফিত্না সৃষ্টি করার জন্যে 'আপত্তিকর' হাদীসসমূহের যে ফিরিস্তি প্রকাশ করেছে তা আপনার চোখেও পড়েছে এবং সেক্ষেত্রে আপনি কেবল এতটুকু কষ্ট স্বীকার করেছেন যে, বুখারী ও মুসলিমের পৃষ্ঠা খুলে সেখানে ঐ হাদীসগুলো উদ্ধৃত হয়েছে কিনা এটুকু দেখে নিশ্চিত হয়েছেন। আপনি যদি এই হাদীসগুলোর সংশ্লিষ্ট সমগ্র

অধ্যায় পড়ে নিতেন, তাহলে সেখানেই আপনার সন্দেহের জবাব পেয়ে যেতেন। বরং অনেকগুলো হাদীসের পুরো বাক্যটিও আপনি পড়ে দেখেননি বলে মনে হয়। উল্লিখিত ফিত্‌নাবাজ দলটি নিজেদের পক্ষ থেকে সেগুলোর যে মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত অর্থ তৈরি করে বর্ণনা করেছে আপনি সেগুলোই নকল করে দিয়েছেন। এভাবে ঐ দলটি স্বল্প শিক্ষিত ও স্বল্পবুদ্ধি লোকদেরকে প্রতারিত করে আসছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, আপনার ন্যায় উচ্চশিক্ষিত লোকও এতো সহজে তাদের দ্বারা প্রতারিত হচ্ছেন! হাদীস সম্পর্কে মত প্রকাশ করার জন্যে যে সামান্য ও ভাসা ভাসা পড়াশুনা করাকে আপনি যথেষ্ট মনে করছেন আপনি কি জানেননা, দুনিয়ার কোনো বিদ্যা, জ্ঞান ও শিল্প সম্পর্কিত বিষয়ের ব্যাপারে এতটুকু বিদ্যাকে যথেষ্ট মনে করা হয়না? আপনি যেভাবে হাদীসের কতিপয় কথাকে পূর্বাপর সম্পর্ক ও বিষয়বস্তু থেকে আলাদা করে এবং একেবারেই হাল্‌কা অর্থ গ্রহণ করে উদ্ধৃত করেছেন, অনুরূপভাবে দুনিয়ার প্রত্যেকটি বিদ্যা, জ্ঞান ও শিল্পকে হাস্যাস্পদ করার জন্যে তাদের সংশ্লিষ্ট কিতাব থেকে বিশেষ বিশেষ অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর এখন আমি আপনার পেশকৃত হাদীসগুলোর প্রত্যেকটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো। এর ফলে কেবল আপনিই নন বরং হাদীস 'অস্বীকারকারীদের' ফিত্‌না দ্বারা প্রতারিত অন্যান্য লোকেরাও হাদীস অনুসন্ধানের যথার্থ পদ্ধতি জানতে পারবেন।

১. হযরত আয়েশার (রা) গোসল সম্পর্কিত হাদীসটি বুখারী শরীফের গোসল অধ্যায়ে 'এক সা' ও এই পরিমাণ পানিতে গোসল শিরোনামে উদ্ধৃত হয়েছে, এ হাদীসে হযরত আবু সালামা (রা) বলেনঃ আমি ও হযরত আয়েশার (রা) ভাই হযরত আয়েশার (রা) নিকট গেলাম। হযরত আয়েশার ভাই তাঁকে রসূলুল্লাহর (স) গোসল সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। জবাবে হযরত আয়েশা একটি পাত্র আনালেন। পাত্রটিতে প্রায় 'এক সা' (প্রায় সাড়ে তিন সের) পরিমাণ পানি ধরে। তিনি গোসল করলেন এবং নিজের মাথায় পানি ঢাললেন। তখন তাঁর ও আমাদের মধ্যে একটি পর্দা লটকানো ছিল।

এই হাদীস সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপনকারীদের প্রথম ভুল হলো এই যে, তারা আবু সালামার নাম দেখেই মনে করেন বুঝিবা তিনি কোনো গায়ের মাহরাম ব্যক্তি হবেন। অথচ তিনি ছিলেন হযরত আয়েশার দুধ ভাগ্নে। হযরত আবু বকরের (রা) কন্যা হযরত উম্মে কুলসুম (রা) তাঁকে দুধপান করিয়েছিলেন। কাজেই হযরত আয়েশার নিকট যে দুই ব্যক্তি মাসায়েল জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিলেন তাঁরা তাঁর মাহরাম ছিলেন, গায়ের মাহরাম ছিলেননা।

অতপর দ্বিতীয় ভুল এবং বাড়াবাড়ি হলো, হাদীসে কেবল 'হিজাব' অর্থাৎ পর্দার উল্লেখ আছে। কিন্তু আপত্তিকারীরা নিজেদের পক্ষ থেকে বাড়িয়ে বলে যে,

সুক্ষ্ম পর্দা ছিল। এই বৃদ্ধির সপক্ষে যুক্তি পেশ করে তারা বলেন যে, পর্দা যদি সুক্ষ্ম না হতো এবং তার অন্তরাল থেকে হযরত আয়েশার গোসল দৃষ্টিগোচর না হতো, তাহলে মাঝখানে তা ঝুলিয়ে দিয়ে গোসল করায় লাভ কি? অথচ কোন্ বিষয়ের অনুসন্ধানের জন্যে তারা দু'জন নিজেদের বোন ও খালার নিকট গিয়েছিলেন, এ কথা যদি আপত্তিকারীরা জানতেন, তাহলে তারা নিজেদের প্রশ্নের জবাব পেয়ে যেতেন এবং পর্দাটি মোটা ছিল কি পাতলা ছিল, এ কথা চিন্তা করার কোনো প্রয়োজনই হতোনা।

আসলে গোসলের পদ্ধতি কি ছিল, এ কথা জানার প্রশ্ন সেখানে ছিলনা। সেখানে প্রশ্ন এই ছিল যে, গোসলের জন্যে কতটুকু পানি যথেষ্ট? অনেকে রসূলুল্লাহর (স) এ হাদীস শুনেছিলেন যে, তিনি গোসলের জন্যে 'এক সা' (প্রায় সাড়ে তিন সের) পরিমাণ পানি নিতেন। এই সামান্য পরিমাণ পানিকে লোকেরা গোসলের জন্যে অকিঞ্চিত মনে করতো। তাদের বিভ্রান্তির কারণ ছিল এই যে, তারা নাপাকি থেকে পাক হবার জন্যে গোসল ও পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতার জন্যে গোসলের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারেনি। হযরত আয়েশা তাঁদেরকে শিক্ষা দেবার জন্যে মাঝখানে একটি পর্দা ঝুলিয়ে দেন। এর ফলে দর্শকদ্বয় কেবল তাঁর মাথা ও চেহারা দেখতে পায়। অতপর পানি আনিয়ে তিনি নিজের মাথায় ঢালেন। এভাবে হযরত আয়েশা (রা) তাঁদেরকে একই সংগে দুটি কথা জানাতে চাচ্ছিলেন। এক, পবিত্রতা অর্জনের জন্যে যে গোসল করা হয় তাতে কেবল গায়ে পানি ঢালাই যথেষ্ট। দুই, এ জন্যে কেবল 'এক সা' পরিমাণ পানি যথেষ্ট।

এই ব্যাখ্যার পর আপনি নিজেই চিন্তা করুন, অযথা একটি নির্ভরযোগ্য হাদীস অস্বীকার করার অতপর সমস্ত হাদীসের অনির্ভরযোগ্য হবার জন্যে একে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করার মতো কোনো আপত্তিকর বিষয় এতে আছে কি?

২–৩. হযরত সাবরাতুল জাহানী ও হযরত জাবির (রা) বর্ণিত হাদীস দুটি মুসলিম শরীফের 'মুতা বিবাহ' অধ্যায়ে উদ্ধৃত হয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, আপত্তিকারীরা নিছক আপত্তি করার জন্যে হাদীস তালাশ করতে থাকে এবং এ দুটি হাদীসকেও তাদের ফিরিস্তিতে জুড়ে নেয়। অন্যথায় যদি তারা মুতার তাৎপর্য ও স্বরূপ জানবার চেষ্টা করতো এবং এ ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে কোন্ ধরনের বিতর্ক দেখা দিয়েছিল আর ঐ বিতর্কের মীমাংসার জন্যে মুহাদ্দিসগণ মুতার বৈধতা ও হারাম হওয়া সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত হাদীসসমূহ কি উদ্দেশ্যে নিজেদের কিতাবসমূহে উদ্ধৃত করেছেন, এ কথাও জানবার চেষ্টা করতো, তাহলে হয়তো এ হাদীসগুলোর উপর তাদের কৃপাদৃষ্টি পড়তোনা।

আসল ব্যাপার হলো, ইসলামপূর্ব জাহেলী যুগে বিবাহের যে সমস্ত পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তন্মধ্যে 'মুতা বিবাহ' অন্যতম। অর্থাৎ কোনো মহিলাকে কোনো

কিছুর বিনিময়ে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে বিবাহ করা হতো। রসূলুল্লাহর (স) নীতি ছিলো, আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে কোনো বস্তু বা বিষয় নিষিদ্ধ হবার নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত তিনি পূর্ব প্রচলিত পদ্ধতি বাতিল করতেননা বরং সেগুলোর প্রচলন সম্পর্কে নীরব থাকতেন অথবা প্রয়োজনকালে অনুমতিও দিয়ে দিতেন। মুতার ক্ষেত্রেও এই একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি ঘটে। প্রথম দিকে তিনি এ ব্যাপারে নীরব থাকেন এবং পরে কোনো যুদ্ধ বা সফরকালে লোকেরা কামপ্রবৃত্তির তীব্রতা প্রকাশ করলে তিনি এর অনুমতি দেন। কারণ তখনও এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আসেনি। অতপর নিষেধাজ্ঞা এসে পৌঁছলে তিনি একে পুরোপুরি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু এ নিষেধাজ্ঞা যথাসময়ে সমস্ত লোকের নিকট পৌঁছতে পারেনি এবং এরপরও কিছু লোক অজ্ঞতার কারণে 'মুতা বিবাহ' করতে থাকে। অবশেষে হযরত উমর (রা) তাঁর আমলে এ নিষেধাজ্ঞাটির ব্যাপক প্রচার করেন এবং পূর্ণ শক্তিতে এর প্রচলন বন্ধ করেন।

এ বিষয়ে ফকীহগণের সম্মুখে বিভিন্ন প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। যেমন, রসূলুল্লাহ (স) কখনো কি এর সুস্পষ্ট অনুমতি দিয়েছিলেন? দিয়ে থাকলে কি অবস্থায় ও কখন দিয়েছিলেন? তিনি কি এ সম্পর্কে কখনো নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন? জারি করে থাকলে কখন জারি করেছিলেন এবং তার শব্দাবলী কি ছিল? এ ছাড়া এটিকে কি রসূলুল্লাহ (স) নিজেই হারাম করেছিলেন, না হযরত উমর (রা) নিজ দায়িত্বে এর প্রচলন বন্ধ করেছিলেন? এই ধরনের বিভিন্ন প্রশ্ন সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাবার এবং যাচাই–পর্যালোচনা করার জন্যে ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণ এ সম্পর্কিত বিভিন্ন হাদীস সংগ্রহ করার প্রয়োজন অনুভব করেন। এ প্রসংগে অভিযোগকারীরা অভিযোগ করার জন্যে যে হাদীস দুটি বাছাই করে নিয়েছে ইমাম মুসলিম সে দুটিরও উল্লেখ করেছেন।

এর মধ্যে একটি হলো হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণিত হাদীস। এতে তিনি বলেন যে, তাঁরা রসূলুল্লাহ (স) ও হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) আমলেও মুতা করতেন। অতপর হযরত উমর (রা) তাঁর আমলে এর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। অন্য হাদীসে হযরত সাবরাতুল জাহানী (রা) বলেন, মক্কা বিজয়ের সময় রসূলুল্লাহ (স) এ কাজের অনুমতি দেন। কাজেই আমি নিজেই একটি চাদরের বিনিময়ে জনৈক মহিলার সাথে মুতা বিবাহ করি। কিন্তু ঐ একই যুদ্ধের সময় রসূলুল্লাহ (স) ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ তাআলা মুতা বিবাহকে কিয়ামত পর্যন্ত হারাম করে দিয়েছেন। এ ছাড়া এই বিষয়ের বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করে এ ধরনের বিভিন্ন হাদীস ইমাম বুখারী ও মুসলিম এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ সংগ্রহ করেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, মুহাদ্দিসগণ এ হাদীসগুলো সংগ্রহ না করলে ইসলামী আইন প্রণেতারা কিসের ভিত্তিতে মুতার বৈধতা ও অবৈধতার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন?

৪. হযরত জাবির (রা) বর্ণিত এ হাদীসটি মুসলিম শরীফের হজ্জ অধ্যায় 'ইহ্রামের বর্ণনা' শিরোনামে উল্লিখিত হয়েছে। এ শিরোনামে ইহ্রামের নিয়মাবলী সম্পর্কিত হাদীসসমূহ একত্র করা হয়েছে। এ প্রসংগে ইমাম মুসলিম হযরত জাবিরেরও বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। এতে তিনি বলেন, আমরা কেবল হজ্জের নিয়ত করে মদীনা থেকে বের হয়েছিলাম। ৪ঠা যিলহজ্জ তারিখে রসূলুল্লাহ (স) মক্কায় পৌঁছে বললেন যে, তোমাদের মধ্য থেকে যারা হাদী (কোরবানীর পশু) আনেনি তারা ইহরাম খুলতে পারে এবং নিজেদের স্ত্রীদের সাথে মিলিত হতে পারে। এটা তাঁর নির্দেশ ছিলনা বরং তিনি বলতে চাচ্ছিলেন যে, তোমরা ইহরাম খুলে এমনটি করতে পারো। কাজেই আমরা কাবা শরীফের তাওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করার পর নিজেদের স্ত্রীদের নিকট গেলাম। এ সময় যারা ইহ্রাম খুলতে ইতস্তত করছিল রসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে বুঝালেন, আমি তোমাদের চাইতে আল্লাহকে অধিক ভয় করি। যদি আমি হাদী সংগে করে না আনতাম, তাহলে তোমাদের সাথে আমিও ইহ্রাম খুলতাম। এ কথা শুনে সবাই নিশ্চিত হয়ে তাঁর নির্দেশ পালন করলো।

এ ঘটনা বর্ণনা করার পেছনে হযরত জাবিরের (রা) যে উদ্দেশ্য ছিল তা হলো, এরপরও বহু লোকের মন থেকে এ সন্দেহ নির্মূল হয়নি যে, ইহ্রাম বেঁধে হজ্জের পূর্বে মক্কায় পৌঁছে তাওয়াফ ও সাফা–মারওয়ার মধ্যস্থলে দৌড়াদৌড়ি করার পর কোনো ব্যক্তি ইহ্রাম খুলতে পারে কিনা এবং হজ্জের জামানায় সে হারেম শরীফ থেকেই ইহ্রাম বাঁধতে পারে কিনা। এই সন্দেহ নিরসনের জন্যেই হযরত জাবির (রা) অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বলেন, রসূলুল্লাহর (স) জামানায়ও আমরা এমন অবস্থায় আরাফাতে পৌঁছেছিলাম যখন 'তাকতুরু মাযাকিরুনাল মনী'। এই প্রকাশভংগীর কারণে যদি কেউ নাসিকা কুঞ্চন করতে চান, তাহলে করতে পারেন, তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু এর মাধ্যমে হযরত জাবির (রা) ঐ সন্দেহবাদীদেরকে যে কথা বলতে চাচ্ছিলেন তা ছিল এই যে, আরাফাতে পৌঁছবার মাত্র একদিন পূর্বে তাঁরা স্ত্রী সহবাস করেছিলেন, অতপর সদ্য ইহ্রাম বেঁধে বের হয়েছিলেন। এ সবকিছু তাঁরা রসূলুল্লাহর (স) নির্দেশ অনুযায়ী করেছিলেন। কাজেই এরপর আর কারও সন্দেহ করার কোনো যুক্তিসংগত কারণ থাকতে পারেনা।

৫. হযরত আবুযার গিফারীর (রা) হাদীসটি বুখারী শরীফের 'সৃষ্টির সূচনা' অধ্যায়ে 'সূর্য ও চন্দ্রের গুণাবলী' শিরোনামে উদ্ধৃত হয়ছে। আপনি এর যে সংক্ষিপ্তসার পেশ করেছেন তা যথার্থ নয়। এর সঠিক তর্জমা নিম্নরূপঃ

রসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করেনঃ জানো, সূর্য অস্তমিত হয়ে কোথায় যায়? আমি বললামঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল ভালো জানেন। তিনি বললেনঃ সূর্য গিয়ে

আরশের নীচে সিজদা করে এবং অনুমতি চায় (আবার পূর্বদিক থেকে উদিত হবার) এবং তাকে অনুমতি দান করা হয়। এমন এক সময় আসবে যখন সে জিস্‌দা করবে এবং অনুমতি চাইবে কিন্তু তাকে অনুমতি দেয়া হবেনা। তাকে নির্দেশ দেয়া হবে ফিরে যাও। তখন সে পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। অতপর রসূলুল্লাহ (স) এ আয়াতটি পড়েনঃ

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ - (يٰس : ٣٨)

"সূর্য তার কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে এটি হচ্ছে সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ নির্ধারিত।" [ইয়াসিনঃ ৩৮]

এর মধ্যে আসলে যে বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে তা হলো, সূর্য প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর হুকুমের অনুগত। সে আল্লাহর হুকুমে উদিত হয় এবং তাঁরই হুকুমে অস্তমিত হয়। বলা বাহুল্য, আমরা নামাযের মধ্যে যেমন সিজ্‌দা করে থাকি, সূর্যের সিজ্‌দা করা ঠিক সেই অর্থে সিজ্‌দা করা নয়। বরং সূর্যের সিজ্‌দা করা হচ্ছে সেই অর্থে, যে অর্থে কুরআনে দুনিয়ার প্রত্যেকটি বস্তুকে আল্লাহর সম্মুখে সিজ্‌দানত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ সে আল্লাহর নির্দেশের পূর্ণ অনুগত। আবার সূর্যের পশ্চিমও একটি নয় বরং কুরআনের দৃষ্টিতে সূর্যের পশ্চিম হচ্ছে বহু। কারণ প্রতি মুহূর্তে সে দুনিয়ার একটি স্থানে উদিত হয় এবং অন্য স্থানে অস্তমিত হয়। কাজেই অনুমতি নিয়ে উদিত ও অস্তমিত হবার অর্থ হলো প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর অধীন থাকা আর কোনো সময় পশ্চিম থেকে উদিত হওয়াও কোনো আশ্চর্য ব্যাপার নয়। বিশ্বজাহানের আবর্তন ও মাধ্যাকর্ষণ নীতি এবং গ্রহ–নক্ষত্রের গতি যে কোনো মুহূর্তে ওলট–পালট হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিদগণের মধ্যে একজনও এই নীতিকে অপরিবর্তনীয় বলে স্বীকার করেননা এবং এ ব্যবস্থার মধ্যে কোনো পরিবর্তন সূচিত হওয়া বা এর সম্পূর্ণ ওলট–পালট হয়ে যাওয়াকে অসম্ভব মনে করেননা।

অবশ্যি এ হাদীসে উদয়াস্তকে সূর্যের আবর্তনের ফল মনে করা হয়েছে, পৃথিবীর আবর্তনের ফল মনে করা হয়নি। এ সম্পর্কে আপত্তি উথ্‌াপনকারীদের দুটি কথা ভালোভাবে জেনে রাখা উচিত। এক, আল্লাহর নবীগণ বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা সম্পর্কিত বিষয়াবলীর জ্ঞান দান করার জন্যে দুনিয়ায় আসেননি বরং সত্যের নিগূঢ় তত্ত্ব বর্ণনা করার এবং চিন্তা ও কর্মের পরিশুদ্ধির জন্যে দুনিয়ায় এসেছিলেন। পৃথিবী ঘুরে না সূর্য ঘুরে এ কথা ব্যক্ত করা তাঁদের কাজ ছিলনা। বরং তাঁরা ব্যক্ত করতে চাচ্ছিলেন যে, একই আল্লাহ পৃথিবী ও সূর্যের মালিক, শাসক ও পরিচালক এবং প্রত্যেকটি বস্তু প্রতি মুহূর্তে তাঁরই বন্দেগী করছে। দুই, প্রচারকের সমকালীন বস্তু–বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে

হাজার বছর পরের বস্তু-বিজ্ঞানকে সত্যের নিদূঢ় তত্ত্ব শিক্ষা দানের মাধ্যমে পরিণত করা প্রচার টেকনিকের পরিপন্থী। সত্যের যে নিগূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ংগম করাবার দায়িত্ব তাঁর উপর বর্তায়, তাকে যথাযথরূপে হৃদয়ংগম করাবার জন্যে তাঁকে অবশ্যি নিজের যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহায্য গ্রহণ করতে হয়। অন্যথায় শত শত বছর পর মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান যে পর্যায়ে উপনীত হবে তার ভিত্তিতে যদি তিনি সত্যের বাণী প্রচার করতে থাকেন, তাহলে তাঁর সমকালীন লোকেরা তাঁর শিক্ষাকে শিঁকেয় তুলে রেখে তিনি কী আশ্চর্য ও বিস্ময়কর কথা বলছেন, সে আলোচনায় মত্ত হয়ে উঠবে। তিনি যে শিক্ষা প্রচার করছিলেন, তাতে একজনও প্রভাবিত হবেনা। এখন আপনি নিজেই চিন্তা করুন, কোনো নবীর শিক্ষা যদি তাঁর সমকালীন লোকেরা বুঝতে না পারে এবং তাঁর যুগের লোকদের মধ্যেই যদি তা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম না হয়, তাহলে পরবর্তী যুগের লোকদের নিকট তা কেমন করে পৌছবে? আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে যদি উপরোল্লিখিত হাদীসটির অর্থ এমনভাবে বর্ণনা করা হতো যার ফলে শ্রোতা সূর্যের পরিবর্তে পৃথিবীর আবর্তনকে উদয়াস্তের কারণ মনে করতো, তাহলে অবশ্য আজকের যুগের লোকেরা একে একটি অলৌকিক তত্ত্ব মনে করতো এতে সন্দেহ নেই, কিন্তু আপনার মতে তৎকালীন লোকেরা এই অলৌকিক তত্ত্বকে কিভাবে স্বাগত জানাতো? উপরন্তু এই তত্ত্বের মাধ্যমে যে প্রকৃত সত্য তাদের মন-মস্তিষ্কে অনুপ্রবেশ করানো আসল উদ্দেশ্য ছিল, তাতে কতদূর সাফল্য অর্জিত হতো? আর সেই যুগের লোকেরাই যখন এই ধরনের "অলৌকিক তত্ত্বের" বদৌলতে ঈমান আনা থেকে বঞ্চিত থাকতো, তখন এই অলৌকিক তত্ত্ব আপনাদের নিকট পৌছুতই বা কেমন করে এবং আপনাদের নিকট না পৌছলে তার উপর বাহ্‌বা দেবার সুযোগই বা আপনারা পেতেন কেমন করে?

৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত এ হাদীসটি বুখারী শরীফের 'নামাযের সময়' অধ্যায়ে 'গ্রীষ্মকালে ঠান্ডার মধ্যে যোহরের নামায পড়া' শিরোনামে উদ্ধৃত হয়েছে। এর সংক্ষিপ্তসারও আপনি যথার্থভাবে বিবৃত করেননি। এর সঠিক তরজমা এরূপ রসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ গরমের সময়ে যোহরের নামায ঠান্ডা করে পড়ো (অর্থাৎ দেরী করে পড়ো, যখন রৌদ্রের প্রখরতা কমে যায়)। কারণ গ্রীষ্মের প্রাখর্য হচ্ছে জাহান্নামের ফুৎকার। জাহান্নাম তার রবের নিকট অভিযোগ করে, হে আমার রব! আমার অংশগুলো পরস্পরকে খেয়ে ফেলছে। তার রব তাকে দু'বার নিঃশ্বাস নেবার অনুমতি দেন! একবার শীতকালে এবং অন্যবার গ্রীষ্মকালে। গ্রীষ্মকালে তোমরা যে তীব্রতম উত্তাপের সম্মুখীন হও জাহান্নামের উষ্ণশ্বাস ঠিক সেই পর্যায়ের উত্তপ্ত হয়। অনুরূপভাবে শীতকালে তোমরা যে তীব্রতম শীতের সম্মুখীন হও জাহান্নামের শীতল শ্বাস ঠিক তেমনি হিমশীতল হয়।"

এ হাদীসটি সম্পর্কে আপত্তি করার পূর্বে একটি বিষয় চিন্তা করুন যে, এ হাদীসটি বর্ণনা করার পেছনে রসূলুল্লাহর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে? তিনি কি একজন ভূ–বিজ্ঞানীর ন্যায় ঋতু পরিবর্তনের কারণ বর্ণনা করতে চাচ্ছিলেন? অথবা একজন নবী হিসেবে উত্তাপের কষ্ট অনুভবকারীদের মনে জাহান্নামের ধারণা সৃষ্টি করতে চাচ্ছিলেন? কুরআন ও রসূলুল্লাহর (স) জীবন সম্পর্কে যে ব্যক্তি সামান্য চিন্তাও করেছে সে নির্দ্বিধায় বলে দেবে যে, রসূলুল্লাহ (স) প্রথম দলের নন দ্বিতীয় দলের অন্তর্ভুক্ত। আর গ্রীষ্মের তীব্রতা যখন চরমে পৌঁছে, তখন যোহরের নামায ঠান্ডা করে পড়ার হুকুম দিয়ে তিনি যা কিছু বলেছেন তার মাধ্যমে তিনি মানুষকে জাহান্নামের ভয় দেখাতে এবং যে সব কাজ মানুষকে জাহান্নামের দিকে পরিচালিত করে সেগুলো থেকে তাকে বিরত রাখতে চাচ্ছিলেন। এ দিক দিয়ে তাঁর এ বাণী তাবুক যুদ্ধের সময় অবতীর্ণ কুরআনের এ বাণীর সাথে সামঞ্জস্যশীলঃ

وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا - (التوبة : ٨١)

"তারা বললোঃ প্রচন্ড এই গরমের মধ্যে জিহাদে রওয়ানা হয়োনা! হে নবী! তুমি তাদেরকে বলে দাও, জাহান্নামের আগুন এর চাইতেও গরম।" [তাওবাঃ ৮১]

কুরআন যেমন এখানে বিজ্ঞানের কোনো বিষয় বর্ণনা করছেনা, অনুরূপভাবে রসূলুল্লাহর (স) এ হাদীসও বিজ্ঞানের শিক্ষা দান করার জন্যে উক্ত হয়নি। কুরআন দুনিয়ার গরমকে জাহান্নামের সাথে তুলনা করেছে। এর কারণ হলো, এর পটভূমিকায় এমন সব লোক ছিল যারা এই গরমের ভয়ে ভীত হয়ে জিহাদে যেতে গড়িমসি করছিল। অনুরূপভাবে রসূলুল্লাহরও (স) দুনিয়ার তীব্রতম উষ্ণতা ও তীব্রতম শৈত্যকে মাত্র জাহান্নামের দুটি ফুৎকারের সমান বলার কারণ হচ্ছে এই যে, তাঁর সম্মুখে এমন অনেক লোক ছিল যারা শীতকালে ফযরের এবং গ্রীষ্মকালে যোহরের নামাযের জন্যে বের হতে ভয় করছিল। মুসনাদে আহমদে যায়েদ ইবনে সাবিতের (রা) এ বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছেঃ

لم يكن يصلي صلوة اشد على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها.

"রসূলুল্লাহর (স) সাহাবাগণের জন্যে যোহরের নামাযের চাইতে কঠিন নামায আর কিছুই ছিলনা।"

গ্রীষ্মকালের দুপুরে যে ব্যক্তি কোনো দিন আরবে অবস্থান করেছেন তিনি এ

কথার সত্যতা স্বীকার করবেন।

অতপর হাদীসের আসল শব্দের আলোচনায় আসুন।

فان شدة الحرّ من فيح جهنم -

"উত্তাপের প্রাখর্য জাহান্নামের ফুৎকার"

এর অর্থ অবশ্যি এ নয় যে, জাহান্নামের ফুৎকারে দুনিয়ার উত্তাপ সৃষ্টি হয়। বরং এর অর্থ এও হতে পারে যে, দুনিয়ার এই উত্তাপ জাহান্নামের ফুৎকারেরই মতো বা ঐ জাতীয়। কারণ আরবী ভাষায় 'মিন' শব্দটি এক জাতীয় বা এক ধরনের বস্তু বিবৃত করার জন্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, কুরআনেও এর বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমনঃ

١. وقالوا مهما تاتنا به من اية -

٢. ما يفتح الله للناس من رحمته -

٣. اجتنبوا الرجس من الاوثان -

আর শেষ বাক্যটিতে এ কথা বলা হয়নি যে, জাহান্নামের ঐ দুটি ফুৎকারের কারণে দুনিয়ায় গ্রীষ্মকাল ও শীতকাল সৃষ্টি হয়। বরং সেখানে আসল শব্দ হচ্ছেঃ

فاذن لها بنفسين، نفس فى الشتاء ونفس فى الصيف اشد ما تجدون من الحرّ واشد ما تجدون من الزمهرير -

অর্থাৎ "তার রব তাকে দু'বার নিঃশ্বাস ফেলার অনুমতি দেন। একবার শীতকালে আর একবার গ্রীষ্মকালে। তোমরা যে তীব্রতম গরম অনুভব করো গ্রীষ্মকালের শ্বাসটি তদ্রুপ আর তোমরা যে তীব্রতম শীত অনুভব করো শীতকালের শ্বাসটি তদ্রুপ।"

৭-৮. এ হাদীস দুটি মুসলিম শরীফের হায়েয অধ্যায়ে নারী ও পুরুষের বীর্যের স্বরূপ শিরোনামে এবং বুখারী শরীফের ইল্‌ম, গোসল, শিষ্টাচার ও আম্বিয়া অধ্যায়ে বিভিন্ন শিরোনামে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু এগুলোর অর্থও আপনি ভুল বর্ণনা করেছেন। আসলে বিভিন্ন হাদীসে যে কথাটি বর্ণনা করা হয়েছে তা হলো এই যেঃ

উম্মে সলীম (রা) এসে রসূলুল্লাহকে (স) জিজ্ঞেস করেন, পুরুষরা স্বপ্নে যা কিছু দেখে মেয়েরাও যদি তাই দেখে (অর্থাৎ তাদেরও যদি স্বপ্নদোষ হয়) তাহলে তারা কি করবে? রসূলুল্লাহ (স) জবাব দেনঃ তাহলে গোসল করবে। এ কথা শুনে হযরত উম্মে সালামা (রা) জিজ্ঞেস করেনঃ মেয়েদেরও কি এমনটি

হয়? তাঁর বক্তব্য ছিল এই যে, মেয়েদেরও কি স্বপ্নদোষ ও বীর্যপাত হয়? রসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ

نعم فمن اين يكون الشبه ان ماء الرجل غليظ ابيض و ماء المرأة رقيق اصفر فمن ايهما علا او سبق يكون منه الشبه،

"অবশ্যি! নইলে সন্তান মায়ের মতো হয় কেমন করে? পুরুষের বীর্য হয় ঘন এবং সাদাটে আর নারীর বীর্য হয় পাত্‌লা এবং হলদে। অতপর তাদের মধ্য থেকে যে শক্তিশালী হয় বা যে অগ্রবর্তী হয় সন্তান তার মতো হয়।"

অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে, জনৈক মহিলার প্রশ্নে হযরত আয়েশাও (রা) অনুরূপ বিস্ময় প্রকাশ করলে রসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ

وهل يكون الشبه لابن قبل ذالك اذا علا ماؤها ماء الرجل اشبه الولد اخواله و اذا علا ماء الرجل ماءها اشبه الولد اعمامه۔

"সন্তানের মায়ের মতো হবার পেছনে কি এছাড়া অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে? যখন নারীর বীর্য পুরুষের উপর আধিপত্যশালী হয়, তখন সন্তান মায়ের খান্দানের লোকদের মতো হয়। আর যখন পুরুষের বীর্য নারীর বীর্যের উপর আধিপত্যশালী হয়, তখন সন্তান পিতার খান্দানের মতো হয়।"

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, জনৈক ইহুদী আলিম রসূলুল্লাহর (স) নিকট সন্তান সম্পর্কে প্রশ্ন করলে জবাবে তিনি বলেনঃ

ماء الرجل ابيض و ماء المرأة اصفر فاذا اجتمعوا فعلا منى الرجل منى المرأة اذكرا باذن الله و اذا علا منى المرأة منى الرجل انثا باذن الله ـ

"পুরুষের বীর্য সাদাটে এবং নারীর বীর্য হলদেটে হয়। যখন এ দুটি মিলিত হয় এবং পুরুষের বীর্য নারীর বীর্যের উপর আধিপত্যশালী হয় তখন আল্লাহর হুকুমে পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে। আর যখন নারীর বীর্য পুরুষের বীর্যের উপর আধিপত্যশালী হয়, তখন আল্লাহর হুকুমে কন্যা সন্তান জন্মলাভ করে।"

জানিনা আপনি কোন্ শব্দটি থেকে এ অর্থ গ্রহণ করেছেন যে, "এই মিশ্রিত পদার্থটি সাদাটে হলে পুত্র সন্তান জন্মে অন্যথায় কন্যা সন্তান জন্মে।" উপরন্তু আপনি কোন্ বাক্যটির এ তর্জমা করেছেন যে, "যদি মিলনের সময় নারীর পূর্বে

পুরুষের বীর্যপাত হয়, তাহলে সন্তান পিতার ন্যায় হয় অন্যথায় মাতার ন্যায়?" আসল হাদীসে যে কথা বলা হয়েছে তার বুদ্ধি-জ্ঞান বিরোধী হবার ব্যাপারে যদি কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ থাকে, তাহলে পেশ করা হোক।

৯. এই ধরনের হাদীস বুখারী শরীফের 'আম্বিয়া', 'অনুমতি প্রার্থনা' ও 'আকীকা' অধ্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু সর্বত্র 'ইখতাতানা' اختتن শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হলো, হযরত ইবরাহীম (আ) স্বহস্তে নিজের খাত্না করেছিলেন। আর কোনো ব্যক্তি নিজেই যখন এ কাজ করতে পারেন, তখন আশি বছরের এক বৃদ্ধ ডাক্তার ডাকিয়ে এ কাজ সমাধা করেছেন, এ অর্থ কেন গ্রহণ করা হয়? উপরন্তু মুসনাদে আবী ইয়ালীতে এর যে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় তা ব্যাপারটিকে একেবারেই পরিষ্কার করে দেয় যে, হযরত ইবরাহীম (আ) নিজে নিজেই এ কাজটি সমাধা করেছিলেন। মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন ইবরাহীমকে (আ) খাত্না করার হুকুম দেয়া হয়, তখন তিনি কুদুম (কর্মকারের একটি অস্ত্র) নিয়ে স্বহস্তে খাত্না করে নেন। এর ফলে তাঁর ভীষণ কষ্ট হয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাহা নাযিল হয়ঃ 'হে ইবরাহীম! তুমি চটপট কাজটা সমাধা করলে, নয়তো আমি নিজেই তোমাকে এর উপযোগী যন্ত্রের সন্ধান দিতাম। তিনি বললেনঃ হে আমার রব! তোমার হুকুম তামিল করতে বিলম্ব হবে, এটা আমার পছন্দ হয়নি।" (ফতহুল বারীঃ ৬ষ্ঠ খন্ড ২৪৫ পৃষ্ঠা)

১০. এ বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস বুখারী শরীফের আম্বিয়া, জিহাদ এবং ঈমান ও নজরানা অধ্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে। এ হাদীসগুলোর কোনোটিতে হযরত সুলাইমানের (আ) স্ত্রীর সংখ্যা বলা হয়েছে ৬০, কোনোটিতে বলা হয়েছে ৭০, কোনোটিতে বলা হয়েছে ৯০, কোনোটিতে বলা হয়েছে ৯৯, আবার কোনোটিতে বলা হয়েছে ১০০। প্রত্যেকটি হাদীস পৃথক পৃথক ব্যক্তিদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। এত বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে যে হাদীস মুহাদ্দিসগণের নিকট পৌঁছেছে, তাকে একেবারেই ভিত্তিহীন বলা বড় কঠিন। কিন্তু মনে হয় রসূলুল্লাহর (স) বক্তব্য অনুধাবন করতে হযরত আবু হুরাইরার (রা) কোনো ভুল হয়ে থাকবে অথবা তিনি রসূলুল্লাহর (স) কথা পুরোপুরি শুনতে পাননি। সম্ভবত রসূলুল্লাহ (স) এ কথা বলে থাকবেন যে, হযরত সুলাইমানের (আ) বহু স্ত্রী ছিল, ইহুদীরা তাদের সংখ্যা ৬০, ৭০, ৯০, ৯৯ ও ১০০ পর্যন্ত বলে থাকে; আর হযরত আবু হুরাইরা (রা) মনে করে থাকবেন যে, এটি রসূলুল্লাহর (স) নিজের ভাষণ। অনুরূপভাবে এও সম্ভব যে, রসূলুল্লাহ (স) হযরত সুলাইমানের বক্তব্যকে এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ "আমি আমার প্রত্যেক স্ত্রীর সাথে মিলিত হবো এবং প্রত্যেকের গর্ভে একজন করে মুজাহিদ জন্ম নেবে।" আর হযরত আবু হুরাইরা (রা) মনে করেছেন যে, "এক রাতে মিলিত হবো" বহু হাদীস থেকে এ

ধরনের ভুল বুঝার দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে এবং অন্য একাধিক হাদীস এই ভুল বুঝার নিরসন করেছে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর সুযোগ ঘটেনি। 'বাচনিক' হাদীসের ক্ষেত্রে এ ধরনের ব্যাপার সংঘটিত হওয়া মোটেই বিস্ময়কর নয়। এই জাতীয় কতিপয় দৃষ্টান্ত খাড়া করে সমস্ত হাদীসকে অনির্ভরযোগ্য গণ্য করা কোন সুবিবেচক ব্যক্তির কাজ হতে পারেনা।

আর 'ইনশাআল্লাহ' সম্পর্কে বলা যায় যে, হযরত সুলাইমান (আ) জেনে-বুঝে ইনশাআল্লাহ বলেননি, এ কথা কোনো হাদীসেই উক্ত হয়নি। কাজেই এতে নবীদের অমর্যাদার কোনো কারণ দেখা যায়না। "জনৈক ব্যক্তি বললো, এই সংগে ইনশাআল্লাহও বলুন, কিন্তু তিনি এর পরোয়া করলেননা" –এ কথা আপনি কোন্ হাদীসে দেখেছেন? হাদীসে যে শব্দগুলো উল্লিখিত হয়েছে তা হচ্ছে নিম্নরূপঃ

فقال له صاحبه ان شاء الله فلم يقل -

অর্থাৎ তাঁর সাথী তাঁকে বললোঃ 'ইনশাআল্লাহ, কিন্তু তিনি বললেন না।' এর অর্থ হলো, হযরত সুলাইমানের মুখ থেকে যখন এ কথা বের হলো, তখন নিকটে উপবিষ্ট তাঁর জনৈক সাথী নিজেই বললোঃ 'ইনশাআল্লাহ' এবং হযরত সুলাইমান তার বলাটাকেই যথেষ্ট মনে করলেন, নিজে আর তার পুনরাবৃত্তি করলেননা।

১১. এ হাদীসটি বুখারী শরীফের উযু অধ্যায়ে বিভিন্ন শিরোনামে উদ্ধৃত হয়েছে এবং হাদীসের অন্যান্য গ্রন্থেও এর উল্লেখ আছে। কিন্তু কোনো হাদীসে হযরত হুযাইফার (রা) মুখ থেকে এ শব্দগুলো উচ্চারিত হয়নি যে, "রসূলুল্লাহ (স) আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে পেশাব করেন।" আপনি বলতে পারেন, এ বাক্য আপনি কোথায় পেলেন? তাঁর আসল শব্দাবলী হচ্ছে নিম্নরূপঃ 'আমি ও রসূলুল্লাহ (স) পথ চলছিলাম, পথে রসূলুল্লাহ (স) একটি দেয়ালের পেছনে অবস্থিত একটি আবর্জনা স্তূপের দিকে গেলেন। তিনি দাঁড়ালেন যেমন তোমাদের কেউ দাঁড়ায় অতপর পেশাব করলেন।। আমি দূরে সরে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে ইশারা করলেন এবং আমি তাঁর পেছনে এসে দাঁড়ালাম। অবশেষে তাঁর পেশাব করা শেষ হলো।' এ থেকে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ (স) দেয়াল ও আবর্জনা স্তূপের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে পেশাব করেন। এভাবে সামনে পেছনে উভয় দিক থেকে অন্তরাল সৃষ্টি হয়। এবং তিনি হযরত হুযাইফাকে (রা) পেছনে দাঁড় করান, কারণ এ অবস্থায় দেখা যাবার সকল সম্ভাবনাই তিরোহিত হয়।

এখানে এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে, নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহ থেকে জানা যায়, রসূলুল্লাহ (স) হামেশা বসে বসে পেশাব করতেন। কিন্তু এ সময় কোনো অসুবিধার কারণে তিনি দাঁড়িয়ে পেশাব করেন। হযরত হুযাইফার (রা) সময়ে অনেক লোক দাঁড়িয়ে পেশাব করাকে চরম অবৈধ বলে গণ্য করতে শুরু করেছিল, তাই তিনি এ হাদীসটি বর্ণনা করেন।

১২. এ হাদীসটি বুখারীর 'কিতাবু আহাদীসিল আম্বিয়া' ও মুসলিমের বাবু 'ইছ্বাতিশ শাফায়াতে' রয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য হাদীস গ্রন্থেও উদ্ধৃত হয়েছে। এসব হাদীসের সনদ এবং বিপুল সংখ্যক বর্ণনা পরম্পরার প্রতি দৃষ্টি দিলে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুই যে এই হাদীসগুলোর মূল বর্ণনাকারী, সে ব্যাপারে কারোর সন্দেহ থাকেনা। কেননা এত বিপুল সংখ্যক বর্ণনাকারীর ব্যাপারে বিশেষ করে যখন তাদের অধিকাংশই এবং বেশীর ভাগই নির্ভরযোগ্য ছিলেন এ ধারণা করা যেতে পারেনা যে, তাঁরা একজন সাহাবীর নাম নিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে একটি মিথ্যা হাদীস রচনা করে থাকবেন। আর হযরত আবু হুরাইরা (রা) সম্পর্কে আমরা এ সন্দেহ করতে পারিনা যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কোনো বেঠিক কথা সম্পৃক্ত করে দেবেন। কিন্তু আমাদের জন্য এই বর্ণনাকারীদেরকে মিথ্যুক মনে করা যতটা কঠিন তার চেয়ে অনেক বেশী কঠিন এ কথা মনে করা যে, একজন নবী মিথ্যা বলে থাকবেন, অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (নাউযুবিল্লাহ) একজন নবীর বিরুদ্ধে মিথ্যা বলার মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকবেন। তাই অনিবার্যভাবে আমরা এ কথা মনে করতে বাধ্য যে, এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই কোনো ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে, যে কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি সঠিকভাবে উদ্ধৃত হয়নি। এর প্রমাণ হচ্ছে, এই হাদীসে ইবরাহীমের যে তিনটি মিথ্যার বর্ণনা দেয়া হয়েছে তার মধ্যে দুটি তো মোটেই মিথ্যা নয় এবং তৃতীয় মিথ্যাটি আসলে বনী ইসরাঈলদের মিথ্যা, যা তারা বাইবেলে এক জায়গায় নয় বরং দু' জায়গায় হযরত ইবরাহীমের সাথে সম্পৃক্ত করেছে।

প্রথম ঘটনাটি কুরআন মজীদে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু তার কোনোটিকে আল্লাহ মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করেননি এবং ঘটনার প্রকৃত চিত্র থেকে মিথ্যা হবার কোনো প্রমাণও পাওয়া যায়না। প্রথম ঘটনাটি হচ্ছে, যখন হযরত ইবরাহীমের গোত্রের ও পরিবারের লোকেরা নিজেদের একটি মুশরিকী অনুষ্ঠান সর্বস্ব মেলায় যাবার জন্য শহর থেকে বের হতে থাকে, তখন তিনি إِنِّي سَقِيمٌ (আমি অসুস্থ) এই ওজর পেশ করে তাদের পেছনে শহরে থেকে যান। একে মিথ্যা গণ্য করতে হলে প্রথমে কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে এ কথা জানা প্রয়োজন যে, সে সময় হযরত ইবরাহীম (আ) একেবারেই সুস্থ ছিলেন এবং তাঁর কোনো রকম অসুস্থতা ছিলনা। কিন্তু আল্লাহ ও রসূল কেউই এ কথা জানাননি। তাহলে কিসের ভিত্তিতে একে মিথ্যা গণ্য করা হবে?

দ্বিতীয় ঘটনাটি হলো, হযরত ইবরাহীম (আ) যখন নিজ জাতির মূর্তি মন্দিরে প্রবেশ করে শুধুমাত্র বড় মূর্তিটি ছাড়া বাকি সমস্ত মূর্তি ভেঙে ফেলেন, তখন জাতির লোকেরা এ ব্যাপারে তাঁকেই সন্দেহ করে। কাজেই তাঁকে ডাকা হয়। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয় আমাদের খোদাদের সাথে এই ব্যবহার তুমি

করেছো? তিনি জবাব দেনঃ

بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَسْئَلُوْهُمْ إِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ - (الانبياء : ٦٣)

"বরং এ কাজ এঁদের এই বড়টাই করেছে। এই আহত মূর্তিগুলোকে জিজ্ঞেস করো, যদি এরা কথা বলতে পারে।" (আম্বিয়াঃ ৬৩১)

এই বাক্যের শব্দগুলো পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) মিথ্যা বিবৃতি হিসেবে নয় বরং শিরকের বিরুদ্ধে একটি প্রমাণ হিসেবে এই বাক্যটি বলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল প্রশ্নকারীদেরকে এই সত্যটি সম্পর্কে সজাগ করে দেয়া যে, তোমাদের এসব কেমন ধরনের খোদা, যারা নিজেদের বিপদের কাহিনীটুকু পর্যন্ত বলতে পারেনা? আর তোমাদের এই বড় খোদাটাই বা কেমন যার ব্যাপারে তোমরা নিজেরাই জানো যে, সে কোনো একটা কাজ করার ক্ষমতা রাখেনা? যুক্তি তত্ত্ব বুঝার সামান্য ক্ষমতা আছে এমন একজন সাধারণ লোকও তো একে মিথ্যা বলতে পারেনা। এ ক্ষেত্রে আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে কেমন করে এই কুধারণা করি যে, তিনি একে মিথ্যা বলেছিলেন?

আর তৃতীয় "মিথ্যাটি" সম্পর্কে বলতে হয়, সেটি আসলে বাইবেলে নবীদের নামে যে সব মনগড়া কাহিনী তৈরি করা হয়েছে সেগুলোরই একটি। বাইবেলের আদি পুস্তকে এ ঘটনাটি এক জায়গায় নয় বরং দু'জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম ঘটনাটি মিসরের এবং তা বাইবেলের ভাষায়ঃ

> "আর আব্রাম যখন মিসরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হন, তখন নিজের স্ত্রী সারাকে কহিলেন, দেখ, আমি জানি, তুমি দেখিতে সুন্দরী; এ কারণ মিস্রীয়েরা যখন তোমাকে দেখিবে, তখন তুমি আমার স্ত্রী বলিয়া আমাকে বধ করিবে, আর তোমাকে জীবিত রাখিবে। বিনয় করি, এই কথা বলিও যে, তুমি আমার ভগিনী। .... মিস্রীয়েরা ঐ স্ত্রীকে পরমা সুন্দরী দেখিল। .... সেই স্ত্রী ফরৌনের বাটিতে নীত হইলেন। .... কিন্তু আব্রামের স্ত্রী সারার জন্য সদাপ্রভু ফরৌন ও তাঁহার পরিবারের উপরে ভারী ভারী উৎপাত ঘটাইলেন। তাহাতে ফরৌন আব্রামকে ডাকিয়া কহিলেন, আপনি আমার সহিত একি ব্যবহার করিলেন? উনি আপনার স্ত্রী এ কথা আমাকে কেন বলেন নাই? উহাকে আপনার ভগিনী কেন বলিলেন? আমিত উহাকে বিবাহ করিতে লইয়াছিলাম।" (১২ঃ ১১-২০)

মজার ব্যাপার হলো, বাইবেলের নিজেরই বক্তব্য অনুসারে সে সময় হযরত সারার বয়স ছিল ৬৫ বছর। এরপর দ্বিতীয় ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে

ফিলিস্তিনের দক্ষিণ এলাকার। সেটি হলোঃ

> *"আর আব্রাম আপন স্ত্রী সারার বিষয়ে কহিলেন, এ আমার ভনিগী; তাহাতে সরারের রাজা অবীমেলক লোক পাঠাইয়া সারাকে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু রাত্রিতে ঈশ্বর স্বপ্নযোগে অবীমেলকের নিকটে আসিয়া কহিলেন, দেখ, ঐ যে নারীকে গ্রহণ করিয়াছ তাহার জন্য তুমি মৃত্যুর পাত্র, কেননা সে এক ব্যক্তির স্ত্রী। .... পরে অবীমেলকে আব্রামকে ডাকাইয়া কহিলেন, আপনি আমাদের সহিত এ কি ব্যবহার করিলেন? আমি আপনার কাছে কি দোষ করিয়াছি যে, আপনি আমাকে ও আমার রাজ্যকে এমন মহাপাপগ্রস্ত করিলেন?" (২০ঃ ২-১৬)*

বাইবেলের নিজের বর্ণনা অনুযায়ী এ সময় হযরত সারার বয়স ছিল ৯০ বছর। এ দুটি কাহিনী নিজেই বলে দিচ্ছে, এগুলো একেবারেই মিথ্যা এবং আমরা কোনো ক্রমেই কল্পনা করতে পারিনা যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগুলোকে সত্য বলেছেন।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, যদি এ তিনটি কথা বুদ্ধির দৃষ্টিতে অসত্য হয়ে থাকে, তাহলে মুহাদ্দিসগণ নিজেদের কিতাবে এগুলি সংযুক্ত করলেন কেন? এর জবাব হলো, বুদ্ধিবৃত্তির সম্পর্ক হচ্ছে হাদীসের মূল বিষয়বস্তুর সাথে এবং রেওয়ায়েত বা বর্ণনার সম্পর্ক হচ্ছে পুরোপুরি সনদ বা বর্ণনা পরম্পরার সাথে। বর্ণনাকারী তথা মুহাদ্দিসগণ যে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন তা মূলত এই ছিল যে, নির্ভরযোগ্য উপায়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানার সাথে সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে একত্র করবেন। এ দায়িত্ব তাঁরা পালন করেছেন। তারপর বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্লেষণকারীদের কাজ হচ্ছে, তারা মূল বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে ঐ রেওয়ায়েতগুলো থেকে কাজের কথা তথা প্রয়োজনীয় বিষয় বের করে নেবেন। যদি মুহাদ্দিসগণ বিশ্লেষণের কাজে লেগে যেতেন এবং বিষয়বস্তুর সমালোচনা করে এমন সব রেওয়ায়েত প্রত্যাখ্যান করে যেতে থাকতেন যেগুলোর বিষয়বস্তু তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত রায় অনুযায়ী সঠিক নয়, তাহলে আমরা আজ এমন বহুতর হাদীস থেকে বঞ্চিত থেকে যেতাম যা হাদীস লিপিবদ্ধকারীদের দৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয় ছিল, কিন্তু অন্য বহু লোকের দৃষ্টিতে প্রয়োজনীয়। তাই মুহাদ্দিসগণ সনদ সমালোচনার মধ্যেই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নিজেদের কর্মতৎপরতা সীমাবদ্ধ রেখেছেন এবং বিষয়বস্তু বিশ্লেষক ও সমালোচকদের জন্য নির্ভরযোগ্য সূত্র মাধ্যমে তথ্যাদি সংগ্রহ করে দিয়েছেন, এমনটি করাই যথার্থ ছিল।

১৩. এ হাদীসটি বুখারী শরীফের 'সৃষ্টির সূচনা' অধ্যায়ে 'মুসলমানের সর্বোত্তম সম্পদ হচ্ছে সংকীর্ণ পার্বত্য এলাকায় বিচরণকারী তার মেষ' শিরোনামে এবং 'নবীগণের কথা' অধ্যায়ে আল্লাহর বাণীঃ 'আল্লাহ ইবরাহীমকে

বন্ধু বানিয়ে নিলেন' শিরোনামে উল্লিখিত হয়েছে। এই বিষয়বস্তু সম্বলিত সমস্ত হাদীস একত্রিত করলে যে কথাটি জানা যায় তাহলো, রসূলুল্লাহ (স) গিরগিটিকে হিংস্র জানোয়ারের মধ্যে শুমার করেছিলেন।[১] আবার কোনো কোনো হাদীস থেকে এ কথা জানা যায়, তিনি অন্যান্য হিংস্র জানোয়ারদের ন্যায় একেও হত্যা করতে বলেছিলেন। বুখারী শরীফে উল্লিখিত সর্বাধিক নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য হাদীসে হযরত আয়েশা (রা) বলেছেনঃ

ان النبى صلى الله عليه وسلم قال الوزغ الفويسق ولم اسمعه امر بقتله

অর্থাৎ 'রসূলুল্লাহ (স) গিরগিটিকে হিংস্র বলেছেন, কিন্তু তিনি তাকে হত্যা করার হুকুম দিয়েছেন, এটা আমি শুনিনি।'

মুসনাদে আহমদ ও ইবনে মাজায় হযরত আয়েশার (রা) অন্য একটি হাদীসও উদ্ধৃত হয়েছে, তাতে গিরগিটিকে হত্যা করার উল্লেখ আছে এবং হযরত ইবরাহীমের (আ) আগুনে ফুক দেবারও। কিন্তু মশহুর হাদীস সমালোচক ও ব্যাখ্যাতা হাফিয ইবনে হাজার ফতহুল বারী গ্রন্থে লিখেছেনঃ বুখারীর হাদীসটিই অধিকতর নির্ভুল।

আবার বুখারী শরীফের এই হাদীসে এ বাক্যও আছেঃ 'সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের (রা) দাবী ছিল এই যে, রসূলুল্লাহ (স) গিরগিটি হত্যা করার হুকুম দিয়েছিলেন।' কিন্তু হযরত সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের (রা) নিকট থেকে এ কথা কে শুনেছে, এ হাদীসে তা উল্লেখ করা হয়নি। দারু কুত্‌নীতে এ হাদীসটি নিম্নোক্তভাবে উদ্ধৃত হয়েছেঃ 'ইবনে শিহাব সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন।' কিন্তু ইবনে শিহাব হযরত সাআদকে (রা) দেখেননি। কাজেই এটি মুনকাতে[২] হাদীস।

১৪. এ হাদীসটি মুসলিম শরীফের নামায অধ্যায়ে 'মুসাল্লার সুতরা' শিরোনামে উল্লিখিত হয়েছে। এ শিরোনামে ইমাম মুসলিম নির্ভরযোগ্য

---

১. হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (স) কতিপয় জানোয়ারকে হিংস্র গণ্য করে বলেছিলেন যে, এগুলোকে হারেম শরীফে এবং ইহরাম অবস্থায় হত্যা করার অনুমতি আছে। বিছা, পাগলা কুকুর এবং ইঁদুরও এর অন্তর্ভুক্ত।

২. 'মুনকাতে হাদীস' দুই প্রকার। এক, যে হাদীসের শেষের দিকের কোন বর্ণনাকারীর অর্থাৎ সাহাবার নাম বাদ পড়ে, তাকে 'মুনকাতে মুরসাল' বলা হয়। ইমামগণের মধ্যে একমাত্র ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালিক এ ধরনের হাদীস গ্রহণ করেছেন। দুই, যে হাদীসের প্রথম দিকের বর্ণনাকারীর অর্থাৎ সাহাবীর পর এক বা একাধিক নাম বাদ পড়ে, তাকে 'মুনকাত্তে মুয়াল্লাক' বলে। এ ধরনের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের আলোচ্য হাদীসটি এই দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। (অনুবাদক)

বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে 'সুত্রা' সম্পর্কে তাঁর নিকট যতগুলো হাদীস পৌছেছে সবগুলো জমা করেছেন এবং এর সমগ্র দিক আমাদের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। এর মধ্য থেকে কোনো একটি মাত্র হাদীস নিয়ে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ঠিক নয়। বরং সমস্ত হাদীসের ওপর ব্যাপক দৃষ্টিপাতের পরই কোনো সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব। এই হাদীসগুলো থেকে যে মূল কথাটি জানা যায় তাহলো এই যে, রসূলুল্লাহ (স) নামাযীকে নিজের সম্মুখে 'সুত্রা' [১] রাখার হুকুম দিয়েছিলেন এবং এর কারণ দর্শাতে গিয়ে বলেছিলেনঃ সুত্রা ছাড়া কোনো ব্যক্তি যদি কোনো খোলা জায়গায় নামায পড়তে দাঁড়ায়, তাহলে নারী, কুকুর, গাধা সবাই তার সামনে দিয়ে চলে যাবে। এ কথা শুনে কতক লোক এ কথাটিকে এভাবে বর্ণনা করতে শুরু করে যে, নারী, কুকুর ও গাধা সামনে দিয়ে চলে গেলে নামায নষ্ট হয়ে যায়। এ কথা যখন হযরত আয়েশার (রা) কানে পৌছলো, তখন তিনি বললেনঃ

ان المرأة لدابة سوء -

"তাহলে তো মেয়েরা বড় নিকৃষ্ট ধরনের জানোয়ার।"

عدلتمونا بالكلاب والحمر -

"তোমরা তো আমাদেরকে কুকুর ও গাধার পর্যায়ে এনে দাঁড় করালে।"

ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى من الليل وانا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة -

"রসূলুল্লাহ সে) রাত্রে নামায পড়তেন এবং আমি তাঁর ও কেবলার মধ্যস্থলে জানাযার ন্যায় পড়ে থাকতাম।"

১৫. এ বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস বুখারী শরীফের 'সৃষ্টির সূচনা' এবং 'চিকিৎসা' অধ্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে। উপরন্তু ইবনে মাজা, নাসায়ী, আবু দাউদ ও দারু কুত্নীতেও এ হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। অনেক হাদীস ব্যাখ্যাতা এই হাদীসের শব্দাবলীকে শাব্দিক অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁরা এর অর্থ এই মনে করেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে মাছির একটি ডানায় আছে রোগ এবং অন্যটিতে আছে তার ওষুধ। তাই কোনো খাদ্যবস্তুতে মাছি পড়লে তাকে একটি চুবানি দিয়ে বের

---

১ কোন খোলা জায়গায় নামায পড়ার সময় নামাযীর সম্মুখে এমন একটি বস্তু দাঁড় করিয়ে রাখা যা নামাযী ও তাঁর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমকারীর মধ্যে অন্তরাল সৃষ্টি করে।

করে ফেলে দেয়া উচিত।[১] আবার অনেকে এর এ অর্থ নিয়েছেন যে, রসূলুল্লাহ (স) লোকদের অযথা অহংকার নির্মূল করতে চাচ্ছিলেন। দুধ বা তরকারির পাত্রে মাছি পড়লে অনেক লোক তার সম্পূর্ণটাই ফেলে দিতো বা চাকর-বাকরদের দিয়ে দিতো।

এই ধরনের লোকদের অহংকার নির্মূল করার জন্যে রসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ তোমাদের খাদ্যবস্তুতে মাছি পড়লে তাকে একটি চুবানি দিয়ে বের করে ফেলে দাও অতপর খাবারটি খেয়ে নাও। তার একটি ডানায় রোগ আছে অর্থাৎ অহংকার রোগ, তাকে খাদ্যে পড়তে দেখেই এ রোগ তোমাদের মধ্যে জন্মে এবং অন্য ডানায় আছে ওষুধ অর্থাৎ এই অহংকারের ওষুধ- যে অহংকারের ফলে তোমরা খাদ্য ফেলে দাও বা চাকরদের দিয়ে দাও। অন্য বহু হাদীসও এই অর্থটি সমর্থন করে। ঐ হাদীসগুলোতে রসূলুল্লাহ (স) পাত্রে সামান্য খাবার রেখে উঠে যাওয়াকে অপছন্দ করেছেন এবং হুকুম দিয়েছেনঃ তোমাদের পাত্রের সবটুকু খেয়ে নিয়ে তারপর ওঠো। এ নির্দেশের কারণও হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তি এভাবে পাত্রে কিছু রেখে দিয়ে উঠে পড়ে, সে এ কথাই বলতে চায় যে, তার এ অভুক্ত খাদ্যটুকু ফেলে দেয়া হোক বা অন্য কেউ খেয়ে ফেলুক।

সর্বশেষে আপনি বুখারী শরীফের 'আল্লাহর কিতাবের পর সর্বাধিক নির্ভুল কিতাব' হওয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন। এর সংক্ষিপ্ত জবাব হলো, দুনিয়ায় আল্লাহর কিতাবই একমাত্র কিতাব যেটিকে আমরা সবচাইতে বিশ্বস্ত উপায়ে লাভ করেছি। কারণ হাজার হাজার লোক তাকে একইভাবে উদ্ধৃত করেছে। কিন্তু এরপর যে কিতাবটি সবচাইতে নির্ভরযোগ্য বর্ণনার মাধ্যমে আমাদের নিকট পৌঁছেছে, সেটি হচ্ছে বুখারী শরীফ। কারণ অন্যান্য কিতাবের রচয়িতাদের তুলনায় এই কিতাবের রচয়িতা অধিকতর সতর্কতার সাথে বর্ণনাকারীদের যাচাই পর্যালোচনা করেছেন।

এ প্রসংগে এ কথাও জেনে নেয়া প্রয়োজন যে, কোনো বর্ণনার দিক দিয়ে নির্ভুল হলে তার বিষয়বস্তুও সকল দিক দিয়ে নির্ভুল এবং হুবহু গ্রহণযোগ্য হওয়া অপরিহার্য নয়। আমাদের নিজেদের জীবনেই আমরা বারবার দেখেছি, কোনো ব্যক্তির কথাকে অন্যের নিকট পৌঁছবার সময় নির্ভুল বর্ণনার চেষ্টা করা সত্ত্বেও বর্ণনাকারীর বর্ণনায় বহু ত্রুটি থেকে যায়। যেমন অনেকের সমস্ত কথা মনে থাকেনা এবং তার একটি অংশ মাত্র তারা বর্ণনা করে। অনেকে কথাটি হয়তো পুরোপুরি বুঝতে পারেনা, তাই তারা অসম্পূর্ণভাবে

---

১ আধুনিক ভেষজ অনুসন্ধানের মাধ্যমে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, মাছির ডানায় এক বিশেষ ধরনের জীবণু থাকে। এগুলোকে জীবাণু নাশক জীবণু খাদক (Bacteriophge) বলা হয়। এগুলো মাছির শরীরের অন্যান্য জীবাণুকে সহজে ধ্বংস করতে পারে।

মোটামুটি কথাটাই বর্ণনা করে। অনেকে আলোচনার মাঝখানে উপস্থিত হয়, তারা জানতে পারেনা আগে কি কথা হচ্ছিল। এ ধরনের নানান ত্রুটি থাকার কারণে অনেক সময় সদুদ্দেশ্য ও সততা সত্ত্বেও বক্তার কথা যথার্থরূপে উদ্ধৃত হতে পারেনা। অবস্থা ও কর্মের ধারা বিবরণী বর্ণনার ক্ষেত্রেও এই একই ব্যাপার সংঘটিত হয়। কখনো কখনো অপরাপর হাদীস এই ত্রুটিগুলো দূর করে দেয় এবং সমস্ত হাদীস এক সাথে মিলিয়ে দেখলে পূর্ণ চিত্র ভেসে ওঠে। আবার কখনো কখনো একটি মাত্র হাদীসই বর্তমান থাকে (হাদীসের পরিভাষায় একে বলা হয় গরীব), তখন 'রেওয়ায়েত' বা বর্ণনার মাধ্যমে এই ত্রুটি দূর করা যেতে পারেনা এবং 'দেরায়েত' বা বিষয়বস্তু পর্যালোচনার মাধ্যমে রসূলুল্লাহর (স) আসল বক্তব্য কি হতে পারে অথবা এ কথাটি এর বর্তমান আকৃতিতে গ্রহণযোগ্য কিনা অথবা রসূলুল্লাহর (স) মনন ও বাকরীতির সাথে এ কথা সামঞ্জস্যশীল কিনা, এ সম্পর্কে মত প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। হাদীসশাস্ত্রে এতটুকু অনুসন্ধান করার যোগ্যতা যাদের নেই, তাদের প্রথমত হাদীস গ্রন্থসমূহ পাঠ করাই উচিত নয় এবং পাঠ করলেও কমপক্ষে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রকাশ না করা উচিত। [তরজমানুল কুরআন, অক্টোবর-নভেম্বর, ১৯৫২]

রোযা রাখার সক্ষমতা সত্ত্বেও কি ফিদইয়া দেয়া যেতে পারে?

প্রশ্নঃ এখানে কেম্বেলপুরে একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক গত রমযান মাসে একটি ফিত্না সৃষ্টি করেন। তার মতে রমযানের রোযা সম্পর্কে সূরায়ে বাকারার আয়াতসমূহ একই সময় নাযিল হয়। সুতরাং সেখানে রোযা রাখার সক্ষমতা সত্ত্বেও রোযা না রেখে ফিদইয়া আদায় করার যে সুযোগ শুরুতে দেয়া হয়েছে তা একটি অপরিবর্তনীয় অনুগ্রহ বৈকি। আজও এই সুযোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। এ বক্তব্যের দলিল হিসেবে সূরা বাকারার ১৮৩ আয়াতের শেষাংশ পেশ করা হয়। এ অংশে আছে 'যদি রোযা রাখো তাহলে সেটা উত্তম, আর না রাখলে ফিদইয়া আদায় করে দাও।' ভদ্রলোকের বক্তব্য হলো, ১৮৪ নম্বর আয়াতটি প্রথম আয়াতগুলোর সাথেই নাযিল হয়। সুতরাং এ আয়াতটি ১৮৩ নম্বর আয়াতের সুযোগ কিভাবে ছিনিয়ে নিতে পারে।

আপনার তাফসীর অধ্যয়নে জানা গেল ১৮২ ও ১৮৩ আয়াত বদর যুদ্ধের আগে দ্বিতীয় হিজরী সনে নাযিল হয়। আর ১৮৪ আয়াত নাযিল হয় এক বৎসর পর। যদি এ কথাটি স্বপ্রমাণিত হয়, তাহলে আজও একজন সুস্থ সবল লোক ফিদইয়া দিয়ে রোযার ফরয হুকুম থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে এ ধারণা খন্ডন করা সম্ভব।

এই ভদ্রলোক নিজকে হাদীসশাস্ত্রের শিক্ষক এবং কুরআনের ভাষ্যকার

মনে করে থাকেন এবং উভয়টি সম্পর্কে নিজস্ব ধ্যান-ধারণা দুনিয়ার সামনে পেশ করছেন। দয়া করে আপনি কিছুটা কষ্ট স্বীকার করে ১৮২ ও ১৮৩ আয়াত দ্বিতীয় হিজরী সনে বদর যুদ্ধের পর এবং ১৮৪ আয়াত এক বছর পর নাযিল হওয়ার প্রামাণ্য গ্রন্থগুলোর নাম উল্লেখ করে দিন। আমাদের কাছে এটা হবে একটি দলিল। এর মাধ্যমে তাকে তার বাতিল ধ্যান-ধারণার প্রচারণা থেকে বিরত রাখতে আমরা সচেষ্ট হবো। এটাও ইসলামেরই খিদমত। আশা করি, আপনি আপনার সুমহান চিন্তা গবেষণা দ্বারা আমাদের অবশ্যই উপকৃত করবেন।

জবাবঃ প্রশ্নে উল্লিখিত ফিত্‌নার উদ্দেশ্য তার বক্তব্য ও বিষয়বস্তু থেকেই প্রকাশিত। ভদ্রলোকের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য এটাই অনুমিত হয় যে, রমযানের রোযা রাখার মুসীবত(?) থেকে নিজেও বাঁচবেন এবং সমমনা পানাহারকারী ভদ্রমহোদয়দেরকেও বাঁচাবেন। সাধারণ পাপাসক্ত লোকেরা বরং ভালো, তারা খোলাখুলি ভাবেই নাফরমানীর আচরণ গ্রহণ করে থাকে এবং যে যে পাপাচারে লিপ্ত হতে চায় তা বিনা দ্বিধায় করে ফেলে। নাফরমানী করার জন্য স্বয়ং আল্লাহর কিতাবকে দলিল হিসেবে দাঁড় করাবার প্রতারণা অন্তত তাদের মধ্যে নেই। কিন্তু যারা নিজেদের পাপাচারিতায় কুরআনের আশ্রয় গ্রহণ করে, তারা অদ্ভুত ধরনের পাপিষ্ঠ। তারা কুরআন দ্বারা এরূপ ফায়দা লুটার উদ্দেশ্যেই হাদীসকে কুরআন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, যাতে করে নিজেদের খেয়াল-খুশি মতো আয়াতসমূহের অর্থ করা সম্ভব হয়। তারা আজ ব্যাপক সুযোগ পেয়ে গেছে। আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহর কিতাবের নাম নিয়ে আল্লাহর দীন থেকে ফিরাচ্ছে। প্রথমত এরা 'দুই কুরআন' প্রণয়ন করে, তারপর 'দুই ইসলাম'। পরবর্তীতে 'দুই আল্লাহ' বানালেও কে তাদের রুখবে?

রোযার ব্যাপারে তারা কুরআন থেকে যে দলিল উপস্থাপন করেছে, তার ভ্রান্তি সুস্পষ্ট করার জন্য আমি সর্ব প্রথম স্বয়ং কুরআনের সাক্ষ্য পেশ করছি। আলোচ্য আয়াতসমূহের আভিধানিক অর্থ হলোঃ

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের মতই রোযা ফরয করা হয়েছে, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পার। রোযা কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনের জন্য, তোমাদের মধ্যে কেউ রোগাক্রান্ত হলে কিংবা সফরে থাকলে অন্য সময় এই দিনগুলোর রোযা পূরণ করে নেবে। আর যারা রোযা রাখতে সমর্থ, তারা ফিদইয়া হিসেবে একজন মিসকীনকে খাওয়াবে। আর কেউ স্ব ইচ্ছায় নেক কাজ করলে সেটা তার জন্য উত্তম। কিন্তু তোমরা যদি বুঝতে পার তবে রোযা রাখাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। যে মাসে কুরআন নাযিল হয়, সে মাসই মাহে রমাদান। আর কুরআন হলো বিশ্ববাসীর পথ-

নির্দেশিকা, সুস্পষ্ট উপদেশাবলীতে পরিপূর্ণ এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য নির্ণয়কারী। তোমাদের যে কেউ এই মাস পাবে সে যেন অবশ্যি রোযা রাখে। কেউ অসুস্থ কিংবা সফরে থাকলে তার সে অন্যদিনে এই সংখ্যা পূরণ করবে।"

[সূরায়ে বাকারার ১৮২–১৮৫ আয়াত এবং আসলের সাথে মিলিয়ে আসল এবং তরজমার মধ্যে অর্থের দিক থেকে কোনো পার্থক্য আছে কিনা সে সম্পর্কে খুব ভালো করে নিশ্চিত হোন]।

এই সম্পূর্ণ কথাগুলো যদি একই ধারার এবং একই সময়ে বর্ণিত বিবৃতি হয়ে থাকে, তাহলে যে কেউ মুক্তমনে এই বাক্য পাঠ করলে তার মনে অবশ্যই এ প্রশ্ন দেখা দেবে যে "মাহে রমাদানে তোমাদেরকে এই নিয়ামত দেয়া হয়েছে, সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ এই মাহিনার সম্মুখীন হবে, এ মাসে তার রোযা রাখা উচিত।" এ কথা আয়াতের মধ্যে প্রথমেই বলা হলোনা কেন? পরিশেষে এটা কি ধরনের বর্ণনা পদ্ধতি যে, প্রথমে বললো, রোযা নির্দিষ্ট কয়েকদিনের, তারপর তিন–চারটি বাক্যে রোযা সম্পর্কে কতিপয় হুকুম আহকাম বর্ণিত হলো। তারপর বলা হলো, সেই নির্দিষ্ট কয়েকটি দিন রমাদানের। রমাদানকে এ কারণে এ কাজের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। সুতরাং পুরা মাস রোযা রাখতে হবে। একটি যুক্ত ধারাবাহিক বিবরণীর মধ্যে এভাবে নিজের কথা সম্ভবত একজন আনাড়ী লোকও ব্যক্ত করতো না। বরং এভাবে বলতো– আগের লোকদের মতো তোমাদের উপরও রোযা ফরয করা হয়েছে। আর যেহেতু রমাদান মাসে তোমাদেরকে কুরআন নামের নিয়ামত দেয়া হয়েছে সুতরাং সে মাসে তোমাদের ফরয রোযা আদায় কর। তারপর এ সম্পর্কিত যা কিছু আহকাম বর্ণনা করার সেগুলো বর্ণনা করে দিতেন।

একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তির মনে দ্বিতীয় যে প্রশ্নটির উদয় হবে তা হলো, "তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে কিংবা সফরে গেলে অন্যদিন সেই নির্দিষ্ট সংখ্যা পূরণ করে নেয়া উচিত।" এই বাক্যটি যখন বক্তব্যের প্রথমেই এসে গেছে, তখন পুনর্বার সেটির উল্লেখ করার প্রয়োজন কি ছিল? আর বাস্তবিকই যদি এর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন থেকে থাকে, তাহলে 'যারা রোযা রাখতে সক্ষম তারা ফিদইয়া স্বরূপ একজন গরীবকে খাওয়াবে, এ বাক্যের পুনরাবৃত্তি হলোনা কেন? প্রকৃতপক্ষে দু'টির একটিরও পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন ছিলনা। কিন্তু একটির পুনরাবৃত্তি করা আর অপরটির পুনরাবৃত্তি না করা একটি হেয়ালি বলেই মনে হয়।

তার মনে তৃতীয় যে প্রশ্নের উদয় হবে তাহলো– "রমাদান মাস এমন একটি মাস" –এই বাক্যাংশের পূর্বের কথা এবং পরের কথার মধ্যে সুস্পষ্ট স্ববিরোধিতা পরিদৃষ্ট হয়। প্রথম কথার বিষয়বস্তু সুস্পষ্টভাবে এ কথা বলছে যে, রোযা রাখতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি রোযা রাখেনা, সে যেনো ফিদইয়া দিয়ে দেয়। তবে যদি সে রোযা রাখে, তাহলে সেটাই তার জন্য উত্তম।

"যে মাহে রমাদান পাবে সে ঐ মাসে অবশ্যই রোযা রাখবে"। দ্বিতীয় বাক্যের এ কথা তার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ প্রকাশ করছে। প্রথম বাক্যে অসুস্থ ও মুসাফিরদেরকে যে অনুগ্রহ দেয়া হয়েছিল তার পুনরাবৃত্তি করে এই আবশ্যিক নির্দেশকেই শক্তিশালী করা হচ্ছে। কিন্তু উপরে রোযা রাখতে সক্ষম লোকদেরকে যে অবকাশ দেয়া হয়েছিল তা রহিত করে দেয়া হয়। একই ব্যাপারে অভিন্ন সময়ে দু'টি ভিন্নমুখী নির্দেশ দেয়ার আশা করা একজন অতি সাধারণ আইনদাতার কাছ থেকেও যখন সম্ভব নয়, তখন আল্লাহর ন্যায় মহান মর্যাদাসম্পন্ন সত্তার কাছ থেকে এটা কেমন করে আশা করা যেতে পারে?

প্রথম দু'টো প্রশ্ন শুধুই প্রশ্ন। তবে এই ইবারত থেকে উৎসারিত শেষ প্রশ্নটি একটি শক্ত প্রশ্ন। হাদীসের সহায়তা ছাড়া এর সমাধান কারো পক্ষে কিভাবে দেয়া সম্ভব তা বুঝে আসে না। যারা হাদীসের সাহায্য ছাড়া কুরআন বুঝার দাবী করে এবং হাদীসকে দীনের বিধিবিধানের উৎস ও কুরআনের প্রমাণভিত্তিক ব্যাখ্যা হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করে, তাদের কাছে এসব প্রশ্ন ও অভিযোগের জবাব কি তা জিজ্ঞেস করুন!

হাদীস কিভাবে কুরআনের এই বক্তব্য বুঝার জন্য আমাদের সহায়তা করে তা এবার লক্ষ্য করুন। যাদের সামনে কুরআনের এই আহকাম নাযিল হয়, তাদের বর্ণনা হলো, "হে লোকগণ" থেকে শুরু করে "যদি তোমরা জ্ঞাত হও" পর্যন্ত বক্তব্যের এই অংশ প্রথমে নাযিল হয়। দ্বিতীয় অংশ এর এক বৎসর পর নাযিল হয়। প্রথম বৎসর রোযা ফরয করার সময় রোযা রাখার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও রোযার পরিবর্তে ফিদইয়া দেয়ার অবকাশ মানুষকে দেয়া হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বৎসর এই সুযোগ রহিত হয়ে যায়। তবে মুসাফির ও রোগীর বেলায় আগের অনুগ্রহ বহাল থাকে।

এই বর্ণনায় শুধুমাত্র সমগ্র সন্দেহেরই অবসান হয়নি বরং দ্বিতীয় বৎসর চূড়ান্ত ও অকাট্য নির্দেশ দেয়ার সময় রমাদান মাসে কুরআনের মতো অপূর্ব নিয়ামত দেয়ার যে ভূমিকা পাড়া হলো তা কেন পাড়া হলো সে কথাও বুঝা গেল। বুঝা গেল যে, প্রথমে আল্লাহর এই নিয়ামতের অনুভূতি প্রদান করা হয়েছে। তারপর এই নিয়ামতের শুকরিয়া স্বরূপ এই মাসে রোযা রাখা বাঞ্ছনীয় বলে হুকুম দেয়া হয়েছে।

মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরগণ অসংখ্য সাহাবা ও তাবেয়ী থেকে এই বিশ্লেষণ বর্ণনা করেছেন। যেমন, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) হযরত মুয়ায ইবন জাবাল (রা) থেকে একটি দীর্ঘ ব্যাখ্যার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, নামায ও রোযা এই উভয়ের বর্তমান পদ্ধতি ক্রমান্বয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। নামায প্রথমে বাইতুল মাকদিসমুখী হয়ে প্রবর্তিত ছিল, তারপর মক্কামুখী হয়। প্রথমে লোকেরা একে অপরকে নামাযের সময় সম্পর্কে অবহিত করতো। তারপর আযানের

পদ্ধতি নির্ধারিত হয়। নামাযের জামায়াতে যদি কেউ মধ্যখানে এসে হাযির হতো, তাহলে প্রাথমিক নিয়মানুযায়ী সে প্রথমে নামাযের অপঠিত অংশ আদায় করার পর ইমামের সাথে শামিল হতো। ইমামকে যে অবস্থায় পাওয়া যাবে সে অবস্থাতেই তার অনুসরণ করার পদ্ধতি পরে নির্ধারিত হয়। তখন ঠিক হয় যে, ইমাম সালাম ফেরার পরে সে তার পরিত্যক্ত অংশ দাঁড়িয়ে আদায় করবে। এভাবে রোযার নির্দেশাবলীও ধীরে ধীরে ও পর্যায়ক্রমে আসে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, মদীনায় তাশরীফ এনে প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোযা রাখতেন এবং মহররমের দশম দিনে একটি রোযা রাখতেন। তারপর আল্লাহ রমযানের রোযা ফরয করে দেন। তবে যে রোযা রাখবেনা, তাকে সুযোগ দেয়া হয় একজন মিসকীনকে খাওয়াবার মাধ্যমে অবকাশ নেয়ার। তারপর রমাদানের রোযা রাখা জরুরী হওয়ার নির্দেশ আসে এবং সুস্থ সবল মুকীম লোকের ফিদইয়া দেয়ার অনুগ্রহ বা সুযোগ রহিত হয়ে যায়। প্রথমে লোকেরা শয়ন না করা পর্যন্ত ইফতারের পর খানাপিনা ও স্ত্রীসহবাস করা জায়েয মনে করতো। তারা মনে করতো, শয়ন করার পরই দ্বিতীয় দিনের রোযা শুরু হয়। এ বিষয়ে স্পষ্ট কোনো দলিল না থাকা সত্ত্বেও লোকেরা এরূপই মনে করে আসছিলো। পরে নির্দেশ এলো,

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ إِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ - (البقرة : ١٨٧)

এ বিষয়ের সমর্থনে বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ অনেক রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। এসব রেওয়ায়েত হযরত আয়েশা (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এবং হযরত সালমাহ ইবনে আকওয়াহ (রা) প্রমুখ থেকে বর্ণিত। প্রখ্যাত মুফাসসির ইবনে জারীর তাবারী (মৃত্যু ৩১০ হিজরী) পূর্ণ সনদসহ যেসব সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে এর সমর্থনে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের নাম হলোঃ মুআয ইবনে জাবাল, ইবনে উমর, ইবনে আব্বাস, সালমাহ বিন আকওয়া, আলকামাহ, ইকরামাহ, হাসান বসরী, শাবী, আতা, যুহরী প্রমুখ। ইমাম তাবারী মুআয ইবনে জাবাল থেকে একটি রেওয়ায়েতের ব্যাখ্যা এভাবে প্রদান করেন যে, আরববাসী প্রথমে রোযা রাখতে অভ্যস্ত না হওয়ায় রোযা রাখা তাদের জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণে রমাদান মাসে যেদিন রোযা রাখবেনা সেদিন একজন মিসকীনকে খানা খাওয়াবার সুযোগ তাদেরকে দেয়া হলো। পরে রমাদানের পুরো মাস আবশ্যিকভাবে রোযা রাখার নির্দেশ আসে। অসুস্থ হলে কিংবা সফরে থাকলে ভিন্ন কথা। অপর একটি রেওয়ায়েতে তিনি

ইবনে আব্বাসের এই ব্যাখ্যার বিবরণ দিয়েছেন এভাবে যে, প্রথম বৎসরের রোযাসমূহে আল্লাহ তায়ালা ফিদইয়া দেয়ার অবকাশ দেন। কিন্তু দ্বিতীয় বৎসরের নির্দেশে মুসাফির ও রোগীর অনুগ্রহ বহাল থাকে। তবে মুকীমের ফিদইয়া দেওয়ার সুযোগের কথার উল্লেখ ছিলনা। সুতরাং সে সুযোগ রহিত হয়ে যায়।

উপরোক্ত ব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বতই অনুমান করতে সক্ষম যে, যারা হাদীসের পরোয়া না করে বরং হাদীসসমূহকে উপহাস ও ঘৃণার সাথে উপেক্ষা করে কুরআনের মনগড়া আহকাম উদ্ভাবন করছে, তারা নিজেরা কিভাবে বিপথগামী হচ্ছে এবং সাধারণ মুসলমানদেরকেও বিভ্রান্ত করছে। [তরজমানুল কুরআন, রজব শাবান ১৩৭১ হিজরী, এপ্রিল–মে ১৯৫৩]

হাদীস অস্বীকারকারীদের আরো একটি আপত্তি

প্রশ্নঃ হাদীস অস্বীকারকারীরা মুসলিম শরীফের একটি হাদীস উল্লেখ করে থাকে। হাদীসটির বিষয়বস্তু হলো, হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মে ওয়ালাদ, (বাঁদী, সন্তান হবার কারণে পুত্রমাতা) মারিয়া কিবতিয়ার সাথে যিনা করার অপবাদ দেয়া হলো এক ব্যক্তির উপর। তাতে নবী আলাইহিস্‌সালাম অপরাধীকে হত্যা করার জন্য হযরত আলীকে (রা) নির্দেশ দেন। হযরত আলী (রা) তলোয়ার নিয়ে লোকটিকে হত্যা করতে গিয়ে দেখেন সে গোসল করছে। হযরত আলী (রা) আরো দেখেন লোকটি নপুংসক। তিনি নবীর কাছে ফিরে এসে ঘটনা শুনালেন। এ হাদীসের আলোকে নিম্নোক্ত প্রশ্নাবলী দেখা দেয়ঃ

১. নবী আলাইহিস্‌সালাম শুধুমাত্র অপবাদের উপর ভিত্তি করে ঘটনার তদন্ত না করে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে অপরাধীকে হত্যা করার নির্দেশ কেমন করে দিলেন? অথচ এটা ইসলামের সামগ্রিক চেতনা এবং ন্যায়বিচারের নীতিসম্পন্ন হাদীসসমূহের খেলাপ।

২. যিনার শাস্তি দুররা কিংবা রজম (যদিও মুনকিরে হাদীস রজমের সমর্থন নয়)। তাহলে উপরোক্ত ঘটনায় হত্যার নির্দেশ কেন দেয়া হলো?

৩. হযরত আলী (রা) উলংগ অপরাধীর প্রতি তাকালেন কেন? অথচ কাউকে উলংগ অবস্থায় দেখতে রসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতিপয় হাদীসের মাধ্যমে নিষেধ করেছেন।

৪. হাফিয ইবনে হাজার, ইবনে জাওযী, মোল্লা আলী কারী এবং অন্যান্য হাদীস সমালোচকগণ জারাহ ও তাদিলের যেসব নীতি নির্ধারণ করেছেন তার মানদন্ডে এই হাদীসের স্থান কোন্ পর্যায়ের? আগেকার আলিমগণ তাদের পূর্ণ সতর্কতা সত্ত্বেও মানব সুলভ চপলতার কারণে যদি এ ব্যাপারে কোথাও ত্রুটি করে থাকেন তাহলে পরবর্তী আলেমগণ এ ব্যাপারে যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও সে

ক্ষতি পূরণ করার অধিকার কি তাদের নেই?

৫. হাদীসটির মতনের উপর চিন্তা করলে এটা রসূলের কালাম বলে মনে হয়না। বরং মনে হয় কোনো রাবী মামলার কার্যবিবরণী শুনাচ্ছেন। সম্ভবত কোনো কোনো বিস্তারিত বিবরণ বিস্মৃত হয়ে তিনি সম্পূর্ণ কার্যবিবরণী নিজ ভাষায় ব্যক্ত করতে অসমর্থ হয়েছেন।

জবাবঃ এসব হাদীস অস্বীকারকারীরা আসলে চরম মূর্খতায় নিমজ্জিত। এরা যেসব বিষয়ে জানেনা সেগুলো যারা জানেন তাদের কাছে জিজ্ঞেস করার পরিবর্তে তারা নিজেরাই আলেমের মুখোশ পরে সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকে। তারপর সেগুলো প্রচার করে জনগণকে বিভ্রান্ত করা শুরু করে দেয়। তাদের বিভ্রান্তিকর রচনাগুলোর অধিকাংশই আমাদের দৃষ্টিতে এসেছে। দলিল দিয়ে খন্ডন করা যাবেনা তাদের এমন কোনো অভিযোগ নেই। তবে মৌনতা অবলম্বন করতে বাধ্য হওয়ার প্রকৃত কারণ হলো, তারা নিজেদের আলোচনার ব্যাপারে সাধারণত বাজারের গুন্ডাদের নীতি অবলম্বন করে থাকে। তাদের লেখাসমূহ পাঠ করার সময় অনুভূত হয় যেন কেউ আবর্জনায় ভরা একটি ঝাড়ু হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কেউ মুখ খুলতেই তার মুখে ঝাড়ু মেরে দেবে। এমন লোকদের মুখোমুখী হওয়া কোনো ভদ্রলোকের পক্ষে যে অসম্ভব তা বলাই বাহুল্য। কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার উপযুক্ত বলেও এ শ্রেণীর লোকদেরকে মনে করা যায়না।

অবশ্য এসব ফেত্‌নাবাজদের লেখায় যেসব ভদ্রলোকের মনে সংশয়ের উদ্রেক হয় তাদের সে সংশয় নিরসন করতে আমরা প্রস্তুত। যদিও তাদের আজেবাজে কথা ও অভদ্র বাকরীতি দেখা সত্ত্বেও ভদ্র ও জ্ঞানী লোকেরা তাদের কথাকে মূল্য দেবেন বলে আমরা মনে করিনা।

যে ঘটনা সম্পর্কে আপনি প্রশ্ন করেছেন তার বাস্তবতা হলো, হযরত মারিয়ায়ে কিবতিয়ার সাথে তাঁর আপন চাচাতো ভাইয়ের অবৈধ সম্পর্কের অপবাদ। মদীনার মুনাফিকরা এ গুজব রটায়। কথাটি ধীরে ধীরে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌছে। তিনি হযরত আলীকে (রা) নির্দেশ দিলেনঃ

اذهب فان وجدته عند مارية فاضرب عنقه -

"যাও, যদি তুমি তাকে মারিয়ার কাছে পাও তাহলে ঘাড় মটকে দিবে।" এটা অসম্ভব নয় যে, হুজুরের কাছে রটনাকারী বলেছে যে এসময় সে সেখানে উপস্থিত আছে আপনি কাউকে পাঠিয়ে দেখুন। আর নবীও এ পরিপ্রেক্ষিতে বলে থাকবেন, যদি তাকে সেখানে কোনো অসৎ কাজে লিপ্ত থাকা অবস্থায় পাও তাহলে তাকে হত্যা করবে। এ নির্দেশ মতো হযরত আলী (রা) যখন সেখানে

পৌঁছলেন তখন সে হাউজে গোসল করছিল। তিনি সেখানে পৌঁছেই তাকে তিরষ্কার করলেন এবং হাত ধরে হাউজ থেকে টেনে আনলেন। পানি পূর্ণ হাউজে নামা একটি লোক উলংগ কি অউলংগ তা বাইরের কোনো লোকের পক্ষে আঁচ করা সহজ নয়। হযরত আলী (রা) তাকে টেনে আনার পর হঠাৎ তার গুপ্তস্থানে নজর পড়ে যায়। এভাবেই লোকটির লিংগ কর্তিত বলে তিনি জানতে পারেন। সাথে সাথেই তিনি লোকটিকে ছেড়ে দিয়ে ফিরে এসে নবীকে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করেন।

এবার বলুন, এই ঘটনার উপর অভিযোগ কি এবং কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে? এ কথাও জানিয়ে দিচ্ছি যে হাদীসটি সনদের দিক থেকে দুর্বল নয়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকটির নপুংসক হওয়ার কথা জানতেন এবং হত্যার কথা শুনলে লোকটি তার গোপন রহস্য প্রকাশ করে দেবে শুধু এ উদ্দেশ্যে তিনি হযরত আলীকে (রা) হত্যার নির্দেশ দিয়ে পাঠান। আর এভাবে ঘটনাটির সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন হওয়ার কথা সকলেই জানতে পারবে। কোনো কোনো মুহাদ্দিস এর কারণে এরূপ এ কথাই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আমার কথা হলো, ঘটনাটি এরূপ না হলেও অভিযোগ করার মতো এটি কোনো ঘটনাই নয়। যদি কেউ স্বচক্ষে রসূলের অবমাননা হতে দেখে, তাও আবার চরম অবমাননা, তাহলে অবমাননাকারীকে হত্যা করার অধিকার কি প্রত্যক্ষদর্শীর নেই? নিজের মা, স্ত্রী কিংবা বোনের সাথে এরূপ আচরণ করতে দেখে উত্তেজিত হওয়ার সংগত কারণ বলে দুনিয়া স্বীকার করে থাকে। আর নবীর শয্যায় এরূপ ব্যাপার সংঘটিত হওয়া কত বড় ধৃষ্টতা। তবুও এর উপর অভিযোগকারী লোকটিকে জিজ্ঞেস করুন যদি তারা স্ত্রী সম্পর্কে এ ধরনের একটি কলংকজনক খবর তাকে শুনানো হয়, তাহলে তার প্রতিক্রিয়া কি হবে? [তরজমানুল কুরআন, জমাদিউস সানী,১৩৭১ হিজরী, মার্চ ১৯৫২]

যবেহ ছাড়াই মাছ হালাল হবার দলিল

প্রশ্নঃ 'তরজমানুল কুরআন' এর একটি পুরাতন সংখ্যায় দেখলাম বৃটেনের একজন ছাত্র গোশ্ত খাওয়ার ব্যাপারে নিজের সমস্যা তুলে ধরেছেন। তার জবাবে আপনি লিখেছেনঃ ইহুদীদের যবেহকৃত পশুর গোশত অথবা মাছের গোশ্ত খাওয়া যায়। মাছ যবেহ করা সম্পর্কে আপনার কাছে আমার কিছু বক্তব্য আছে। কেননা, সম্ভবত আপনিও দুনিয়ার অধিকাংশ মুসলমানের মতো মাছের গোশ্ত খাওয়াকে হালাল মনে করে থাকেনঃ

আমার মতে হালাল হারাম হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকার আল্লাহ ছাড়া কোনো মানুষের নেই। কারণ কুরআনের নির্দেশ হলোঃ

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ـ (النحل: ١١٦)

"আর মুখের কথায় যে তোমরা মিথ্যা আরোপ করে বলো এটা হালাল আর এটা হারাম, এভাবে হুকুম লাগিয়ে আল্লাহ সম্পর্কে তোমরা মিথ্যা চালিয়ে দিয়োনা। যেসব লোক আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা চালায়, তারা কখনই সফলতা লাভ করবেনা।" (নাহলঃ ১১৬)

কুরআনের আলোকে যবেহ ব্যতীত মাছ খাওয়া হারাম। কেননা, মাছও একটি প্রাণী বিশেষ। আর প্রত্যেক প্রাণীকে যবেহ করার (শূয়র, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি ব্যতিক্রম ছাড়া) স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। যেমনঃ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ.......الخ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ـ (المائدة: ٣)

"তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু..... এসব কাজ সম্পূর্ণ ফাসিকী।" (মায়েদাঃ ৩)

মাছও মৃত জীব বিশেষের মধ্যে শামিল।

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ .... الخ ـ (المائدة: ٤)

"লোকেরা জিজ্ঞেস করে, তাদের জন্যে কি কি হালাল করা হয়েছে। আপনি বলে দিন, সমস্ত পবিত্র বস্তুই তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে। তারা যেসব প্রাণী তোমাদের জন্যে ধরে রাখবে তাও তোমরা খেতে পার। অবশ্য তার উপর আল্লাহর নাম নিতে হবে...।" (মায়েদাঃ ৪)

এখানে সমস্ত পবিত্র বস্তুকে যবেহ করার এবং এগুলোর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করার স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। মাছ এ নির্দেশের বাইরে নয়।

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ـ (المائدة: ١١٩)

"তোমরা যদি আল্লাহর আয়াতের প্রতি ঈমান এনে থাকো, তাহলে যেসব জন্তুর উপর (যবেহ করার সময়) আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে, সে সবের গোশত খাও।" (মায়েদাঃ ১১৯)

শুধুমাত্র আল্লাহর নাম নিয়ে যবেহকৃত জন্তুর গোশ্ত খাওয়ার যে নির্দেশ রয়েছে আয়াতটি তারই ইতিবাচক দিক। এখানেও মাছ যবেহ করার নির্দেশের বাইরে নয়। বরং অন্যান্য জন্তুর ন্যায় মাছও আল্লাহর নামে যবেহ করতে হবে।

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ - (الانعام : ١٢١)

"যার উপর আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি তা তোমরা খেয়ো না। কেননা তা অপবিত্র।"

যবেহ করার নির্দেশের এ আয়াত হলো নেতিবাচক দিক। এখানে আয়াতের ব্যাখ্যার উত্তম নমুনা রয়েছে। এভাবে একভাবে কেউ বুঝতে না পারলে অন্যভাবে বুঝতে পারবে। কুরআনের সাধারণ রীতি অনুযায়ী এ ব্যাপারেও ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিক রয়েছে। এখানে যবেহ ছাড়া কোনো প্রাণী খাওয়াকে অপবিত্র বলা হয়েছে। الا السمك والجراد "মাছ এবং পঙ্গপাল" শব্দ এখানেও নেই। কাজেই যবেহ ছাড়া মাছের গোশত খাওয়া অকাট্যভাবে হারাম।

যবেহ ছাড়া মাছ খাওয়া হালাল হওয়ার কোনো কথা কুরআনের কোথাও উল্লেখ থাকলে তা মেহেরবানী করে 'তরজমানুল কুরআন'–এর মাধ্যমে অবহিত করার ব্যবস্থা করবেন।

ما وجدنا عليه اباؤنا

"বাপ দাদার কাছ থেকে আমরা যা পেয়েছি।"

সাধারণ আলেমগণ তো এ দলিলটি পেশ করেই মুক্তি পেয়ে যান। কিন্তু কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা অবস্থায় এ ধরনের দলিল কখনো কোনো কাজে আসতে পারেনা। সন্দেহ নেই, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসে যবেহ ছাড়া মাছ খাওয়া হালাল ঘোষিত হয়েছে। তবে কুরআনের মুকাবিলায় কুরআনের দলিল হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এ ব্যাপারে কুরআনের অনুকূলে যেসব হাদীস রয়েছে, সেগুলো আমরা চোখ–কান বন্ধ করে গ্রহণ করবো। কিন্তু যদি কোনো হাদীস কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশের খেলাপ হয়, তাহলে আমরা বলবো, এ হাদীস কখনো রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নয়। বরং এটি মাওযূ বা জাল। হাদীসকে কুরআনের উপর বিচারক মনে করার তো কোনো প্রশ্নই ওঠেনা।

আমি আপনার কাছে কুরআনের দলিল পেশ করেছি। সুতরাং কুরআনের দলিলই পেশ করার জন্যে আপনার কাছে অনুরোধ রইলো। চারটি দলিলের মুকাবিলায় একটি দলিলই যথেষ্ট মনে করা হবে।

জবাবঃ আপনি কুরআনের উপর চিন্তা-গবেষণা করছেন এটা খুশীর কথা। তবে আপনার প্রশ্ন থেকে অনুমিত হয়, আপনি চিন্তা-গবেষণার ভুল পথে পাড়ি জমিয়েছেন। কুরআনের উপর চিন্তা-গবেষণার অর্থ এই নয় যে, নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, তাঁর সংগী-সাথী সাহাবাদের ব্যাখ্যা, প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত উম্মতের সমস্ত আলেম, ফকীহ, মুহাদ্দিস ও মুফাস্‌সিরদের গবেষণা এবং উম্মতে মুহাম্মদীর ধারাবাহিক কর্মধারা ইত্যাদি সবকিছু পরিত্যাগ করে আপনি শুধুমাত্র কুরআনের শব্দাবলীর মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকবেন। এর মাধ্যমে যা কিছু আপনি বুঝতে পারেন কেবলমাত্র সেগুলোই সত্য-সঠিক আর এর বিপরীত যেখানে যা কিছু পাবেন তা পরিহার করার উপযুক্ত বলে মনে করবেন, সেগুলো রসূলের হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামের উক্তি হোক, কিংবা ফকীহদের গবেষণা হোক, অথবা মুসলিম জাতির ধারাবাহিক কর্মধারা হোক তাতে আপনার কিছু আসে-যায়না। মাফ করবেন, এ পদ্ধতি অবলম্বন করলে আপনি কুরআনের মাধ্যমে হিদায়াত পাওয়ার পরিবর্তে গোমরাহী লাভ করবেন।

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ

"আল্লাহ এ কুরআন দ্বারা অনেককে গোমরাহ করেন আবার অনেককে হিদায়াত দান করেন। আল্লাহর সাথে অংগীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর যারা ভংগ করে এবং যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে আল্লাহর নির্দেশ রয়েছে, সে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং যারা যমীনে ঝগড়া-ফাসাদ করে বেড়ায়, সেসব ফাসিক লোক ছাড়া আর কাউকে আল্লাহ কুরআন দ্বারা গোমরাহ করাননা।"

রাগ করবেননা। আপনি জ্ঞান-গবেষণার এই পদ্ধতি অবলম্বন করে আল্লাহর কিতাবের সম্পর্ক থেকে নবীর সম্পর্ককে ছিন্ন করে দিচ্ছেন। অথচ আল্লাহ স্বয়ং এ সম্পর্ক যুক্ত করেছেনঃ

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ - (النحل: ٦٤)

"আপনার উপর এই কিতাব এ জন্যে অবতীর্ণ করেছি যাতে আপনি বিতর্কিত বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা তাদের সামনে উপস্থাপন করেন।"

এ কারণে আপনি নিজকে বিপদে ফেলছেন এবং কুরআনের মাধ্যমে

হিদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহী লাভ করছেন।

আল্লাহর কিতাব বুঝার জন্যে হাদীস, আছার এবং পূর্ববর্তী মনীষীদের গবেষণার দ্বারস্থ হওয়াকে কখনো "পূর্ব পুরুষদের থেকে যা পেয়েছি"–এর সাথে তুলনা করা যায়না। কুরআনের আয়াতকে কুরআনের উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার এটা একটা হীন উদাহরণ। কুরআনের যেখানেই এ কথা বলা হয়েছে সেখানে তার দ্বারা যারা নিজেদের পথভ্রষ্ট বাপ–দাদা পূর্বপুরুষদের অন্ধানুকরণ করে, তাদেরকে ভর্ৎসনা করা হয়েছে। যারা আল্লাহর কিতাবের উদ্দেশ্য জ্ঞাত হওয়ার জন্যে কুরআনে অভিজ্ঞ লোকদের শরণাপন্ন হলো তাদের বিরুদ্ধে এ আয়াত প্রয়োগ করা যুক্তির দিক দিয়ে শুধু ভুলই নয় বরং স্বয়ং কুরআনের ব্যাখ্যারও বিরোধী। যদি এ কাজকে আপনি وجدنا عليه اباونا এর অধীনে এনে তিরস্কার যোগ্য মনে করেন, তাহলে আপনার মতে–

فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

"যদি না জানো, তাহলে জ্ঞানীদের কাছে জিজ্ঞাসা কর।" এবং

اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ

"তারা এমন লোক ছিল যাদেরকে আল্লাহ হিদায়াত করেছেন। সুতরাং তোমরা তাদের হিদায়াতের অনুসরণ কর।" কুরআনের এ আয়াতদ্বয়ের উদ্দেশ্য কি?

যেসব বস্তু কুরআনের অতিরিক্ত কিংবা কুরআনের বর্ণনা থেকে ভিন্নতর হাদীসে পরিদৃষ্ট হয় তার সবকিছু অবশ্যই কুরআন বিরোধী হওয়ায় পরিহার করতে হবে– আপনার এ কথাও ঠিক নয়। কুরআনের কোনো হুকুম যদি সাধারণ ভাবে বর্ণিত হয়, তাহলে এই সাধারণ হুকুম কোন্ বিশেষ অবস্থায় প্রযোজ্য হবে, তা হাদীসে বলে দেয়া হয়েছে। এ পদ্ধতি কুরআনের হুকুমের অস্বীকৃতি নয় বরং কুরআনের ব্যাখ্যা। এরূপ ব্যাখ্যাকে কুরআন বিরোধী আখ্যায়িত করে যদি আপনি প্রত্যাখ্যান করেন এবং প্রত্যেক সাধারণ হুকুমকে তার স্থানে রাখতে বাধ্য করেন, তাহলে এমন অগণিত ত্রুটির সৃষ্টি হবে যার উদাহরণ আপনার সামনে তুলে ধরলে আপনি নিজেও স্বীকার করবেন যে, সত্যিই এটা বার বার ঘটে যাওয়া ভুল।

যবেহ ছাড়া মাছ হালাল হওয়ার কোনো দলিল কুরআন হতে পেশ করার জন্যে আপনি বার বার দাবী করেছেন। আমি এর জবাব পেশ করছি। তবে প্রথমেই আমি পরিষ্কার বলে দিতে চাই, আপনার এ দাবীকে নীতিগত

ভাবে সঠিক মনে করে আমি জবাব পেশ করছিনা বরং আপনার কুরআন চর্চা কতটুকু অগভীর এবং এ অগভীরতার উপর নির্ভর করে হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ্ এবং উম্মতের ধারাবাহিক কর্মধারা ইত্যাদি প্রত্যেক বস্তুকে পরিহার করতে উদ্যত থাকার ব্যাপারে আপনার ধৃষ্টতা যে কত মারাত্মক, তা বলে দেয়ার জন্যে পেশ করছি। আমার এই সতর্কীকরণের পর আপনি হাদীস অস্বীকারকারীদের সৃষ্ট ফিত্না থেকে নিরাপদ থাকুন এবং কুরআন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণার সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করুন, আল্লাহ্র কাছে এই দোয়া করি।

প্রথম কথাটি উসূলে তাফসীরের সাথে সম্পৃক্ত। বিষয়টি আপনার ভালোভাবে বুঝে নেয়া উচিত। উসূলটি হলো– কুরআন আইনের ভাষায় কথা বলেনা বরং তার বর্ণনারীতি হলো বক্তৃতামূলক। বক্তৃতামূলক বর্ণনারীতি এমন সব বিষয়ের ব্যাখ্যা করা হয়না যেগুলো শ্রোতা স্থান-কালের প্রেক্ষাপটে নিজে বুঝতে পারে এবং এমন সব সুযোগ-সুবিধাও বিবেচনা করা হয়না, যেগুলো আইনের ধারা সংকলনের সময় সামনে রাখা হয়। কেননা, সাধারণ শ্রোতাদের সামনে এ পদ্ধতিতে বক্তৃতা করার সময় এ আশংকা হয়না যে, তারা শব্দকে তাদের পরিচিত গন্ডি থেকে বাড়িয়ে-কমিয়ে আইনের গন্ডির মধ্যে শামিল করে নেবে। এ উসূলটি বুঝার পর যদি আপনি উল্লিখিত আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন, যেগুলোর মাধ্যমে আপনি "প্রত্যেক প্রাণী যবেহ্ করার" এবং "যবেহ ছাড়া কোনো প্রাণী হালাল না হওয়ার" সর্বজনীন বিধান উদ্ভাবন করেছেন, তাহলে আপনি নিজেই জানতে পারবেন যে, সেখানে স্থান-কালের প্রেক্ষাপটে, আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক ও সাধারণ ঐতিহ্য অনুযায়ী প্রকৃত পক্ষে আলোচনা চলছিল জীবজন্তু ও অন্যান্য প্রাণী সম্পর্কে, জলজ প্রাণী সম্পর্কে নয়। তাছাড়া, এটা একটা সাধারণ জ্ঞানের ব্যাপার। যবেহ ছাড়া কোনো প্রাণী না খাওয়ার সাধারণ হুকুম শুনেই কোনো বুদ্ধি-বিবেকবান ব্যক্তিই তাকে টেনে মাছের সাথেও যোগ করে দেবেননা। তাই একটি অসাংবিধানিক বাক্প্রণালীতে মাছকে এর ব্যতিক্রম হিসেবে চিহ্নিত করে পৃথকভাবে হুকুম দেয়ার প্রয়োজন ছিলনা।

তারপর দেখুন, কুরআনে বিশেষভাবে জলজ প্রাণী সম্পর্কে কি হুকুম পাওয়া যায়। সূরায়ে মায়েদায় বলা হয়েছেঃ

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ - (المائدہ: ৯৬)

"তোমাদের জন্যে সমুদ্রের শিকার ও তার খাদ্য হালাল করা হয়েছে।" এখানে দু'টি চিন্তার বিষয় রয়েছেঃ

এক. সমুদ্রের শিকার হালাল করা হয়েছে। এখানে শিকারের অর্থঃ শিকার

কার্য নয় বরং শিকার করা প্রাণী। কেননা, শুধুমাত্র শিকার কার্য হালাল হওয়া অর্থহীন যদি শিকার করা প্রাণী খাওয়া হালাল না হয়। আর শিকার করা প্রাণী হালাল হওয়ার জন্যে যদি কোনো শর্ত আরোপ না করা হয়, তাহলে সাধারণভাবে পানির শিকার যেভাবে ব্যবহৃত হয় সেখানে এর ব্যবহারও হালাল করা হয়েছে, এ কথা বুঝা যাবে। এবার আপনি খোঁজ করে বলুন, দুনিয়ার কোন্ দেশে কখন মাছ যবেহ করা হয়ে থাকে, যার পরিপ্রেক্ষিতে সমুদ্রের শিকারের অর্থের মধ্যে সাধারণ রীতি অনুসারে শিকার করা মাছকেও যবেহ করতে হবে বলে মনে করতে পারেন? বলা বাহুল্য, যেসব জিনিস যবেহ ছাড়া খাওয়ার রেওয়াজ সারা বিশ্বে প্রচলিত রয়েছে, সেগুলো যবেহ করার শর্তাবলীর ব্যাখ্যা তো অবশ্যই থাকবে। তবে সেগুলো যবেহ করার শর্তসাপেক্ষ না হওয়ার ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

দুই. এখানে শিকারের সাথে আরো একটি বস্তুর হালাল হওয়ার কথা উল্লেখ আছে। আর সেটা হলো সমুদ্রের খাদ্য। প্রশ্ন হলো সমুদ্রের এ খাদ্যটা কি?

طعامُهٗ এর মধ্যে যে সর্বনাম আছে তা সমুদ্রের স্থলে নয় বরং শিকারের স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে এ কথা আপনি বলতে পারবেননা। আপনি বলতে পারবেননা যে, এখানে এর অর্থ হলো, সামুদ্রিক শিকার খাওয়া। কারণ যদি এ অর্থ হতো, তাহলে وطعامه এর স্থলে طَعْمُهٗ বলা হতো। সুতরাং এই সর্বনাম অবশ্যই সমুদ্রের স্থলে এসেছে। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, সামুদ্রিক শিকার ছাড়া সামুদ্রিক খাদ্যও হালাল। এই সামুদ্রিক খাদ্যের কোনো ব্যাখ্যা আপনি করতে পারলে অবশ্যই করবেন। তবে আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি, হযরত আবুবকর (রা), হযরত উমর (রা), হযরত ইবনে আব্বাস (রা) প্রমুখ এর ব্যাখ্যা বর্ণনা প্রসংগে বলেছেন, যেসব প্রাণী শিকার করা হয়না বরং সমুদ্র তার তীরে নিক্ষেপ করে দেয় এখানে সেগুলোর কথা বলা হয়েছে। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এ কথা স্বয়ং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেছেন এভাবে–

ما القاه البحر او جزر عنه فكلوه-(ابو داؤد)

"যা সমুদ্র ফেলে দিয়েছে অথবা তীরে পরিত্যাগ করে সমুদ্রের পানি চলে গেছে তা খেয়ে নাও" (আবু দাউদ)। অধিকন্তু নিম্নোক্ত হাদীসটিও এই আয়াতাংশের তাফসীর– "সামুদ্রিক প্রাণীগুলো আল্লাহ তাআলা আদম সন্তানের জন্যে যবেহ করে রেখেছেন" (দার কুতনী) এবং মুআত্তায় উল্লিখিত হয়েছেঃ "সমুদ্রের মৃত হালাল"। আপনি ইচ্ছা করলে এসব তাফসীর রদ করতে পারেন। তবে মেহেরবানী করে এটাও অবশ্যই করবেন যে, সামুদ্রিক শিকারের সাথে طعامه "সামুদ্রিক খাদ্য" হালাল হওয়ার তাৎপর্য আপনি নিজে

কি বুঝেছেন?

ইবনে কাইউম "যাদুল মা'আদে" (২য় খন্ড ফী সাবীয়াতিল খাবত্ অধ্যায়ে) মাছের ব্যাপারে একটি সূক্ষ্ম আলোচনা করেছেন। মেহেরবানী করে সেটাও দেখে নেবেন। প্রকৃতপক্ষে মাছ যবেহ্ করার কোনো প্রয়োজন নেই এ কথা তিনি দলিল ছাড়া বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছেন। কারণ মাছের শুধুমাত্র পানি থেকে বের হয়ে আসাই তার পরিশুদ্ধি ও পবিত্রতার জন্যে যথেষ্ট। [তরজমানুল কুরআন, মুহাররম ১৩৭১, অক্টোবর- ১৯৫১]

মুরতাদ হত্যা প্রসংগে একটি আপত্তি

প্রশ্নঃ ১.

١- إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا..

"অবশ্যি যারা ঈমান এনেছে তারপর কাফির হয়েছে, তারপর আবার ঈমান এনেছে..... শেষ পর্যন্ত (সূরা নিসা)।" এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমার জনৈক কাদিয়ানী বন্ধু আপত্তি তুলেছেন যে, সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী সাহেব তার 'মুরতাদের শাস্তি' বইতে লিখছেনঃ "যে ব্যক্তি একবার ইসলাম গ্রহণ করে তা থেকে বের হয়ে যায়, ইসলাম তাকে হত্যা করার হুকুম দিয়েছে।" কিন্তু কুরআনে একবার মুরতাদ হবার পর দ্বিতীয়বার ইসলাম গ্রহণ করার কথা উপরে উল্লিখিত আয়াত থেকে প্রমাণিত। মেহেরবানী করে এক্ষেত্রে জটিলতা দূর করার জন্য আমাকে সাহায্য করুন।

২. সূরা নূর-এর নিম্নলিখিত আয়াত এর আসল অর্থ কি?

٢- اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ......الخ(النور: ٢٦) -

জবাবঃ ১.

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا -

আয়াত থেকে আপনার কাদিয়ানী বন্ধু যে যুক্তি পেশ করছেন তা আসলে তাঁর স্বল্প জ্ঞানের ফল। তিনি এ কথা জানেননা যে, মুরতাদকে হত্যা করার হুকুম কেবল সেখানেই প্রবর্তিত হতে পারে, যেখানে ইসলামী রাষ্ট্র সরকার প্রতিষ্ঠিত থাকে। কিন্তু মুসলমান এমন সব জায়গায়ও পাওয়া যেতে পারে যেখানে ইসলামী সরকার নেই এবং মুরতাদকে শাস্তি দেয়াও যেখানে সম্ভবপর নয়। তাই উল্লিখিত আয়াত থেকে এ যুক্তি পেশ করা যেতে পারেনা যে, কুরআনের দৃষ্টিতে সব অবস্থায় বার বার কুফরী করার পর বার বার ইসলাম গ্রহণ করা প্রমাণিত। মুরতাদকে হত্যা করার আইন বর্তমান থাকা অবস্থায় এমনটি অবাস্তব। তারপর আপনার ঐ কাদিয়ানী বন্ধু এ কথাও জানেননা যে,

ইসলামী আইন কোনো ব্যক্তির মুরতাদ হবার পর সংগে সংগেই তাকে হত্যা করার হুকুম দেয়না। বরং তাকে নিজের ভুল অনুধাবন করার ও তওবা করারও সুযোগ দেয়। আর সে তওবা করে নিলে তাকে মাফ করে দেয়। এছাড়া তিনি এ কথাটিও চিন্তা করেননি যে, এই আয়াতে মুরতাদের পরকালীন শাস্তির কথা বলা হয়েছে। আর কোনো অপরাধের পরকালীন ফল বর্ণনা করার মানে এই নয় যে, তার কোন পার্থিব শাস্তি হওয়া উচিত নয়। কুরআনে যেসব গুনাহের শাস্তির কথা উল্লিখিত হয়েছে তার মধ্যে এমন অসংখ্য গুনাহ রয়েছে যেগুলোর পার্থিব শাস্তির সাথে সাথে পরকালীন শাস্তির কথাও বলা হয়েছে। যেমন কোনো মুসলমানকে জেনে-বুঝে হত্যা করা। তাই এমন বহুতর অবস্থা হতে পারে এবং প্রায়ই হয়ে থাকে, যাতে এক ব্যক্তি অপরাধ সংঘটিত করে এবং পার্থিব শাস্তির হাত থেকে বেঁচে যায়। এই জেনে-বুঝে মুরতাদ হবার ব্যাপারটিই নিন। এই অপরাধের পার্থিব শাস্তি কেবলমাত্র তখনই দেয়া যেতে পারে যখন কেউ প্রকাশ্যে মুরতাদ হয়, সরকার তা জানতে পারে এবং আদালতে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণাদি পেশ করা হয়। কিন্তু মুরতাদের অসংখ্য ঘটনা গোপনেও অনুষ্ঠিত হয়ে যেতে পারে এবং বার বার তওবা করার পরও এক ব্যক্তি বার বার কাফির হয়ে যেতে পারে। কাজেই পার্থিব শাস্তি নির্ধারণ করার পরও পরকালীন শাস্তির উল্লেখ প্রয়োজন। আর কোথাও নিছক পরকালীন শাস্তির উল্লেখ হওয়ার অর্থ কখনোই এ নয় যে, সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য কোন পার্থিব শাস্তি নেই।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা আমি বুঝে উঠতে পারছিনা, সেটা হলো, মুরতাদের শাস্তির কতা শুনলে কাদিয়ানী সাহেবরা এত বেশী পেরেশান হয়ে পড়েন কেন? আমার বইতে আমি ভুলেও তাদের প্রতি কোনো ইংগিত করিনি। এরপরও তারা এত বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন যেন মনে হয় তাদের জন্যই এই মৃত্যুদন্ড ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। তারা কি নিজেদের ব্যাপারে কোনো সন্দেহের মধ্যে পড়ে রয়েছেন?

২. "আল খাবীসাতু লিলখাবীসীনা" আয়াতের অর্থ হচ্ছে ব্যভিচারী পুরুষদের জন্য ব্যভিচারী মেয়েরাই যোগ্য স্ত্রী এবং ব্যভিচারী মেয়েদের জন্যে ব্যভিচারী পুরুষরাই যোগ্য স্বামী। এই ধরনের পুরুষ ও মেয়েদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা মুত্তাকি ঈমানদার লোকদের কাজ নয়। [তরজমানুল কুরআন, মে ১৯৫২]

নবীর উপর যাদু এবং সূরা ফালাক ও নাস

প্রশ্নঃ কোনো কোনো মুফাসসির সূরা নাস ও সূরা ফালাকের শানে নুযুল বর্ণনা প্রসংগে হাদীসের বরাত দিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ইহুদী মেয়েদের প্রভাব পড়া এবং এ দুটি সূরা পড়ার মাধ্যমে সেই প্রভাব

খতম হয়ে যাওয়ার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এটা কতদূর সত্য? তাছাড়া যাদুর তাৎপর্য কি? কোনো কোনো লোক রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যাদুর প্রভাবকে রিসালাতের মর্যাদার বিরোধী মনে করেন?

জবাবঃ শানে নুযুলের ব্যাপারে একটা কথা জেনে রাখা প্রয়োজন। মুফাস্‌সিরগণ যখন কোনো ঘটনা সম্পর্কে লিখেন যে, এই আয়াতগুলো এই ঘটনার ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, তখন তার এ অর্থ হয়না যে, ঘটনাটি যখনই ঘটেছিল ঠিক তখনই এই আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিল। বরং এর অর্থ হলো এই ঘটনাটির সাথে এই আয়াতগুলোর সম্পর্ক রয়েছে।

সূরা নাস ও সূরা ফালাক সম্পর্কে এ কথা প্রমাণিত যে, এ সূরা দুটি মক্কা শরীফে নাযিল হয়। আর হাদীসে যাদুর যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তা হচ্ছে মদীনা তাইয়েবার ঘটনা। কাজেই যাদুর ঘটনাটি যখন ঘটে তখনই এ সূরা নাযিল হয়, এ কথা বলা সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। আসলে এর অর্থ হলো, ঘটনাটি ঘটার পর সূরা দুটি পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়।

যাদুর তাৎপর্য জানতে চাইলে কুরআন মজীদে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের কাহিনীটি পড়ুন। যাদুকরেরা লাঠি ও রশিগুলোকে সাপ বানিয়েছিল। সেগুলো আসলে সাপ হয়ে যায়নি, বরং সেখানে যারা উপস্থিত ছিল তারা অনুভব করেছিল যে, রশিগুলো লাঠিতে ও সাপে পরিণত হয়েছে। এমনকি নবী হওয়া সত্ত্বেও হযরত মূসার চোখ যাদুর প্রভাবে সেগুলোকে সাপ হিসেবেই দেখেন। কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ

فَلَمَّآ أَلْقَوْا سَحَرُوٓا أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ - (اعراف ١١٦)

"যাদুকরেরা যখন নিক্ষেপ করলো, তখন তা লোকদের দৃষ্টিকে সম্মোহিত করলো এবং আতংক করলো" – (আরাফঃ ১১৬)।

فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ فَأَوْجَسَ فِى نَفْسِهِۦ خِيفَةً مُّوسَىٰ - (طٰه : ٦٦-٦٧)

"তখন অকস্মাৎ তাদের যাদুর কারণে তাদের লাঠি ও রশিগুলো মূসার দিকে দৌড়াচ্ছে বলে মনে হলো এবং মূসা মনে মনে ভয় পেয়ে গেলো" – (ত্বাহাঃ ৬৬, ৬৭)।

এ থেকে জানা গেলো, যাদু কখনো অন্তরনিহিত সত্তার পরিবর্তন করেনা।

বরং এক বিশেষ ধরনের মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব বিস্তার করে মানুষের চেতনা ও অনুভূতিকে প্রভাবিত করে। তাছাড়া এ থেকে এ কথাও প্রমাণ হয় যে, যাদুর এ প্রভাব কেবল সাধারণ মানুষের উপরই পড়েনা বরং নবীদের উপরও পড়তে পারে। যদিও এভাবে কোনো যাদুকর নবীকে পরাজিত করতে পারেনা, তাঁর মিশনকে ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হয়না এবং তাঁকে এতদূর প্রভাবিত করতে পারেনা যার ফলে তিনি যাদুর প্রভাবাধীন হয়ে নবুয়্যতের মর্যাদা বিরোধী কোনো কাজ করে বসেন। কিন্তু নবীর উপর যাদুর প্রভাব পড়তে পারে, এ কথা কুরআন থেকে প্রমাণিত।

হাদীস গ্রন্থসমূহে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যাদুর প্রভাব পড়ার সাথে সম্পর্কিত যে সব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত হয়েছে সেগুলোর কোনো একটি বিষয়ও বিচারবুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ দর্শনের বিরোধী নয়। কুরআন বর্ণিত যে মহাসত্যের কথা আমি ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি তারও বিরোধী নয়। নবী যদি আহত হতে পারেন, শহীদ হতে পারেন, তাহলে যাদুর দ্বারা তাঁর প্রভাবিত হওয়াটা এমন কি বিস্ময়ের ব্যাপার হতে পারে? হাদীস থেকে তো কেবল এতটুকু জানা যায় যে, কয়েকদিন পর্যন্ত রসূলে করীমের (স) হালকা স্মৃতি বিভ্রমের মতো হয়ে গিয়েছিল এবং তাও সব ব্যাপারেই নয় বরং কোনো কোনো ব্যাপারে আংশিকভাবে। [লাহোর, জুন–জুলাই ১৯৫২]

হাদীসের কতিপয় হুকুম কুরআন বিরোধী মনে করার ভ্রান্তি

প্রশ্নঃ যখন নামাযের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করবো, তখন আমাদের উযু করতে হবে এ কথা পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে জানতে পারি। এর তাৎপর্য হলো, প্রত্যেক নামাযের জন্যে নতুন করে উযু করা জরুরী। নামায পড়ার পর উযুর মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। দ্বিতীয় নামাযের জন্যে ভিন্ন উযু করা অপরিহার্য। তাহলে এক উযু দিয়ে লোকেরা কয়েক ওয়াক্তের নামায কেমন করে আদায় করে তা বুঝতে পারছিনা। এমনি করে কুল্লি করা এবং নাকে পানি দেয়ার কথা কুরআনে বর্ণিত উযুর আরকানের কোথায়ও উল্লেখ নেই এবং উযু ভংগ হওয়ার কাজ ও কারণগুলোর সূচীও কুরআনের কোথাও দেয়া হয়নি। এমতাবস্থায় কুল্লি ইত্যাদি করা এবং কোনো কাজকে উযু ভংগকারী কাজ গণ্য করা কি কুরআনী শিক্ষার বিরোধী নয়?

কসরের নামায সম্পর্কেও কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে যে, কেবল বিপদসংকুল জিহাদী সফরেই নামায কসর করা যায়। নিরাপদ সাধারণ সফরে নামায কসর করা কি কুরআন বিরোধী নয়?

জবাবঃ এ কথা ঠিক যে, কুরআন মজীদে হুকুম দেয়া হয়েছে, যখন নামাযের জন্যে দাঁড়াও, তখন উযু কর। তবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হুকুমের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য আমাদের বলে দিয়েছেন। এমনিভাবে কুরআনে শুধু মুখমন্ডল ধৌত করার হুকুম এসেছে। তবে নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুলি করে নাকে পানি দিয়ে মুখমন্ডল ধৌত করার সঠিক পদ্ধতি ও অর্থ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। কুরআনে শুধুমাত্র মাথা মসেহ করার নির্দেশ এসেছে। মাথা মসেহ করার সাথে কানও মসেহ করার শামিল এ কথা রসূল বলেছেন। উযু শুরু করার আগে যে হাত দিয়ে উযু করতে হবে, সে হাতগুলো প্রথমে পরিষ্কার করে নিতে হবে এ কথাও তিনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। এ কথাগুলো কুরআনে উল্লেখ নেই। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনী হুকুমের ব্যাখ্যা দান করতে গিয়ে এগুলো আমাদের বলেছেন। কুরআনের সাথে রসূলের আগমনের উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে, তিনি কুরআনের উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে আমাদের বলবেন এবং তা বাস্তবায়িত করে দেখাবেন এ আয়াতের মধ্যে সে তথ্যই ফুটে উঠেছেঃ

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ - (النحل: ٤٤)

"হে নবী! এই যিকর আমি লোকদের কাছে সরাসরি প্রেরণ করার পরিবর্তে আপনার কাছে এ কারণে অবতীর্ণ করেছি যাতে করে আপনি তাদের কাছে সেই হিদায়াতের ব্যাখ্যা দান করতে পারেন যা তাদের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে।"

উপরের কথাটি ভাল করে বুঝতে পারলে একই উযুর সাহায্যে অত্যধিক নামায পড়া কিভাবে জায়েয হতে পারে, সে কথাটি বুঝতেও কোনো কষ্ট হবেনা। আসলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের বলেছেন এক উযুর মেয়াদ কতটুকু এবং কি কারণে এর মেয়াদ বা সময়সীমা শেষ হয়ে যায়। যদি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব কথা না বলতেন, তাহলে একজন লোকের এ ভুল করার সম্ভাবনা ছিল যে, সে উযু করার পর প্রশ্রাব পায়খানা কিংবা উযু ভংগকারী কোনো কাজ করার পরও নামাযের জন্যে দাঁড়িয়ে যেতেন। অথবা নামায আদায় কালে বাতকর্ম হওয়া সত্ত্বেও নামায আদায় করে নিতেন। নামাযের জন্যে উযু জরুরী, কুরআনে শুধু এতোটুকু বলা হয়েছে। উযু কতক্ষণ পর্যন্ত থাকবে এবং কি কি কারণে ভংগ হবে তা বলা হয়নি। যে ব্যক্তি এই মাত্র উযু করলো, তার গুহ্যদ্বার দিয়ে বাতাস বের হওয়ার কারণে কি ক্ষতি হলো সে নিজে তা বুঝতে সক্ষম ছিলনা। এবার যখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিষ্কারভাবে বলে দিলেন যে, নামায ভংগ হওয়ার কারণ কি কি, তখন সে নিজে জানতে পারলো যে, এসব কারণ প্রকাশ

না হওয়া পর্যন্ত উযু থাকবে, তাতে যতো ঘন্টাই অতিবাহিত হোক না কেন। আর এসব কারণ প্রকাশ পেলেই উযু ভেংগে যাবে যদিও এই মাত্র উযু করা হোক না কেন এবং অংগ থাক না কেন?

"যখন তোমরা নামাযের জন্যে দাঁড়াও, তখন উযু করে নাও"। কুরআনের শব্দগত এরূপ ভাবার্থের কারণে প্রত্যেক নামাযের জন্যে নতুনভাবে উযু করা জরুরী- যদি আমরা আপনার এ যুক্তি মেনে নিই, তাহলে এক ব্যক্তি এমনি ধরনের যুক্তি প্রদর্শন করে এ হুকুম দিতে পারে যে, কুরআনের আলোকে প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তিকে প্রতিবছর হজ্জ করতে হবে এবং জীবনে একবার যাকাত আদায় করলেই কুরআনের হুকুম পালিত হয়ে যাবে। রসূলের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দ্বারস্থ না হয়ে প্রত্যেকেই প্রত্যেক আয়াতের একেকটি অদ্ভুত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তো দিতে পারে, তবে কারো মত অপর কারোর জন্যে দলিল হতে পারেনা।

উযু সম্পর্কে যে ভুল আপনি করেছেন, কসর সম্পর্কিত প্রশ্নেও সে ভুলেরই পুনরাবৃত্তি করেছেন। কুরআনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে যিনি কুরআন নিয়ে এসেছেন সেই রসূলের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে এড়িয়ে যাওয়া এক বিরাট মৌলিক ভুল, যার পরিণতিতে অগণিত ত্রুটি দেখা দেয়। উপরে আমি এই ত্রুটিগুলোর কয়েকটির প্রতি ইঙ্গিত করেছি। কেবলমাত্র ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় নামায কসর করার কথা কুরআনে উল্লেখ আছে। সে অবস্থায় ইমাম ছাড়া অন্যদের জন্যে শুধুমাত্র এক রাকআতই যথেষ্ট। নিরাপদ অবস্থায় কসরের নেতিবাচক হুকুম কোথাও নেই। এই দ্বিতীয় যে হুকুমটি আমরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে পাই তাহলো, সফরের সময় ফজর ও মাগরিবের ফরয পুরা পড়তে হবে। যোহর, আসর ও ইশার ফরয দু'রাকাআত পড়তে হবে। এই কসরকে যে কুরআন বিরোধী বলে সে দু'টি মস্তবড় ভুল করেঃ

এক. সে কোনো হুকুম কুরআনে না থাকা এবং কুরআনের বিরোধী হওয়া এক বস্তু মনে করে। অথচ এ দুয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।

দুই. সে নবীর মাধ্যমকে মাঝখান থেকে হটিয়ে সরাসরি কুরআনকে গ্রহণ করতে চায়। অথচ কুরআন সরাসরি তার কাছে আসেনি। বরং নবীর মাধ্যমেই এসেছে। আল্লাহ এ মাধ্যম এ জন্য গ্রহণ করেছেন যাতে নবী কুরআনের উদ্দেশ্য ও বক্তব্য তাদেরকে বুঝিয়ে দেন। সে ব্যক্তি কি এ কথা বলতে চায় যে, আল্লাহ এ মাধ্যম অনর্থক গ্রহণ করেছেন? [তরজমানুল কুরআন, জমাদিউল উলা ১৩৭২, ফেব্রুয়ারী ১৯৫৩]

কুরআনে বর্ণিত চুরির দন্ড

প্রশ্নঃ এ চিঠির সাথে "কুরআনে বর্ণিত চুরির দন্ড" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ পাঠালাম। সম্ভব হলে আপনার মাসিক সাময়িকীতে প্রবন্ধটি প্রকাশ করবেন।

আমার উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন লোক এর উপর মতামত প্রকাশ করুক। যদি অধিকাংশ লোক আমার সাথে একমত হয়, তাহলে পরবর্তীতে ব্যভিচারের অপরাধ সম্পর্কেও এমন ধরনের ব্যাখ্যা করা হবে।

পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন পরিষদের সামনে রয়েছে যিনা ও চুরির এমন দু'টি ফৌজদারী অপরাধ যার শরীয়তসম্মত দন্ড বর্তমান মানসিক প্রবণতার বিরোধী। আমার নিবন্ধের উদ্দেশ্য হলো, পার্লামেন্ট যেন একদিকে কুরআনের দন্ডবিধি অনুসারে আইন প্রণয়ন করতে পারে এবং অন্যদিকে লোকদের মানসিক প্রবণতার মর্যাদাও রক্ষিত হয়। কোনো অপরাধের দরুন যথাসম্ভব কারাদন্ড না দেয়া এবং বেত্রাঘাত, জরিমানা, নির্বাসন ইত্যাদির প্রচলন করলে তা কুরআনের হুবহু উদ্দেশ্য অনুযায়ী হবে।[১]

"সূরা মায়িদার ৩৮–৩৯ আয়াতে যে চুরির দন্ডবিধির কথা বলা হয়েছে, তাহলো চোরের হাত কেটে দেয়া হবে। السارق সাথে السارقة শব্দটি যুক্ত করার ফলে সকল মুফাসসির এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, এখানে মেয়ে চোরের কথা বলা হয়েছে।" – "প্রশ্ন হলো, আল্লাহ্ তাআলা যখন আদম সন্তানের জন্যে কোনো শাস্তি অথবা পুরস্কারের কথা বলেন, তখন ব্যতিক্রমী ঘটনা ছাড়া তা শুধুমাত্র পুরুষদের জন্যই উল্লেখ থাকে। আর মেয়েরা তো নিজে নিজেই এর মধ্যে শামিল আছে বলে মনে করা হয়।" – "প্রকৃতপক্ষে এখানে السارقة মানে চোরের সাহায্য ও সহায়তাকারী। দুনিয়াতে দু'ধরনের লোক আছে। এক, যারা কাজ করে, দুই, যারা কর্মীদের সাহায্য করে। নারী–পুরুষের মধ্যে সাধারণত পুরুষই কাজ করে, আর নারী তো হয় তাদের সাহায্যকারী। এ জন্যেই সাহায্যকারীদের জন্যে আল্লাহ্ তাআলা স্ত্রীলিংগ ব্যবহার করেছেন। পবিত্র কুরআনে যেখানেই সাধারণভাবে কোনো কাজ অথবা পরিণাম সম্পর্কে পুংলিংগের সাথে স্ত্রীলিংগের ব্যবহার করা হয়েছে, সেখানে স্ত্রীলিংগ দ্বারা সে কাজের সাহায্য ও সহায়তাকারী অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। সাহায্যকারী স্ত্রী বা পুরুষ যেই হোক না কেন। ব্যভিচার কার্যে পুরুষের প্রথম সাহায্যকারী ব্যভিচারিণী। আর দ্বিতীয় সাহায্যকারী হলো কার্য সম্পাদনা ও বাস্তবায়নের জন্যে উভয়ের মধ্যস্থিত দালাল। এ কারণেই ব্যভিচারিণী শব্দের মধ্যে এরা সবাই শামিল। এমনিভাবে চুরি সাধারণত হতে পারেনা, যতোক্ষণ না পরামর্শদাতা, চোরের আশ্রয়দাতা এবং চোরাই মাল গোপন করার লোক বর্তমান থাকবে। আল্লাহ্ তাআলা السارقة মেয়ে চোর শব্দের মধ্যে এদের সবাইকে শামিল করেছেন এবং সকলের জন্যই হাত কাটার দন্ড নির্ধারণ

---

[১] বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ প্রশ্নকর্তার উপরোল্লিখিত নিবন্ধের কতিপয় জরুরী উদ্ধৃতি এখানে সন্নিবেশিত হলো। এই উদ্ধৃতিগুলো ১৯৫০ সালের ১লা নভেম্বরের "পয়গামে সুলাহ" পত্রিকা থেকে কেটে চিঠির সাথে পাঠানো হয়েছিল।

করেছেন।"

السارق (চোর) এবং والسارقة (মেয়ে চোর) এ শব্দদ্বয়ের মাঝখানে ও و 'এবং' সংযোজন করে, বুঝানো হয়েছে যে, "শারেকাহ" মানে চোরের সহায়তাকারী। কারণ, যদি এর উদ্দেশ্য নারী চোর হতো, তাহলে 'ওয়াও'–এর পরিবর্তে 'আও' (অথবা) শব্দ ব্যবহার করা হতো।" "দ্বিতীয় যে কথাটি এখানে প্রনিধানযোগ্য তা হচ্ছে এই যে, খাঁটি তওবা করে দন্ড থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার সুযোগ আল্লাহ্ তাআলা চোরকে দিয়েছেন। অথচ ইসলামী আইনবিদদের প্রণীত দন্ডবিধির মধ্যে তাদেরকে ক্ষমা করার কথা উল্লেখ নেই।" (এ প্রসঙ্গে তওবা সম্পর্কে কতিপয় হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে) "সুতরাং আমার মতে কুরআনের আলোকে চোরকে একবার খাঁটি তওবা করার সুযোগ দেয়া উচিত। তওবা করা সত্ত্বেও যদি সে পুনর্বার চুরি করে, তাহলে তাকে অবশ্যই সাজা পেতে হবে।" "কুরআন একদিকে যখন চোরকে ক্ষমা করার কথা বলে এবং অন্যদিকে হাত কাটার হুকুম দেয়, তখন তা থেকে চোরের সর্বনিম্ন শাস্তি ক্ষমা করা আর সর্বোচ্চ শাস্তি হাত কেটে দেয়ার কথা বলা ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। কাজেই এ কথা বলা যায় যে, ইসলামে চোরের শাস্তি হাত কাটা ছাড়া আর কিছুই নেই, আমার মতে এটা উসুলে কুরআনের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা।" কুরআনের আলোকে চোর এবং তার সাহায্যকারী সম্পর্কে কাযীর (বিচারক) পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। তার হাত কেটে দেয়া বিচারকের জন্য জরুরী নয়। বিচারক চোরকে তওবা করিয়ে সম্পূর্ণ মুক্তও করে দিতে পারে, আবার বেত্রাঘাত ও জরিমাণা করতে এবং কারাদন্ডও দিতে পারে। এর শেষ দন্ড হলো হাত কাটা। এ ব্যাখ্যার পর কুরআনের দন্ডবিধি বর্বর যুগের দন্ড ছাড়া আর কিছুই নয় এবং তা আধুনিক সভ্য জগতে অচল, এ ধরনের কথা বলার ও প্রোপাগান্ডা করার আর কোনো অবকাশই থাকেনা।

জবাবঃ আপনি চুরির দন্ড সম্পর্কে যে যুক্তি পেশ করেছেন তার সাথে আমি একমত নই। سارقة এবং زانية দ্বারা সাহায্যকারী অর্থ গ্রহণ করা নিছক একটি বাড়াবাড়ি ও জবরদস্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। আরবী ভাষায় এর কোনো অবকাশই নেই। এমনিভাবে কুরআনের ভাষার মধ্যে জোরপূর্বক একটি অর্থ সৃষ্টি করাকে আমি জায়েয মনে করিনা। এবার এ কথায় আসুন যে, سارق এর সাথে سارقة এর উল্লেখ করা আল্লাহর কি প্রয়োজন ছিল? এর পরিষ্কার জবাব হলো, হাত কাটার ব্যাপারে দন্ডের প্রচন্ডতা নিয়ে লোকদের মনে একটা বিশেষ অস্বস্তি এমনিতেই দেখা দেয়। কিন্তু পুরুষের তুলনায় মেয়েদের বেলায় এ ধারণা আরো বেশী অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে। এ কারণে সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে যে, কেবল মাত্র পুরুষই নয়, মেয়েলোক চোর হলেও তাকে এ সাজা ভোগ করতে হবে। এ

প্রয়োজনের প্রেক্ষিতেই ব্যভিচারী পুরুষের সাথে ব্যভিচারিণী নারীর কথাও সুস্পষ্ট রূপে ব্যক্ত করা হয়েছে। সংযোগমূলক "ওয়াও" শব্দ দ্বারা আপনি যে অর্থ সৃষ্টির চেষ্টা করছেন তা ঠিক নয়। আরবী ভাষায় সংযোগমূলক "ওয়াও" শুধুমাত্র সংগ–সাথীর অর্থেই ব্যবহৃত হয়না যে জন্য আপনি যার সংযোগ হয়েছে এবং যার সাথে সংযোগ হয়েছে উভয়ের হুকুম এক সাথে প্রযোজ্য হওয়ার অর্থ আবশ্যিক মনে করেছেন। সাধারণ বহুবচনের অর্থেও ওয়াও–এর প্রয়োগ হয়। তখন এর অর্থ হয় বর্ণিত হুকুম যার সংযোগ হয়েছে ও যার সাথে সংযোগ হয়েছে উভয়ের মধ্যে সমভাবে প্রযোজ্য হওয়া। এ অবস্থায় 'ওয়াও' (এবং) প্রায় 'আও' (অথবা)–এর সমর্থক হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ উভয়ের যে কোনো একটিতে বর্ণিত হুকুম প্রযোজ্য হবে। এ কারণেই আপনি

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ـ(النساء : ٣)

এ আয়াতের অর্থ গ্রহণ করেছেন দুই দুই, তিন তিন, চার চার। সবগুলো এক সাথে নয়। কাজেই اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ বলার তাৎপর্য হলো– চোর পুরুষ বা নারী যেই হোক, উভয়ের ক্ষেত্রে এই হাত কাটার হুকুম প্রযোজ্য হবে।

চোরের তওবার ব্যাপারে আলোকপাত করতে গিয়ে আপনি এ কথা ভুলে গেছেন যে, কে এমন চোর আছে যে দন্ড থেকে মুক্তি পাওয়ার আশা থাকলে তওবা করবেনা? তাছাড়া কতবার তওবা করার পরও এক ব্যক্তি চুরি করলে তার হাত কেটে দিতে হবে– এ সীমারেখা আপনি কিভাবে নির্ধারণ করবেন?

চুরি ও ব্যভিচারে যারা সাহায্য করে, তাদের জন্য কুরআন কি দন্ড নির্ধারণ করেছে? আপনার এ প্রশ্নও ঠিক নয়? শুধুমাত্র এই একটি প্রসংগ কেন, দন্ডবিধির অনেক ধারা সম্পর্কেই কুরআন নীরবতা অবলম্বন করেছে। তাহলে প্রত্যেক অপরাধের শাস্তি কুরআন থেকে উদ্ভাবন করা কি আমার বা আপনার জন্যে জরুরী? আর নাকি কুরআনে উল্লিখিত অপরাধ ও শাস্তি ছাড়া অন্য কোনো অপরাধের শাস্তি দেয়া যাবেনা? কুরআন শুধুমাত্র সীমারেখা নির্ধারণ করে। বাকি থাকে দন্ডবিধি প্রসংগ। শরীয়তের এ কথা স্বীকৃত যে, এ অধ্যায়ে প্রয়োজন অনুসারে বিধান প্রণয়ন করা যেতে পারে। [তরজমানুল কুরআন, সফর ১৩৭০ হিজরী, ডিসেম্বর ১৯৫০]

কুরআনে বর্ণিত ব্যভিচারের দন্ড

প্রশ্নঃ আপনি আমার 'কুরআনে বর্ণিত চুরির দন্ড' প্রবন্ধটির উপর যে বক্তব্য

রেখেছেন সে জন্য কৃতজ্ঞ। এখন এ ধরনের আরেকটি প্রবন্ধ কুরআনে বর্ণিত ব্যভিচারের দন্ড শিরোনামে পাঠালাম। আশা করি, এর উপর আপনার রায় প্রকাশ করবেন। আল্লাহ্ চাইলে আপনার উভয় সমালোচনার জবাব একত্রে দেবো।

এখানে মোটামুটিভাবে এতোটুকু আরয করা জরুরী যে, কুরআনে সর্বাধিক শাস্তির কথা বলা হয়েছে এবং ন্যূনতম শাস্তি বিচারকের বিবেক-বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল, আপনি আমার এ ব্যাখ্যার কোনো সমালোচনা করেননি। দুনিয়ায় কোন্ অপরাধের শাস্তি অপরাধীকে আখিরাতের শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেয়, সে সম্পর্কেও আপনি কিছুই বলেননি।[১]

"আমি আমার আগের প্রবন্ধে (কুরআনে বর্ণিত চুরির সাজা) বলেছি, سارقة দ্বারা চুরি করতে সহায্যকারী স্ত্রী-পুরুষ সব ধরনের লোক বুঝায়। চোর যদি নারী হয় তবে سارق শব্দের মধ্যে স্ত্রী চোর শামিল আছে। اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ এই আয়াতেও একই অবস্থা বিরাজমান। اَلزانية (ব্যভিচারিণী) শব্দের মধ্যে যিনাকার্যে সাহায্যকারী সমস্ত লোক শামিল। সাহায্যকারীরা হতে পারে দালাল (স্ত্রী-পুরুষ উভয়ই) অথবা যিনার প্রস্তাবক অথবা ব্যভিচারের ব্যবস্থাপক কিংবা উপস্থাপক ইত্যাদি।

চুরির শাস্তির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে سارقة কে سارق, এর পরে নেয়া হয়েছে। কিন্তু এখানে زانی এর আগে নেয়া হয়েছে زانية শব্দ কোনো সংগত কারণে। আমার জানা মতে এর কারণ হলো- চুরি করার অপরাধে সবচেয়ে বড় অপরাধী হলো চোর। তৎপরবর্তী অপরাধী হলো চোরের সাহায্যকারীরা। কিন্তু ব্যভিচারের ব্যাপারে সহায়তা দানকারী (অর্থাৎ زانية ব্যভিচারী নারী ও পুরুষের চেয়ে বেশী অপরাধী। কেননা, তাদের সাহায্য ব্যতিরেকে ব্যভিচার কার্যটি সংঘটিত হতে পারেনা। এ কারণেই زانية শব্দটি অগ্রভাগে ব্যবহার করা হয়েছে।"

"কুরআনে ব্যভিচারের দু'টি শাস্তির কথা বলা হয়েছে। এক, ব্যভিচারীদেরকে একশত বেত্রাঘাত করা। দুই, তাদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করা, মু'মিনদের জামায়াত থেকে তাদেরকে আলাদা করে দেয়া এবং তওবা করা ছাড়া মু'মিনকে বিবাহ করার অনুমতি না দেয়া"। কুরআনে অন্যান্য আহকামের আলোকে কোনো মু'মিন মুশরিক নারীকে বিবাহ করতে পারেনা।

---

১ ব্যাখ্যা তলবকারীর উল্লিখিত প্রবন্ধের কতিপয় জরুরী উদ্ধৃতি নিম্নে প্রদান করা হলো, যাতে সে আলোকে জবাব পর্যালোচনা করা যায়।

অথচ এখানে সে হুকুমের খেলাফ বলে প্রতীয়মান হয়। এর জবাব হলো, এখানে মুশরিক ও মুশরিকাহ্ আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ যে স্ত্রীলোক সংগম–সুখ উপভোগ করার ব্যাপারে নিজের স্বামীর সাথে অন্য কোনো পুরুষকে শরীক করে, সে মুশরিকাহ্। আর যে পুরুষ নিজের স্ত্রীর সাথে ভিন্ন কোনো সংগম সুখ দান কারিণীকে শরীক করে সে মুশরিক।" "কাজেই যানিয়াহ্ (যিনাকারিণী) ও মুশরিকাহ্র অর্থের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। মুশরিকাহ্ হচ্ছে, স্বামীর বর্তমানে ব্যভিচারিণী। আর যানিয়াহ্ হলো, যে পুরুষ বা স্ত্রীলোক ব্যভিচার কার্যে অন্যকে সাহায্য করে নিজকে ব্যভিচারপীড়িত করে বা অন্যভাবে। এমনিভাবে যানী (ব্যভিচারী) ও মুশরিক শব্দের অর্থেও পার্থক্য আছে। যানী শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়, তার স্ত্রী থাকুক বা নাই থাকুক। অন্যদিকে যার স্ত্রী আছে এমন ব্যভিচারী পুরুষকে মুশরিক বলে।" "যে আলেম সাহেবগণ আমার এ কথা মেনে নেবেননা, তারা ব্যভিচারের জন্যে কেবলমাত্র একটি শাস্তিরই প্রস্তাব করবেন। অর্থাৎ শত বেত্রাঘাত। বয়কট সম্পর্কিত দ্বিতীয় দন্ডটি তাদের মতে কোনো দন্ড হিসেবে বিবেচিত হবেনা।" "শত বেত্রাঘাত তো চরম সাজা। আমি আমার প্রবন্ধে (কুরআনে চুরির সাজা) লিখেছিলাম, চুরির চরম সাজা হলো, হাত কাটা আর ন্যূনতম সাজা বিচারকের বোধশক্তির উপর নির্ভরশীল।" "অপরাধীর অবস্থার বিভিন্নতার উপর অপরাধ শক্ত ও হালকা হওয়া নির্ভর করা সত্ত্বেও এই নিয়মের বিরোধিতা করে সব অপরাধীর জন্যে একই শাস্তি নির্ধারণ এবং একই লাঠিতে সব ধরনের অপরাধীকে ধাওয়া করার বিধান ইসলামের দন্ডবিধি কিতাব অর্থাৎ কুরআন মজীদে কিভাবে থাকতে পারে?" –এ কারণেই খলিফা চতুষ্টয় এবং স্বয়ং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যিনার চরম অবস্থায় শত বেত্রাঘাতের শাস্তিকে অপর্যাপ্ত মনে করে অপরাধীকে রজম অর্থাৎ মৃত্যুদন্ড প্রদান করার হুকুম জারী করেন।" ..."আমাদের যুগে রজম জায়েয কি না? তবে অন্তত এতোটুকু তো জানা আছে যে, কুরআনে রজমের কোনো কথা উল্লেখ নেই। এমতাবস্থায় তিলাওয়াত রহিত কিন্তু হুকুম বহাল, এ ধরনের একটি আয়াত হিসেবে এর আলোচনা করা হয়না কেন?" "অবশ্য কন্যা ও ভাতিজীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত ব্যক্তিকে জীবিত রাখা বিবেকসম্মত নয়। তাই বিশেষ অবস্থায় ব্যভিচারের বিরুদ্ধে মৃত্যুদন্ডের বিধান জারী করা দোষের নয়। তবে সেটা হবে শুধুই মৃত্যুদন্ড, রজম নয়। কেননা, রজম তথা প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু প্রদান করাকে বরদাশ্ত করতে পারেনা। ... যিনা এবং চুরি করার অপরাধের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য আছে, এ কথা এড়িয়ে যাওয়া উচিত হবেনা। পার্থক্যটা হলো– চোরকে দন্ড দেয়ার আগেই তওবা করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। আর ব্যভিচারীকে শাস্তির পর।

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ.... এখানে 'যালিকা' শব্দ দ্বারা

সাজার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ব্যভিচারী কোনো অবস্থাতেই শাস্তি থেকে রেহাই পাবেনা। কিন্তু চোর তওবা করে দন্ড থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে যদি বিচারক গ্রহণ করেন।"

জবাবঃ "কুরআনে যিনার শাস্তি" শিরোনামের প্রবন্ধসহ চিঠি পেয়েছি। আপনার প্রথম ও দ্বিতীয় প্রবন্ধ মনোযোগ দিয়ে পড়ার পর আমি যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি তা হচ্ছে, (আমার এ বক্তব্যে আপনি মনোক্ষুণ্ন হবেননা)। কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং শরয়ী আহ্কামের বিশদ বিবরণ দিতে গিয়ে আপনি সে সব সাবধানতা অবলম্বন করেননি, যা একজন আল্লাহ্ ভীরু লোকের অবলম্বন করা উচিত। যদি আপনি আমার উপদেশ মানেন, তাহলে আমি আপনাকে দু'টি নীতিগত কথা বলবো। একটা হলো, আপনি নিজের মন মাফিক মতবাদ তৈরি করে নিয়ে তার সপক্ষে কুরআন ও হাদীস থেকে দলিল খোঁজ করার পদ্ধতি ত্যাগ করুন। এর পরিবর্তে কুরআন ও হাদীস থেকে যে শিক্ষা পাওয়া যায় তার আলোকে মতবাদ গঠন করুন। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, কুরআন ও হাদীস থেকে কোনো মাসয়ালা উদ্ভাবন করার সময় আগেকার মুজতাহিদ, মুফাস্সির ও মুহাদ্দিসগণের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে একেবারে এড়িয়ে যাবেননা। তাদের একজনের মত বর্জন করে অন্য জনের মত গ্রহণ করার স্বাধীনতা আপনার আছে। তবে তাদের সকলের থেকে আলাদা হয়ে আপনি নিজে একটি স্বতন্ত্র মাযহাব বানানোর চেয়ে তাদের কারো এক জনের সাথে থাকা উত্তম। একক ও স্বতন্ত্র মত কেবলমাত্র সে অবস্থায়ই জায়েয হতে পারে, যখন আপনি কুরআন ও হাদীস গভীরভাবে অধ্যয়ন করে উচ্চ পর্যায়ের গবেষণা-মূলক তত্ত্বজ্ঞান ও অন্তরদৃষ্টি লাভ করতে সক্ষম হবেন (যার পরিচয় আপনার লেখাসমূহে আমার নজরে পড়েনি)। আর যে বিষয়ের উপর আপনি এককভাবে মতামত ব্যক্ত করতে চান, সে বিষয়ে আপনার দলিল হতে হবে অত্যন্ত দৃঢ় ও মজবুত। এ দু'টি কথা যদি আপনি স্মরণ রাখেন, তাহলে আপনার প্রবন্ধে যে ধরনের ভুল আমি পেয়েছি, তা থেকে অব্যাহতি পাবেন বলে আশা রাখি।

আপনার প্রবন্ধের বিষদ সমালোচনা করা অবশ্য আমার জন্যে কঠিন। তবে যেসব ভুল এক নজরে ধরা পড়েছে, সেগুলো আমি বলে দিচ্ছিঃ

১. আপনার এ কথাটি একদিক থেকে ঠিক যে, কুরআনে চুরি ও ব্যভিচারের যে দন্ডবিধির কথা বলা হয়েছে তা চরম দন্ড। ন্যূনতম শাস্তি বিচারকের বোধশক্তির উপর নির্ভরশীল। তবে এথেকে একটা বড় ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে। এই সংগে এ কথাও সুস্পষ্ট হওয়া দরকার যে, যখন যিনা সাব্যস্ত হওয়ার জন্যে শরীয়ত মুতাবিক প্রয়োজনীয় সাক্ষী পাওয়া যায় এবং শরয়ী আইনানুযায়ী চুরি করার অপরাধ সাব্যস্ত হয়ে যায়, তখন চুরি ও যিনার

জন্যে কুরআনে নির্ধারিত আইন প্রয়োগ করতে হবে। এমতাবস্থায় নির্ধারিত দন্ডের চেয়ে কম শাস্তি দেয়ার অধিকার বিচারকের থাকবেনা। তবে সামান্য পর্যায়ের চুরির জন্যে সামান্য শাস্তি পাবে। আর যিনা সাব্যস্ত হবার সাক্ষী–প্রমাণ ছাড়া যদি লঘু পর্যায়ের অশ্লীল কাজ প্রমাণিত হয়, তাহলে এমতাবস্থায় লঘু শাস্তি দেয়া যেতে পারে।

২. আপনি এ নিবন্ধেও আপনার ভুলের পুনরাবৃত্তি করেছেন। الزانية এর অর্থ করেছেন যিনা কার্যে সহায়তা দানকারী লোক। যিনা কার্যের মেয়ে ও পুরুষ দালাল, প্রস্তাবক, ব্যবস্থাপক সবাইকে এর মধ্যে শামিল করেছেন। কুরআন সুস্পষ্টভাবে এ অর্থ অস্বীকার করে। যে আয়াতে الزانى ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর সাজার কথা বলা হয়েছে, সে আয়াতে الزانى এর আগে الزانية এর উল্লেখ আছে। তারপর উভয়ের জন্যে একই দন্ডবিধি নির্ধারিত হয়েছে।

فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

"উভয়ের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত কর।" এখানেও আপনি কুরআনের আলোকে নিজের মত পরিবর্তন করার পরিবর্তে কুরআনের হুকুমকে নিজের মতানুযায়ী পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছেন। এমন তৎপরতা চরম ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা পরিহার করা উচিত ছিল।

৩. মুশরিক ও মুশরিকাহর যে অর্থ আপনি বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ যে স্ত্রী নিজের স্বামীর সাথে যৌন উপভোগে শরীক করে সে হলো মুশরিকাহ। আর যে স্বামী নিজের স্ত্রীর সাথে অপর স্ত্রীলোককে যৌন উপভোগে শরীক করে, সে হলো মুশরিক, এ অর্থ সম্পূর্ণ অদ্ভুত, যার কোনো ভিত্তি অভিধানে নেই, নেই পরিভাষায়ও। এমন কোনো ইশারা–ইংগিতও পাওয়া যায়না। যার ভিত্তিতে এমন ধারণাতীত ও অকল্পনীয় অর্থ করা যেতে পারে।

اَلزَّانِىْ لَايَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً......(النور:٣)

আয়াতের لَايَنْكِحُ অর্থ হলো لا يليق به ان ينكح অর্থাৎ যিনাকারী এমন পাপীষ্ট যে সে কোনো পাক পবিত্র সতী সাধ্বী মু'মিন রমণীর পানি গ্রহণ করার যোগ্যতা রাখেনা। তার জন্যে একজন পাপিষ্ঠা অসতী নারী কিংবা মুশরিকা উপযুক্ত হতে পারে। আর ব্যভিচারিণী নারী এমন পাপিষ্টা, কলঙ্কিণী যে সে কোনো নিষ্পাপ নিষ্কলুষ মু'মিন পুরুষের উপযোগী নয়। সে নারী যদি বিবাহ করতে চায় তাহলে একজন পাপী অসৎ চরিত্র পুরুষ কিংবা মুশরিকই তার জন্যে উপযুক্ত হতে পারে। এর মাধ্যমে যিনার দোষ ত্রুটি ও করুণ পরিণতি স্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে এবং ঈমানদার, নেককার ও সৎ

লোকদের বলা হয়েছে, তারা যেন পরিচিত ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী নর–নারীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন না করে। এ কথা বলাই আয়াতের উদ্দেশ্য।

৪. এটাকে অদ্ভুত ব্যাপার ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে! আপনি নিজেই দেখছি স্বীকার করেন যে, খলীফা চতুষ্টয় এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যিনার চরম অবস্থায় (বিবাহিত ব্যভিচারীর কথা আপনি খুলে বলেননি) অপরাধীকে রজম করার শাস্তি দিয়েছেন। কিন্তু তারপরও আপনি "রজম আধুনিক সভ্যতা বিরোধী এবং কোনো মানবিক চেতনা রজমকে বরদাশ্‌ত করতে পারেনা।" এসব কথা বলতে সংকোচ বোধ করছেননা। আমি মনে করি, যদি আপনি কখনো আপনার কথিত বাক্যের উপর নিজে চিন্তা করেন, তাহলে আপনি নিজেই লজ্জিত হবেন। কোনো মানবিক প্রকৃতি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে বেশী পবিত্র, দয়ার্দ্র ও সহানুভূতিশীল হতে পারে কি? আধুনিক সভ্যতা (আণবিক বোমা সমৃদ্ধ সভ্যতা) কি মুসলমানদের জন্যে কোনো সত্যের মানদন্ড হিসেবে বিবেচিত?

আপনি নিজে আমাকে আপনার লেখার সমালোচনা করার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। শুধু সে কারণেই এ কয়েকটি কথা পেশ করলাম। আপনি নিজেই সমালোচনার আমন্ত্রণ জানিয়ে যে উদারতার পরিচয় দিয়েছেন, তাতে আমি মনে করি আপনি আমার কথাগুলো ঠান্ডা মাথায় পড়বেন এবং সত্য সঠিক মনে হলে গ্রহণ করবেন। [তরজমানুল কুরআন, রবিউল আওয়াল–রবিউস সানী ১৩৭০, জানুয়ারী– ফেব্রুয়ারী ১৯৫১]

তাফহীমুল কুরআন সম্পর্কে কতিপয় প্রশ্ন

প্রশ্নঃ নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উপর আলোকপাত করুনঃ

১. তাফহীমুল কুরআনের এক জায়গায় নূহ (আ)–এর তুফান বিশ্বব্যাপী ছিলনা বলে আপনি ধারণা দিয়েছেন। কিন্তু বাহ্যিক আলামত এ কথার খেলাফ প্রতীয়মান হয়। প্রথমত, নৌকা কেন বানানো হলো? হযরত নূহ (আ)–কে হিজরত করার আদেশ করা হলোনা কেন? দ্বিতীয়ত, নৌকায় প্রত্যেক প্রকারের একেক জোড়া জীব নেয়া তুফান ব্যাপক হওয়ার কথা প্রমাণ করে। তাছাড়া

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا

"হে প্রভু, দুনিয়ার বুকে কাফিরদের একজনকেও রেহাই দিওনা।" হযরত নূহ (আ)–এর এ বদদোয়াও তো তুফান বিশ্বজুড়ে হওয়ার প্রতিই সুক্ষ্ম ইংগিত করে।

২. আপনি বলেছেন, দুনিয়ার বর্তমান মানবগোষ্ঠী হযরত নূহ (আ)–এর সাথে যারা নৌকায় আরোহণ করেছিল, তাদের সকলের বংশধর। এর সপক্ষে আপনার দলিল হলো–

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ-

কিন্তু এটা ঠিক নয়। কারণ নূহ (আ)-এর সাথে তার তিন ছেলেও নৌকায় আরোহণ করেছিলেন।

مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ -(بنى اسرائيل:٣)

এ আয়াতে নূহ (আ)-এর ছেলেদের কথাই বলা হয়েছে। অন্য কোনো লোকের কথা বলা উদ্দেশ্য নয়। অন্যত্র স্বয়ং কুরআন এ আয়াতের তাফসীর এভাবে করেছেঃ

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبٰقِيْنَ -(الصافات:٧٧)

"আর তার সন্তানদের আমরা অবশিষ্ট রাখলাম।" এটা খুবই স্পষ্ট ও পূর্ণাংগ কথা।

৩. সূরা ইউসূফের তাফসীরে আপনি লিখেছেন, হযরত ইউসুফ (আ) যুলাইখাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেননি। কারণ এই মহিলার বদাচরণ সম্পর্কে কুরআনের মাধ্যমে জানা যায়। হযরত লূত (আ) ও হযরত নূহ (আ)-এর স্ত্রীগণ কি কাফির ছিলনা? যদি কাফির থেকে থাকে তাহলে কুফরী কি বদাচরণ থেকে অধিক মারাত্মক নয়? অধিকন্তু যুলাইখার বিবাহের সময় মুসলমান হয়ে যাওয়া এবং আগেকার বদ চাল-চলনের জন্যে তওবা করার কথা হযরত ইউসুফ (আ)-এর কাহিনীতেই বর্ণিত হয়ে থাকে।

জবাবঃ

১. হযরত নূহ (আ)-এর তুফান বিশ্বব্যাপী ছিলনা, এ কথা আমি দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলতে পারবোনা। তবে ইতিহাস ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাবলীর অধ্যয়নের প্রেক্ষাপটে আমার অনুমান, হযরত নূহ (আ)-এর সম্প্রদায় যে এলাকায় বসবাস করতো তুফান শুধুমাত্র সে এলাকা জুড়ে ছিল। এ কথার সপক্ষে কিংবা বিপক্ষে কোনো সুস্পষ্ট কথা কুরআনে পাওয়া যায়না।

নৌকা বানানোর হুকুম দেয়া হলো, হিজরত করার হুকুম দেয়া হলোনা কেন? আপনার এ অভিযোগের জবাব হলো, সে সময় পর্যন্ত আদম (আ)-এর বংশধর সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েনি। নূহ (আ)-এর গোষ্ঠী যতোটুকু এলাকায় বসবাস করতো দুনিয়াও ততোটুকু আবাদ ছিল। আপনার দ্বিতীয় অভিযোগের জবাবও এটাই।

২. হযরত নূহ (আ) সম্পর্কে এ কথা কুরআন থেকে প্রমাণিত যে, শুধুমাত্র তাঁর ঘরের লোকেরাই তাঁর উপর ঈমান আনেনি। বরং তাঁর গোত্রের অন্যান্য লোকও ঈমান এনেছিলেন, যদিও সংখ্যায় ছিল তারা অতি নগণ্য, অধিকন্তু সকল ঈমানদারই নৌকায় আরোহণ করেছিলেন।

সূরা হূদে আছেঃ

قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ - (هود : ٤٠)

"নৌকায় প্রত্যেক প্রকারের একেক জোড়া তুলে নাও এবং তোমার পরিবারবর্গকে, তবে যাদের সম্পর্কে আগেই নিষেধাজ্ঞা এসেছে, তারা ছাড়া, আর যারা ঈমান এনেছে। আর যারা তার সাথে ঈমান এনেছেছিল তারা সংখ্যায় ছিল অতি নগণ্য।"

এসব লোকদের বংশধরগণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এ কথা কোথাও বলা হয়নি। অপরদিকে, পরবর্তী প্রজন্ম যারা হযরত নূহ (আ)-এর সাথে নৌকায় আরোহণ করেছিল তাদেরই সন্তান-সন্ততি ছিল, এ কথা কুরআনের দু'জায়গায় স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা বনী ইসরাঈলে বলা হয়েছেঃ

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ - (بنى اسرائيل : ٣)

"নূহ (আ)-এর সাথে যাদেরকে আমি নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম এরা তাদেরই বংশধর।"

مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ - (مريم : ٥٨)

"আদম (আ)-এর বংশজাত নবীদের মধ্য থেকে এবং যাদেরকে আমি নূহ (আ)-এর সাথে আরোহণ করিয়েছিলাম তাদের বংশধরদের মধ্য থেকে।"

এর জবাবে আপনি সূরা সাফ্ফাতের এ আয়াত উল্লেখ করেছেন

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ -

এবং বলেছেন, এর মধ্যে সামগ্রিকভাবে পরিবেষ্টন করার অর্থ নিহিত রয়েছে। এর জবাব হলো এ কেবলমাত্র হযরত নূহ (আ)-এর সন্তানগণ জীবিত ছিল এ কথা বলা এখানে উদ্দেশ্য নয়। বরং যারা হযরত নূহকে (আ) এই মহাসংকটে নিমজ্জিত করেছিল তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে আর যাদেরকে তারা নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছিল, তাদের বংশধরগণই জীবিত রয়ে গেছে, একথা প্রকাশ করাই এখানে উদ্দেশ্য।

৩. যুলাইখার সাথে হযরত ইউসুফ (আ)-এর বিবাহ হয়েছিল, এ কথা কুরআন, সহীহ হাদীস এবং বনী ইসরাঈলের নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত হয়না। কুরআনে এই মহিলার তওবা করার প্রমাণও মিলেনা। তারপরও

অযথা এ কাহিনীর উপর এতোটা জোর দেয়ার প্রয়োজন কি? আযীযের স্ত্রী যে বদাচরণে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল হযরত লূত (আ) ও হযরত নূহ (আ)-এর স্ত্রীদের সম্পর্কে এমন ধরনের আচরণের কোনো প্রমাণ নেই। 'কুফরের চেয়ে অধিক বদাচরণ আর কী হতে পারে' আপনার এ উক্তি সম্পর্কে গভীর ভাবে চিন্তা করলে আপনি নিজেই এ কথার দুর্বলতা জানতে পারবেন। ব্যভিচার এবং তৎপূর্ব কর্মকান্ড গর্হিত ও লজ্জাকর হিসেবে পরিগণিত। এমন কাজে জড়িয়ে পড়া এক কথা এবং কুফর ও শিরকে নিমগ্ন হওয়া অন্য কথা। নবীগণের বাপ-দাদা এমনকি কোনো কোনো নবীর স্ত্রী পর্যন্ত কুফর ও শিরকে মগ্ন ছিল বটে। কিন্তু তারা যৌন পংকিলতায় আবদ্ধ ছিলনা। আকীদাগত দিক থেকে কুফর ও শেরেকী যতো মারাত্মকই হোকনা কেন, নৈতিকতার দিক থেকে যৌন পাপ অনেক বেশী হীন ও ঘৃণ্য কাজ, যাকে কাফির মুশরিকরা পর্যন্ত ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে থাকে।

প্রশ্নঃ উদ্ভিদ বিদ্যা সম্পর্কে আমার কোনো পান্ডিত্য নেই। তবু তাফহীমুল কুরআন অধ্যয়ন করতে গিয়ে কতিপয় প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। নিশ্চিন্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে প্রশ্নগুলো আপনার সমীপে পেশ করছিঃ

তরজমানুল কুরআনের ৩৫ খন্ড ৩,৪ সংখ্যার ১৪৩ পৃষ্ঠায় এ নোট লেখা আছেঃ "একই বৃক্ষের প্রতিটি ফল একই ধরনের হওয়া সত্ত্বেও আকার, পরিমাণ ও স্বাদে বিভিন্ন" এবং "একই শিকড় থেকে দু'টি ভিন্ন শাখা বের হলো অথচ ফলগুলো ভিন্নতর।"

"স্বাদে ভিন্ন" হওয়ার যে কথা আপনি লিখেছেন তা কি অভিজ্ঞতার আলোকে লিখেছেন নাকি বইপত্র পড়ে? যদি বাস্তব এটাই হয়ে থাকে, তাহলে এ ধরনের কতিপয় বৃক্ষের উদাহরণ দেয়া উচিত ছিল। আমার ধারণা মতে একই গাছের ফলের স্বাদের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য হয়না। তবে গাছের যে অংশ সূর্যকিরণ পর্যাপ্ত পরিমাণে পায়, সে অংশের ফল প্রথমে পরিপক্ক হয়। ফলের আকার ও পরিমাপের মধ্যে তো তারতম্য হতে পারে। কিন্তু স্বাদে তারতম্য হওয়ার কথা আমি বুঝতে পারছিনা।

জবাবঃ বৃক্ষ শিকড়ের সাহায্যে যে খাদ্য গ্রহণ করে থাকে তার উপর ফলের ছোট-বড় আকার, রং ও স্বাদ নির্ভর করে। সূর্যকিরণ, হাওয়া এবং দিবা-নিশির অন্যান্য প্রভাবে যে ঠান্ডা-গরম পড়ে তাও ফলের উপর কার্যকর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এসব উপকরণ যেহেতু সমস্ত ফলের উপর সমভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনা বরং প্রত্যেকটি ফলে অন্যান্য ফলের তুলনায় প্রভাবের দিক থেকে কিছু না কিছু পার্থক্য হয়, যার কারণে যেমনিভাবে পরিমাণগত আকার ও রংয়ের মধ্যে বেশ একটা পার্থক্য অবশ্যই হয়ে থাকে, তেমনি স্বাদেও

অল্পবিস্তর তারতম্য হয়ে থাকে। যদিও সেটা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

তাছাড়া এটা একটা বিশ্বজনীন সত্য যে, সৃষ্টিজগতে এমন কোনো দু'টি বস্তু নেই যা সবদিক থেকে সম্পূর্ণভাবে সমান সমান। আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেকটি বস্তুর মধ্যে এমন স্বাতন্ত্র রেখে দিয়েছেন যার মধ্যে অপর কোনো বস্তুর অংশীদারিত্ব নেই। এমনকি একই ব্যক্তির শরীরের এক হাতের রেখাগুলি অন্য হাতের রেখাগুলি থেকে ভিন্নতর হয়ে থাকে। একই চেহারার ডানদিক বামদিক থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। একই মাথার দু'খানি চুলও এক রকম নয়। এভাবে পরিপূর্ণ ও পূর্ণতার অধিকারী স্রষ্টা দেখিয়ে দিলেন যে, তাঁর সৃষ্টি ও শিল্প নিপুণতার মধ্যে রয়েছে চরম পর্যায়ের অভিনবত্ব ও বৈচিত্র্য। এই বিস্ময়কর সৃষ্টি কৌশলের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে মানুষ বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে যে, আল্লাহ্ তাআলা এই বিশ্বজগতের প্রত্যেক স্থানে প্রতি মুহূর্তে প্রত্যেকটি বস্তু নিয়ন্ত্রণ করছেন এবং প্রত্যেকটি জিনিসের প্রতি তাঁর গভীর মনোযোগ রয়েছে। তাঁর সৃষ্টি, শাসন ও ব্যবস্থাপনার কাজ বিশ্ব পরিমন্ডলে সর্বক্ষণ জারী রয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা এই পৃথিবী চালু করে দিয়ে কোনো এক প্রান্তে বেকার বসে আছেন আর বর্তমানে এ কারখানাটি এক গতানুগতিক রীতিতে নিজে নিজেই চলছে, যারা এরূপ মনে করে তারা নেহাত অজ্ঞ ও মূর্খ ছাড়া আর কিছুই নয়। যদি সত্যিই এমনটি হতো, তাহলে সৃষ্টিকর্মে এই অসাধারণ ও সীমাহীন বৈচিত্র্য এবং শিল্প সৌকর্যে চূড়ান্ত পর্যায়ের অভিনবত্ব কিভাবে পাওয়া যেতো? [তরজমানুল কুরআন, জমাদিউল উলা, জমাদিউস্‌সানী, রজব–১৩৭০, মার্চ, এপ্রিল, মে ১৯৫১]

ফিক্‌হ ও তাফসীর সংক্রান্ত কয়েকটি প্রশ্ন

প্রশ্নঃ নিম্নলিখিত প্রশ্নমালার জবাব দেবার জন্য আপনাকে কষ্ট দিচ্ছিঃ

১. নিম্নোক্ত আয়াতটির অর্থ বুঝতে পারছিনা।

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ـ (السجدة ٥:)

এখন আমার সম্মুখে তাফসীরে কাশ্‌শাফ আছে। কাশ্‌শাফ লেখকের ব্যাখ্যার সাথে আমি একমত নই। কারণ কুরআনের শব্দাবলী এই ব্যাখ্যা সমর্থন করেনা। এর উপর মন্তব্য লিখে আমি আপনার সময় নষ্ট করতে চাইনা। আপনার মতে এ আয়াতটির যথার্থ অর্থ কি? يعرج اليه শব্দ দুটির আভিধানিক

অর্থ সম্মুখে থাকা উচিত। উপরন্তু الامـــر শব্দটি কুরআনের পরিভাষায় কোন্ কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয়?

২. মাওলানা আবুল কালাম আযাদ তাঁর তাফসীর গ্রন্থ তরজমানুল কুরআনের ২য় খন্ডের ৫৪০ থেকে ৫৪৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত–

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ـ (المؤمنون : ١٢ ـ ١٦)

বর্ণিত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে প্রসূতি বিদ্যার ছয়টি স্তরকে যেভাবে কুরআনের শব্দের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন, তা দেখে আমি বিস্ময়াভিভূত হয়েছি। মওলানা আযাদের বিপুল পান্ডিত্য স্বীকার করা সত্ত্বেও এ কথা প্রকাশ করতে আমি মোটেই ইতস্তত করবোনা যে, সাহাবা কেরাম এবং সলফে সালিহীনের মধ্য থেকে একজনও এই ছ'টি পর্যায় বর্ণনা করেননি। হতে পারে হয়তো আমি ভুল বুঝার কারণে এ কথা বলতে পারি। আপনি এ স্থানটি গভীরভাবে অধ্যয়ন করে এই "আধুনিক গবেষণা" সম্পর্কে নিজের মতামত ব্যক্ত করবেন। উপরন্তু মওলানার এই ব্যাখ্যার সাথে যদি আপনি একমত না হন, তাহলে আপনার মতে এ আয়াতটির অর্থ কি এবং পুরাতন তাফসীরসমূহের উপর মওলানা যে আপত্তি উত্থাপন করেছেন আপনার নিকট তার কি জবাব আছে?

৩. ইমাম রাগিব ইস্ফাহানীর মুফরাদাতুল কুরআন এবং জামাখশরীর আসাসুল বালাগা সম্পর্কে আপনার মতামত কি? কুরআন বুঝবার জন্যে যদি কোনো উত্তম ও নির্ভরযোগ্য অভিধান পুস্তক আপনার জানা থাকে, তাহলে জানাবেন।

৪. ইসলামী শরীয়ত পুরুষদের জন্যে সোনা–রূপার ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে। সোনা বা রূপার পানদানও কি এর অন্তর্ভুক্ত? উপরন্তু ঘড়ির কোনো কোনো অংশে সোনা ব্যবহার করা সম্পর্কে আপনার মত কি?

৫. রহীম ইয়ারখানের আমেরিকান সোপ ফ্যাক্টরীর ইংরেজ ম্যানেজার সাবানের উপাদান সম্পর্কে আলোচনা প্রসংগে বলেছেন যে, ইউরোপ থেকে যে সমস্ত সুগন্ধি সাবান আসে, সেগুলোয় চর্বির ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে থাকে। এতে শূকর, গরুসহ সব রকমের প্রাণীর চর্বি ব্যবহৃত হয়। এই নতুন কথা শুনার পরে

আমি লাক্স, হাম্মাম প্রভৃতি ব্যবহার করা বন্ধ করে দিয়েছি। এ বিষয়ে আপনার মত কি? আপনি কি বিলাতী সুগন্ধি সাবান ব্যবহার করেন?

জবাবঃ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ -

আয়াতটি 'মুতাশাবেহাতে'র অন্তর্ভুক্ত। এর সংক্ষিপ্ত অর্থ তো বোধগম্য হতে পারে, কিন্তু বিস্তারিত অর্থ নির্ণয় করা কঠিন। কারণ এ জন্যে আমাদের নিকট কোনো জ্ঞানসূত্র নেই। এর দ্বারা সংক্ষেপে যা কিছু বুঝা যায় তা হলোঃ কেবল এই ভূ-পৃষ্ঠেই এর পরিচালনার ব্যবস্থা হচ্ছেনা বরং সমগ্র সৃষ্টি জগতের শৃংখলা বিধানকারী ও পরিচালক সত্তাই এই ব্যবস্থা পরিচালনা করছেন। এই পরিচালনা ব্যবস্থার যোগসূত্র উর্ধ্ব জগতের সাথে স্থাপিত। সেখানে এই পৃথিবী এবং এর বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে পরিকল্পনা তৈরী হয়। বিশ্ব পরিচালনা ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত কর্মীগণ পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার কাজে নিযুক্ত হন। অতপর এই পরিকল্পনার প্রতিটি পর্যায়ের পূর্ণতা বিধানের পর উর্ধ্বজগতে নিজেদের রিপোর্ট পেশ করেন। এই পরিকল্পনার এক একটি পর্যায়ের স্কীম অনেক সময় এক হাজার বছর এবং পঞ্চাশ হাজার বছরেরও হয়ে থাকে। আমাদের জন্যে এটি সুদীর্ঘকাল সন্দেহ নেই, কিন্তু বিশ্ব পরিচালকের নিকট তা যেন একটি মাত্র দিনের কাজ। يعرج اليه শব্দের আভিধানিক অর্থকে সম্মুখে রেখে এর যে অর্থ আমি বুঝতে পেরেছি তা হলো, বিশ্ব পরিচালনা ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত কর্মিগণ তাদের কাজের রিপোর্ট নিয়ে আল্লাহর সম্মুখে যান। অন্য কথায় প্রথমে স্কীম আকারে যে কাজটি তাদের উপর সোপর্দ করা হয়েছিল সেটি সম্পন্ন হবার পর রিপোর্ট আকারে উপরে (forward) পাঠানো হয়।

এসব স্থানে الامر অর্থ হয়ে থাকে 'বিশ্বজাহানের ব্যবস্থাপনা।

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ

২. আয়াতটির যে অর্থ মওলানা আযাদ করেছেন, তার অধিকাংশই ঠিক। এ সকল ব্যাপারে প্রাচীন মুফাসসিরগণের সাথে দ্বিমত পোষণ করা আপত্তিকর নয়। বলা বাহুল্য, বস্তু বিদ্যা সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান যত বাড়তে থাকবে এই ধনের কথার অর্থ তত অধিক সঠিক পদ্ধতিতে বুঝতে পারা যাবে। এটা শরীয়তের কোনো বিধান অথবা কোনো আকীদা বিশ্বাসের ব্যাপার নয়। কাজেই এখানে পূর্ববর্তীগণের জ্ঞান অধিক নির্ভরযোগ্য হবার কোনো কারণ নেই। তবে এই ব্যাখ্যার যেখানে তিনি আয়াতের সম্পর্ক ডারউইনের বিবর্তনবাদের সাথে জুড়েছেন সে অংশটি নির্ভরযোগ্য নয়। তিনি ডারউইন বাদের যুক্তি দ্বারা এতদূর প্রভাবিত যে, প্রসূতি বিদ্যার যে সমস্ত তত্ত্ব মূলত এই মতবাদের পরিপন্থী, সেগুলোকে তিনি এর সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে গণ্য করেছেন।

৩. 'মুফরাদাতে ইমাম রাগিব' ও 'আসাসুল বালাগা' কুরআন বুঝবার

ব্যাপারে অবশ্যি অনেকটা সাহায্য করে, কিন্তু অনেক সময় মানুষ এর দ্বারা ভুল ব্যাখ্যার পথে অগ্রসর হয়। কারণ লেখকদ্বয় কুরআন ব্যাখ্যার ব্যাপারে নিজেদের একটি পৃথক মত রাখেন এবং শাব্দিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে নিজেদের ঐ মতবাদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। তাই যাদের জ্ঞান কেবল ঐ কিতাবগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাঁরা ধারণা করতে থাকেন যে, ইমাম রাগিব ও জামাখ্শারী কোনো শব্দের যে আভিধানিক অর্থ বিশ্লেষণ করেছেন, সেটিই তার একমাত্র ব্যাখ্যা। আমার মতে এর পরিবর্তে লিসানুল আরব, তাজু উরুস, ইবনে আসীরের নেহায়া, কামুস, জাম্হারা ইবনে দারীদ ও ইবনে জারীরের আভিধানিক বিশ্লেষণ অধিক নির্ভরযোগ্য। কারণ এঁরা শব্দের কেবল আভিধানিক অর্থই বিশ্লেষণ করে থাকেন, তার মধ্যে নিজেদের মতাদর্শের অনুপ্রবেশ ঘটাননা।

৪. সোনা ও রূপা কেবল পরিধান করাই নিষিদ্ধ নয়, এর পাত্র ব্যবহার করাও নিষিদ্ধ। কাজেই সোনা ও রূপার পানদানের জায়েয হবার কোনো উপায় নেই। তবে ঘড়ি সম্পর্কে বলা যায় যে, তার ভিতরে কোনো কলকব্জায় সোনা ব্যবহার করা যেতে পারে কিন্তু বাইরে সৌন্দর্য প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে সোনা-রূপা ব্যবহার করা জায়েজ নয়।

৫. হারাম বস্তুতে রাসায়নিক মিশ্রণের পরও তার মৌলিকত্ব বাকি থাকে কিনা এ বিষয়টি অনুসন্ধান সাপেক্ষ। আর যদি তার মৌলিকত্ব বাকি না থাকে এবং রাসায়নিক মিশ্রণের ফলে তার মৌলিকত্ব নষ্ট হয়ে যায় এবং রাসায়নিক মিশ্রণ তাকে ও তার সাথে মিশ্রিত অন্যান্য বস্তুকে একটি নতুন বস্তুকে পরিণত করে থাকে, তাহলে ঐ নতুন বস্তুটির উপাদানে একটি হারাম বস্তু শামিল ছিল বলেই কি তা হারাম হয়ে যাবে? এটি একটি সূক্ষ্ম বিষয়। এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্যে প্রথমে নিছক মিশ্রণ, সংযোগ, একত্রীকরণ এবং রাসায়নিক ও মিশ্রণ ও দ্রবীভূত করণের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্যকে ভালোভাবে হৃদয়ংগম করা উচিত। এই সংগে এ কথাও অনুধাবন করা উচিত যে, রাসায়নিক মিশ্রণ বস্তুর মৌলিকত্বে যে পরিবর্তন সূচিত করে তা উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে খাদ্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্যশীল।

বিষয়টির এদিকটি ভালোভাবে হৃদয়ংগম করার পর বিশেষজ্ঞদেরকে জিজ্ঞেস করা প্রয়োজন যে, সাবানে নিছক মিশ্রণ অনুষ্ঠিত হয়, না রাসায়নিক মিশ্রণ? অর্থাৎ তার উপাদানগুলোর মিশ্রণ কি নিছক মিশ্রণের পর্যায়ভুক্ত? সেখানে প্রতিটি বস্তু কি তার মৌলিকত্ব অপরিবর্তিত রাখে? নাকি সমস্ত বস্তু মিলে একটি রাসায়নিক মিশ্রণের মাধ্যমে তাদের প্রাথমিক মৌলিকত্ব খতম করে একটি নতুন বস্তুতে পরিণত হয়?

অতপর আলেম সমাজের এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত যে, শেষোক্ত পর্যায়ের মিশ্রণে হারাম বস্তু শামিল করার ফলে সে সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি হবে?

এ অনুসন্ধানের প্রয়োজন অত্যধিক। কারণ আমাদের দেশ প্রধানত কাঁচামাল উৎপাদন করে তা বিদেশে রফতানী করে এবং এর পরিবর্তে আমরা এমন সব দেশ থেকে আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আমদানী করে থাকি, যেখানকার লোকেরা হালাল ও হারামের মধ্যে পার্থক্য করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এখন মাঝে মাঝে আমরা জানতে পারি যে, বিদেশ থেকে যে সমস্ত বস্তু আমদানী করা হয়, তার মধ্যে অমুক বস্তুটির উৎপাদনের ক্ষেত্রে অমুক হারাম বস্তু ব্যবহার করা হয়। এ কথা শুনে দিনের পর দিন আমাদের জীবন তিক্ত হয়ে ওঠে। মনে সন্দেহ জাগে যে, আমরা গুনাহে লিপ্ত হয়ে গেলাম নাকি? এ সমস্যার সমাধানের জন্যে প্রথমে আমাদের নীতিগতভাবে শরীয়তের দৃষ্টিতে বিভিন্ন মিশ্রণের স্বরূপ নির্ণয় করতে হবে অতপর প্রত্যেকটি সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে শরীয়তের বিধান বর্ণনা করতে হবে।

আমি এ ব্যাপারে নিজেই সংশয়িত এবং এখনো কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারিনি। তবে এই পেরেসানীতে আমিও সবার সাথে শরীক। মাঝে মাঝে কোনো কোনো বস্তু সম্পর্কে আমিও শুনতে পাই, তার মধ্যে কোনো হারাম বস্তু মিশ্রিত আছে। এখন আপনি সাবানের খবর শুনিয়ে আর একটি সন্দেহ বৃদ্ধি করলেন। [তরজমানুল কুরআন, এপ্রিল–মে ১৯৫২]

তকদীর প্রসংগ

প্রশ্নঃ মিশকাতে 'তাকদীরের প্রতি ঈমান' অধ্যায়ে বুখারী ও মুসলিম শরীফের বরাত দিয়ে নিম্নলিখিত হাদীসটি উল্লিখিত হয়েছেঃ

.... ان خلق احدكم يجمع فى بطن امه........
ثم يبعث الله اليه ملكا باربع كلمات
فيكتب عمله واجله ورزقه وشقى او
سعيد ثم ينفخ فيه الروح.......

"... অবশ্যি তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টি তার মায়ের গর্ভেই হয়ে থাকে। ... অতপর আল্লাহ তাআলা একটি ফেরেশ্‌তাকে চারটি কথাসহ প্রেরণ করেন। ফেরেশ্‌তা তার কর্ম, আয়ু, রিযিক এবং সৎ ও অসৎ হওয়া সম্পর্কে লেখেন, অতপর তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা হয়।"

প্রশ্ন জাগে, মায়ের গর্ভেই যদি এ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে থাকে, তাহলে এরপর কর্মের স্বাধীনতা ও কর্মের দায়িত্ব গ্রহণের কোনো অবকাশ থাকে কি? এ ধরনের হাদীস শুনার পর সাধারণত লোকেরা হাত–পা

গুটিয়ে বসে পড়ে।

জবাবঃ *তাকদীর সম্পর্কে আপনার মনে যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে দু'–চার কথায় তার জবাব দেয়া কঠিন। পুরোপুরি বুঝতে চাইলে আমার 'তকদীরের হাকীকত' বইটি পড়ুন।*

হাদীসের ব্যাপারে এ কথা মনে রাখা উচিত যে, কোনো বিষয়ের সমগ্র দিক একটি মাত্র হাদীসের মধ্যে উল্লিখিত হয়না। কাজেই মাত্র দুটি একটি হাদীস নিয়ে যে ব্যক্তি তা থেকে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চাইবেন, তিনি বিভ্রান্ত হবেন। একটি হাদীস থেকে আপনার মনে যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে কুরআনের একটি আয়াত থেকে কোনো বৃহৎ সমস্যার সমাধান করতে চাইলে আপনার মনে এর চাইতে অনেক বেশী প্রশ্ন দেখা দেবে। এই তাকদীরের ব্যাপারে কুরআনের একটি আয়াত মানবিক অক্ষমতার দ্ব্যর্থহীন প্রকাশ করে আবার অন্য একটি আয়াত প্রকাশ করে তার ক্ষমতা ও স্বাধীনতার গুরুত্ব। স্বাধীনতা ও অক্ষমতা উভয়টিই একই সময়ে মানব জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে এমনভাবে ক্রিয়াশীল যে, নিছক একটিকে পৃথক দেখলে অন্যটির কোনো স্থান আছে বলে দৃষ্টিগোচর হয়না। অথচ একটিকে দেখার সাথে সাথে এ কথাও মনে রাখা উচিত যে, মানব জীবনে অন্যটির যে স্থান আছে তাও তার স্বস্থানে বহাল থাকবে। তাকদীরের যে ব্যাখ্যা সত্যের একটি দিককে অন্য দিকটির পুরোপুরি অস্বীকারের মাধ্যমে পরিণত করে তা কোনোক্রমেই যথার্থ ব্যাখ্যা হতে পারেনা। তাই আলেমগণ দ্বীনের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে পরিপূর্ণ মত প্রতিষ্ঠার জন্যে যতগুলো আয়াত ও হাদীস থেকে একটি বিষয়ের উপর আলোকপাত হয় ঐসবগুলোকেই সম্মুখে রাখা অপরিহার্য গণ্য করেছেন।

যে বিশেষ হাদীসটি সম্পর্কে আপনি প্রশ্ন তুলেছেন সে সম্পর্কে আপনি আর এক দিক দিয়ে চিন্তা করুন। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা প্রতিদিনি অসংখ্য বস্তু ও প্রাণী সৃষ্টি করে যাচ্ছেন। এদের প্রত্যেকের মধ্যে কি যোগ্যতা আছে, দুনিয়ার কার কি স্থান এবং কাকে বিশ্বজাহানের কোথায় থাকতে হবে ও কি কাজ করতে হবে, এ কথা যদি তার জানা না থাকে, তাহলে কি আপনি মনে করেন যে, (মায়ায আল্লাহ) এই অজ্ঞতার মধ্যে আল্লাহ তাআলা একদিনও এই বিশাল বিশ্বজাহানের ব্যবস্থা পরিচালনা করতে পারেন? দুনিয়ার স্রষ্টা ও পরিচালক তাঁর সৃষ্টির বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে অজ্ঞ থাকবেন, এ কথা কেমন করে চিন্তা করা যেতে পারে? এই বিশাল বিশ্বজাহানের পরিচালক এ কথাও জানবেননা যে, আগামীকাল তাঁর এই রাজ্যে কি সংঘটিত হবে এবং কোনো ব্যক্তি তার কাজ শেষ করার পর তবেই তিনি তার সৎ বা অসৎ ইচ্ছা সম্পর্কে অবগত হবেন, এ কথা কেবল বুদ্ধি বিরোধীই নয় বরং, এর ফলাফল সম্পর্কে চিন্তা করলে

পূর্বাহ্নেই তাকদীর লিখিত হবার খবর শুনে আপনার মনে যে প্রশ্ন জেগেছে তার চাইতে অনেক বেশী প্রশ্ন দেখা দেবে। এ কথা অনস্বীকার্য সত্য যে, যা কিছু হয়েছে, হচ্ছে ও হবে আল্লাহ তাআলা তার পূর্ণাংগ জ্ঞান রাখেন এবং প্রত্যেক প্রাণীর ভবিষ্যতের জ্ঞান তাঁর নখদর্পণে। খোদার জ্ঞান তাঁর ক্ষমতার পরিপন্থী নয়। খোদার ক্ষমতা প্রত্যেকটি মানুষকে ভালো ও মন্দের মধ্য থেকে যেকোনোটিকে নির্বাচন করার স্বাধীনতা দান করেছে এবং তাঁর জ্ঞান জানে যে, কোন্ ব্যক্তি কোন্‌টিকে নির্বাচন করবে। তাঁর জ্ঞান সকল প্রকার ত্রুটিমুক্ত এবং তাঁর ক্ষমতা অক্ষমতার লেশমুক্ত।

তবে এ কথা সত্য যে, লোকেরা তাকদীর বিশ্বাসকে ভুল অর্থে গ্রহণ করছে এবং তা থেকে খারাপ ফলাফল বের করছে। কিন্তু এ জন্যে একটি সত্যকে পরিবর্তিত করার কোনো কারণ দেখা যায়না এবং কোনো সত্যকে বুঝার ব্যাপারে যদি মানুষ ভুল করে, তাহলে সে জন্যে ঐ সত্যটি কখনো পরিবর্তিত হতে পারেনা। ভুল সত্যের নয়, বরং ভুল হচ্ছে মানুষের বুঝার এবং এরই সংশোধন প্রয়োজন। [তরজমানুল কুরআন, সেপ্টেম্বর ১৯৫২]

মানুষের প্রকৃতির উপর সৃষ্টি হবার অর্থ

প্রশ্নঃ

كل مولود يولد على الفطرة فابواه او ينصرانه اويمجسانه -

এ হাদীসটির অর্থ কি? আপনার 'খুতবাত' পুস্তকের এক স্থানে (ঈমানের হাকীকতে) আপনি মত প্রকাশ করেছেন যে, 'মানুষ মায়ের গর্ভ থেকে ইসলাম গ্রহণ করে আসেনা' –এরই কারণে এ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। সাধারণত এ হাদীসটির অর্থ করা হয়ে থাকে যে, প্রতিটি শিশু ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু আপনার উপরোক্ত বাক্যটি এ অর্থের পরিপন্থী। অন্যান্য আপত্তিকারীরাও আপনার এ বাক্যটি সম্পর্কে আপত্তি করেছে। কিন্তু আমি এ বাক্যটির অর্থ অন্যের নিকট থেকে বুঝার পরিবর্তে আপনার নিজের কাছ থেকে বুঝতে চাই। কারণ অনেক বার দেখা গেছে, আপত্তিকারী আপনার কোনো বাক্যের উপর আপত্তি জানিয়েছে এবং আপাতদৃষ্টিতে তার আপত্তি যুক্তিসংগত বিবেচিত হয়েছে কিন্তু আপনার পক্ষ থেকে ঐ বাক্যের অর্থ বিবৃত হবার পর বিবেক আপনার বক্তব্যকেই সত্য বলে মেনে নিয়েছে।

জবাবঃ এ হাদীসে যে কথাটি বলা হয়েছে তাহলো, মানুষ আল্লাহর নিকট থেকে কুফরী, শিরক বা নাস্তিকতা নিয়ে আসেনা। বরং সে আসে নির্ভেজাল প্রকৃতি নিয়ে। সে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদকে জানেনা। আল্লাহর

শরীয়তের প্রাকৃতিক নীতি-নিয়ম ছাড়া আর কোনো বস্তুর সাথে সে পরিচিত নয়। যদি এই প্রকৃতির উপর মানুষ প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং কোনো বিকৃত পরিবেশ তাকে শিরকমূলক চিন্তা ও কর্ম এবং গোমরাহসুলভ নৈতিক বৃত্তি ও গুণাবলীর দিকে ফিরিয়ে না দেয়, তাহলে নবী প্রদত্ত শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে সে মোটেই ইতস্তত করবেনা। এই বস্তুকে সে এমনভাবে গ্রহণ করবে যেন এটি তার নিজের বস্তু ছিল, কেউ এনে আবার তাকে দিয়েছে।

কিন্তু এটি সত্যের মাত্র একটি দিক। দ্বিতীয় দিকটি হলো, কোনো ব্যক্তি আপনা আপনি ইসলাম লাভ করেনা। বরং নবীর মাধ্যমে লাভ করে। উপরন্তু নবী প্রদত্ত দীনকে জেনে বুঝে অন্তরে তার সত্যতা স্বীকার করার মাধ্যমেই কোনো ব্যক্তি মুসলমান হতে পারে। এমনকি যদি কোনো ব্যক্তি বুদ্ধির উদ্‌গম হবার পর আল্লাহ তাআলা তাকে যে প্রকৃতির উপর সৃষ্টি করেছিলেন পুরোপুরি তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহলেও নবীর মাধ্যমে দীন লাভ করার এবং তাকে কবুল করার উপরই তার মুসলমান হওয়া নির্ভর করবে। যে ব্যক্তি এ কথা স্বীকার করেনা, সে আসলে বলতে চায়, মানুষ পেট থেকে যে প্রকৃতি নিয়ে আসে সেটিই পূর্ণাংগ ইসলাম এবং মানুষের হেদায়াতপ্রাপ্ত হবার জন্য এটাই যথেষ্ট। অন্য কথায় এর অর্থ হলো, শরীয়ত নাযিল হওয়া ও নবীগণের আগমন একটি সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার। অথচ কুরআন বার বার দ্ব্যর্থহীনভাবে এ কথাই বলছে যে, মানুষের অবশ্যি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পথ-নির্দেশের প্রয়োজন এবং তা প্রত্যেক ব্যক্তি সরাসরি নয় বরং নবীদের মাধ্যমেই লাভ করতে পারে, আর নবীদের আনুগত্য গ্রহণের উপরই মানুষের নাজাত নির্ভরশীল। যখন আদতে সামাজিক পরিবেশের অস্তিত্বই ছিলনা এবং কোনো ইহুদীবাদ, খৃষ্টবাদ বা অগ্নি-উপাসনার নাম-নিশানাও ছিলনা, তখনো আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে সম্বোধন করে বলেছেনঃ

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ - (البقرة: ٣٨)

'কাজেই আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট যখন পথ নির্দেশ আসবে, তখন যারা আমার 'পথ নির্দেশের' আনুগত্য করবে, তাদের জন্যে কোনো ভয় নেই এবং তারা মনোঃক্ষুণ্ণও হবেনা' (বাকারাঃ ৩৮)।

এ থেকে জানা যায়, মানুষের প্রকৃতিতে যে আল্লাহ তাআলা ফুজুর ও তাকওয়া ঐশী জ্ঞান দান করেছেন তা নিজের যথাযথ ও খোদা নির্ধারিত অবস্থায় সংরক্ষিত থাকলেও পথের সন্ধান লাভ করার জন্যে তার নিজস্ব সত্তাই যথেষ্ট নয়। বরং অহীর মাধ্যমে পথ-নির্দেশ লাভ করা তার জন্যে অপরিহার্য। প্রকৃতির বড়জোর এতটুকু যোগ্যতা আছে যে, অহীর মাধ্যমে যখন তার সম্মুখে

সত্য পথ উপস্থাপন করা হয়, তখন সে তাকে চিনে নেয় এবং তার সত্যতার স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু অহীর সাহায্য ছাড়া নিজে নিজে সত্য পথ লাভ করা তার সাধ্যাতীত। রসূলুল্লাহর (স) চাইতে অধিক খোদা প্রদত্ত প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি আর কেই বা হতে পারে? তাঁর অবস্থা এই ছিল যে, যতক্ষণ অহী কোনো পথ নির্দেশ দেয়নি, ততক্ষণ তিনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন, পথ কোন্‌দিকে তার কোনো সন্ধানই জানতেননাঃ

١. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى ٢. كَذٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ٣. مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيْمَانُ۔

১. "তিনি তোমাকে পথহারা পেয়েছেন, অতপর পথ নির্দেশ দিয়েছেন।"

২. "এভাবেই আমি তোমার কাছে অহী করেছি আমার নির্দেশের একটি রূহ।"

৩. "তুমি তো জানতেনা কিতাব কি আর ঈমানইবা কি?

এই ঈমান সম্পর্কে কোনো জ্ঞানী ও বিবেকবান ব্যক্তি কেমন করে এ কথা বলতে পারে যে, কেবলমাত্র মুসলমানের গৃহে জন্মগ্রহণ করলেই প্রত্যেক ব্যক্তি আপনা আপনি এ সম্পদ লাভ করবে এবং এ সম্পদ লাভ করার জন্যে আদতে কোনো জ্ঞান, চেতনা ও ইচ্ছামূলক স্বীকৃতির প্রয়োজন নেই? [তরজমানুল কুরআন, অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৫২]

কুরআনের বিচ্ছিন্ন অক্ষর

প্রশ্নঃ আপনি তাফহীমুল কুরআনে বিচ্ছিন্ন অক্ষরসমূহের আলোচনায় লিখেছেন, কুরআন নাযিল হওয়ার যুগে শব্দের পরিবর্তে এ ধরনের অক্ষরের ব্যবহারকে ভাষার অলংকারিত্ব ও বর্ণনার সৌন্দর্যের প্রতীক মনে করা হতো। অধিকন্তু এগুলোর অর্থ ও তাৎপর্য সম্পূর্ণ পরিচিত ছিল। এ কারণেই ইসলাম বিরোধী পক্ষ থেকে সে সময়ে এগুলোর প্রয়োগ সম্পর্কে কখনো অভিযোগ উঠেনি। আপনি আরো লিখেছেন, এসব অক্ষরের ব্যাখ্যার তেমন গুরুত্ব নেই এবং এগুলো বুঝার উপর হিদায়াত নির্ভরশীল নয়। এ প্রসংগে আমি নিম্নলিখিত আরয পেশ করছিঃ

যদি এসব অক্ষর প্রথম যুগে এতোই পরিচিত ছিল তাহলে কবিতা ও সাহিত্যে এগুলোর ব্যবহার পরিত্যক্ত হওয়া এবং হঠাৎ করে এগুলোর অর্থ মন-মগজ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুছে যাওয়া কিভাবে সম্ভব হলো? এর তাৎপর্য

তো এ দাঁড়ায় যে, কুরআনে ব্যবহৃত এমন কতিপয় শব্দের ব্যবহার যদি আজকের আরব দেশ পরিত্যাগ করে, তাহলে কিছুদিন পর ইসলামী দুনিয়ায় কুরআনের সে সব শব্দের সঠিক তাৎপর্য নির্দিষ্ট থাকবেনা। 'যেহেতু হিদায়াত ও মুক্তি এসব অক্ষরের অর্থ নিরূপণের উপর নির্ভরশীল নয়, তাই এগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আদৌ প্রয়োজন নেই।' আপনার এ যুক্তি আরো বিস্ময়কর। এভাবে কুরআনের অনেক অংশ সম্পর্কে বলা যায় যে, সেসব অংশের তাৎপর্য বুঝার উপর হিদায়াত নির্ভরশীল নয়। অতএব, সেসব অংশের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করলেও চলে। এ মতাদর্শের প্রেক্ষিতে সংস্কারপ্রিয় মহোদয়গণের কুরআনের এক অংশের উপর গুরুত্ব দেয়া এবং অপর অংশ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়া কিছু মাত্র বিচিত্র নয়। মেহেরবানী করে আপনি আপনার বক্তব্যের পুনঃ ব্যাখ্যা দান করবেন।

জবাবঃ আপনি যেসব অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তার আগে যদি আপনি প্রাচীন ও আধুনিক সব তাফসীরগুলোর মুকাত্তাআত (বিচ্ছিন্ন অক্ষর) সম্পর্কীয় আলোচনাগুলো পড়ে নিতেন, তাহলে আমার কথা বুঝতে আপনার খুবই সহজ হতো। বরং এসব আলোচনা দেখার পর সম্ভবত আমার লেখাই সবচেয়ে বেশী সান্ত্বনাদায়ক বলে আপনার মনে হতো।

কোনো ভাষার কতিপয় বর্ণনা রীতি পরিত্যক্ত হওয়া অথবা এর প্রচলন না থাকা এমন কোনো অভূতপূর্ব ঘটনা নয় যা শুনামাত্র আপনাকে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হবে। পক্ষান্তরে অত্যাশ্চর্য ব্যাপার তো এটা যে, কুরআনের বদৌলতে তেরশ' বছরের মধ্যে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে অতি অল্পই পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এতো দীর্ঘ সময়ে ভাষার মধ্যে কতোই না আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়ে থাকে।

মুকাত্তাআত অক্ষরসমূহ কবিতা ও সম্বোধনে বেশীর ভাগ ব্যবহৃত হতো। এগুলোর এমন কোন সুনির্দিষ্ট অর্থ ছিলনা, যা নিয়মানুযায়ী অভিধানে সম্পৃক্ত করা যায়। বরং এগুলো ছিল এক ধরনের বর্ণনা রীতি যা অধিক প্রয়োগের কারণে কথক ও শ্রোতা উভয়ই সমভাবে এর অর্থ সম্যক জ্ঞাত থাকতো। এ কারণেই যখন ধীরে ধীরে এ পদ্ধতির প্রচলন হ্রাস পেয়ে ভাষা থেকে পরিত্যক্ত হয়ে যায়, তখন লোকদের জন্যে এটা বুঝা মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি তৃতীয়-চতুর্থ হিজরী শতাব্দীর মুফাসসিরগণকে এগুলোর অর্থ নিরূপণ করতে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করতে হয়। তারপরও তাঁরা কোন সন্তোষজনক কথা বলতে পারেননি।

বর্ণনারীতি ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত হওয়ার ব্যাপারটাই এমনি ধরনের যে, সে রীতি পরিত্যক্ত হওয়ার কোনো নির্দিষ্ট তারিখ বর্ণনা করা যায়না। একটি সময়

অতিবাহিত হওয়ার পর লোকেরা এগুলো বুঝতে অক্ষম এ কথা অনুভব হতে থাকে। যে যুগে এগুলোর ব্যবহার ছিল, সে যুগে এগুলোর ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি, আর যখন এগুলোর ব্যবহার উঠে যায়, তখন ব্যাখ্যারও প্রয়োজন হয় এবং ব্যাখ্যা করাও হয়। কিন্তু ব্যাখ্যা এমন বিভিন্নতার রূপ পরিগ্রহ করে যে, তার মধ্যে কোনো একটিও সান্ত্বনাদায়ক হতে পারেনি।

যদি কুরআনের কোনো কোনো শব্দের ব্যবহার পরিত্যক্ত হয়ে যায়, তাহলে সেগুলোর তাৎপর্যও নির্দিষ্ট থাকবেনা আপনার এ আশংকাও ঠিক নয়। শব্দ ও বর্ণনা রীতিকে এক সাথে মিশিয়ে ফেলবেননা। শব্দাবলীর সমস্ত মূল উৎস ধাতু অভিধানে সুরক্ষিত অবস্থায় আছে এবং এগুলোর যাবতীয় গঠন-পদ্ধতি ও পরিভাষায় এগুলোর ব্যবহার-বিধি সবকিছুই ভাষাবিদগণ ব্যাখ্যাসহ লিখে গেছেন। সুতরাং এখন যদি আরবী ভাষায় এগুলোর ব্যবহার সাধারণভাবে না হয়, তাহলেও কোনো ক্ষতির আশংকা নেই। কিন্তু বর্ণনা রীতির ব্যাপারটি বড়ই ভিন্ন। এগুলোর অর্থ কোথাও সুরক্ষিত থাকেনা। বরং প্রয়োগের মাধ্যমেই বুঝতে পারা যায়। ব্যবহার পরিত্যক্ত হওয়ার পর এর অর্থ তারাই কিছুটা বুঝতে সক্ষম, যারা সে পদ্ধতি চালু থাকার যুগে রচিত সাহিত্য বেশী পরিমাণে চর্চা করে। শেষ পর্যন্ত তাদের রুচি ঐসব রীতির সাথে পরিচিত হয়ে যায়।

মুকাত্তাত অক্ষর সম্পর্কে আমি যে কথা বলেছি তার অর্থ না বুঝলে কোনো বড় ধরনের ক্ষতি হবেনা। আপনি অযথা এটাকে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে গেছেন। আমার উদ্দেশ্য হলো এসব অক্ষর যেহেতু বিশুদ্ধ বক্তৃতার মর্যাদা রাখে এবং এগুলোর মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট হুকুম বা নির্দিষ্ট শিক্ষা নেই- এ কারণে যদি মানুষ এর উদ্দেশ্য বুঝতে অক্ষম হয়, তাহলে আল্লাহর কোন হুকুম জানতে অথবা কোনো শিক্ষা থেকে ফায়দা হাসিল করা থেকে বঞ্চিত হওয়ার মতো কোনো ক্ষতি হবেনা। সুতরাং এগুলোর অর্থ নিরূপণের জন্যে কোনো নীতি যখন হাতে নেই এবং কোনো প্রমাণ ভিত্তিক ব্যাখ্যাও মিলেনা, তখন অযথা কষ্ট করে অর্থের সৃষ্টি করা এবং খামখা লড়াই করার প্রয়োজন নেই। এগুলোর সঠিক উদ্দেশ্য আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়ে কুরআনের সে সব আয়াত নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে থাকুন, যেগুলো বুঝার জন্যে আমাদের কাছে উপকরণ ও মাল-মসলা রয়েছে। [তরজমানুল কুরআন, যিলহজ্জ ১৩৭১, সেপ্টেম্বর ১৯৫২]

কুরআনে নসখ (রহিতকরণ)

প্রশ্নঃ *'নস্‌খ' (রহিতকরণ) সম্পর্কে মেহেরবানী করে নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উপর আলোকপাত করবেন।*

১. কুরআনের 'নস্‌খ' সম্পর্কে আপনার গবেষণা কি? কুরআনে এমন কোনো আয়াত আছে কি যা তিলাওয়াত তো করা হয় কিন্তু হুকুম 'মানসুখ' (রহিত) হয়ে গেছে?

২. কুরআনে এমন কোন আয়াত আছে কি যার তিলাওয়াত 'মান্‌সুখ' হয়ে গেছে কিন্তু হুকুম বহাল আছে? ফকীহ্ ও মুহাদ্দিসগণ রজমের আয়াতকে উদাহরণ স্বরূপ পেশ করে থাকেন।

৩. উসূলে ফিক্‌হের কিতাবে লেখা আছে, হাদীস কুরআনকে 'মান্‌সুখ' করতে পারে। এ মতবাদটি কি ফকীহ্ ইমামগণ কর্তৃক প্রমাণিত? যদি তাই হয়, তাহলে এর সঠিক তাৎপর্য কি?

জবাবঃ *আপনার সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলীর জবাবের জন্যে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন। কিন্তু আমার এতোটা অবকাশ নেই। তাই সংক্ষিপ্ত জবাব প্রদান করছি।*

১. প্রকৃত পক্ষে কুরআনে 'নস্‌খের' ভিত্তি হলো আহ্‌কামের ক্রমবিকাশ। এ নস্‌খ চিরন্তন নয়। এমন কতিপয় 'মান্‌সুখ' আহ্‌কাম আছে সেগুলো যে অবস্থার প্রেক্ষাপটে বহাল করা হয়েছিল, সে অবস্থায় আমাদের যদি কখনো সামাজিকভাবে ফিরে যেতে হয়, তাহলে সেসব রহিত আহ্‌কামের উপর আমল করতে হবে। 'মান্‌সুখ' কেবলমাত্র সে অবস্থায় হয়ে থাকে, যখন সমাজ সে অবস্থা কাটিয়ে পরবর্তী আহ্‌কাম জারী করার পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।

২. আমার মতে কুরআনে এমন কোনো আয়াত নেই, যার তিলাওয়াত 'মানসুখ' হয়ে গেছে অথচ হুকুম বহাল আছে। কোনো কোনো রিওয়ায়েতে রজমের আয়াতের কথা উল্লেখ থাকলেও প্রকৃত পক্ষে সেটা অন্য কিতাবুল্লাহ্ অর্থাৎ তাওরাতের আয়াত ছিল, কুরআনের নয়। সে আয়াত 'মান্‌সুখ' হওয়ার অর্থ হলো, যে কিতাবের এ আয়াত ছিল, সে কিতাবকে তো 'মান্‌সুখ' করা হয়েছে কিন্তু তার রজম হুকুমটিকে বহাল রাখা হয়েছে।

৩. 'সুন্নাত' কুরআনকে 'মান্‌সুখ' করতে পারে এবং কুরআনের উপর বিচারকও হতে পারে, ফকীহ্‌দের একটি গ্রুপ এ কথার সমর্থক, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বাক্যটি থেকে বাহ্যত যা বুঝা যায় এর অর্থ কিন্তু তা নয়। বরং এর অর্থ হলো নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাখ্যা দ্বারা যেভাবে কুরআনের একটি নির্দিষ্ট হুকুম অনির্দিষ্ট হতে পারে অথবা একটি অনির্দিষ্ট হুকুম নির্দিষ্ট হতে পারে ঠিক তেমনিভাবে তাঁর কাওলী (উক্তিমূলক) ও

আমলী (বাস্তব কর্মমূলক) ব্যাখ্যা এ কথাও বলে যে, কোনো নির্দিষ্ট আয়াতের হুকুম আর বর্তমান নেই। এ তাৎপর্য ছাড়া উল্লিখিত মূলনীতি থেকে যদি অন্য কোনো তাৎপর্য গ্রহণ করা হয়, তাহলে তা সঠিক নয়। [তরজমানুল কুরআন, শাবান-রমযান ১৩৭২, মে-জুন ১৯৫৪]

ঘর ঘোড়া ও নারীর কুলক্ষণ হওয়া প্রসংগ

প্রশ্নঃ বসবাসের জন্যে আমি একখানা ঘর কিনতে চাই। ঘরটির মৃত মালিক নিঃসন্তান ছিলেন। তার দূর সম্পর্কীয় এক আত্মীয় উত্তরাধিকার সূত্রে ঘরটি পায়। আমি সে ঘরটি কিনতে চাইলে আমার পরিবারের কিছু লোক প্রতিবাদ করে বললোঃ ঘরটি কুলক্ষণের পরিচায়ক। এ ঘরে বসবাসকারীদের বংশ বাড়েনা এমনকি আসল মালিকের বংশ নির্বংশ হয়ে গেছে। ঘর, ঘোড়া ও নারীর কুলক্ষণ হওয়া সম্পর্কিত হাদীসটির কথা তারা উল্লেখ করে। আমি হাদীসের কিতাবে এ সম্পর্কিত বর্ণনা দেখেছি এবং প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা ও টীকা-টিপ্পনীতে যা কিছু লেখা আছে তাও পড়েছি, কিন্তু দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে কোনো নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা বুঝতে পারছিনা। এ প্রসংগে আপনার মতামত কি?

জবাবঃ আপনি যেসব বর্ণনার কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলো হাদীসের কিতাবসমূহে তো আছে তবে হযরত আয়েশার (রা) একটি রেওয়ায়েত থেকে এগুলোর অর্থ অন্য কিছু বলে প্রতীয়মান হয়। ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদে হাদীসটি এভাবে উল্লেখ করেছেনঃ

عن ابى حسان الاعرج ان رجلين دخلا على عائشة وقالا ان ابا هريرة يحدث ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول انما الطيرة فى المرأة والدابة والدار. فقالت والذى انزل الفرقان على ابى القاسم ما هكذا كان يقول ولكن كان يقول كان اهل الجاهلية يقولون الطيرة فى المرأة والدابة والدار، ثم قرأت عائشة ما اصاب من مصيبة فى الارض ولا فى انفسكم الا فى كتاب من قبل ان نبرأها.

"আবু হাসান আরাজ থেকে বর্ণিত। দু'জন লোক হযরত আয়েশার (রা)

খেদমতে হাযির হয়ে আরয করলোঃ 'হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ নারী, ঘোড়া ও ঘরে কুলক্ষণ আছে।' এ কথা শুনে হযরত আয়েশা (রা) বললেনঃ সে সত্তার শপথ! যিনি আবুল কাসেমের (অর্থাৎ রসূল) উপর কুরআন নাযিল করেছেন, তিনি এরূপ বলতেননা বরং তিনি বলেছেনঃ জাহিলী যুগে লোকেরা ঘর, ঘোড়া ও নারীর মধ্যে কুলক্ষণ আছে বলে মনে করতো। তারপর হযরত আয়েশা (রা) এ আয়াতটি পাঠ করলেনঃ

"যমীনেও তোমাদের উপর এমন কোনো মুসীবত আসেনা যা প্রকাশিত হওয়ার আগে ভাগ্যলিপিতে লিখিত হয়না।"

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা)–এর এ ব্যাখ্যায় প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আবু হুরাইরার (রা) বর্ণিত হাদীসটি সম্ভবত সঠিক শব্দে প্রকাশ পায়নি। তদুপরি যদি এটাকে সঠিক বলেও মেনে নেয়া যায়, তাহলে এর একটা যুক্তিসংগত ব্যাখ্যাও হতে পারে।

কুলক্ষণের এক অর্থ তো সন্দেহপ্রবণতা ও কাল্পনিকতা, যার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু কুলক্ষণের অন্য একটি তাত্ত্বিক অর্থও আছে। কোনো বস্তুর অসামঞ্জস্যতা ও গরমিল হওয়া এর এক অর্থ। এ অর্থ যুক্তিসংগত এবং শরীয়তসম্মত, সুতরাং হাদীসে ঘর কুলক্ষণ হওয়ার যে বর্ণনা এসেছে তার তাৎপর্য এই নয় যে, ঘরে এমন কোনো সন্দেহযুক্ত বস্তু আছে, যা ঘরবাসীদের ভাগ্য বিগড়িয়ে দিতে পারে। বরং এর তাৎপর্য এমন হতে পারে যে, অভিজ্ঞতার আলোকে এ ঘর বসবাসের অনুপযোগী বলে প্রমাণিত। অনেক সময় কোনো একটি বিশেষ রোগে আক্রান্ত কতিপয় রোগী একই ঘরে পর পর বসবাস করতে থাকে। তাতে ঐ রোগের বিষময় প্রভাব সেখানে স্বতন্ত্র ভাবে জায়গা করে নেয়। এক্ষেত্রে যদি অভিজ্ঞতার আলোকে জানা যায় যে, যে ব্যক্তিই সে ঘরে বসবাস করে, সে ঐ রোগে আক্রান্ত হয়, তাহলে এ ঘর বাসের অনুপযোগী বুঝতে হবে। বিশেষত প্লেগ ও যক্ষার বেলায় এ কথা অভিজ্ঞতার আলোকে বার বার প্রমাণিত হয়েছে। যেখানে প্লেগের প্রাদুর্ভাব, সেখানে ইচ্ছাপূর্বক না যাওয়া এবং সেখান থেকে পলায়নও না করার নির্দেশ হাদীসে রয়েছে। নারী ও ঘোড়া সম্পর্কেও একই কথা। যদি কতিপয় লোকের একটি ঘোড়ার উপর আরোহণ করা অনুপযোগী প্রমাণিত হয় অথবা কতিপয় লোক পর পর একটি মেয়েকে বিয়ে করে বিশেষ রোগের শিকার হয়, তাহলে বুঝতে হবে এই ঘোড়া অথবা মহিলার মধ্যে অজানা কোনো রোগ বা ত্রুটি আছে।

যে ঘর আপনি কিনতে চান তার কুলক্ষণ হওয়া কি সন্দেহপ্রবণতার ভিত্তিতে অথবা অভিজ্ঞতাপ্রসূত তা দেখা এখন আপনার কাজ। [তরজমানুল কুরআন, রবিউস্‌সানী ১৩৭২, জানুয়ারী ১৯৫৩]

২

ফিকহী বিষয়াদি

যাকাতের তাৎপর্য ও মৌলিক বিধান

প্রশ্নমালাঃ

১. যাকাতের সংজ্ঞা কি?

২. যাকাত প্রদান করা কার উপর ওয়াজিব? এ ব্যাপারে মহিলা, অপ্রাপ্তবয়স্ক, কয়েদী, মুসাফির, পাগল ও প্রবাসীরা কোন্ পর্যায়ভুক্ত, বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করবেন।

৩. যাকাত প্রদান ফরয হবার জন্যে কত বছর বয়স্ক ব্যক্তিকে প্রাপ্তবয়স্ক মনে করা উচিত?

৪. যাকাত ফরয হবার জন্যে মেয়েদের ব্যক্তিগত ব্যবহার্য অলংকারাদি কোন্ পর্যায়ভুক্ত?

৫. কোম্পানীর যাকাত কি কোম্পানী প্রদান করবে, নাকি প্রত্যেক অংশীদার নিজে অংশ অনুযায়ী পৃথক পৃথকভাবে যাকাত প্রদান করবে?

৬. কারখানা ও অন্যান্য ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের উপর যাকাত ওয়াজিব হবার সীমা বর্ণনা করুন।

৭. যে সমস্ত কোম্পানীর শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য যাকাত নির্ধারণ করার সময় তাদের মধ্যে কার উপর যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হবে– শেয়ার ক্রয়কারীর উপর নাকি বিক্রয়কারীর উপর?

৮. কোন্ কোন্ আসবাবপত্র ও বস্তুর উপর এবং বর্তমান সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোন্ অবস্থায় যাকাত ওয়াজিব হয়? বিশেষ করে নিম্নলিখিত বস্তুগুলো সম্পর্কে অথবা সেগুলো থেকে সৃষ্ট অবস্থায় কোন্ পদক্ষেপ গৃহীত হবে?

ক. নগদ টাকা, সোনা, রূপা, অলংকার ও মূল্যবান পাথর।

খ. ধাতুর মুদ্রা (স্বর্ণখচিত, রৌপ্যখচিত ও অন্যান্য ধাতুখচিত মুদ্রা এর অন্তর্ভুক্ত) এবং কাগজের মুদ্রা।

গ. ব্যাংকে গচ্ছিত আমানত, ব্যাংক অথবা অন্যস্থানে রক্ষিত বস্তুসমূহ, অন্য কোথাও থেকে গৃহীত ঋণ, বন্ধকী সম্পত্তি ও বিবাদমূলক সম্পত্তি এবং এমন সম্পত্তি যার বিরুদ্ধে মামলা বা অভিযোগ করা হয়েছে।

ঘ. উপহার, পুরস্কার।

ঙ. বীমার পলিসি এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডের অর্থ।

চ. গবাদি পশু, দুধ, দই, ছানা প্রভৃতি উৎপন্ন কৃষিজাত দ্রব্যাদি, তরিতরকারি, ফল ও ফুলসহ।

ছ. খনিজ দ্রব্য।

জ. আহরিত গুপ্তধন।

ঝ. প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ।

ঞ. বনের বা গৃহপালিত মৌমাছির মধু।

ট. মাছ, মোতি ও পানির অন্যান্য বস্তু।

ঠ. পেট্রোল।

ড. আমদানী–রফতানী।

৯. রসূলুল্লাহর (স) আমলে যে সমস্ত বস্তুর উপর যাকাত ফরয ছিল খোলাফায়ে রাশিদীন তার মধ্যে কোনো বস্তুর নাম বৃদ্ধি করেছিলেন কি? কোনো বৃদ্ধি বা পরিবর্তন হয়ে থাকলে কোন্ নীতির ভিত্তিতে তা হয়েছিল?

১০. নিকেলের মুদ্রা ও সোনা–রূপা ছাড়া প্রচলিত অন্যান্য ধাতুর মুদ্রার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে কি? যে সকল মুদ্রার প্রচলন নেই অথবা যেগুলো নষ্ট হয়ে গেছে বা সরকার প্রচলন রহিত করেছেন অথবা যেগুলো বিদেশের মুদ্রা, সেগুলোর যাকাত দিতে হবে কিনা?

১১. প্রকাশ্য ও গোপন সম্পদের সংজ্ঞা কি? এ ব্যাপারে ব্যাংকে সঞ্চিত অর্থ কোন্ পর্যায়ভুক্ত?

১২. যাকাতের উদ্দেশ্যে বর্ধনশীল সম্পদের সীমা বর্ণনা করুন। কেবলমাত্র বর্ধনশীল সম্পদের উপরই কি যাকাত ফরয হয়?

১৩. যে সমস্ত গৃহ, অলংকার ও অন্যান্য বস্তু ভাড়া দেয়া হয়, সেগুলোর এবং টেক্সী ও মোটর প্রভৃতির উপর যাকাত নির্ধারণ করার পদ্ধতি কি হওয়া উচিত?

১৪. কোনো ব্যক্তির মালিকানাধীন কোন্ কোন্ পশুর উপর যাকাত ফরয হবে? এ ব্যাপারে মহিষ, মুরগী ও অন্যান্য গৃহপালিত এবং সখ করে পালা পশুসমূহ কোন্ পর্যায়ভুক্ত? তাদের যাকাত কি নগদ টাকায় দিতে হবে নাকি পশুই দিতে হবে? কোনো ব্যক্তির মালিকানাধীন বিভিন্ন পশু কত সংখ্যায় ও কোন্ অবস্থায় পৌঁছলে তাদের উপর যাকাত ফরয হবে?

১৫. যে সব বস্তুর উপর যাকাত ফরয হয় সেগুলোর যাকাতের হার কি?

১৬. খোলাফায়ে রাশিদীনের আমলে নগদ টাকা, মুদ্রা, গবাদি পশু, ব্যবসায়ী সম্পদ ও কৃষি উৎপাদনের উপর যাকাতের হারের মধ্যে কি কোনো পরিবর্তন হয়েছে? যদি পরিবর্তন হয়ে থাকে, তাহলে সনদসহ বিস্তারিত কারণ বর্ণনা করুন।

১৭. নগদ টাকার ক্ষেত্রে যদি দু'শ রৌপ্যখচিত দিরহাম ও বিশ স্বর্ণখচিত মিসকালের উপর যাকাত ওয়াজিব হয়ে থাকে তাহলে এগুলো কত দেশীয় টাকার সমান হবে? তরিতরকারির ব্যাপারে 'সা' ও 'ওয়াসাক' দেশের বিভিন্ন এলাকা ও প্রদেশের কোন্ কোন্ প্রচলিত ওজনের সমমানের?

১৮. বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নেসাবের (কমপক্ষে যে পরিমাণ অর্থ সম্পদের উপর যাকাত হয়) মধ্যে এবং যাকাতের হারের মধ্যে কোনো পরিবর্তন সাধিত হতে পারে কি? এ ব্যাপারে যুক্তি-প্রমাণ সহকারে আপনার চিন্তা পেশ করুন।

১৯. কি পরিমাণ সময় অতিক্রান্ত হবার পর বিভিন্ন বস্তুর উপর যাকাত ওয়াজিব হয়ে যায়?

২০. এক বছরে যদি একাধিক ফসল হয়, তাহলে বছরে কেবল একবার যাকাত আদায় করা উচিত নাকি প্রত্যেক ফসলের যাকাত প্রদান করতে হবে?

২১. চান্দ্র বর্ষের হিসাবে যাকাত প্রদান করা উচিত নাকি সৌর বর্ষের হিসাবে? যাকাত নির্ধারণ ও আদায়ের জন্যে কোনো মাস নির্দিষ্ট করা উচিত কি না?

২২. যাকাতের টাকা কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ব্যয় হওয়া উচিত?

২৩. কুরআন মজীদের যাকাতের যে ব্যয়ক্ষেত্র উল্লিখিত হয়েছে তার সীমারেখা বর্ণনা করুন। বিশেষ করে 'ফী সাবীলিল্লাহ' পরিভাষাটির অর্থ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করুন।

২৪. যাকাতের অর্থের একটি অংশ কুরআনে বর্ণিত যাকাতের ব্যয়ক্ষেত্রসমূহের প্রত্যেকটিতে ব্যয় করার জন্যে পৃথক করে রাখা কি অপরিহার্য? নাকি যাকাতের সমুদয় অর্থ কুরআনে বর্ণিত সমস্ত ব্যয়ক্ষেত্রে ব্যয় করার পরিবর্তে কোনো একটিতে বা কয়েকটিতে ব্যয় করা যেতে পারে?

২৫. যাকাত গ্রহণকারী প্রতিটি শ্রেণীর মধ্য থেকে কোন্ ব্যক্তি কোন্ অবস্থায় যাকাত গ্রহণ করার অধিকারী হয়? পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকার বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সাইয়েদ ও বনী হাশিমের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গ কি পরিমাণ যাকাত গ্রহণের অধিকারী হতে পারে তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করুন।

২৬. যাকাত কি কেবল ব্যক্তিকে দিতে হবে নাকি প্রতিষ্ঠানকেও (যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এতিমখানা, দরিদ্র সেবা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি) দেয়া যেতে পারে?

২৭. যাকাতের অর্থ থেকে গরীব, মিসকীন, বিধবা এবং পঙ্গু ও বার্ধক্যের জন্যে যারা রোজগার করতে অসমর্থ, তাদেরকে সারা জীবন পেনশন দেয়া যেতে পারে কি?

২৮. যাকাতকে জনসেবার কাজে, যেমন- মসজিদ, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট, পুল, কুয়া, পুকুর প্রভৃতি খনন, নির্মাণ বা মেরামতের কাজে লাগানো যেতে পারে কিনা, যারফলে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবাই উপকৃত হতে পারে?

২৯. যাকাতের টাকা কোনো ব্যক্তিকে 'কর্জে হাসানা' অথবা সুদহীন ঋণ হিসাবে দেয়া যেতে পারে কি?

৩০. যে এলাকা থেকে যাকাত আদায় করা হয়, তা সেখানেই ব্যয় করা কি অপরিহার্য? নাকি ঐ এলাকার বাইরে বা পাকিস্তানের বাইরে দুর্বল মনকে সবল করার জন্যে, ভূমিকম্প, বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত ব্যক্তিদেরকে সাহায্য দানের ব্যাপারেও ব্যয় করা যেতে পারে? এ ব্যাপারে আপনার মতে এলাকার সংজ্ঞা কি?

৩১. কোনো মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে যাকাত আদায় করার পদ্ধতি কি হওয়া উচিত?

৩২. লোকেরা যাতে যাকাত পরিশোধের ব্যাপারে কোনো বাহানার আশ্রয় গ্রহণ করতে না পারে সে জন্যে কি কি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে?

৩৩. যাকাত উসুল ও তার ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকা উচিত, না কি প্রদেশের হাতে? কেন্দ্র যদি যাকাত আদায় করে, তাহলে তাতে প্রদেশগুলোর অংশ নির্ধারণ করার জন্যে কি নীতি অবলম্বিত হবে?

৩৪. আপনার মতে যাকাত ব্যবস্থা পরিচালনার সর্বোত্তম পদ্ধতি কি? যাকাত জমা করার জন্যে কি পৃথক বিভাগ কায়েম করা দরকার নাকি বর্তমান সরকারী বিভাগসমূহের মাধ্যমে এ কাজ নেয়া যাবে?

৩৫. যাকাতকে কি কখনো সরকারী ট্যাক্স গণ্য করা হয়েছে? নাকি এটি এমন একটি ট্যাক্স যার কেবল ব্যবস্থাপনা করার ও আদায় করার দায়িত্ব সরকারের উপর বর্তায়?

৩৬. রসূলুল্লাহ (স) বা খোলাফায়ে রাশিদীনের আমলে জনস্বার্থমূলক কাজের জন্যে সরকারী পর্যায়ে যাকাত ছাড়া অন্য কোনো ট্যাক্স আদায় করা হয়েছে কি? যদি আদায় করা হয়ে থাকে, তাহলে তা কি ট্যাক্স ছিল?

৩৭. মুসলিম দেশসমূহে যাকাতের ব্যবস্থাপনার ও আদায়ের কি পদ্ধতি ছিল এবং বর্তমানে কি পদ্ধতি আছে?

৩৮. যাকাত আদায় ও ব্যয় করার ব্যবস্থা কি একমাত্র রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন থাকবে? নাকি এ জন্যে কোনো কমিটি নিযুক্ত করে সরকার ও জনগণের যুক্ত তত্ত্বাবধানে তা পরিচালিত হবে?

৩৯. যাকাত সংগ্রহ করার জন্যে যেসব কর্মচারী নিযুক্ত করা হবে, তাদের বেতন, এলাউন্স, পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও চাকরির শর্তাবলী কি হওয়া উচিত?

জবাবঃ[১]

১. যাকাতের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে পবিত্রতা ও প্রবৃদ্ধি। এই গুণ দুটির পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী পরিভাষায় যাকাত এমন একটি ইবাদতকে বলা হয় যা প্রত্যেক 'সাহেবে নেসাব' মুসলমানের উপর এই উদ্দেশ্যে ফরয করা হয়েছে যে, আল্লাহ ও বান্দার হক আদায় করে তার অর্থ-সম্পদ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে এবং তার নিজের অন্তঃকরণ ও তার সমাজ কার্পণ্য, স্বার্থান্ধতা, হিংসা, বিদ্বেষ প্রভৃতি অসৎ প্রবণতামুক্ত হবে, অন্যদিকে তার মধ্যে প্রেম, ভালোবাসা, ঐদার্য, কল্যাণ কামনা, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহানুভূতির গুণাবলী বৃদ্ধিলাভ করবে।

ফকীহগণ যাকাতের বিভিন্ন সংজ্ঞা পেশ করেছেন। যেমনঃ

حق يجب في المال - (المغني لابن قدامه ج٢ ص٤٣٣)

"এমন একটি অধিকার যা প্রদান করা অপরিহার্য।" (আল মুগনীঃ ইবনে কুদামা দ্বিতীয় খণ্ড ৪৩৩ পৃষ্ঠা)

اعطاء جزء من النصاب الى فقير و نحوه غير متصف بمانع شرى يمنع من الصرف اليه - (نيل الاوطار ج ٤ ص ٩٨)

"নেসাব থেকে একটি অংশ এমন কোনো অভাবী ও তার সমপর্যায়ের ব্যক্তিকে দান করা, যে সমস্ত কারণে শরীয়ত কাউকে যাকাত দিতে অস্বীকার করে, সে সমস্ত কারণ যেমন তার মধ্যে বিদ্যমান না থাকে।" (নাইলুল আওতারঃ চতুর্থ খন্ড ৯৮ পৃষ্ঠা)

تمليك مال مخصوص لمستحقه بشرائط مخصوصة -

"বিশেষ অর্থ-সম্পদ বিশেষ শর্তানুযায়ী তার প্রাপকের মালিকানায় প্রদান করা।" (আল-ফিকহ আলাল মাযাহিবিল আরবাআঃ ১ম খন্ড ৫৯০ পৃষ্ঠা)

২. বুদ্ধিমান ও প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমান নারী-পুরুষ যদি সাহেবে নেসাব হয়, তাহলে তাদের উপর যাকাত প্রদান করা ফরয এবং এর পরিশোধের ব্যাপারে তারা নিজেরাই দায়িত্বশীল।

অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে মতবিরোধ আছে। একটি মত হচ্ছে এই যে, এতীমের উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। দ্বিতীয় মতটি হচ্ছে, এতীম

---

১. প্রত্যেকটি জবাব পাঠ করার সময় সংশ্লিষ্ট প্রশ্নটিকে সম্মুখে রাখবেন।

বালেগ হবার পর যখন তার অভিভাবক তার সমুদয় অর্থ–সম্পদ তাকে সোপর্দ করবে, তখন তাকে যাকাতের বিষয়েও বিস্তারিতভাবে জানাবে, অতপর যে কয় বছর সে এতীম অবস্থায় ছিল তার পুরোপুরি যাকাত আদায় করার দায়িত্ব হবে তার নিজের। তৃতীয় মতটি হচ্ছে, এতীমের অর্থ–সম্পদ যদি কোনো ব্যবসায়ে খাটানো হয় এবং তার থেকে লাভ আসতে থাকে, তাহলে অভিভাবক তার যাকাত আদায় করতে পারে, অন্যথায় করতে পারেনা। চতুর্থ মত হচ্ছে, এতীমের অর্থ–সম্পদের উপর যাকাত ওয়াজিব এবং তা আদায় করার দায়িত্ব হচ্ছে তার অভিভাবকের। আমাদের মতে এই চতুর্থ মতটিই অধিক নির্ভুল। হাদীসে উক্ত হয়েছেঃ

الا من ولى يتيما له مال فليتجر له فيه ولا يتركه فتأكله الصدقة ـ

"সাবধান! যে ব্যক্তি এমন কোনো এতীমের অভিভাবক, যে অর্থ–সম্পদের অধিকারী, তার উচিত তার অর্থ–সম্পদ কোনো ব্যবসায়ে খাটানো এবং সেগুলো এমনভাবে ফেলে রাখা উচিত নয় যার ফলে তা সম্পূর্ণরূপে যাকাতের উদরে প্রবেশ করে।" (তিরমিযী, দারা কুতনী, বায়হাকী, কিতাবুল আমওয়াল লিআবি উবাইদ)

ইমাম শাফেয়ী এরই সমার্থক একটি মুরসাল[২] হাদীস এবং তাবারানী ও আবু উবাইদ একটি মারফু[৩] হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। সাহাবী ও তাবেয়ীগণের বিভিন্ন কথা ও কর্ম একথাটিরই সমর্থক। হযরত উমর (রা), হযরত আয়েশা (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা), হযরত আলী (রা), হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) এবং মুজাহিদ, আতা, হাসান, ইবনে ইয়াযীদ, মালিক ইবনে আনাস ও যুহুরী প্রমুখ তাবেয়ীগণের নিকট থেকে এ কথা উদ্ধৃত হয়েছে।

বুদ্ধিভ্রষ্ট লোকদের ব্যাপারেও উপরোল্লিখিত চার ধরনের মতবিরোধ আছে। এ ক্ষেত্রেও আমাদের নিকট নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য মত হলো, পাগলের অর্থ–সম্পদের উপর যাকাত ওয়াজিব এবং এটি আদায় করার দায়িত্বও তার অভিভাবকের উপর বর্তায়। ইমাম মালিক ও ইবনে শিহাব যুহুরী এই মতই প্রদান করেছেন।

---

২ *যে হাদীসের সনদে সর্বশেষ ব্যক্তি অর্থাৎ সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে এবং তাবেয়ী নিজেই রসূলুল্লাহ (স)–এর নাম করে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাকে মুরসাল হাদীস বলা হয়। –(অনুবাদক)*

৩. *যে হাদীসের সনদ রসূলুল্লাহ (স) পর্যন্ত পৌছেছে অর্থাৎ যা নিঃসন্দেহে রসূলুল্লাহ (স)–এর হাদীস বলে সাব্যস্ত হয়েছে, তাকে মারফু হাদীস বলা হয়। –(অনুবাদক)*

কয়েদীর উপরেও যাকাত ওয়াজিব। যে ব্যক্তি তার অবর্তমানে তার ব্যবসায় বা অর্থ–সম্পদের অভিভাবক হবে, সে তার পক্ষ থেকে অন্যান্য অপরিহার্য কার্য–সম্পাদন করার ন্যায় যাকাতটিও আদায় করবে। ইবনে কুদামা এ সম্পর্কে তাঁর কিতাব 'আল মুগনীতে লিখেছেনঃ

'অর্থ–সম্পদের অধিকারী যদি কারারুদ্ধ হয়ে পড়ে, তাহলে তার উপর থেকে যাকাত রহিত হবেনা। কারাবাস ও তার অর্থ–সম্পদের মধ্যে অন্তরাল সৃষ্টি করলে বা না করলেও এ ব্যাপারে কোনো পার্থক্য সুচিত হবেনা, কারণ আইনত সে নিজের অর্থ–সম্পদ ব্যবহারের অধিকারী। আর বেচা–কেনা, দান, ইখতিয়ারনামা সবকিছুই আইনত বৈধ।' (দ্বিতীয় খণ্ড, ৪২৬ পৃষ্ঠা)

মুসাফিরের উপরও যাকাত ওয়াজিব। এতে সন্দেহ নেই যে, মুসাফির হিসাবে সে নিজেও যাকাত গ্রহণের অধিকারী। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, 'সাহেবে নেসাব' (যে পরিমাণ অর্থ থাকলে যাকাত ওয়াজিব হয়, সে পরিমাণ অর্থের অধিকারী) হওয়া সত্ত্বেও তার উপর থেকে যাকাত রহিত হবে। সফর তাকে যাকাত গ্রহণের হকদার করে এবং বিত্তশালিতা তার উপর যাকাত ফরয করে।

এদেশের মুসলমান অধিবাসী যদি বিদেশে অবস্থান করে এবং দেশে তার সম্পত্তি বা ব্যবসায়ে নিয়োজিত অর্থ নেসাব পরিমাণ মজুদ থাকে, তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। অন্য কোনো মুসলমান দেশের মুসলমান নাগরিক যদি এদেশে অবস্থান করে এবং এখানে তার নিকট নেসাব পরিমাণ অর্থ–সম্পদ থাকে, তাহলে তার নিকট থেকেও যাকাত আদায় করা হবে। কিন্তু যদি কোনো অমুসলিম রাষ্ট্রের মুসলমান এদেশে অবস্থান করে, তাহলে তাকে যাকাত দিতে বাধ্য করা যেতে পারেনা। তবে সে স্বেচ্ছায় দিতে চাইলে দিতে পারে। কারণ তার আইনগত মর্যাদা রাষ্ট্রের অমুসলিম প্রজাদের থেকে ভিন্নতর নয়।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ
وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ . (انفال:٧٢)

"যারা ঈমান এনেছে বটে কিন্তু হিজরত করেনি তাদের সাথে তোমাদের অভিভাবকত্বের কোনো সম্পর্ক নেই।" (আনফালঃ৭২)

৩. যাকাত আদায়ের অপরিহার্যতার জন্যে কোনো বয়সের শর্ত নেই। কোনো এতীম প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত তার তরফ থেকে তার অভিভাবকের যাকাত পরিশোধ করে দিতে হবে। আর প্রাপ্তবয়স্ক হবার পর যখন সে নিজেই নিজের অর্থ–সম্পদ ব্যবহারের যোগ্য হবে, তখন নিজের যাকাত আদায় করার দায়িত্ব তার নিজের উপর বর্তাবে।

৪. অলংকারাদির যাকাতের ব্যাপারে একাধিক মত আছে। একটি মত হলো, অলংকারাদির উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। অলংকারাদি অন্যকে ধার দেয়াই তার যাকাতের সমপর্যায়ভুক্ত। এটি হচ্ছে হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা), সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব, কাতাদা ও শাবীর মত। দ্বিতীয় মত হলো, সারা জীবনে একবার যাকাত দেয়াই অলংকারাদির জন্যে যথেষ্ট। তৃতীয় মত হচ্ছে, যে অলংকারাদি মেয়েরা হামেশা পরিধান করে থাকে, তার উপর যাকাত নেই। এবং যেগুলো অধিকাংশ সময় উঠিয়ে রাখা হয় সেগুলোর উপরে যাকাত ওয়াজিব। চতুর্থ মত হচ্ছে সব রকমের অলংকারাদির উপর যাকাত ওয়াজিব। আমরা এই শেষোক্ত মতটিকেই নির্ভুল মনে করি। প্রথমত, যে সব হাদীসে অলংকারাদির উপর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোর শব্দ ব্যাপক। যেমনঃ 'রূপার মধ্যে শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত এবং পাঁচ উকিয়া থেকে কম হলে তার উপর যাকাত নেই।'

আবার বিভিন্ন হাদীস ও সাহাবাগণের কথা কর্মেও এ কথা পরিস্ফুট হয়েছে যে, অলংকারাদির উপর যাকাত ওয়াজিব। আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী শক্তিশালী সনদের মাধ্যমে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, জনৈক মহিলা রসূলুল্লাহর (স) খেদমতে হাযির হলেন। তার সাথে তার এক মেয়ে ছিল। মেয়েটির হাতে সোনার কংকন ছিল। রসূলুল্লাহ (স) তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি এর যাকাত দিয়ে থাকো? মহিলা নেতিবাচক জবাব দিলেন। রসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ

"কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তোমাকে এর বদলে আগুনের কংকন পরিধান করাবেন, এটাই কি তুমি পছন্দ করো?"

উপরন্তু মুয়াত্তা, আবু দাউদ ও দারা কুতনীতে রসূলুল্লাহ (স)–এর এ উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে যে, যে অলংকারের যাকাত তুমি আদায় করে দিয়েছ, তা আর খনিজ দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত থাকেনি। ইবনে হাজাম মুহাল্লায় বর্ণনা করেছে, হযরত উমর (রা) তাঁর গভর্ণর হযরত আবু মুসা আশয়ারীকে (রা) যে ফরমান পাঠান তাতে নির্দেশ দেনঃ মুসলমান মহিলারা তাদের অলংকারাদির যাকাত দেবার হুকুম দাও। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) নিকট অলংকারাদির যাকাত সম্পর্কে ফত্ওয়া জিজ্ঞেস করা হয়। জবাবে তিনি বলেনঃ 'তা দুশো দিরহাম পর্যায়ে পৌছে গেলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হয়ে যায়।' এই বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যশীল উক্তি করেছেন হযরত ইবনে আব্বাস (রা), আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) ও হযরত আয়েশা (রা) প্রমুখ সাহাবাগণ, সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব, সাঈদ ইবনে জুবাইর, আতা, মুজাহিদ, ইবনে সিরিন ও যুহরী প্রমুখ তাবেয়ীগণ এবং সুফিয়ান ছাওরী, আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ প্রমুখ ফিকাহ্শাস্ত্রের ইমামগণ।

৫. কোম্পানী সম্পর্কে আমাদের মত হলো, যে অংশীদারের অংশ নেসাবের চাইতে কম অথবা যে ব্যক্তি এক বছরের কম সময়ের জন্যে নিজের অংশের মালিক ছিল, তাদেরকে বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সকল অংশীদারের যাকাত এক সংগে কোম্পানী থেকে আদায় করা উচিত। এর ফলে ব্যবস্থাপনার দিক থেকে বিষয়টি সহজ হয় এবং এ পদ্ধতির মধ্যে এমন কোনো বিষয় নেই, যা শরীয়তের নীতিগুলোর মধ্য থেকে কোনোটির পরিপন্থী হতে পারে। আমাদের এ মত ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী এবং অন্যান্য একাধিক ফকীহগণের মতের অনুসারী। (বেদায়াতুল মুজতাহিদ, প্রথম খন্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা)

৬. কারখানার যন্ত্রপাতির উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। কেবল বছরের শেষভাগে যে কাঁচামাল বা শিল্পদ্রব্য তাদের হাতে থাকবে, তার দাম এবং নগদ অর্থের যাকাত ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে ব্যবসায়ীদের আসবাবপত্র, ষ্টেশনারী দোকান বা গৃহ এবং এই ধরনের অন্যান্য বস্তুর যাকাত ওয়াজিব হবেনা। কেবল বছরের শেষে তাদের দোকানে যে মালপত্র থাকবে, তার দাম ও তাদের তহবিলে সঞ্চিত নগদ অর্থের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে।[৪] এ ব্যাপারে মুলনীতি হলো, কোনো ব্যবসায়ে যে সমস্ত বস্তু ও যন্ত্রপাতিকে উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হয়, সেগুলোর উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। হাদীসে বলা হয়েছে– 'ওয়া লাইসা ফিল ইবিলিল আওয়ামিলে সাদাকাহ্' অর্থাৎ 'যে সব উটের দ্বারা পানি সেচের কাজ করা হয়, সেগুলোর উপর যাকাত নেই'– (কিতাবুল আমওয়াল)। কারণ তাদের কার্যক্রমের ফলে জমিতে যে ফসল উৎপন্ন হয়, তা থেকেই তার যাকাত আদায় করে নেয়া হয়। এর উপর 'কেয়াস' করে ফকীহগণ অন্যান্য যাবতীয় উৎপাদনযন্ত্রকে যাকাতমুক্ত গণ্য করেছেন।

৭. কোম্পানীর যে সমস্ত বিক্রয়যোগ্য শেয়ার বছরের মধ্যভাগে বিক্রী হয়, তার ক্রেতা বা বিক্রেতা কারুর উপর ঐ বছর যাকাত ওয়াজিব হবেনা। কারণ তাদের দু'জনের কারুর মালিকানা পুরো এক বছর অতিবাহিত হয়নি।

৮. শরীয়তে নিম্নলিখিত বস্তুগুলোর যাকাত ওয়াজিব। ফসল কাটার পর ফসলের উপর, বছরের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নেসাব পরিমাণ বা তার চাইতে অধিক পরিমাণে মজুদ থাকা সোনা ও রূপার উপর, সোনা ও রূপার স্থলাভিষিক্ত নগদ টাকার উপর, বংশ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পালিত বছরের প্রথম

---

৪. যে সব ব্যবসায় এ ধরনের নয় এবং তাদের যাকাতের হিসাব যদি এভাবে না রাখা যায় (যেমন সংবাদপত্র ব্যবসায়)। তাহলে প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী বার্ষিক আয়ের পরি–প্রেক্ষিতে ঐসব ব্যবসায়ে নিয়োজিত অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে এবং তার উপর যাকাত দিতে হবে।

থেকে শেষ পর্যন্ত থাকা নেসাব পরিমাণ গবাদি পশুর উপর, বছরের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নেসাব পরিমাণ মজুদ ব্যবসায় পণ্যের উপর, খনিজ দ্রব্য ও গুপ্তধনের উপর।

ক. নগদ টাকা, সোনা, রূপা ও অলংকারাদির উপর যাকাত ওয়াজিব। অলংকারের যাকাতের ক্ষেত্রে কেবল তার মধ্যে মজুদ থাকা সোনা ও রূপার ওজনই ধর্তব্য হবে। মণি-মুক্তা বা মূল্যবান পাথর অলংকারের গায়ে বসানো থাক বা পৃথক থাক তার উপর কোনো যাকাত নেই। তবে যদি কেউ মূল্যবান পাথরের ব্যবসা করে, তাহলে অন্যান্য পণ্য দ্রব্যের ন্যায় তার উপরও অর্থাৎ তার মূল্যের শতকরা আড়াই ভাগের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। 'আলফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআয়' লিখিত হয়েছেঃ 'ব্যবসায়ে খাটানো নাহলে মোতি, ইয়াকুত ও অন্যান্য মূল্যবান পাথরের উপর যাকাত নেই। এ ব্যাপারে সকল মাযহাব একমত।' (প্রথম খন্ড ৫৯৫ পৃষ্ঠা)

খ. ধাতব মুদ্রা ও কাগজের মুদ্রার উপর যাকাত ওয়াজিব। কারণ সেগুলোর মূল্য সৃষ্টিতে ধাতু বা কাগজের কোনো ভূমিকা নেই বরং আইনের সাহায্যে সেগুলোর মধ্যে যে ক্রয় মূল্য সৃষ্টি করা হয়েছে তার কারণেই সেগুলোর দাম এবং এ জন্যে সেগুলো সোনা ও রূপার স্থলাভিষিক্ত এবং সেগুলোকে নিঃসংকোচে সোনা ও রূপার দ্বারা বিনিময় করা যেতে পারে। এ জন্যে ইমাম আবু হানীফা (র) মালিক (র) ও শাফেয়ী (র) এই তিনজন শ্রেষ্ঠ ইমামের মাযহাব হচ্ছে এই যে, এগুলোর উপর যাকাত ওয়াজিব। (উক্ত গ্রন্থ প্রথম খন্ড, ৬০৫ পৃষ্ঠা)

গ. ব্যাংকে সঞ্চিত আমানতের উপর যাকাত ওয়াজিব। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যদি রেজিস্টার্ড হয়ে থাকে এবং সরকার তাদের হিসাবপত্র যাচাই করতে পারে, তাহলে সেখানে রক্ষিত আমানতও ব্যাংকের সমপর্যায়ভুক্ত হবে। আর যদি সেগুলো রেজিস্টার্ড না হয়ে থাকে এবং তাদের হিসাবপত্র যাচাই করাও সরকারের পক্ষে সম্ভব না হয়ে থাকে, তাহলে সেখানে রক্ষিত আমানত গুপ্তধনের পর্যায়ভুক্ত হবে অর্থাৎ সেগুলোর যাকাত আদায় করার দায়িত্ব সরকারের উপর বর্তায়না। তাদের মালিকরা নিজেরাই সেগুলোর যাকাত আদায় করবে।

ঋণ যদি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে গৃহীত হয়ে থাকে এবং তা খরচও হয়ে থাকে, তাহলে তার উপর যাকাত নেই। আর যদি ঋণ গ্রহীতা পুরো এক বছর ঋণ নিয়ে রাখে এবং নেসাব পরিমাণ হয়ে থাকে, তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। আর ব্যবসায়ে খাটানো হলে তা ঋণ গ্রহীতার ব্যবসায়ী পুঁজি রূপে গণ্য হবে এবং ব্যবসা সংক্রান্ত যাকাত আদায় করার সময় তার এই ঋণকে বাদ দেয়া হবেনা।

প্রদত্ত ঋণ যদি সহজে ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। কোনো কোনো ফকীহর মতে বছরে বছরে এ অর্থের যাকাত আদায় করতে হবে। এটি হচ্ছে হযরম উসমান (রা), ইবনে উমর (রা), জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা), তাউস, ইবরাহীম নাখয়ী ও হাসান বসরীর মত। আবার অনেকের মতে ঐ ঋণ আদায় হবার পর বিগত সমস্ত বছরের যাকাত এক সাথে আদায় করতে হবে। এটি হচ্ছে হযরত আলী (রা), আবু সওর, সুফিয়ান ছাওরী ও হানাফী ঈমামগণের মত। আর যদি এ ঋণ ফেরত পাওয়া সন্দেহযুক্ত হয়ে থাকে, তাহলে ঐ অর্থ যখন ফেরত পাওয়া যাবে কেবল তখনই তার মাত্র এক বছরের যাকাত আদায় করতে হবে, এ মতটিই আমাদের নিকট অধিক গ্রহণযোগ্য। এটি হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয, হাসান, লাইস, আওযায়ী ও ইমাম মালিকের মত। এতে ধনের মালিক ও বায়তুলমাল উভয়ের সাথে সুবিচার করা হয়।

বন্ধকী সম্পত্তি যার আয়তাধীন থাকবে তার নিকট থেকে তার যাকাত আদায় করা হবে। যেমন বন্ধকী যমীন যদি মহাজনের আয়তাধীনে থাকে, তাহলে মহাজনের নিকট থেকেই তার উশর আদায় করা হবে।

বিবাদকালে বিবাদমূলক সম্পত্তি যে ব্যক্তির আয়তাধীনে থাকে, তার নিকট থেকে তার যাকাত আদায় করা হবে। আর মীমাংসা হয়ে যাওয়ার পর যে ব্যক্তির সপক্ষে মীমাংসা হবে যাকাত দানের দায়িত্ব তার উপর বর্তাবে।

নালিশকৃত সম্পত্তির যাকাতের ব্যাপারটিও একই রূপ। এ সম্পত্তি কার্যত যতদিন যার আয়তাধীন থাকে, ততদিন তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। কারণ যে ব্যক্তি যে বস্তু থেকে ফায়দা হাসিল করবে তার যাবতীয় দায় তাকেই পরিশোধ করতে হবে।

ঘ. উপহার, উপঢৌকন ও পুরস্কার যদি নেসাব পরিমাণ হয়, তাহলে বছর অতিক্রান্ত হবার পর যে ব্যক্তিকে তা দান করা হয়েছিল তার নিকট থেকে তার যাকাত আদায় করা হবে।

ঙ. বীমা ও প্রভিডেন্ট ফান্ড যদি বাধ্যতামূলক হয়, তাহলে তা যখন ফেরত পাওয়া যাবে কেবল তখন তার মাত্র এক বছরের যাকাত পরিশোধ করতে হবে। আর যদি তা স্বেচ্ছাধীন হয়, তাহলে আমাদের মতে প্রতি বছরের শেষে কোনো ব্যক্তির নামে বীমা কোম্পানীতে প্রভিডেন্ট ফান্ডে যে টাকা জমা হয়, তার যাকাত আদায় করতে হবে। কারণ যদিও সে এ টাকা নির্ধারিত সময়ের পূর্বে লাভ করতে সক্ষম নয়, তবুও যেহেতু সে নিজের অর্থকে স্বেচ্ছায় এ অবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করেছে তাই তার যাকাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোনো কারণ নেই।

চ. দুগ্ধ উৎপাদন কেন্দ্রের (ডেয়ারী ফার্ম) গবাদি পশু পণ্য উৎপাদকের পর্যায়ভুক্ত। তাই এগুলোর উপর যাকাত নেই। তবে ডেয়ারী ফার্মের উৎপন্ন দ্রব্যের উপর অন্যান্য কারখানার উৎপন্ন দ্রব্যের ন্যায় যাকাত নির্ধারিত হবে।

কৃষি দ্রব্যের মধ্যে যেগুলো গুদামজাত করার যোগ্য, সেগুলোর উপর উশর অথবা উশরের অর্ধাংশ ওয়াজিব। শুকনা ফল, খোরমা প্রভৃতি যে সমস্ত ফল গুদামজাত করা যায়, সেগুলোর উপরও অনুরূপ যাকাত ওয়াজিব। যে সব জমিতে বৃষ্টির পানিতে ফসল উৎপন্ন হয়, সেগুলোর উপর উশর ওয়াজিব এবং যে সব জমিতে কৃত্রিম উপায়ে পানি সেচের মাধ্যমে চাষাবাদ করা হয় সেগুলোর ফসলের উপর উশরের অর্ধাংশ ওয়াজিব। শাক–সবৃজি, তরিতরকারি, ফুল, ফল প্রভৃতি যেগুলো গুদামজাত করা যায়না, সেগুলোর উপর অবশ্যি উশর ওয়াজিব নয়, কিন্তু কৃষক যদি সেগুলো বাজারে বিক্রি করে, তাহলে নেসাব পরিমাণ পৌঁছলে তার উপর ব্যবসায়ী যাকাত ওয়াজিব হবে। এ ব্যাপারে ব্যবসায়ে যে নেসাব নির্ভরযোগ্য, সেই নেসাবই নির্ধারিত হবে। অর্থাৎ ঐ ব্যবসায়ে নিয়োগকৃত পূঁজি বছরের শুরুতে ও শেষে দুশো দিরহাম বা তার চাইতে অধিক হতে হবে।

ছ. খনিজ দ্রব্যের ব্যাপারে আমাদের মতে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মতই সর্বোত্তম। অর্থাৎ ধাতব, তরল (যেমন পেট্রোল, পারদ প্রভৃতি) বা ধন (যেমন গন্ধক, কয়লা প্রভৃতি) যে কোনো প্রকারের বস্তু জমি থেকে বের হয় তার মূল্য যদি নেসাব পরিমাণে পৌঁছে এবং তা যদি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন হয়, তাহলে তার উপর শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত ওয়াজিব। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের (র) শাসনামলে এ মতই কার্যকর ছিল (ইবনে কুদামার আলমুগনীঃ দ্বিতীয় খন্ড ৫৮১ পৃষ্ঠা)

জ. লব্ধ গুপ্তধনের ব্যাপারে হাদীসে বলা হয়েছেঃ ওয়া ফির রিকাযিল খুমস অর্থাৎ গুপ্তধন থেকে এক পঞ্চমাংশ (শতকরা ২০ ভাগ) যাকাত আদায় করা হবে।

ঝ. প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ নিজের ঘরে যে সমস্ত মূল্যবান বস্তু রেখে যায় সেগুলোর উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। তবে যদি ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে সেগুলো রাখা হয়, তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে।

ঞ. মধুর একটি পরিমাণ যাকাত হিসেবে গৃহীত হবে অথবা অন্যান্য ব্যবসায়ী পণ্যের উপর যেমন যাকাত নির্ধারিত হয় মধু ব্যবসায়ের উপরও তেমনি যাকাত নির্ধারিত হবে, এ ব্যাপার দ্বিমত আছে। হানাফীদের মতে, মধুর পরিমাণ যাকাত হিসাবে গৃহীত হবে। ইমাম আহমদ, ইসহাক ইবনে রাহ্ওয়ায়হ, উমার

ইবনে আবদুল আযীয, ইবনে উমর ও ইবনে আব্বাস এই মতের প্রবক্তা। ইমাম শাফেয়ীর একটি বাণীতেও এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। অন্যদিকে ইমাম মালিক ও সুফিয়ান ছাওরী বলেন, 'মধুর পরিমাণের উপর যাকাত নেই। এটিই ইমাম শাফেয়ীর মশহুর মত বলে পরিচিত। ইমাম বুখারী বলেনঃ 'মধুর যাকাতের ব্যাপারে কোনো সহীহ্ হাদীস নেই।' আমাদের মতে মধুর ব্যবসায়ের উপর যাকাত নির্ধারণ করাই উত্তম।

ট. মাছের পরিমাণের উপর যাকাত নেই বরং অন্যান্য ব্যবসায় পণ্যের ন্যায় মাছের ব্যবসায়ের উপর যাকাত ওয়াজিব।

মণি-মুক্তা এবং অন্যান্য যে সমস্ত বস্তু সমুদ্র থেকে উত্তোলিত হয় আমাদের মতে সেগুলোর ব্যাপারে খনিজ দ্রব্যের পথ অনুসৃত হওয়া উচিত। এটি ইমাম মালিকের মত এবং হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের শাসনামলে এটিকেই কার্যকরী করা হয়েছিল। (কিতাবুল আমওয়াল ৩৪৯, কিতাবুল মুগনী লিইবনে কুদামা দ্বিতীয় খন্ড ৫৮৪ পৃষ্ঠা)

ঠ. পেট্রোলের বিষয়টি খনিজ দ্রব্য প্রসংগে বর্ণিত হয়েছে।

ড. রফতানীর উপর কোনো যাকাত নেই। আমদানীর উপর হযরত উমরের (রা) আমলে যে কর আদায় করা হতো, তা যাকাতের পর্যায়ভুক্ত ছিলনা। বরং তা ছিল নিছক প্রতিবেশী দেশসমূহ ইসলামী রাষ্ট্র থেকে আমদানীকৃত দ্রব্যের উপর নিজেদের দেশে যে কর আদায় করতো কেবল তার বিরুদ্ধে জবাবী ব্যবস্থা।

৯. খোলাফায়ে রাশিদীনের আমলে রসূলুল্লাহর (স) আমলের যাকাতের দ্রব্যসমূহের তালিকায় কোনো মৌলিক পরিবর্তন করা হয়নি। বরং সেখানে যাকাতের দ্রব্যাদির তালিকায় এমন কতিপয় বস্তুর নাম বৃদ্ধি করা হয়েছিল যেগুলোকে রসূলুল্লাহর (স) নির্ধারিত যাকাতের দ্রব্যাদির উপর 'কিয়াস' করা যেতে পারে। যেমন হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয মহিষকে গরুর উপর 'কিয়াস' করেন এবং গরুর উপর রসূলুল্লাহ (স)কর্তৃক নির্ধারিত যাকাত তার উপরও নির্ধারিত করেন।

১০. সব রকমের মুদ্রার উপর যাকাত ওয়াজিব। উপরে অষ্টম নম্বরের খ দফায় এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

যে সব মুদ্রার প্রচলন নেই বা যেগুলো নষ্ট হয়ে গেছে অথবা যেগুলো সরকার ফেরত নিয়েছে, সেগুলোতে যদি সোনা রূপা থাকে, তাহলে সেগুলোর মধ্যে যে পরিমাণ সোনা বা রূপা আছে, তার পরিপ্রেক্ষিতেই সেগুলোর উপর যাকাত নির্ধারিত হবে।

অন্য দেশের মুদ্রা যদি আমাদের দেশের মুদ্রার সাথে সহজে বিনিময় করা সম্ভব হয়, তাহলে তা নগদ অর্থের পর্যায়ভুক্ত হবে। আর যদি বিনিময় করা

সম্ভব না হয়, তাহলে যখন তার মধ্যে নেসাব পরিমাণ সোনা ও রূপা মজুদ থাকবে কেবল মাত্র তখনই তার উপর যাকাত নির্ধারিত হবে।

১১. সরকারী কর্মচারীরা যে সম্পদ পর্যবেক্ষণ ও নির্ধারণ করতে পারে, তাকে বলা হয় প্রকাশ্য সম্পদ এবং সরকারী কর্মচারীদের পক্ষে যে সম্পদ পর্যবেক্ষণ ও নির্ধারণ করা সম্ভবপর হয়না, তা হচ্ছে গোপন সম্পদ। ব্যাংকে সঞ্চিত অর্থ প্রকাশ্য সম্পদের পর্যায়ভুক্ত।

১২. যে সম্পদ প্রকৃতিগতভাবে বৃদ্ধি লাভের যোগ্যতা রাখে অথবা প্রচেষ্টা ও কর্মের দ্বারা যাকে বৃদ্ধি করা যেতে পারে, তা বর্ধনশীল সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। এই সংজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে যেসব সম্পদ বর্ধনশীল কেবল তাদের উপর যাকাত নির্ধারণ করা হয়েছে। আর সঞ্চিত অর্থের মালিক যেহেতু তার বৃদ্ধি রোধ করেছে তাই তার উপর যাকাত নির্ধারিত হয়েছে।

১৩. যে সমস্ত বস্তু ভাড়ায় খাটানো হয় প্রচলিত নিয়মানুসারে তাদের লাভ থেকে তাদের অর্থ নির্ধারিত করা হবে এবং তা থেকে শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত গৃহীত হবে। লাইস ইবনে সাআদ বলেন, 'যে সমস্ত উট ভাড়ায় খাটানো হতো আমি মদীনায় তাদের থেকে যাকাত নিতে দেখেছি। (কিতাবুল আমওয়াল ৩৭৬ পৃষ্ঠা)

১৪. গবাদি পশু (উট, গরু, মহিষ, ছাগল এবং এগুলোর সমপর্যায়ভুক্ত পশু) যদি বংশ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পালন করা হয় এবং তাদের সংখ্যা নেসাব পরিমাণ বা তার চাইতে বেশী হয়, তাহলে শরীয়ত গবাদি পশুর জন্যে যে যাকাত নির্ধারণ করেছে (এর বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্যে পড়ুন মওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদবীর সীরাতুন নবী, পঞ্চম খন্ড, ১৫৬–১৬৭ পৃষ্ঠা), তার উপর ঐ একই পরিমাণ যাকাত নির্ধারিত হবে। আর যদি সেগুলো ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত হয়ে থাকে, তাহলে তার উপর ব্যবসায়ের যাকাত নির্ধারিত হবে। অর্থাৎ যদি তাদের মূল্য নেসাব পরিমাণ (দুশো দিরহাম) বা তার চাইতে বেশী হয়, তাহলে তা থেকে শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত গৃহীত হবে। আর যদি তাদেরকে কৃষি বা যানবাহনের কাজে লাগানো হয় বা কোনো ব্যক্তি যদি নিজের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহারের জন্যে তাদেরকে পালন করে, তাহলে তাদের সংখ্যা যত বেশী হোকনা কেন, তাদের উপর কোনো যাকাত নেই।

যদি সখ করে মুরগী ও অন্যান্য পশু পালন করা হয়, তাহলে তার উপর যাকাত নেই। আর যদি সেগুলো ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে পালন করা হয়, তাহলে তার উপর ব্যবসায়ের যাকাত নির্ধারিত হবে। আর যদি ডিম বিক্রি করার জন্যে মুরগী প্রতিপালন কেন্দ্র (পোলট্রি) কায়েম করা হয়, তাহলে তা পূর্বোক্ত ডেয়ারী ফার্ম ও অন্যান্য কারখানার পর্যায়ভুক্ত হবে।

গবাদি পশুর যাকাত বাবদ নগদ টাকা নেয়া যেতে পারে এবং গবাদি পশুও নেয়া যেতে পারে। হযরত আলী (রা) এ ফতওয়া দিয়েছেন। (কিতাবুল আমওয়াল, ৩৬৮ পৃষ্ঠা)

১৫. যে সমস্ত বস্তুর উপর যাকাত ওয়াজিব তাদের হার নিম্নরূপঃ

কৃষি উৎপাদন	ঃ	বৃষ্টির পানিতে চাষাবাদ হলে শতকরা ১০ ভাগ এবং কৃত্রিম সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে হলে শতকরা ৫ ভাগ।
নগদ টাকা ও সোনা–রূপা		শতকরা আড়াই ভাগ।
ব্যবসায়ী পণ্য		শতকরা আড়াই ভাগ।
গবাদি পশু		উপরের বর্ণনা অনুযায়ী সীরাতুন নবীর পঞ্চম খন্ডে এর নক্শা দেখে নিন।
খনিজ দ্রব্য	ঃ	শতকরা আড়াই ভাগ।
গুপ্তধন	ঃ	শতকরা ২০ ভাগ।
কারখানার দ্রব্যাদি	ঃ	শতকরা আড়াই ভাগ।

১৬. খোলাফায়ে রাশিদীনের আমলে রসূলুল্লাহ (স) নির্ধারিত নেসাব ও যাকাতের হারের মধ্যে কোনো প্রকার পরিবর্তন সাধন করা হয়নি। বর্তমানে এর কোনো প্রয়োজন অনুভূত হয়না। আমাদর মতে রসূলুল্লাহর (স) পর তাঁর নির্ধারিত হার পরিবর্তন করার অধিকার কারুর নেই।

১৭. নগদ অর্থ, রূপা, ব্যবসায়ী পণ্য, খনিজ দ্রব্য, গুপ্তধন ও কারখানার দ্রব্যাদির নেসাব হচ্ছে দুশো দিরহাম। মাওলানা আবদুল হাই ফিরিংগী মহলের অনুসন্ধান মতে দুশো দিরহামের রূপা আমাদের দেশের প্রচলিত ওজনের হিসাব অনুযায়ী ৩৬ তোলা ৫ মাশা ৪ রতি হয়। কিন্তু সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ওজন।

মাওলানা আবদুল হাই সাহেবের অনুসন্ধান অনুযায়ী ২০ স্বর্ণ খচিত মিসকাল ৫ তোলা ২ মাশা ৪ রতি সোনার সমান। তবে সাড়ে ৭ তোলা সোনাই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ওজন।

আবু উবাইদ লিখিত কিতাবুল আমওয়ালে যে হিসাব দেখানো হয়েছে, সে পরিপ্রেক্ষিতে ১০ দিরহামের ওজন হয় ৮২ $\frac{৩}{১০}$ বার্লি যা ৭ স্বর্ণখচিত মিসকালের সমান।

১৮. এর জবাব ১৬ নম্বরে দেয়া হয়েছে। তবে সোনার নেসাব পরিবর্তন সম্ভব। কারণ ২০ মিসকালের কথা যে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তার সনদ অত্যন্ত দুর্বল।

১৯. খনিজ দ্রব্য, গুপ্তধন ও কৃষি উৎপাদন ছাড়া বাকি যাবতীয় দ্রব্যের যাকাতের জন্য শর্ত হলো, তার নেসাব পরিমাণ বা তার চাইতে অধিক পরিমাণ দ্রব্যের উপর একটি বছর অতিবাহিত হতে হবে। খনিজ দ্রব্য ও গুপ্তধনের এক বছর অতিবাহিত হবার শর্ত নেই। অন্যদিকে ফসল কাটার সাথে সাথেই কৃষি উৎপাদনের উপর যাকাত ওয়াজিব হয়ে যায়। বছরে দু'বার বা তার চাইতে অধিকবার ফসল হলেও প্রতিবারেই ফসল কাটার পর যাকাত দিতে হবে। কুরআনে বলা হয়েছেঃ আতু হাক্কাহু ইয়াওমা হিসাদিহ। "ফসল কাটার দিনই তার হক আদায় করে দাও।"

২০. এর জবাব ১৯ নম্বরে দেয়া হয়েছে।

২১. যেহেতু আজকাল যাবতীয় ব্যাপারে এবং হিসাব-নিকাশের ক্ষেত্রে সৌর বছর ব্যবহৃত হচ্ছে, তাই যাকাতের ব্যাপারেও সৌর বছর ব্যবহারে ক্ষতি নেই। চান্দ্র বছরের হিসাবে যাকাত দান করা ওয়াজিব হবার বিষয়টি কুরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণিত নয়। যাকাত আদায় করার জন্যে কোনো বিশেষ মাস নির্ধারণ করা হয়নি। সরকার যে তারিখ থেকে যাকাত আদায় করার ব্যবস্থা করবে, সেই তারিখ থেকেই বর্ষ শুরু করা যেতে পারে।

২২. ও ২৩. কুরআন মজীদে যাকাতের ৮টি ব্যয়ক্ষেত্র বর্ণনা করা হয়েছে, যথাঃ গরীব, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী কর্মচারীবৃন্দ, দুর্বলচিত্ত ব্যক্তি, গোলাম মুক্তি, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহর পথে ও মুসাফির।

গরীব অর্থ হচ্ছে, নিজের জীবন ধারণের জন্যে যে ব্যক্তি অন্যের মুখাপেক্ষী হয়। এ শব্দটি সকল প্রকার অভাবীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। বার্ধক্য বা অংগ-প্রত্যংগের কোনো প্রকার ত্রুটির কারণে যারা স্থায়ীভাবে সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয় অথবা কোনো সাময়িক কারণে আপাতত সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয় এবং কিছুটা সাহায্য লাভ করে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে এমন প্রত্যেকটি লোক এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন এতীম ছেলেমেয়ে, বিধবা মহিলা, বেকার ও উপার্জনক্ষম এবং কোনো সাময়িক দুর্ঘটনা কবলিত ব্যক্তিবর্গ।

মিসকীন শব্দের ব্যাখ্যা হাদীসে এভাবে দেয়া হয়েছেঃ

"যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন পরিমাণ সামগ্রী লাভ করেনা, মানুষ তাকে সাহায্য করে বলে বুঝা যায়না এবং মানুষের সামনে হাতও পাতেনা।" এ প্রেক্ষিতে মিসকীন এমন এক ভদ্র ও শরীফ ব্যক্তিকে বলা হয়, যে নিজর রুজী-রোজগারের জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করে কিন্তু নিজের প্রয়োজন পরিমাণ রুজী আহরণে সক্ষম হয়না। তাকে উপার্জনরত দেখে লোকেরা তাকে সাহায্য করেনা। অন্যদিকে নিজের শরাফতের কারণে সে কারও কাছে হাতও পাততে পারেনা।

যাকাত আদায়কারী কর্মচারী বলতে তাদেরকে বুঝায়, যারা যাকাত উসুল, বন্টন ও তার হিসাব-নিকাশে রত থাকে। তারা নেসাবের মালিক হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় তারা যাকাতের অর্থ থেকে তাদের পারিশ্রমিক লাভ করবে।

দুর্বলচিত্ত ব্যক্তি হচ্ছে তারা, যাদেরকে ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের স্বার্থের বিরোধিতা থেকে বিরত রাখা অথবা এই স্বার্থের খেদমতে নিয়োজিত করারই উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্য অর্থ দিয়ে তাদের মনোতুষ্টি করা ছাড়া গত্যন্তর থাকেনা। এরা কাফিরও হতে পারে আবার এমন মুসলমানও হতে পারে যাদের ইসলাম তাদেরকে ইসলামী স্বার্থের খেদমতে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে যথেষ্ট হয়না। উপরন্তু এরা ইসলামী রাষ্ট্রের বাসিন্দাও হতে পারে আবার অন্য কোনো দেশের বাসিন্দাও হতে পারে। এ ধরনের লোকেরা নেসাবের মালিক হলেও ইসলামী রাষ্ট্র প্রয়োজন বোধ করলে তাদেরকে যাকাত দেয়া যেতে পারে। আমরা এ ব্যাপারে একমত নই যে, দুর্বলচিত্ত (মুয়াল্লেফাতুল কুলুব) ব্যক্তিদের অংশ চিরতরে মুলতবী হয়ে গেছে। হযরত উমর (রা) এ ব্যাপারে যে মত পোষণ করেছিলেন, তা কেবল তাঁর নিজের যামানার জন্যে ছিল, পরবর্তী সকল যামানার জন্যে তিনি এ মত পোষণ করেননি।

গোলাম মুক্তির অর্থ, গোলামকে মুক্ত করার জন্যে যাকাত দেয়া। যদি কোনো যুগে গোলাম না থাকে, তাহলে তখন এ খাতটি মুলতবী থাকবে।

ঋণগ্রস্থ বলতে এমন সব ঋণীদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা নিজেদের সম্পূর্ণ ঋণ আদায় করে দেবার পর তাদের নিকট নেসাব পরিমাণ অর্থ অবশিষ্ট থাকেনা। তারা উপার্জনকারী হতে পারে আবার বেরোজগারও হতে পারে।

আল্লাহর পথে মানে আল্লাহর পথে জিহাদ। এ জিহাদ হচ্ছে তরবারি, কলম, কথা বা হাত-পা-এর সাহায্যে আল্লাহর পথে শ্রম ও প্রচেষ্টা চালানো। পূর্ববর্তী আলেমগণের একজনও একে জনসেবার অর্থে ব্যবহার করেননি। তারা সবাই এর অর্থকে আল্লাহর দীন কায়েম করার, তার প্রচার-প্রসার ও ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার জন্যে প্রচেষ্টা চালানো পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রেখেছেন।

মুসাফির তার স্বদেশে ধনীও হতে পারে কিন্তু সফর অবস্থায় যদি সে সাহায্য লাভের মুখাপেক্ষী হয়, তাহলে যাকাতের অর্থ থেকে সাহায্য করা যেতে পারে।

২৪. যাকাতের অর্থ কুরআন নির্ধারিত প্রত্যেকটি ব্যয়ক্ষেত্রে একই সঙ্গে ব্যয় করা অপরিহার্য নয়। সরকার প্রয়োজন ও পরিস্থিতি অনুযায়ী যে যে ক্ষেত্রে যে পরিমাণ ব্যয় করা সংগত মনে করবে ব্যয় করতে পারবে। এমনকি প্রয়োজন দেখা দিলে একই খাতে সমস্ত অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে।

২৫. যাকাতের হকদারদের মধ্য থেকে গরীব ও মিসকীনরা যদি নেসাবের মালিক না হয়, তাহলে তারা যাকাত নিতে পারে। যাকাত বিভাগে কর্মরত কর্মচারী ও মুয়াল্লেফাতুল কুলুব'গণকে নেসাবের মালিক হওয়া সত্ত্বেও যাকাত দেয়া যেতে পারে। গোলাম নিছক গোলাম হওয়ার কারণেই তার মুক্তির জন্যে যাকাতের টাকা ব্যয় করা যেতে পারে। ঋণগ্রস্থ যদি তার সমস্ত ঋণ আদায় করার পর নেসাবের মালিক না থাকে, তাহলে যাকাত নিতে পারে। আল্লাহর পথে জিহাদকারীরা যদি নেসাবের মালিক হয়, তাহলেও যাকাতের খাত থেকে অর্থ সাহায্য করা যেতে পারে। মুসাফির সফর অবস্থায় সাহায্যের মুখাপেক্ষী হলেই কেবল যাকাত গ্রহণ করতে পারে।

বনী হাশিমদের জন্যে যাকাত গ্রহণ করা হারাম। কিন্তু বর্তমানে এদেশে কে বনী হাশিম আর কে বনী হাশিম নয় এ পার্থক্য করা বেশ কঠিন ব্যাপার। কাজেই সরকার প্রত্যেক অভাবিকেই যাকাত দেবে। কিন্তু গ্রহীতা নিজের বনী হাশিম হওয়া সম্পর্কে যদি নিশ্চিত হয়, তাহলে যাকাত গ্রহণ না করা হবে তার নিজের কর্তব্য।

২৬. রাষ্ট্রের ধনাগারে যাকাত সংগৃহীত হবার পর রাষ্ট্র তা থেকে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে দান করতে পারে এবং রাষ্ট্র নিজেও সেই অর্থে যাকাতের ব্যয়ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানও কায়েম করতে পারে।

২৭. যারা স্থায়ী বা সাময়িকভাবে যাকাতের মুখাপেক্ষী, তাদেরকে স্থায়ী বা সাময়িকভাবে মাসোহারা দেয়া যেতে পারে।

২৮. 'আল্লাহর পথে' যাকাত দেবার খাতটি 'জনসেবা'র সমার্থক গণ্য করার মতো ব্যাপক নয়।

২৯. যাকাতের অর্থ থেকে 'কর্জে হসানা' দিতে কোনো বাধা নেই। বরং বর্তমান অবস্থায় অভাবীদেরকে কর্জে হাসানা দেবার জন্যে বায়তুলমালে একটি খাত নির্দিষ্ট করা আমাদের মতে অতি উত্তম কাজ।

৩০. সাধারণ অবস্থায় যে এলাকার যাকাত সেই এলাকার অভাবীদের মধ্যে বন্টন করাই বিধেয়। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের আমলে একবার রায় শহরের যাকাত কুফায় স্থানান্তরিত করা হয়েছিল কিন্তু তিনি আবার তাকে রায় শহরে ফেরত পাঠাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন (কিতাবুল আমওয়ালঃ ৫৯০ পৃষ্ঠা)। তবে অন্য কোনো এলাকায় যদি যাকাতের অত্যধিক প্রয়োজন থাকে, তাহলে যে এলাকায় যাকাত বন্টন করার পর কিছু অবশিষ্ট রয়ে গেছে অথবা যেখানে প্রয়োজনের চাহিদা তুলনামূলকভাবে কম, সেখান থেকে ঐ পূর্বোক্ত স্থানে তা স্থানান্তরিত করা সহানুভূতি প্রকাশার্থে বা তালীফে কুলুবের (দুর্বল হৃদয়কে সবল বা বিরোধীদের মুখ বন্ধ করার) উদ্দেশ্যে সেখানে যাকাত প্রেরণ করা যেতে

পারে। কিন্তু স্বএলাকার অভাবীরা যেন বঞ্চিত না থেকে যায় এক্ষেত্রে সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে।

এলাকার অর্থ হচ্ছে প্রশাসনিক সার্কেল। জেলা, বিভাগ ও প্রদেশ তিনটিই এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। দেশের তুলনায় এলাকা বললে প্রদেশ বুঝাবে, প্রদেশের তুলনায় বিভাগ বুঝাবে এবং বিভাগের তুলনায় জেলা বুঝাবে।

৩১. মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি থেকে সর্বপ্রথম তার ঋণ আদায় করা হবে, যা সে অন্যের নিকট থেকে গ্রহণ করেছিল। অতপর তার যাকাতের যে অংশ বাকি ছিল তা আদায় করা হবে। তারপর তার অছিয়ত পূর্ণ করা হবে এবং সর্বশেষে যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে তা উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টিত হবে। মালিকের মৃত্যুর কারণে তার সম্পদের যাকাত খতম হয়ে যাবেনা। সে অছিয়ত না করে গেলেও তার সম্পদ থেকে তা আদায় করা হবে। আতা, যুহরী, কাতাদা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মুহাম্মদ, ইসহাক ইবনে রাহওয়ায়হ ও আবু সাওর প্রায় এই একই ধরনের মত পোষণ করেন। কোনো কোনো ফকীহ মত প্রকাশ করেছেন যে, মৃত ব্যক্তি যদি যাকাত আদায় করার জন্যে অছিয়ত করে গিয়ে থাকে, তাহলে তার সম্পদ থেকে তা আদায় করা হবে, অন্যথায় আদায় করা হবেনা। কিন্তু আমাদের মতে এটি কেবল গুপ্ত সম্পদের ক্ষেত্রে যথার্থ হতে পারে। কারণ এক্ষেত্রে হতে পারে মালিক তার যাকাত আদায় করে দিয়েছে কিন্তু অন্যরা তার খবর রাখেনা। কিন্তু প্রকাশ্য সম্পদের যাকাত আদায় করার ব্যবস্থা যখন সরকার নিজেই করছে, তখন এর কোনো সম্ভাবনা নেই। তাই যাকাতের অর্থ ঐ ব্যক্তির যিম্মায় ঋণ বলে গণ্য হবে। প্রথমে তার সম্পদ থেকে মানুষের ঋণ আদায় করা হবে অতপর আল্লাহ ও জমায়াতের ঋণ।

৩২. যাকাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্যে বাহানাবাজি করার পথ রোধ করার জন্যে তিনটি উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে।

এক. রাষ্ট্র পরিচালনার ভার এমন লোকদের হাতে ন্যস্ত করতে হবে যারা হবে ঈমানদার, যারা উৎকোচ গ্রহণ করবেনা, যারা যাকাত আদায় ও বন্টনের ব্যাপারে পক্ষপাতিত্বের আশ্রয় গ্রহণ করবেনা এবং যারা যাকাতের খাতে আদায়কৃত অর্থের বৃহদংশ নিজেদের বেতন ও এলাউন্সে ব্যয় করবেনা। যাকাত আদায়কারীরা যদি বিশ্বস্ত ও ঈমানদার হয়, তাহলে জনগণ তাদের উপর আস্থা স্থাপন করতে পারবে যে, তাদের যাকাত সঠিক পদ্ধতিতে আদায় এবং যথার্থ ক্ষেত্রে ব্যয় করা হবে। তখনই যাকাত প্রদান থেকে বাঁচবার জন্যে তারা বাহানাবাজি করার চেষ্টা করবেনা।

দুই. সামাজিক চরিত্রের সংস্কার সাধন করতে হবে। জনগণের চরিত্র ও কর্মজীবনে আল্লাহর মহব্বত ও তাঁর ভীতির ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে।

সরকারের কাজ কেবল দেশের প্রশাসনিক বিষয়াবলী ও দেশরক্ষা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবেনা বরং জনগণকে শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্বও তাকে গ্রহণ করতে হবে।

তিন. যাকাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের সাধারণ ও সম্ভাব্য উপায়সমূহের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করতে হবে। যেমন কোনো ব্যক্তি যদি তার যে সমস্ত সম্পদের উপর যাকাত নির্ধারিত হতে পারে, সেগুলোর একটি অস্বাভাবিক পরিমাণ বর্ষ শেষের পূর্বে নিজের কোনো আত্মীয়ের নামে লিখে দেয় বা তার নিকট স্থানান্তরিত করে, তাহলে তার উপর মোকাদ্দমা চালাতে হবে এবং যাকাত থেকে বাঁচবার জন্যে যে সে এভাবে সম্পদ স্থানান্তর করেনি এর সপক্ষে প্রমাণ পেশ করার ভার তার উপর দিতে হবে।

৩৩. আমাদের মতে যাকাত আদায় ও বন্টন ব্যবস্থা প্রদেশের পরিচালনাধীন থাকা উচিত এবং কেন্দ্রকে এ ব্যাপারে এতটুকু ক্ষমতা দান করা উচিত যার ফলে সে কোনো প্রদেশের প্রয়োজনাতিরিক্ত যাকাত এমন প্রদেশে প্রেরণ করতে পারে, যেখানকার যাকাত স্থানীয় স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক প্রয়োজন পূর্ণ করতে সক্ষম নয়। উপরন্তু কেন্দ্রের এ ক্ষমতাও থাকা উচিত যে, যাকাতের টাকা থেকে যদি এমন কোনো প্রতিষ্ঠান কায়েম করার বা এমন কিছু কাজ করার প্রয়োজন দেখা দেয় যা দেশের ভেতরে ও বাইরে 'আল্লাহর পথে' জিহাদ করার সাথে সংশ্লিষ্ট অথবা দেশের বাইরে কোনো অস্বাভাবিক বিপদে সাহায্য পাঠাবার প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে সে প্রদেশসমূহের নিকট থেকে যেন তাদের যাকাতের একটি অংশ তলব করতে পারে।

৩৪. আমাদের মতে যাকাত আদায় করার জন্যে কোনো পৃথক বিভাগ কায়েম করার প্রয়োজন নেই। অন্যান্য যাবতীয় ট্যাক্স আদায় করার জন্যে যে সমস্ত বিভাগ পূর্ব থেকেই প্রতিষ্ঠিত আছে, সেগুলোর মাধ্যমেই এই বিভিন্ন ধরনের যাকাত আদায় করা উচিত। যেমন ফসল ও গবাদি পশুর যাকাত জমির খাজনাদি আদায় সংক্রান্ত বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পারে, ব্যবসায়জাত পণ্যের যাকাত আয়কর বিভাগের মাধ্যমে আদায় করা যেতে পারে, কারখানার যাকাত এক্সাইজ বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পারে এবং এভাবে যাকাতের অন্যান্য বিভাগগুলোকেও সরকারী কর বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট করা যেতে পারে। সরকারী অর্থ–দফতরের অধীনে যাকাতর সংরক্ষণ এবং এর হিসাব একাউন্টেন্ট জেনারেল বিভাগের অধীনে পরিচালিত হতে পারে।

আমাদের সুপারিশ অনুযায়ী যাকাতকে যদি প্রদেশের কর্তৃত্বাধীন করা হয় এবং যাকাত আদায় সংক্রান্ত কোনো বিভাগের কাজ যদি কোনো কেন্দ্রীয় দফতরের অধীন করা হয় তাহলে একটি পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে যাকাত

আদায় সংক্রান্ত ঐ বিভাগের যাবতীয় ব্যয়ভার প্রদেশের উপর ন্যস্ত করা যেতে পারে।

তবে যাকাত বন্টন এবং যাকাতের বিভিন্ন ব্যয়ক্ষেত্রে যাকাতের অর্থ ব্যয় করার জন্যে একটি পৃথক বিভাগ কায়েম করা অপরিহার্য। এ বিভাগটিকে ওয়াকফ সম্পত্তি ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের তত্ত্বাবধানকারী দফতরের অধীনস্থ করা যেতে পারে।

৩৫. এ কথা পরিষ্কারভাবে জেনে রাখা উচিত যে, যাকাত কোনো ট্যাক্স নয় বরং একটি 'আর্থিক ইবাদত'। মৌলিক চিন্তা ও নৈতিক প্রাণশক্তির দিক দিয়ে 'ট্যাক্স' ও 'ইবাদতের' মধ্যে আসমান ও যমীনের পার্থক্য বিদ্যমান। সরকারী কর্মচারী ও যাকাতদাতাদের মধ্যে যদি 'ইবাদতে'র পরিবর্তে 'ট্যাক্সের' মানসিকতা সৃষ্টি হয়ে যায়, তাহলে এর ফলে যাকাত থেকে যে সমস্ত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ফায়দা হাসিল করা আসল উদ্দেশ্য, সেগুলো সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যাবে এবং সামগ্রিক ফায়দাসমূহও বহুলাংশে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। যাকাত আদায় ও বন্টন করার ভার রাষ্ট্রের হাতে সোপর্দ করার অর্থ এ নয় যে, এটি একটি সরকারী ট্যাক্স। বরং মুসলমানদের সমস্ত সামগ্রিক ইবাদতে শৃংখলা সৃষ্টি করা একটি ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব, এ জন্যেই এ ইবাদতটির ব্যবস্থাপনা সরকারের হাতে সোপর্দ করা হয়েছে। যাকাত আদায় ও বন্টন করার ন্যায় নামায কায়েম ও হজ্জ পরিচালনাও ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

৩৬. হাদীসে মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে যে, 'মানুষের অর্থ-সম্পদে যাকাত ছাড়া অন্যান্য হকও আছে।' এই নীতিগত বিধানের উপস্থিতিতে ইসলামী রাষ্ট্র যাকাত ছাড়া অন্য কোনো ট্যাক্স লাগাতে পারে কিনা তেমন কোনো প্রশ্নই সৃষ্টি হতে পারেনা। উপরন্তু কুরআনে যখন যাকাতের জন্যে মাত্র কয়েকটি ব্যয়ক্ষেত্র নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে, তখন এ থেকে অনিবার্যভাবে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, এই ক'টি মাত্র ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে সরকারের উপর যে সমস্ত দায়িত্ব অর্পিত হয় সেগুলো সম্পাদন করার জন্যে সরকার জনগণের উপর অন্যান্য ট্যাক্স লাগাতে পারে। উপরন্তু কুরআনে এই নীতিগত বিধানও দেয়া হয়েছে যে, 'ইয়াসআলুনাকা মাযা ইউনফিকুন, কুলিল আফওয়া'। অর্থাৎ 'তারা তোমার (রাসূলুল্লাহর) নিকট জিজ্ঞেস করে, আমরা কি খরচ করবো? তাদেরকে বলো, তোমাদের উদ্বৃত্তাংশ।' 'আফওয়া' বা উদ্বৃত্তাংশ হচ্ছে Economic Surplus -এর সমার্থক। এবং এখানে চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে যে, 'আফওয়া' হচ্ছে ট্যাক্সের যথার্থ স্থান। উপরন্তু খোলাফায়ে রাশিদীনের আমলে যাকাত ছাড়া অন্যান্য ট্যাক্স লাগানো হয়, এর বহু নযীর আছে। যেমন হযরত উমরের (রা) আমলে আমদানীকর নির্ধারিত হয় এবং একে যাকাতের মধ্যে নয় বরং 'ফায়' (রাষ্ট্রের সাধারণ আয়) এর মধ্যে গণ্য করা হয়। এছাড়াও শরীয়তের

এমন কোনো নির্দেশ নেই যা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেতে পারে যে, রাষ্ট্র সামগ্রিক প্রয়োজনের খাতিরে অন্য কোনো ট্যাক্স লাগাতে পারবেনা। বরং এক্ষেত্রে নীতি হচ্ছে এই যে, যে বস্তুকে নিষিদ্ধ করা হয়নি সেটি হচ্ছে মোবাহ। যতদূর আমরা জানি ফকীহগণের মধ্যেও একমাত্র যিহাক ইবনে মুযাহিম নামক জনৈক অপ্রসিদ্ধ ফকীহ ছাড়া একজনও এ কথা বলেননি যে, 'নাসাখাতিয যাকাতু কুল্লা হাক্কিন ফিল মাল।' (যাকাতে অর্থ-সম্পদের বাকি সমস্ত হক নাকোচ করে দিয়েছে।) যিহাকের এই মতকে কোনো উল্লেখযোগ্য ফকীহই সমর্থন জানাননি। (আলমুহাল্লা লি ইবনে হাযম, দ্বিতীয় খন্ড ১৫৮ পৃষ্ঠা)

৩৭. ইসলামের প্রথম যুগে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তহসীলদার নিযুক্ত ছিলেন। তারা প্রকাশ্য ধন-সম্পদ যে সমস্ত স্থানে থাকতো, সেখানে গিয়ে নিজেরাই তার যাকাত আদায় করে আনতেন। যাকাত জমা করার জন্যে কোনো পৃথক অর্থ-দফতর থাকতোনা বরং রাষ্ট্রের সাধারণ অর্থ-দফতরেই তা জমা হতো। তবে এর হিসাব পৃথক থাকতো। রাষ্ট্রের যে সমস্ত কর্মচারী অন্যান্য সরকারী কার্যসমূহ আঞ্জাম দিতেন, তাঁরাই যাকাতও বন্টন করতেন। যাকাত বন্টন করার জন্যে কোনো পৃথক বিভাগ ছিল বলে আমরা জানিনা। কিন্তু এ সকল প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আমরা বর্তমান অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী যেভাবে সংগত মনে করি বাস্তব কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করতে পারি।

বর্তমান মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে কেউ যাকাত আদায় ও বন্টন করার জন্যে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে বলে আমরা জানিনা।

৩৮. আমাদের মতে ইসলামী রাষ্ট্রকেই যাকাত আদায় ও বন্টনের কাজ করা উচিত।

৩৯. যাকাত আদায় ও বন্টন কার্যে নিযুক্ত কর্মচারীদের বেতন, এলাউন্স, পেনশন ও কাজের শর্তসমূহ অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের থেকে পৃথক হওয়া উচিত নয়। অবশ্যি সকল সরকারী কর্মচারীর বেতনের ব্যাপারে সরকারী কর্মপদ্ধতিতে মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হওয়া উচিত। বেতনের ব্যাপারে বর্তমান অসামঞ্জস্য ও বিপুল ব্যবধান অপরিবর্তিত থাকলে যথাযথভাবে যাকাত আদায় ও বন্টন সম্ভব হবেনা। [তরজমানুল কুরআন, নভেম্বর ১৯৫০]

যাকাতের নেসাব এবং হার কি পরিবর্তন যোগ্য?

প্রশ্নঃ যাকাত সম্পর্কে জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, অবস্থা ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে এর হারের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করা যেতে পারে। রসূলুল্লাহ (স) তাঁর নিজের যামানার পরিপ্রেক্ষিতে শতকরা আড়াই ভাগকে সংগত মনে

করেছিলেন। বর্তমানে ইসলামী রাষ্ট্র চাইলে অবস্থানুযায়ী একে বাড়াতে বা কমাতে পারে। তার যুক্তি হলো, কুরআনে যাকাত সম্পর্কে বহু আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু কোথাও এর হারের কথা উল্লেখ করা হয়নি। যদি বিশেষ কোনো হার অপরিহার্য হতো, তাহলে অবশ্যি তা উল্লেখ করা হতো। বিপরীতপক্ষে আমার দাবী হলোঃ রসূলুল্লাহর (স) নির্দেশ চিরন্তন, তার মধ্যে কোনো প্রকার পরিবর্তন–পরিবর্ধনের অধিকার আমাদের নেই। তবে তার যুক্তি সম্পর্কে বলা যায়, ভবিষ্যতে তিনি বলবেন যে, নামাযের রাকআতের মধ্যে পরিবর্তন করা দরকার এবং নামায পড়ার পদ্ধতিও বদলানো উচিত, কারণ তার নিকট অবস্থা ও কালের তাগিদটাই বড় কথা। তাহলে তো রসূলুল্লাহর (স) নির্দেশ আর নির্দেশ থাকবেনা বরং খেলার পুতুলে পরিণত হবে। দ্বিতীয়ত আমি বলেছিলামঃ ইসলামী রাষ্ট্রের অত্যধিক প্রয়োজন দেখা দিলে– 'ইন্না ফীল্ মালে হাক্কান সেওয়ায়্যাকাত' হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় অর্থ আদায় করতে পারে। যাকাতের হার চিরন্তন হবার ব্যাপারে এই হাদীস থেকে পরোক্ষ ইংগিত পাওয়া যায়। যাকাতের হার যদি পরিবর্তিত হতে পারতো, তাহলে এ হাদীসটির প্রয়োজন কি ছিল? কিন্তু এরপরও তিনি নিজের দাবীতে অটল। মেহেরবানী করে আপনি এ ব্যাপারে আলোকপাত করুন।

জবাবঃ যাকাতের ব্যাপারে আপনার যুক্তি যথার্থ। রসূলুল্লাহর (স) নির্ধারিত সীমা ও হারের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করার অধিকার আমাদের নেই। এ দুয়ারটি একবার উন্মুক্ত হয়ে গেলে কেবল যাকাতের নেসাব ও হারের উপরই আঘাত আসবেনা বরং নামায, রোযা, হজ্জ, বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার আইন প্রভৃতি বহু বিষয়ের পরিবর্তন–পরিবর্ধন শুরু হয়ে যাবে। এবং সর্বত্র এর গতি হবে অপ্রতিরোধ্য। উপরন্তু এ দুয়ারটি উন্মুক্ত করার পর আল্লাহ ও তাঁর রসূল ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্যে যে ভারসাম্য কায়েম করেছেন, তা খতম হয়ে যাবে। অতপর ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে রেষারেষি শুরু হয়ে যাবে। ব্যক্তি চাইবে নেসাব ও হারের মধ্যে তার স্বার্থানুকূল্যে পরিবর্তন, অন্যদিকে সমাজও চাইবে তার স্বার্থানুকূল্যে পরিবর্তন। নির্বাচনের সময় এ বিষয়টির একটি সমস্যার রূপ পরিগ্রহ করবে। নেসাব কমিয়ে ও হার বাড়িয়ে যদি কোনো আইন প্রণীত হয়, তাহলে এর মাধ্যমে যে সকল ব্যক্তির স্বার্থহানী হবে তারা ইবাদতের সত্যিকার প্রাণশক্তি অনুযায়ী যথার্থ আন্তরিকতা ও আনন্দ সহকারে তা প্রদান করবেনা বরং ট্যাক্সের ন্যায় জোর জবরদস্তি মনে করেই পরিশোধ করবে এবং টালবাহানা ও পলায়নের পথ খুঁজে বেড়াবে। বর্তমানে যেমন প্রত্যেক ব্যক্তি আল্লাহ ও রসূলের হুকুম মনে করে শির নত করে পরিশোধ করে এবং ইবাদতের আবেগে উদ্দীপ্ত হয়ে সানন্দে যাকাত দিয়ে দেয়

পার্লামেন্টে সংখ্যাধিক্যের মাধ্যমে যথেচ্ছভাবে নেসাব ও হার নির্ধারিত হলে তেমনটি আর কোনোক্রমেই সম্ভব হবেনা। [তরজমানুল কুরআন, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৫১]

কোম্পানীর শেয়ারে যাকাত

প্রশ্নঃ কোনো অংশীদারী ব্যবসায়, যেমন কোম্পানীর শেয়ারের যাকাত সংক্রান্ত বিষয়টি বুঝতে পারছিনা। শেয়ার নিজে তো কোনো মূল্যবান বস্তু নয়। একটি কাগজের টুকরা মাত্র।[১] এই দলীল দ্বারা শুধুমাত্র অংশীদার কোম্পানীর মাল-সামান ও অংশীদারী বিষয়-সম্পত্তিতে শামিল হয়ে নিজের শেয়ারের পরিমাণ অনুসারে মালিক বা অংশীদার হিসেবে পরিগণিত হয়।

দেখতে হবে, কোম্পানীর সম্পত্তি কি এবং কোন্ ধরনের। যদি কোম্পানীর বিষয় সম্পত্তি নির্মাণ সামগ্রী (অট্টালিকা), জমি ও মেশিনপত্র সম্বলিত হয়, তবে অংশীদারের অংশীদারিত্ব এগুলোর উপরই ধার্য হবে। এমতাবস্থায় আপনার বিবৃত নীতি অনুযায়ী যাকাত দিতে হবেনা। অংশীদারের অংশে পুঁজি তো অবশ্যই আছে। কিন্তু তা সমস্ত পুঁজির অংশ মাত্র যা অস্থাবর সম্পত্তির আকারে সামষ্টিকভাবে কোম্পানী লাভ করেছে। তারপরও অংশীদারের অংশের উপর যাকাত ধার্য হবে কেন?

জবাবঃ কোম্পানীর যে অংশীদারের অংশের মূল্য নেসাব পরিমাণ হয়, তার সম্পর্কে একথা বুঝতে হবে যে, সে নেসাব পরিমাণের মালিক। এবার সে যদি নিজের অর্থ কোম্পানীর কারবারে বিনিয়োগ করে, তবে তার থেকে তার পুঁজির হারে ব্যক্তিগতভাবে যাকাত নেয়া যাবেনা। বরং কোম্পানী থেকে ব্যবসায়িক

---

১. শেয়ার সম্পর্কে প্রশ্নকর্তা অনেক ভুল চিন্তা পেশ করেছেন। কাগজের টুকরা না শেয়ার হয় আর না আসল গুরুত্বের দাবী করতে পারে। বরং এটা একটা দলিল, যা এ কথা প্রমাণ করে যে, অমুক ব্যক্তি এরই সুবাদে অমুক কারবারে অংশীদার। যদি দু'জন লোক একটি দোকানে সমান সমান শরীক হয় এবং তারা নিজদের শরীকানার উপর কোনো দলিল লিখে রাখে, তাহলে দলিল তাদের আসল শেয়ারের শরীক হবেনা বরং দলিল তাদের অংশীদারিত্ব প্রমাণ করবে। অনেকে শেয়ারের সম্মিলিত কারবারের এই একই অবস্থা। এ কথাও ভুল যে, "শেয়ার নিজে কোনো মূল্যবান বস্তু নয়।" কেননা 'শেয়ার' মানে হলো পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে কোনো একটি কারবার এবং এর পুঁজি ও কারবারের সাথে সম্পর্কিত মাল-সম্পত্তির মালিকানার অধিকারে শরীক হওয়া। শেয়ারের মূল্য প্রকৃতপক্ষে অধিকারের মালিকানার মূল্যই হয়ে থাকে। শেয়ার কোনো হেয়ালি বস্তু নয় বরং একটি ধ্রুব সত্য তথ্য।

যাকাতের নিয়মানুযায়ী যাকাতের উপযুক্ত ঘোষিত সমস্ত অংশীদারের যাকাত একত্রে নিতে হবে। কোম্পানীর যাকাত হিসাবের সময় মেশিন, জায়গা, আসবাবপত্র ইত্যাদি উৎপাদক উপকরণ বাদ দিতে হবে। অন্যান্য সম্পদ, যা ব্যবসায়ের সম্পদ হিসেবে পরিগণিত এবং কোম্পানীর কোষাগারে বছরান্তে মজুদ অর্থ ইত্যাদি সমস্তের উপর যাকাত দিতে হবে। যদি কোম্পানীর কারবার এ ধরনের না হয়, তবে কোম্পানীর বার্ষিক আয় হিসেবে তার আর্থিক মান নির্ণয় করতে হবে এবং তার উপর যাকাত ধার্য করতে হবে। [তরজমানুল কুরআন, রবিউল আওয়াল রবিউস্‌সানী ১৩৭০ হিজরী, জানুয়ারী–ফেব্রুয়ারী ১৯৫০]

মুদারিবা ব্যবসায়ে যাকাত

প্রশ্নঃ দু'জন মিলে অংশীদারীর ভিত্তিতে কারবার শুরু করলো। প্রথম শরীক পুঁজি দিল এবং শ্রমও দিল। দ্বিতীয় শরীক শুধুমাত্র শ্রমের ভিত্তিতে অংশীদার। মুনাফা বন্টনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হলো যে, মোট মুনাফার তিনটি ভাগ হবে। এক ভাগ মূলধনের। বাদবাকি দু'ভাগ দু'শরীকের। এরূপ ব্যবসায়ের যাকাত সংক্রান্ত বিষয়ে দু'টি প্রশ্নের উদয় হয়। এর জবাবদানে নিশ্চিন্ত করবেনঃ

ক. যদি ব্যবসায়ের সর্বমোট পুঁজি থেকে এক জায়গায় যাকাত বের করা হয়, তবে দ্বিতীয় শরীকের পক্ষ থেকে এ আপত্তি ওঠে যে, ব্যবসায়ের পুঁজি কেবলমাত্র পুঁজি মালিকের মালিকানাধীন। পুঁজির বিনিময়ে পুঁজি মালিক ভিন্নভাবে মুনাফাও পেয়ে থাকে। সুতরাং পুঁজির যাকাত পুঁজি মালিককেই দিতে হবে। দ্বিতীয় শরীকের এ আপত্তি যুক্তিসংগত কি?

খ. ব্যবসায়ে লাভ–লোকসান উভয়টারই সম্ভাবনা থাকে। যাকাত লাভ–লোকসান নয় বরং পুঁজির সাথে সম্পর্কিত। ব্যবসায়ে লোকসান হলেও মজুদ পুঁজির উপর যাকাত দিতে হবে। লোকসানের অবস্থায় যদি কারবার থেকে যাকাত বের করা হয়, তবে দ্বিতীয় শরীকের অংশের যাকাতের এক–তৃতীয়াংশ অর্থ তার আগামী বছরের মুনাফা থেকে বের করা হবে যদি আগামী বছরেও তাকে যাকাতের অর্থ এক–তৃতীয়াংশ দিতে হয়। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় শরীকের উপর এটা আর যাকাত হিসেবে রইলোনা। বরং পুঁজি মালিকের পুঁজির যাকাতের এক অংশ আদায় করা টেক্স হয়ে যায়। এ পদ্ধতি যাকাতের আসল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী নয় কি?

জবাবঃ আপনার উভয় প্রশ্নের জবাব নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

ক. দ্বিতীয় শরীকের এ আপত্তি ঠিক নয়। যাকাত শুধুমাত্র ঐ মূলধনের উপর ধার্য হয়না যে মূলধন দিয়ে কারবারের সূচনা হয়েছিল। বরং কারবারের সমস্ত

অর্থ-সম্পদের উপর যাকাত ধার্য হয়। সঠিক পদ্ধতি হলো, সমস্ত কারবার থেকে প্রথমত যাকাত বের করতে হবে। তারপর পারস্পরিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উভয়ের মধ্যে মুনাফা বন্টন করতে হবে।

খ. ব্যবসায়িক সম্পদের যাকাতের পদ্ধতি হলো, কোনো তিজারতী মাল যদি নেসাব পরিমাণের অতিরিক্ত হয় তাহলে তা থেকে যাকাত বের করতে হবে। এবার যে ব্যক্তি শুধুমাত্র শ্রমের বিনিময়ে শরীক, তার এ শ্রম ব্যবসায়ের সৃষ্টিতে কিছু না কিছু অবশ্যই অংশ নিয়েছে। কারবারের এ অর্থ-সম্পদ শুধুমাত্র প্রাথমিক মূলধনের ফল নয়। এ জন্যে যাকাতের দু'অংশ পুঁজি মালিকের আদায় করতে হবে আর এক অংশ আদায় করবে শ্রম বিনিয়োগকারী। [তরজমানুল কুরআন, রবিউস্‌সানী ১৩৭২ হিজরী, জানুয়ারী ১৯৫৩]

ইসলামী রাষ্ট্র ও কুফরী রাষ্ট্রের মুসলমানদের মাঝে উত্তরাধিকার ও বৈবাহিক সম্পর্ক

প্রশ্নঃ 'আল জিহাদ ফিল্ ইসলাম' গ্রন্থটি অধ্যয়নকালে এ আয়াতটি নজরে পড়ে

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ - (الانفال : ٧٢)

আয়াতটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আপনি লিখেছেনঃ এ আয়াতে স্বাধীন ও পরাধীন মুসলমানদের সম্পর্ক অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ

প্রথমত এ আয়াতে বলা হয়েছে, যে মুসলমান দারুল কুফরে স্বেচ্ছায় অবস্থান করে কিংবা থাকতে বাধ্য হয় তার সাথে দারুল ইসলামের মুসলমানদের সামাজিক সম্পর্ক থাকতে পারেনা। না তারা পারস্পরিক আত্মীয়তা করতে পারে, না একে অপরের ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী হতে পারে। আমার জিজ্ঞাসা হলো, হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান যথাক্রমে 'দারুল কুফর' ও 'দারুল ইসলাম'। হিন্দুস্তানী মুসলমানদের অবস্থা দিবালোকের মত পরিষ্কার। তাদের মন-মানসিকতাও অনেকটা বদলে গেছে। মোটকথা একটি পরাধীন জাতির জন্য যেসব ত্রুটি অনিবার্য হয়ে দেখা দেয় সেগুলো সব তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে। অনেকে সেখানে অবস্থান করতে বাধ্য হয়েছে। আবার অনেকে সেখানে বসবাস করাটা স্বইচ্ছায় গ্রহণ করেছে। কেউ নিজের দীন ও মান-ইজ্জতের নিরাপত্তার জন্য হিজরত করে পাকিস্তানে চলে আসে। তাদের মধ্যে আবার এমনও অনেক আছে যাদের বাপ-মা হিন্দুস্তানে থাকাই বেশী পছন্দ করতেন এবং আমৃত্যু হিন্দুস্তান ত্যাগ করতে তারা তৈরী নয়। কিন্তু ছেলেমেয়ে

পাকিস্তানে চলে আসে এবং তারা হিন্দুস্তানে বসবাসের জন্য কোনোক্রমেই রাজী নয়। এ অবস্থায় নিম্নলিখিত প্রশ্নাবলী সৃষ্টি হয়েছেঃ

১. সন্তান-সন্ততি বাপ-মা অথবা অন্য কোনো আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পদ-সম্পত্তি থেকে মাহরুম থাকবে কি? তাদের মৃত্যুতে যদি সন্তানগণ নিজেদের উত্তরাধিকারের অধিকার দাবী করে, তবে এ দাবী কতটুকু বৈধ বা অবৈধ হবে?

২. বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে কোনো পাকিস্তানী (মুহাজের কিংবা স্থানীয় অধিবাসী) হিন্দুস্তানী কোনো মুসলমান মেয়েকে বিবাহ করতে পারবে কিনা? বিবাহ সম্ভব হওয়ার বেলায় তাদের মধ্যে বিরাজিত সম্পর্কগুলোকে জায়েয মনে করা হবে কিনা?

জবাবঃ দারুল ইসলাম ও দারুল কুফরের মুসলমানদের মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্র ও বৈবাহিক সম্পর্ক না রাখাই আমার জানা মতে কুরআনের উদ্দেশ্য। যেসব মুহাজিরের এমন আত্মীয়-স্বজন দারুল কুফরে রয়ে গেছে যাদের তারা ওয়ারিশ হতে পারে, তাদের সম্পর্কেও আমার ধারণা হলো- তারা হিন্দুস্তানে নিজেদের মীরাস পেতে পারেনা এবং তাদের হিন্দুস্তানী আত্মীয়-স্বজনরাও পাকিস্তানের কোনো সম্পদের মীরাস হওয়ার অধিকার রাখেনা। বিবাহের ব্যাপারে আমার মত হলো- হিজরতের কারণে বিবাহ তো এমনিতেই ছিন্ন হতে পারেনা। তবে স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের মধ্যে একজন যদি দারুল ইসলামে হিজরত করে চলে আসে এবং অপরজন হিজরত করতে প্রস্তুত না হয়, তাহলে এর ভিত্তিতে আদালতে দরখাস্ত দেয়া যেতে পারে এবং আদালত এমন ধরনের বিবাহ বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে। ভবিষ্যতে পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের মুসলমানদের মধ্যে বিয়ে-শাদীর সম্পর্ক না হওয়া উচিত। [তরজমানুল কুরআন, শাবান ১৩৭০, জুন ১৯৫১]

উক্ত বিষয়ে মাওলানা যাফর আহমদ উসমানীর পত্র বিনিময়

[প্রসংগঃ ইসলামী রাষ্ট্র ও কুফরী রাষ্ট্রের মুসলমানদের মাঝে উত্তরাধিকার ও বৈবাহিক সম্পর্ক]

"মাওলানা যাফর আহমদ সাহেবের পত্র"

শ্রদ্ধেয় মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা সাহেব! আল্লাহ্ আপনার গুণাবলী আরো বৃদ্ধি করুন! আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার সাথে রয়েছে আমার এক অদৃশ্য মহব্বতের সম্পর্ক। আপনার মনই এর সাক্ষী। তাছাড়া আমি মাঝে মধ্যে থানাভুন ও ঢাকা থেকে আপনাকে স্বতস্ফূর্তভাবে যে সব পত্র লিখে থাকি তাও এর প্রমাণ। আজকের এ চিঠিও সেই অদৃশ্য মহব্বতের ভিত্তিতে স্বতস্ফূর্ত ভাবেই লিখছি। আজকাল কতিপয়

আলেম আপনাকে কাফির ও ফাসিক বলে ফত্ওয়া দেয়া শুরু করেছেন এবং আপনাকে আহলে হকের জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন মনে করেছেন। এটা জেনে আমার বড়ই দুঃখ হয়েছে। আল্লাহ্ আপনাকে আহলে হক থেকে আলাদা না করলে অন্য কেউ আলাদা করায় কি আসে যায়?

لكل شيئ اذا فارقته عوض
وليس لله ان فارقت من عوض

আমি তরজমানুল কুরআনে একজন বিদগ্ধ বুযুর্গ লেখকের লেখা পড়লাম। আফসোস, তিনি তাসাব্বুরে শায়খ (পীরের ধ্যান)–এর এমন চিত্র পেশ করেছেন যার ভিত্তিতে গবেষকগণ এর তা'লীম স্থগিত রেখেছিলেন। তাসাব্বুরে শায়খ–এর তাৎপর্য শুধু এতটুকু যে, আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছার জন্য দুনিয়ার মহব্বত ও আল্লাহ ছাড়া অন্য সব সম্পর্ক থেকে অন্তরকে পাক–পবিত্র করা জরুরী। এর একটি পদ্ধতি তো এই ছিল যে, প্রত্যেকটি বস্তুর মহব্বত একটি একটি করে আলাদা আলাদাভাবে বের করে দেয়া। পদ্ধতিটি দীর্ঘ আবার কারো জন্যে দুষ্করও। এ কারণে কতিপয় গবেষক সমস্ত কিছুর উপর কোন একটির মহব্বতকে জয়ী করে তোলার পদ্ধতি অবলম্বন করেন। একটি মহব্বতের জয়ের কারণে অন্যান্য বস্তুসমূহের মহব্বত পরাজিত ও দুর্বল হয়ে নিশ্চিহ্ন কিংবা নিশ্চিহ্নের মতো হয়ে যাবে। অতপর বিজয়ী একটি মহব্বতকে ঘায়েল করা বা বের করে দেয়া বেশী দুষ্কর হবেনা। এর জন্যে পীরের মহব্বতের প্রস্তাব করা হয়। কেননা, সামগ্রিকভাবে পীরের সাথে মুরীদের মহব্বত তো হয়েই থাকে। আর যেহেতু এ মহব্বত আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে হয়ে থাকে, তাই এর আধিক্য আল্লাহর প্রতি মহব্বতের সাহায্যকারী হবে, প্রতিবন্ধক হবেনা। যখন পীরের মহব্বত বিজয়ী হয় আর অন্যান্য বস্তুর মহব্বত পরাজয় বরণ করে, তখন পীরের মহব্বতকে পরাভূত করার জন্যে তাসাব্বুরে রসূলের তালীম দেয়া হয়। তারপর ফানাফিল্লাহর রাস্তা শুরু হয়। কিন্তু যখন থেকে স্বল্প বুদ্ধিমান লোকেরা পীরকে ধ্যান করার অর্থ আমাদের কিছু বুযুর্গ ব্যক্তিদের লেখার মতো বুঝতে শুরু করেছে, তখন মুহাককিকগণ এর অনুশীলন মুলতবী করে দেন। তারা এরূপ ধ্যানকে

مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْ اَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُوْنَ.

এ আয়াতের সমার্থক বলে বর্ণনা করেন। এ প্রসংগে আপনার পত্রিকায় যা কিছু লেখা হয়েছে তা আমি সমর্থন করি।

কিন্তু এ প্রসংগে আমি অন্য একটি বিষয়ে বিদগ্ধ জনের কথার সমর্থনে বলতে চাচ্ছি যে, আপনি এবং আপনার জামায়াতের কোনো কোনো লোক কুরআন ও হাদীস থেকে সরাসরি মাসয়ালা উদ্ভাবন করতে চান। অথচ উদ্ভাবিত

মাসয়ালাটি ফকীহদের মতের সপক্ষে না বিপক্ষে সেদিকে আপনারা ভ্রুক্ষেপ করেননা। এর তাজা উাহরণ তরজমানুল কুরআনের শাবান, ১৩৭০ হিজরী মুতাবেক জুন ১৯৫১ মাসের ৩৬ ভলিউমের দ্বিতীয় সংখ্যাটি, যা সম্প্রতি আমার নজরে পড়ে। দারুল ইসলাম ও দারুল কুফরের মুসলমানদের সম্পর্কের বিবরণ দিতে গিয়ে আপনি লিখেছেন, "আমার জানা মতে দারুল ইসলাম ও দারুল কুফরের মুসলমানদের মধ্যে মীরাস ও বিয়ে-শাদীর সম্পর্ক না রাখাই কুরআনের উদ্দেশ্য। অতপর যেসব মুহাজেরের এমন আত্মীয়-স্বজন দারুল কুফরে রয়ে গেছে যাদের তারা ওয়ারিশ হতে পারে, তাদের সম্পর্কে আপনি বলেছেন, "তাদের সম্পর্কেও আমার ধারণা যে, না তারা হিন্দুস্তানে মীরাস পেতে পারে, না তাদের হিন্দুস্তানী আত্মীয়-স্বজন পাকিস্তানে তাদের থেকে মীরাস পাওয়ার অধিকার রাখে।" (পৃষ্ঠা ৬১ ও ১২৫)

আপনার এ ফত্ওয়া হানাফী ও চার মাযহাবের খেলাফ। যে আয়াতের ভিত্তিতে

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِنْ وَّلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا -

আপনি এ রায় প্রদান করেছেন, সে আয়াতের ولايت শব্দটির অর্থ যদি وراثت স্বীকার করে নেয়া হয় এবং موالات এর অর্থ না হয়, তাহলে এটা সে সময়ের হুকুম যখন রসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহ ওয়া সাল্লাম প্রথম মদীনায় এসে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর ভিত্তিতেই মুহাজির আনসারদের এবং আনসার মুহাজিরদের ওয়ারিশ হয়। ঐ আয়াতের এ অংশটুকু এর দলিলঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ط (الانفال: ٧٢)

তারপর মুহাজির ও আনসারদের পারস্পরিক মীরাস যখন সূরায়েঃ আহযাবের এ আয়াতঃ

اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗٓ اُمَّهٰتُهُمْ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ اِلَّآ اَنْ تَفْعَلُوْٓا

إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا - (الاحزاب : ٦)

দ্বারা 'মানসুখ' হয়ে গেল তখন এ হুকুম আর কার্যকর নেই যে, মুসলমান মুহাজির মুসলমান অমুহাজিরের কিংবা অমুহাজির মুহাজিরের ওয়ারিশ হতে পারেনা। বরং মীরাসের আয়াত অনুযায়ী ওয়ারিশ হতে থাকে।

তারপর আপনি এর উপরও চিন্তা করেননি যে, সূরা আল মুমতাহানার আয়াতঃ

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا - (الممتحنة ١٠)

নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মুহাজির সাহাবাদের অমুসলমান স্ত্রীগণ আইনানুগ স্ত্রী হিসাবে মক্কায় অবস্থান করছিলেন। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর হযরত উমর (রা) প্রমুখ সাহাবাগণ নিজেদের কাফির স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দিলে মক্কার কাফিরদের সাথে তাদের বিয়ে হয়। অথচ মক্কা সে সময় শুধু দারুল কুফরই ছিলনা বরং মক্কাবাসীগণ প্রতিপক্ষও ছিল। ষষ্ঠ হিজরীতে হোদাইবিয়ার যুদ্ধে কয়েক বছরের জন্য তাদের সাথে সন্ধি করতে হয়েছিল। তাহলে যে দারুল কুফরের অধিবাসীরা মূলত যুদ্ধরত নয় সেখানকার মুসলমান রমণীদের বিয়ে করা এবং সেখানকার মুসলমানদের সাথে মীরাসের সম্পর্ককে কোন্ দলিলের ভিত্তিতে আপনি অস্বীকার করছেন?

আজকের ভারত যে ধরনের দারুল কুফর বৃটিশ শাসন আমলে সে ধরনেরই ছিল। আজ পাকিস্তান যে পর্যায়ের দারুল ইসলাম হায়দারাবাদও কোনো এক সময় ঐ পর্যায়ের দারুল ইসলাম ছিল। বরং কিছুটা বেশীই ছিল। কারণ সেখানে ধর্মীয় বিভাগ (তথা মন্ত্রণালয়) প্রতিষ্ঠিত ছিল, যা এখনো পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তবে কি আপনি সে সময় হিন্দুস্তান ও হায়দারাবাদের মুসলমানদের পারস্পরিক বিয়ে-শাদি এবং মীরাসকে নিষিদ্ধ মনে করতেন? অথবা এ সময় যদি কোন হাজী মুহাজির হয়ে মক্কা-মদীনায় থেকে যায় এবং তার মৃত্যুর সময় মক্কা-মদীনায় কোন ওয়ারিশ না থাকে, তবে কি আপনি এরূপ ফত্ওয়া দিতে পারেন যে, তার হিন্দুস্তানীয় আত্মীয়-স্বজনদেরকে পরিত্যক্ত সম্পত্তি দেয়া যাবেনা?

যদি আপনি এ ফত্ওয়া দিতেন, তবে গোটা দুনিয়া আপনার বিরোধিতা করতো। হেজায সরকারের এই নীতি তুর্কি শাসনামলেও ছিল এবং এখনও আছে যে, এ ধরনের লোকদের পরিত্যক্ত সম্পদ হিন্দুস্তান সরকারের মারফত মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশকে দেয়া হতো- যখন প্রমাণ হতো যে, মৃত ব্যক্তির

ওয়ারিশ বর্তমান আছে। কোনো মাযহাবের আলেমগণও হেজাযের সরকারকে এ ফত্ওয়া দেননি যে, এসব হাজীর মাল হিন্দুস্তানী ওয়ারিশগণের নয় বরং সরকারের প্রাপ্য।

যদি সূরা আনফালের ولايت শব্দের অর্থ وراثت না হয় বরং موالات হয়, তাহলে মীরাস ও বিয়ের সাথে এর কোনো সম্পর্ক থাকবেনা। বরং এতে موالات পারস্পরিক বন্ধুত্ব স্থাপন করা ও না করার বক্তব্য থাকবে। এতে পরস্পর যুদ্ধরত হওয়া না হওয়ার পার্থক্যও থাকবে এবং নিরাপত্তা ও অনিরাপত্তার পার্থক্যও। সূরা আল-মুমতাহানার এ আয়াতের–

لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ...... الآية

অধীনে তাফসীরকার, মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ এর বিশদ বিবরণ ব্যক্ত করেছেন।

[ইমাম মুহাম্মদ ইবন হাসান শায়বানীর শারহে সিয়ারে কাবীর দ্রষ্টব্য]

পরিশেষে আমি মংগল কামনার্থে কতিপয় বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইঃ

ক. কুরআন থেকে মাসায়েল ও আহকাম উদ্ভাবন করার সময় কমপক্ষে ইমাম রাযীর আহকামুল কুরআন, ইবনুল আরাবীর আহকামুল কুরআন, তাফসীরে রূহুল মাআনী এবং হাকীমুল উম্মত থানভীর বয়ানুল কুরআন অবশ্যই মনোযোগ সহকারে দেখে নেবেন।

খ. ফত্ওয়া দেয়ার পূর্বে হানাফী ফকীহদের কিতাব এবং ফত্ওয়া দানকারী আলেমদের সাথে পুনর্বার মত বিনিময় করে নেবেন। কেননা, ফত্ওয়া লেখার জন্য শুধুমাত্র কিতাবের অধ্যয়নই যথেষ্ট নয়। এর জন্যে ফত্ওয়া দানকারীদের কাছে দীর্ঘ সময় অবস্থান করে কাজ করা প্রয়োজন।

গ. আপনি ও আমরা হানাফী মাযহাব ছাড়া অন্যান্য মাযহাব সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে ওয়াকিফহাল নই। কেননা, এখানে অন্যান্য মাযহাব সম্পর্কে শিক্ষা দেয়ার মতো অভিজ্ঞ আলেম নেই, কেবলমাত্র কিতাবে অন্যান্য ইমামদের মতামত দেখলেই তাদের মাযহাব সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত হওয়া যায়না। আপনি দেখতে পাবেন, আমাদের কিতাবে কোনো কোনো মাসয়ালা সম্পর্কে অন্য ইমামদের মাযহাব সম্পর্কিত ভুল বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। যেমন তাদের কিতাবসমূহে কোনো কোনো মাসয়ালার ব্যাপারে আমাদের মাযহাব সম্পর্কে ভুল কথা বর্ণিত হয়েছে। হাফিজ আবু বকর ইবনে আবু শায়বার মতো মুহাদ্দিস, প্রমাণ ভিত্তিক কথা বলাই যার প্রকৃতি, তিনিও নিজের গ্রন্থের 'আবু হানীফার প্রতিবাদ অধ্যায়ে অনেক মাসয়ালায় ইমাম আবু হানীফা সম্পর্কে এমন ভুল তথ্য সরবরাহ করেছেন, যা হানাফী কিতাবসমূহে নেই। এতে আপনি বুঝতে পারছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো মাযহাবের আলেমের

কাছে নিয়মিত না পড়া হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সে মাযহাব সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবগত হওয়া যায়না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাসয়ালা সঠিক বর্ণিত হয়। কিন্তু এতে যে পরিমাণ ব্যাখ্যা ও শর্তাবলী আসল মাযহাবে আছে, তার সবগুলো বর্ণনা করা হয়না।

যেমন নিখোঁজ স্ত্রীর ব্যাপারে আমাদের কিতাবসমূহে ইমাম মালিকের মতামত অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করা হয়েছে। যখন এ ব্যাপারটি মালিকী মাযহাবের আলেমদের সাথে গভীরভাবে আলোচিত হলো তখন এর বিশুদ্ধ বিবরণ জানা গেল। এ সম্পর্কে অনেক শর্ত জানা গেল যার কোনো উল্লেখই আমাদের কিতাবে নেই। [হাকীমুল উম্মাত থানভী প্রণীত রিসালাহ্ আল হিলাতুন নাজিযাহ্ দ্রষ্টব্য] সুতরাং কোনো মাসয়ালার ব্যাপারে হানাফী মাযহাব ছাড়া এ দাবী করা যে, আমরা চার মাযহাব থেকে বের হয়ে যাইনি সে সময় পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য নয়, যতক্ষণ না ঐ মাসয়ালার ব্যাপারে অন্যান্য মাযহাবের আলেমগণের সমর্থন নেয়া হবে।

ঘ.

نسبت صوفیہ غنیمتیست کبری اما رسوم ایشاں ہیچ نیرزد۔

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ সাহেবের এ উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে সুফীদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করুন। কারণ এছাড়া ইহসানের স্তর হাসিল করার আর কোনো পথ নেই। আর ইহসানের উপরই ঈমানের পূর্ণতা নির্ভরশীল। এ সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে সুফীদের রসম ও রেওয়াজ কিংবা তাদের প্রচলিত কার্যক্রমের মূলত প্রয়োজন নেই। তবে সুফীদের সোহবত লাভ করা একান্ত জরুরী

قال را بگذار مرد حال شو   پیش مردے کاملے پامال شو

আপনার কাছাকাছিই... তশরীফ রাখেন। মাঝে-মধ্যে তাঁর কাছে আসা-যাওয়া করবেন। আশা করি আমার কথাগুলোকে হিতাকাংখীর বক্তব্য হিসেবে মূল্যায়ন করবেন এবং এ দৃষ্টিভংগিতেই চিঠিটাকে দেখবেন।

সালামান্তে
যাফর আহমদ

***জবাবঃ** আমার শ্রদ্ধেয় মওলানা যাফর আহমদ উসমানী সাহেব! আল্লাহ আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি করুন। আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্ ওয়া বারাকাতুহু!*

কিছুটা দেরীতে ২৫ জুলাই চিঠিটা আমার হাতে আসে। এ কারণে জবাবদানে দেরী হলো। এতে আমার ইচ্ছাকৃত ত্রুটি নেই।

আপনার আন্তরিকতা ও মহত্ত্বের জন্যে অন্তরের অন্তস্থল থেকে আমি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। আপনি মেহেরবানী করে যে ইলমী দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন, তজ্জন্য আরো অধিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাআলা আপনাকে উত্তম প্রতিফল দান করুন।

ফতওয়ার ব্যাপারে আপনি যথার্থই বলেছেন। আমারও একান্ত কামনা এটাই যে, আল্লাহর দরবার থেকে যেন বিতাড়িত না হই, তারপর মাযহাবী দরবারসমূহ থেকে বিতাড়িত হওয়ার কোনা পরোয়া আমি না করি।

পীরের ধ্যান সম্পর্কে আপনি যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার উপর অভিযোগ করার কোনো অবকাশ নেই। যদি কোনো লোক আপনার বর্ণনা অনুযায়ী সে নিয়তে তদবীর গ্রহণ করে, তবে তদবীরের সীমা পর্যন্ত এটাকে মোবাহ স্বীকার করা যায়। কিন্তু হাকীম আবদুর রশীদ সাহেব যে ব্যাখ্যা পেশ করেছেন তাতো খুবই বিপদজ্জনক ছিল। মাওলানা আমীন আহসান সাহেব সে ব্যাখ্যারই সমালোচনা করেছেন।

কুরআন থেকে মাসায়েল ও আহকাম উদ্ভাবনের সময় জাস্‌সাস, ইবনুল আরাবীর আহকামুল কুরআন, তাফসীরে রুহুল মাআনী এবং বয়ানুল কুরআন অধ্যয়ন করে নেয়ার যে কথা আপনি বলেছেন তা যথার্থ। আলহামদুলিল্লাহ। আমি আগে থেকেই এ পরামর্শের অনুরূপ কাজ করে আসছি। মাওলানা থানভী সাহেবের বয়ানুল কুরআন তো আমার কাছে নেই। অবশ্য অন্য তিনটি কিতাবই আমার কাছে আছে। আয়াত থেকে আহকাম জানতে এই তিনটি কিতাব সব সময়ই অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখে নিই। শুধু এগুলোই যথেষ্ট মনে করিনা বরং ইবনে কাছীর, ইবনে জরীর এবং তাফসীরে কবীরও সামনে রাখি, যাতে মাসয়ালার সবদিক সামনে এসে যায়। তাই আপনি এ ধারণা করবেননা যে, আমি চিন্তা গবেষণা, অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান ছাড়াই মতামত ব্যক্ত করতে অভ্যস্ত। তবে একটি জিনিস অবশ্যই এমন আছে যেখানে আমার পদ্ধতি আপনাদের থেকে ভিন্নতর। আর তাহলো, আমি এগুলোর মধ্যে কোনো গবেষণাকেই শেষ কথা বলে মনে করিনা। যখন এগুলোর বর্ণনায় আমার তৃপ্তি না আসে, তখন আমি নিজে চিন্তা-ভাবনা করে মতামত গঠন করে থাকি।

আমি আজ পর্যন্ত ভুলেও কখনো ফতওয়া দেইনি। যে কেউ আমার কাছে ফতওয়া জিজ্ঞেস করে, আমি সব সময় তাকে এ জবাব দিয়ে থাকি যে, ফতওয়া দেয়ার মর্যাদায় আমি বসিনি। অবশ্য যারা মাসয়ালাসমূহে আমার অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তাদেরকে নিজের জ্ঞান অনুযায়ী জবাব দিয়ে থাকি। জবাব দেয়ার সময় ফিকাহর নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করে নেয়াকে আমি নিজের উপর আরোপিত দায়িত্ব মনে করি। অধ্যয়ন ও চিন্তা গবেষণা ছাড়া রায় প্রকাশ করা থেকে আমি সব

সময় বিরত থাকি। অবশ্য এ কথা স্বতন্ত্র যে, কখনো শুধু রায়ই প্রকাশ করা যথেষ্ট মনে করি। কারণ তখন দলিল, প্রমাণ ও উৎস উল্লেখ করার অবকাশ থাকেনা।

আপনার এ কথাও যথার্থ যে, কিতাবসমূহে সাধারণত নিজের মাযহাব ছাড়া অন্যান্য মাযহাবের উক্তিসমূহ সতর্কতার সাথে উদ্ধৃত করা হয়নি। এ বিষয়টি আমি নিজেও অনুভব করেছি। এ জন্যে আমি হানাফী মাযহাব ছাড়া অন্যান্য মাযহাবসমূহের মতামত জানার জন্যে শুধু হানাফী ফকীহদের লিখিত কিতাবসমূহের উপর নির্ভর করিনা, বরং নিজে ঐসব মাযহাবের আসল কিতাবসমূহও দেখে নিই। উদাহরণ স্বরূপ হাম্বলী মাযহাবের জন্যে ইবনে কুদামার 'আল মুগনী' মালিকী মাযহাবের জন্যে 'আল মুদাওবেনাহ' ইত্যাদি। অধিকন্তু আমার অভিজ্ঞতায় চার মাযহাবের উক্তি ও মতামতসমূহ 'আল ফিকহ আল-মাযাহেবিল আরবাআ' নামক কিতাবে যথেষ্ট সতর্কতার সাথে উদ্ধৃত করা হয়েছে। 'বেদায়াতুল মুজতাহিদ' ও এ ব্যাপারে তুলনামূলকভাবে বিশেষ নির্ভরযোগ্য। ইমাম শাওকানীকেও এ ব্যাপারে আমি বিশেষ সতর্ক দেখেছি। যদিও কোনো কোনো জায়গায় মাযহাবের বর্ণনায় তিনি ভুল করেছেন। যা হোক, একটি মাসয়ালার যাচাই-বাছাইয়ে অনেকগুলো মূল কিতাবের শরণাপন্ন হলে নিকটতম সঠিক জ্ঞান হাসিল হয়ে যায়।

সুফীদের সংসর্গ থেকে আমি অধিকাংশ সময় ফায়দা হাসিল করেছি। এক সময় তো আমার এ নিয়ম ছিল, কোনো আল্লাহওয়ালা বুযুর্গের খোঁজ পেলেই তাঁর সাথে অবশ্যই দেখা করতাম এবং তাঁর কাছে বসতাম। আমার নিজের খান্দানও আহলে তাসাওউফের অন্তর্ভুক্ত। আমার মরহুম আব্বাজান পর্যন্ত পীর-মুরীদীর সিলসিলা জারী ছিল। আমি তাসাওউফ সম্পর্কে অল্প-বিস্তর লেখাপড়াও করেছি। বিভিন্ন আধ্যাত্মিক শায়খদের নিকট থেকে তাওয়াজ্জুহ নিতে এবং মোরাকাবাহ-মোশাহেদা কার্যক্রম শেখারও চেষ্টা করেছি। এ কারণে তাসাওউফ ও তাসাওউফ পন্থীদের ব্যাপারে যেসব নিজস্ব ধারণা ও মতামতের ভিত্তিতে আমার বদনাম হয়েছে, সেগুলোকে আপনি এমন একজন লোকের ধারণা ও মতামত মনে করবেননা যে এ গলিপথ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আমি তাসাওউফ ও তাসাওউফ পন্থীদেরকে প্রত্যক্ষ করেছি। এর ভাল-মন্দ সবদিক দেখে শুনেই একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। আমি বলছি না যে, আমি যে সিদ্ধান্তে পৌছেছি প্রত্যেককেই তা মেনে নিতে হবে। তবে আমি অবশ্যই আরয করবো, আমার রায়কে নিছক একটি গুরুত্বহীন রায় মনে করার মতো ভুল অন্য লোকও যেন না করেন। আজও কোনো কামিল লোক থেকে ফায়দা গ্রহণ করতে আমার মোটেই দ্বিধা নেই। আমার প্রত্যেকটি মতই পুনর্বার যাচাই-বাছাই করার অবকাশ রাখে। কিন্তু কি করবো, অনেক লোক যারা কামিল বলে কথিত, আমি

তাদেরকে আমার অভিজ্ঞতায় ত্রুটিপূর্ণ (নাকিস) পেয়েছি। আল্লাহতাআলা কোনো সত্যিকার কামিল লোক থেকে উপকৃত হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন।

এবার আমি সেই মূল প্রসংগে ফিরে যেতে চাই, যে ব্যাপারে আপনি বিস্তারিতভাবে পাকড়াও করেছেন। আমি এ প্রসংগে যে রূপ সংক্ষিপ্তাকারে মত ব্যক্ত করেছি তা দেখে হয়তো আপনি ধারণা করে থাকবেন, আমি এ মাসয়ালায় ফকীহদের ভাষ্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নই এবং কুরআনের শুধুমাত্র একটি আয়াত দেখেই রায় প্রকাশ করে বসেছি। অথচ আসল ব্যাপার তা নয়। আসল কথা হলো, দারুল কুফুরের মুসলমান প্রজা এবং দারুল ইসলামের সরকার ও মুসলমান প্রজার মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারটি খুবই জটিল। এ ব্যাপারে ফকীহদের বর্ণনাকে আমি অপর্যাপ্ত পেয়েছি। মুতাকাদ্দিমীন তথা পূর্ববর্তীগণ তো এরূপ সমস্যার বেশী সম্মুখীন হননি। এ কারণে তারা এ বিষয়ের সব গিট খুলে বর্ণনা করেননি। রয়ে গেল মুতআখখিরীন অর্থাৎ পরবর্তীগণ। তাঁরা এরূপ সমস্যার সম্মুখীন অবশ্যই হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা না পূর্ববর্তীদের নিকট থেকে বিস্তারিত পথ–নির্দেশনা পেয়েছিলেন, না নিজেরা ইজতিহাদ করার সাহস করেছেন। বর্তমানে আমরা যখন নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্র লাভ করেছি তখন আমাদের সামনে পুনরায় সেই সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুভব করছি, ফিকাহর পূর্ববর্তী কিতাবগুলো এ ব্যাপারে আমাদের পূর্ণভাবে পথ–নির্দেশনা দিচ্ছেনা। আপনি নিজে ফিকাহর কিতাবসমূহে এ মাসয়ালাটি সম্পর্কিত প্রাপ্ত হুকুমগুলো একটু একত্র করুন। তারপর দেখুন এগুলো আমাদের এ সময়ের অবস্থার সমস্ত মাসয়ালার পরিপূর্ণ জবাব দেয় কি?

দারুল ইসলামের সরকার ও মুসলমান প্রজা এবং দারুল কুফরের মুসলমান প্রজাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারটি শুধুমাত্র আইনানুগ নয়। বরং রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়গুলোও এর সাথে জড়িত। দারুল ইসলামের একজন মুসলমান প্রজা যদি দারুল কুফরের কোনো ব্যক্তির ওয়ারিশ হয় এবং তার কল্যাণ এই ওয়ারিশের সাথে সম্পৃক্ত হয়, তবে এ সম্পৃক্ততাই তার জন্যে বিপদ হয়ে দাঁড়াতে পারে। দারুল কুফরের একটি মেয়ে যার আত্মীয়–স্বজন সকলেই দারুল কুফরে থাকে এবং তার সকল কল্যাণ সে দেশের সাথে জড়িত, সে যদি দারুল ইসলামে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে চলে আসে, তবে হতে পারে অমুসলমানের তুলনায় তাকে গুপ্তচরবৃত্তিতে অধিক সহজে ব্যবহার করা যেতে পারে। একজন স্ত্রীলোক যে হিজরত করে দারুল ইসলামে চলে এসেছে অথবা দারুল ইসলামেরই বাসিন্দা, তার স্বামী যদি দারুল কুফরের অধিবাসী হয় কিংবা সে হিজরত করতে রাজী না হয়, তবে এ কথা পরিষ্কার যে, আমরা না ঐ লোকটির খরচপত্র দিতে পারবো আর না ঐ লোকটির উপর

আমাদের কোনো আদালতের ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করতে পারবো। আমরা তার উপর কোনো অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারবোনা। এমতাবস্থায় অনন্যোপায় হয়ে, হয় মেয়েটিকে তার সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে হবে নতুবা তাকে পুনরায় দারুল কুফরে পাঠিয়ে দিতে হবে। এমনি ধরনের অনেক জটিলতা এসব ব্যাপারে পরিদৃষ্ট হয় যা নিছক আইনের পর্যায়ের নয়।

তারপর এ ব্যাপারে কতিপয় অর্থনৈতিক জটিলতাও দেখা দেয়। দারুল কুফরের সরকার নিজের এলাকায় দারুল ইসলামের প্রজার মালিকানা– অধিকার রহিত করতে পারে অথবা অধিকারসমূহ বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার মাধ্যমে সীমিত করতে পারে। দারুল ইসলামে সম্পদ স্থানান্তরিত করতে বাধা দিতে পারে। কিন্তু দারুল ইসলামে দারুল কুফরের একজন মুসলমানের মীরাসী অধিকার শরীয়ত মোতাবেক স্বীকার করার পর আমরা কিভাবে তা রদ করতে পারি? দারুল ইসলামের একজন মুসলমানকে দারুল কুফরে অবস্থানরত স্ত্রীর খরচপত্র কিংবা মোহর আদায় করতে কিভাবে বাধা দেয়া যাবে? এভাবে ধন–সম্পদের একতরফা প্রবাহের সূচনা হবে যা দারুল ইসলামের জন্যে ক্ষতির ও দারুল কুফরের জন্যে লাভজনক হবে। বিশেষত যখন কোটি কোটি মুসলমান দারুল কুফরের প্রজা হিসেবে বসবাস করতে এবং দারুল ইসলামের অগণিত মুসলমানের সাথে তাদের সম্পর্ক থাকবে। এ ক্ষতি এড়িয়ে যাবার মতো নয়।

আমি এ জটিলতা নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা করেছি। না ফিকাহর কিতাবসমূহে এর যুক্তিসংগত সমাধান পেয়েছি, না ইসলামের প্রথম পর্যায়ের কয়েক বছর পর্যন্ত মক্কা ও মদীনার মুসলমানদের মধ্যে যে অবস্থা বিরাজিত ছিল, তার মধ্যে এর কোনো নযীর পেয়েছি। এ জন্যে কুরআনের আলোকে আমি এর সমাধান জ্ঞাত হওয়ার চেষ্টা করেছি। আমি মনে করি–

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ ـ (الانفال : ٧٢)

এ আয়াতের মধ্যে এর পরিপূর্ণ জবাব নিহিত আছে। আমি আপনাকে বলছি– এ আয়াত থেকে হুকুম কিভাবে উদ্ভাবিত হয়ঃ

এ আয়াতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শব্দ হলো– ولايت যার অর্থ নির্দিষ্ট হওয়া জরুরী আমি বুঝতে পারছিনা শব্দটিকে শুধু ওরাসাত কিংবা কোনো একটি অর্থে সীমাবদ্ধ করার যুক্তিসংগত কারণ কি। আরবী ভাষায় শব্দটির পূর্ণ ব্যাপকতা বজায় রাখলে এর মধ্য থেকে সাহায্য, অভিভাবকত্ব,

সমর্থন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং নৈকট্যের ভাবার্থ ফুটে উঠে। এসব ভাবার্থের প্রেক্ষাপটে আমি বুঝেছি যে, ولايت এর অর্থ হলো, একদিকে এমন সম্পর্ক যা একটি রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের নাগরিকদের পরস্পরের মধ্যে হয়ে থাকে, অপরদিকে এমন সম্পর্ক যা একটি রাষ্ট্রের নাগরিকদের পরস্পরের মধ্যে গড়ে উঠে। আর এ সম্পর্কের সীমা এমন সকল সম্পর্ক পর্যন্ত বিস্তৃত যেগুলোর উপর ولايت শব্দটি আভিধানিক অর্থে প্রযোজ্য হয়। কুরআন মজীদ এ কথা বলতে চায় যে, দারুল ইসলাম সরকার কেবল মাত্র দারুল ইসলামের মুসলমানদের অলী বা অভিভাবক। তাকে দারুল কুফরের মুসলমানদের ولايت থেকে অব্যাহতি দিতে হবে, যাতে সে আন্তর্জাতিক জটিলতায় জড়িয়ে না পড়ে এবং কর্তব্য পালন করতে গিয়ে এমন জটিলতার সম্মুখীন না হয় যার হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া তার পক্ষে বাস্তবে অসম্ভব। সাথে সাথে দারুল ইসলামের মুসলমান প্রজা এবং দারুল কুফরের মুসলমান প্রজার মধ্যেও ولايت এর এসব সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা না হওয়া, বরং ولايت এর সম্পর্কসমূহ দারুল ইসলামের মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যেই সীমিত রাখা কুরআনের লক্ষ্য। এর এ তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট হওয়ার পর এ আয়াত থেকে যেসব বিধান পাওয়া যায় সেগুলো হলোঃ

১. দারুল কুফরের মুসলমান প্রজার সাহায্য-সহানুভূতি, রক্ষণাবেক্ষণ, অভিভাবকত্ব ও দেখাশুনা করা দারুল ইসলাম সরকারের দায়িত্ব নয়।

انا برئ من كل مسلم بين ظهر انى المشركين

"আমি এমন প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব থেকে মুক্ত যে মুশরিকদের সাথে অবস্থান করে।"

এ হাদীসটি এ তাৎপর্যই বহন করে।

তবে যদি তারা দীনের ব্যাপারে ইসলামী রাষ্ট্রের সাহায্য প্রার্থনা করে, তাহলে সামর্থ্যের শর্তাধীনে কাফির জাতির বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করা যায়, যাদের সাথে আমাদের কোনো চুক্তি নেই।

২. দারুল কুফরের কোনো মুসলমান, যিনি রীতিমতো দারুল কুফরের প্রজা হয়ে বসবাস করছেন, দারুল ইসলামে এসে মুসলমানদের সাথে নাগরিক অধিকারে অংশ নিতে পারেননা। দারুল ইসলামে তাকে কোনো দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করাও সরকারের জন্যে জায়েয নয়। এসব অধিকার ও পদমর্যাদা তাকে কেবলমাত্র সে অবস্থাতেই দেয়া যেতে পারে, যখন তিনি হিজরত করে দারুল ইসলামে এসে যাবেন।

৩. দারুল কুফর ও দারুল ইসলামের মুসলমান একে অপরের ওয়ারিশ হতে পারেনা। তবে তখন হতে পারে যখন উভয় সরকার ও রাষ্ট্রের মধ্যে নির্ভরযোগ্য বন্ধুসুলভ সম্পর্কেও চুক্তি স্থাপিত হয় এবং ধন-সম্পদ মীরাসের

ব্যাপারে উভয় সরকারের মধ্যে সমতা ভিত্তিক চুক্তিপত্রও সম্পাদন হয়, যাতে উভয় দেশের নাগরিকরা একে অন্য দেশের ধন–সম্পদের মালিকও সেগুলোর দখলদার হতে পারে।

لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ - (الممتحنه: ٨)

"আল্লাহ্ তোমাদেরকে এ ব্যাপারে নিষেধ করছেননা যে, তোমরা এমন অমুসলমানদের সাথে সম্পর্ক রাখো, যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর থেকে বের করে দেয়নি, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও ইনসাফ করো।"

এ ব্যাপারে আপনি–

وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ -

এ আয়াতের মাধ্যমে যে প্রতিবাদ করেছেন, তা সঠিক নয়। আয়াতের তাৎপর্য শুধু এতটুকু যে, কেবলমাত্র ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের ভিত্তিতে আনসার ও মুহাজির একে অপরের ওয়ারিশ হবেনা বরং ওয়ারিশ হবে বংশ ও স্ত্রীর দিক থেকে আত্মীয়তার সূত্রে। এ থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়না যে, আয়াতটি দারুল ইসলামের মুসলামনদের মীরাস এমন সব আত্মীয়–স্বজনদের কাছে পৌঁছে দিতে চায়, যারা দারুল কুফরের প্রজা হিসেবে বসবাস করছে। কুরআনের যখন সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত এই যেঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا........ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَنَصَرُوْا اُولٰئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ -

"যারা ঈমান এনেছে এবং (দারুল ইসলামে) হিজরত করে এসেছে... এবং যারা মুহাজিরদেরকে জায়গা দিয়েছে এবং সাহায্য করেছে, তারা একে অপরের অলী।"

এরপর কিভাবে এ ধরনের অর্থ গৃহীত হতে পারে?

৪. দারুল ইসলাম ও দারুল কুফরের মুসলমানদের মধ্যে যখন ولايت এর সম্পর্ক নেই, তখন كفايت এর সম্পর্ক থাকবেনা তা বলাই বাহুল্য। তবে এতটুকু কথা বলা যায় যে, তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করা পছন্দনীয় নয়। পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে তারা পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হলে বিবাহ বৈধ হবে বটে, কিন্তু এরূপ না হওয়াই বেহতের। প্রশাসনিক বিধি–ব্যবস্থার মাধ্যমে ইসলামী সরকার এ ধরনের সম্বন্ধের পথে প্রতিবন্ধকতা

দাঁড় করাবার এবং বিশেষ অবস্থায় এগুলোকে বাধা দেবার অধিকার তার আছে। তবে এ কথা বলা যেতে পারেনা যে, প্রথমেই যাদের মধ্যে বিয়ে–শাদী হয়ে গেছে কেবলমাত্র দেশের বিভিন্নতার কারণে তাদের বিয়ে ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু দারুল ইসলামে বসবাসরত কিংবা হিজরত করে দারুল ইসলামে আগত একজন বিবাহিত নারী যদি আদালতে এ ভিত্তিতে বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করে যে, তার স্বামী দারুল কুফরের অধিবাসী, দারুল ইসলামে হিজরত করতে তৈরী নয়, এমতাবস্থায় এ ভিত্তিতে তার আবেদন মঞ্জুর করার একটি যুক্তিসংগত কারণ হবে। কেননা, ইসলামী সরকার তো ঐ স্ত্রীলোকটির মুতাওয়াল্লী এবং তার অধিকারসমূহের রক্ষক। কিন্তু তার স্বামী এই সরকারের অভিভাবকত্বের বাইরে। সুতরাং ঐ স্ত্রী লোকটির কোনো অধিকারই তার স্বামী থেকে সরকার আদায় করতে পারবেনা। কাজেই যদি ইসলামী সরকার স্ত্রীলোকটিকে তার স্বামীর বিবাহ বন্ধন থেকে ছিনিয়ে না আনে তবে তো তার বেলায়াতের (অভিভাবকত্ব) দায়িত্ব পালনে অক্ষম প্রমাণিত হবে। চিন্তা করে দেখুন ব্যাপারটা আপনার কাছেও অদ্ভুত মনে হবে যে, আমরা যার অলী নই, তার অধিকারের তো রক্ষক হয়ে বসবো, অথচ যার অলী সেজে বসে আছি তার অধিকার না দিতে পারবো আর না দেয়াতে পারবো।

এ ব্যাপারে আমার মতে অধিকতর সতর্কতার দাবী হলো, যে স্ত্রীর কাছে খরচপত্র আছে এবং ফিতনায় নিমজ্জিত হওয়ার কোনো সংগত আশংকাও নেই, তার জন্যে একটি পরিমিত সময়সীমা পর্যন্ত অপেক্ষা করার প্রস্তাব করা যাবে। এ সময়সীমার মধ্যে তার স্বামী যদি হিজরত করে চলে আসে, তবে স্ত্রী তারই হবে। অন্যথায়, এরপর বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। যাকে ইচ্ছা স্বামী হিসেবে বরণ করার স্বাধীনতা স্ত্রীলোকটি পেয়ে যাবে। কিন্তু যার কাছে খরচপত্র নেই কিংবা ফিতনায় পতিত হওয়ার যথেষ্ট আশংকা আছে, তার বিবাহ বন্ধন অনতিবিলম্বে ছিন্ন করা উচিত। আমরা দারুল কুফরের কোনো ব্যক্তির খাতিরে দারুল ইসলামের কোনো স্ত্রীলোককে না ক্ষুধায় মারতে পারি, না ব্যভিচারের পংকিলতায় নিক্ষেপ করতে পারি।

لَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ـ(الممتحنه : ١٠)

এ আয়াত দ্বারা আপনি এখানে যে দলিলের অবতারণা করেছেন, তা সম্পূর্ণ অপ্রাসংগিক। হিজরতের সময় মক্কায় অবস্থানরত অমুসলমান স্ত্রীদেরকে মুহাজিরগণ তালাক না দেয়ার কারণ হলো– তখনো (অর্থাৎ হিজরতের সময়) মুশরিক স্ত্রী–পুরুষদের সাথে বিবাহ হারাম হওয়ার হুকুম নাযিল হয়নি। এ কারণে এমন মুসলমান স্ত্রীলোকও মুশরিক পুরুষদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিল যারা হিজরত করে মদীনায় চলে আসেন। অতপর দু'দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাধার

অবস্থা সৃষ্টি হয়, যার পরিপ্রেক্ষিতে মুহাজিরদের ব্যয়িত অর্থ মুশরিকদের থেকে আদায় করে নিজেদের স্ত্রীদেরকে পরিত্যাগ করা এবং মুশরিকদের ব্যয়িত অর্থ-সম্পদ ফিরিয়ে দিয়ে মুসলমান স্ত্রীদেরকে মুশরিকদের বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত করে আনার ব্যাপারটি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অমীমাংসিত থাকে। ব্যাপারটি হোদায়-বিয়ার সন্ধি পর্যন্ত ঝুলন্ত ছিল। সন্ধি চুক্তি সম্পাদিত হবার পর হুকুম আসে-

لَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْئَلُوْا مَا اَنْفَقْتُمْ -(الممتحنة : ١٠)

আমি বুঝতে পারছিনা, উপরোক্ত বিষয় থেকে আলোচ্য মাসআলার সপক্ষে আপনি কি দলিল কেমন করে আনতে পারেন?

আপনি হায়দরাবাদ, হেজায ও তুরস্কের কার্যাবলী থেকে যে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন, তা আপনার মতো একজন বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ আলেমের জন্যে যথার্থ হয়নি। হায়দরাবাদ সরকারের নিজের ধর্মীয় মন্ত্রণালয় থাকা সত্ত্বেও সে দেশটি দারুল ইসলাম ছিলনা। সেটা ছিল দারুল কুফরের অন্তর্ভুক্ত একটি যিম্মী রাজ্যের (Protected State) মতো। হিন্দুস্তানের মুসলমানগণ যেমন ইংরেজদের যিম্মী হিসেবেই বসবাস করতো, তেমনি হায়দরাবাদের নিযামও। নিযাম সরকার যদি কিছু ইসলামী পদ্ধতি চালু রেখে থাকে, তবে সেটা তার নিজের শক্তিতে ছিলনা বরং ইংরেজ তাকে এতোটুকু করার অনুমতি দিয়েছিল বলেই তাঁর পক্ষে এটা করা সম্ভব হয়েছিল। নিযাম যদি ইসলামের অন্যান্য বিধানগুলো চালু করতে চাইতেন, তা করতে পারতেননা। কেননা, ইংরেজ সরকার তা বরদাশ্‌ত করতে প্রস্তুত ছিলনা। এরূপ সরকারকে কিসের ভিত্তিতে দারুল ইসলাম বলা যায়? অপরদিকে পাকিস্তানে শাসনতান্ত্রিকভাবে পূর্ণ ইসলাম প্রতিষ্ঠার ঘোষণা হয়ে গেছে। এর বাস্তবায়নে যদি কোনো বাধা সৃষ্টি হয়, তবে সেটা হবে পাকিস্তানের শাসকদের অনাহার কারণে, কোনো অমুসলমান শক্তির চাপে নয়। এ জন্যে মূলত পাকিস্তান ও হায়দরাবাদের মধ্যে এমন কোনো সাদৃশ্য নেই। যাতে একের বিষয়কে অপরের উপর অনুমান করা যায়। রয়ে গেল তুরস্ক ও হেজায প্রসংগ। সে দেশের আলেমদের মতানুযায়ী সে দেশ চলছে। তাদের মতের সাথে আমার ঐক্যমত্য হওয়া কি জরুরী? আপনার এবং এদেশের অন্যান্য আলেমদের রায়ের সাথে অনৈক্য প্রকাশ করেই তো আমি আমার গবেষণা পেশ করে যাচ্ছি। আপনি আমার উপস্থাপিত যুক্তি ও দলিল প্রমাণ দেখুন। তুরস্ক ও হেজাযে এর বিপরীত কি কাজ হচ্ছে, তা দেখার কোনো প্রয়োজন আছে কি?

আমি জানি, আমার এ সমস্ত দলিল কুরআন ও হাদীস থেকে সরাসরি উৎসারিত এবং এগুলোর পক্ষে ফিকাহ্‌বিদদের সমর্থন আছে কি নেই তার পরওয়া করা হয়নি, এ কথা বলে এগুলো রদ করে দেয়া যায়। তবে এটা যদি

কোনো যুক্তিসংগত ও সঠিক দলিল উপস্থাপনাকে রদ করার শরীয়ত সম্মত যথাযথ নীতি বলে বিবেচিত হয়, তাহলে এই কারণের উৎস সম্পর্কে আমাকে অবহিত করা হোক। অন্যথায় আমাকে ক্ষমা করবেন, যদি আমি আরয করি যে, সম্মানিত আলেম সমাজের ভর্ৎসনা ও তিরস্কার সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত অন্ধ তাকলীদের যে ধরনটি আমি বুঝতে সক্ষম হইনি এটা সেই অন্ধ তাকলীদ ছাড়া আর কিছুই নয়।

ওয়াস্‌সালাম
বিনীত
আবুল আ'লা

মাওলানা যাফর আহমদ সাহেবের দ্বিতীয় পত্র

শ্রদ্ধেয় মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, আপনার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব স্থায়িত্ব লাভ করুক।

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আমার চিঠির জবাবে প্রেরিত মহব্বতনামা হস্তগত হয়েছে। খুব খুশী হয়েছি এবং অন্তর দিয়ে দোয়া করছি। আমার শুভাকাংখাপ্রসূত লেখার উপর আপনি আন্তরিক ও প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়েছেন এবং সবিস্তারে জবাব লেখার কষ্ট স্বীকার করেছেন। আপনার কাছে আমার এরূপই আশা ছিল। এবার আমি এ চিঠি সম্পর্কে আরো কয়েকটি কথা আরয করছি। আশা করি এগুলোও হিতাকাংখা বিবেচনা করে আন্তরিকতার দৃষ্টিতে দেখবেন।

আপনি তাফসীর কিতাবসমূহ[১] সম্পর্কে লিখেছেন, "আমি এগুলোর কোনো গবেষণাকেই শেষ কথা মন করিনা।" ঠিক এমনিভাবে নিজের কোনো গবেষণাকেও চূড়ান্ত মনে করা উচিত নয়। বরং এরূপ ক্ষেত্রে পরিষ্কারভাবে লিখে দেয়া উচিত যে, "সাধারণ মুফাস্‌সিরদের বর্ণনায় আমি নিশ্চিন্ত হতে পারিনি। এ জন্যে চিন্তা-ভাবনা করার পর আমি যা কিছু বুঝেছি তা এই।

---

১. বয়ানুল কুরআন আপনার কাছে নেই জেনে আমি অবাক হয়েছি। সম্ভবত উর্দু ভাষায় লিখিত বলে সেটা আপনি নির্ভরযোগ্য মনে করেননি। কিন্তু দেখলে জানতে পারবেন যে, অনেক আরবী তাফসীর থেকে এর মর্যাদা অনেক উপরে। হযরত আনোয়ার শাহ্‌ কাশ্মীরীর জ্ঞানের গভীরতা বর্তমান সময়ের সকল আলেম কর্তৃক স্বীকৃত। তিনি বয়ানুল কুরআন দেখে বলেন, "বয়ানুল কুরআন দেখে উর্দু কিতাব পড়ার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে।"

অন্যান্যআলেমদের থেকেও জেনে নেবেন। আমার গবেষণাকে ফত্ওয়া মনে করবেননা, কারণ আমি ফত্ওয়া দেয়ার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত নই।"

আপনি লিখেছেন, "অধিকন্তু আমার অভিজ্ঞতায় আল ফিকহ্ আলাল মাযাহিবিল আরবাআহ্" কিতাবে মাযহাব চতুষ্টয়ের রায়সমূহ যথেষ্ট সতর্কতার সাথে উদ্ধৃত করা হয়েছে।" কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে, শুধুমাত্র কিতাব দেখলেই অন্যান্য মাযহাব সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল হওয়া যায়না। যতক্ষণ পর্যন্ত হানাফী ফিকহ্ আমরা নিজেদের আলেমের কাছে যেভাবে পড়ে থাকি সেভাবে অন্যান্য মাযহাবের ফিক্হ তাদের আলেমদের কাছে না পড়ি, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মাযহাব সম্পর্কে পুরোপুরি জানা সম্ভব নয়। কেননা, ফিক্হর কিতাবসমূহে নিজেদের মাযহাব ছাড়া অন্যান্য মাযহাবের মতামত বর্ণনাকারিগণও সাধারণত ঐসব কিতাব দেখেই বর্ণনা করে গেছেন। কিন্তু তারপরও তাদের অনেক ভুল-ত্রুটি হয়েছে।

এরূপ ভুল হওয়ার কারণ হলো, তারা যথারীতি ঐসব মাযহাবের ফিক্হ পাঠ করেননি। এমতাবস্থায় আপনি ও আমরা কেমন করে শুধু কিতাব পাঠ করেই ঐসব মাযহাবের জ্ঞান হাসিল করতে পারি? আমার অভিজ্ঞতা বলে, ইবনে কুদামাহ্ প্রণীত আলমুগনীতে অনেক মাসয়ালা ইমাম আহমদের প্রতি আরোপ করা হয়েছে। অথচ হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণের ফত্ওয়া তার বিপরীত।

তাসাওফের অলিগলি পথ আপনার অচেনা নয়, এ কথা শুনে আমি খুশী হয়েছি। আপনি ইলমে তাসাওফ এর তাসাওফ পন্থীদেরকে প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু

الاحسان ان تعبد الله كانك تراه -

হাদীসটি যে পর্যায়ের দিকে ইংগিত করে, সে পর্যায়ে উন্নীত হওয়াও জরুরী। এর প্রয়োজনীয়তাকে আপনি অস্বীকার করতে পারবেননা। যতোদিন পৃথিবীতে কুরআন ও হাদীস বর্তমান থাকবে ততোদিন দুনিয়া নিশ্চয়ই "মুহসিন" শূন্য হতে পারেনা। এসব লোকের সন্ধান করা জরুরী। জানিনা আপনার কাছে কামালিয়াতের (পূর্ণতার) মাপকাঠি কি! সুফীদের আসল কামালিয়াত তো এই ইহসানের সাথে সম্বন্ধ। এ সম্পর্কে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ (র) বলেছেন, "সুফীদের সম্বন্ধ একটি মস্তবড় নিয়ামত।" হাদীসে এটাকে চিহ্নিত করা হয়েছে এভাবে-

إِذَا رُأُوْ ذُكِرَ اللّٰهُ

"যাকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়।"

নিশ্চয়ই এমন লোক এখনো আছে। তবে তাদের কাছে যেতে হবে শূন্য মস্তিষ্কে। সমালোচনার মনোভাব নিয়ে না যাওয়া উচিত। সমালোচনার

দৃষ্টিতে দেখলে তো রসূলের কামালিয়াতও অদৃশ্য হয়ে যায়, অলী তো কোন্ ছার!

দারুল ইসলামের মুসলমান অধিবাসী এবং দারুল কুফরের মুসলমান অধিবাসীর পারস্পরিক সম্পর্ক প্রসংগে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান শায়বানী প্রণীত শারহে সিয়ারে কবীর অধ্যয়ন করা জরুরী। আল্লাহর ফযলে কিতাবটি এ প্রসংগে যথেষ্ট ও ব্যাপক। আপনি রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক যেসব জটিলতার কথা দু'দেশের অধিবাসীদের বিয়ে ও মীরাসের মধ্যে বর্ণনা করেছেন তা তো দারুল কুফরের মুসলমানদের হিজরতের মধ্যেও বিদ্যমান। তবে গোয়েন্দা হয়ে আসতে পারে এ ধারণার বশবর্তী হয়ে হিজরত কি বন্ধ করে দিতে হবে? বিশেষত পাকিস্তানের হিন্দু প্রজাদের তো হিন্দুস্তান থেকে পাকিস্তানে ফিরে আসা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়া উচিত। বরং পাকিস্তান থেকে বাদবাকি হিন্দুদেরকে বের করে দেয়া উচিত। কেননা, তাদের বিশ্বাসঘাতক হওয়ার আশংকা আছে। অধিকন্তু পাকিস্তানী ব্যবসায়ীদের পণ্যদ্রব্যসহ হিন্দুস্তানে যাওয়া বন্ধ করে দিতে হবে। এমনিভাবে সেখানকার ব্যবসায়ীদের পাকিস্তানে আসাও বন্ধ করতে হবে। কিন্তু বাস্তবে এমনটি করা ও হওয়া সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় শুধুমাত্র মীরাস ও বিয়ে-শাদীর ক্ষেত্রে এসব আশংকা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে কেন? এসব জটিলতার যে সমাধান কুরআন দিয়েছে তা হলোঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا جَاۤءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ -(الممتحنة: ١٠)

"হে মুমিনরা! মুমিন মহিলারা হিজরত করে তোমাদের কাছে এলে তাদের পরীক্ষা করে নাও।" (সূরা মুমতাহানাঃ ১০)

এটাকেই সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করতে হবে, যারা পাকিস্তান থেকে বাইরে যাতায়াত করে অথবা হিন্দুস্তানের সাথে মীরাস ও বৈবাহিক সূত্রে সম্পর্ক রাখে সরকারকে তাদের উপর কড়া নজর রাখতে হবে। কিন্তু যখন হিজরত ও ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করা সম্ভব নয়, তখন কেবল মীরাস ও বিয়ে-শাদীকে ঐসব আশংকার ভিত্তিতে নিষিদ্ধ করা যায়না। আপনি জেনে থাকবেন যে, ব্যবসার দরজা খোলা রাখার দরুন পাকিস্তানের এমন সব পণ্যদ্রব্য পাকিস্তানের বাইরে চলে যাচ্ছে, যেগুলো পাকিস্তান সরকার রফতানী করতে চায়না। মুসলমান মুহাজির ও প্রত্যাগত হিন্দুদের কেউ কেউ পাকিস্তানে এসে গুপ্তচরের কাজও করে থাকে।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ

وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا -

এ আয়াতে ঐ সময়কার হুকুম রয়েছে যখন হিজরত করা ফরয এবং ইসলাম কবুল করার জন্যে শর্ত ছিল।

انا برئ من كل مسلم بين ظهر انى المشركين

মুশরিকদের মাঝে বসবাসরত প্রতিটি মুসলিমের ব্যাপারে আমি সম্পর্কহীন হাদীসটিও সে সময়ের সাথেই সম্পর্কিত। সে সময় মদীনা সরকারের উপর মুহাজিরদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। কিন্তু আপনার সরকার তো তাদের দায়িত্ব নেয়নি বরং মুহাজিরদের আগমনে বাধা দিতে চায়। আর যারা পাকিস্তানে এসে গেছে তাদেরকেও হিন্দুস্তানে ফিরিয়ে দিতে চায়। যেসব হিন্দু এখান থেকে চলে গেছে, তাদেরকে ফিরিয়ে নিতে চায়। এমতাবস্থায় যেসব মুসলমান দারুল কুফরের অধিবাসী হয়ে আছে, তারা অসহায় অপারগ। তাদের উপর আয়াতের অধ্যাদেশ প্রয়োগ করা বড়ই বাড়াবাড়ি। এ জন্যে যতক্ষণ পর্যন্ত হিন্দুস্তানের মুসলমানদের উপর হিজরত করা ফরয না করা হবে এবং পাকিস্তান সরকার চার কোটি হিন্দুস্তানী মুসলমানের বসবাসের দায়িত্বভার নিজের কাঁধে না নেবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আয়াতের মাধ্যমে আপনি যেসব হুকুম প্রমাণ করতে চান, তা প্রমাণিত হবেনা।

যেসব মুফাস্সির এ আয়াত দ্বারা দারুল ইসলাম ও দারুল কুফরের মুসলমানদের মধ্যকার মীরাসের সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া বুঝেছেন এবং ولايت কে وراثت (উত্তরাধিকার) অর্থে প্রয়োগ করেছেন, তারা সে আয়াতকে সূরা আহযাবের এ আয়াত দ্বারা

وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ - (الاحزاب:٦)

"মানসুখ" (রহিত) বলে স্বীকার করেন। আপনিও যেহেতু এ আয়াতকে মীরাস ছিন্ন হওয়ার দলিল হিসেবে পেশ করেছেন, এ কারণে আমি বলেছিলাম যে, ঐ মুফাস্সিরদের মতো এ আয়াতের হুকুমকে সূরা আহযাবের আয়াত দ্বারা "মানসুখ"ও স্বীকার করা উচিত। ঐ বৈপরীত্য আমি সৃষ্টি করিনি। বরং এ প্রসংগে হযরত ইবনে আব্বাসের (রা) উক্তি বর্ণনা করেছি।

আপনি তো দারুল কুফরের মুসলমানদরকে দারুল ইসলামের নাগরিক অধিকার এবং দায়িত্বপূর্ণ পদ দিতে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু পাকিস্তান সরকার দারুল কুফরের কাফিরদেরকে পাকিস্তানে নাগরিক অধিকার ও গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করছে। সম্ভবত আজও অনেক ইংরেজ উচ্চপদে অধিষ্ঠিত এবং অনেক অভিজ্ঞ লোক আমেরিকা, লন্ডন ইত্যাদি রাষ্ট্র থেকে ডেকে আনা হচ্ছে।

সম্ভবত আপনিও এটাকে শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ বলবেননা। অন্যথায় পাকিস্তান উন্নতি করতে পারবেনা। তাহলে শুধুমাত্র অমুহাজির মুসলমানই অপরাধী কেন?

দারুল ইসলাম ও দারুল কুফরের মুসলমানদের মধ্যে সমতা অস্বীকার করা একটি অভিনব গবেষণা। একজন সাইয়েদ হিন্দুস্তানে রয়ে যাওয়ার কারণেই কি সাইয়েদ থাকবেনা, তাঁতী হয়ে যাবে? অভিভাবকত্ব ছিন্ন হলেই (যদি স্বীকারও করে নেয়া হয়) সমতা ছিন্ন হয় কেমন করে?

যে মহিলা হিজরত করে দারুল ইসলামে চলে আসে এবং তার স্বামী দারুল কুফরে অবস্থান করার ব্যাপারে অবিচল থাকে প্রথমত তার স্বামীর কাছ থেকে তালাক গ্রহণ করতে হবে। যদি স্বামী তালাক না দেয়, তবে বিচারকের কাছে আপিলের পর তালাক সাব্যস্ত হতে পারে। উল্লিখিত আয়াতের সাথে এ মাসয়ালার কোনো সম্পর্ক নেই। এর জন্য অন্যান্য দলিল রয়েছে, যেগুলো ফকিহগণ পেশ করেছেন। হাকীমুল উম্মত থানভী (র) প্রণীত 'আল হিলাতুন নাযিয়াহ' দ্রষ্টব্য।

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ -

আয়াতটি দলিলের জন্যে নয় বরং আপনাকে অভিযুক্ত করার জন্যে লেখা হয়েছিল। আপনি তো

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ .... الخ

আয়াত দ্বারা মুসলমানদের মধ্যকার পারস্পরিক অভিভাবকত্ব ছিন্ন করা সমর্থন করছেন। অথচ

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ -

আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, মুসলমান মুহাজির ও অমুহাজির কাফির স্ত্রীর মধ্যকার অভিভাবকত্ব এর আগেও ছিন্ন হয়নি। কারণ বিয়েও অভিভাবকত্বের অর্থের মধ্যে শামিল। রয়ে গেল এ দাবী যে, এ আয়াত নাযিল হওয়া পর্যন্ত মুশরিক স্ত্রী-পুরুষদের সাথে বিয়ে হারাম হওয়ার হুকুম আসেনি। -এ দাবী দলিল সাপেক্ষ।

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ..... وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ۔ (البقره : ٢٢١)

আয়াত এর অনেক আগে নাযিল হয়। হ্যাঁ, এ কথা বলা যায় যে, প্রথমত সূরা বাকারার দ্বারা মুসলমান পুরুষ ও কাফির স্ত্রী কিংবা বিপরীতভাবে

কাফের পুরুষ ও মুসলমান স্ত্রীর মধ্যে বিয়ে হারাম হয়ে যায়। পূর্ব বিবাহ ছিন্ন হয়নি। সূরা মুমতাহানার আয়াত দ্বারা পূর্ব বিবাহ বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং এটা আমার দাবীর সাহায্যকারী যে, মুহাজির মুসলমান পুরুষ ও অমুহাজির কাফির স্ত্রীর মধ্যে সে সময় পর্যন্ত অভিভাবকত্ব বিদ্যমান ছিল। তাহলে আপনি মুসলমান স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে অভিভাবকত্ব ছিন্ন হওয়া সমর্থন কিভাবে করেন?

আমি পুনরায় আরয করছি- কুরআন-হাদীস থেকে সরাসরি মাসায়েল উদ্ভাবন করাকে আমি নিষেধ করছিনা। কিন্তু এর জন্যে হাদীসশাস্ত্রে যে ব্যাপক ও বিপুল জ্ঞান, নাসিখ-মানসুখের পরিচয় ও অতীত ফিকাহবিদদের মতামত সম্পর্কে জানা প্রয়োজন, এ শর্তটি আমার-আপনার মধ্যে অনুপস্থিত। এ কারণে আমরা অবশ্যই বড় বড় ভুল করে বসবো। কোনো মাসয়ালায় আগেকার ফকীহদের ফয়সালা না পাওয়া গেলে সমকালীন আলেমদের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। এটাই নিরাপদ। কারো কাছ থেকে কিছু পাওয়া যেতেও পারে। অথবা অন্তত নিজের গবেষণাকে চূড়ান্ত মনে করা ভুল হবেনা। এক্ষেত্রে পরিষ্কার লিখে দিতে হবে, এ বিষয়ে আগেকার ফকিহদের বক্তব্যে কোনো কথা পাওয়া যায়নি। আমি কুরআন-হাদীস থেকে এটাই বুঝেছি। অন্য আলেমদের কাছ থেকেও অনুসন্ধান করিয়ে নিবেন এবং আমার গবেষণাকে ফত্ওয়া মনে করবেননা।

ওয়াস সালাম
যাফর আহমদ উসমানী

জবাবঃ

মুহতারামী ও মুকাররমী মাওলানা যাফর আহমদ উসমানী সাহেব,
আল্লাহ আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি করুন!
আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার চিঠিটি মর্যাদার কারণ হয়েছে। আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, আমি কখনো আমার কোনো গবেষণাকে অপরের জন্যে তো নয়ই স্বয়ং নিজের জন্যেও চূড়ান্ত মনে করিনা। আমার প্রত্যেকটি মতই পুনর্বিবেচনার যোগ্য। অধিক অধ্যয়ন ও গবেষণার ফলে নিজের কাছে যখন আমার কোনো ভুল ধরা পড়ে, তখন এর সংশোধন করে নিই এবং তা প্রকাশও করে দিই। কখনো কারো সমালোচনায় তা চরম বিরোধিতা ও শত্রুতা-প্রসূতই হোক না কেন, আমার কোনো ত্রুটি দলিল প্রমাণসহ আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেলে তা থেকে প্রত্যাবর্তন করতে আমার মোটেই দ্বিধা থাকেনা। এ কথা আমি বার বার ব্যক্ত করেছি যে, ফিক্হ বিষয়ক মাসায়েলে আমার

গবেষণার ভিত্তিতে যা কিছুই আমি লিখেছি তা কোনো ফত্ওয়া নয়। বরং একটি রায়ের প্রকাশ, যার উপর পন্ডিত ব্যক্তিরা চিন্তাভাবনা করবেন। যদি আমার গবেষণায় নিশ্চিন্ত হন, তাহলে তা গ্রহণ করবেন। অন্যথায় যুক্তি সহকারে রদ করবেন। তবে এ কথা পরিষ্কার যে, প্রত্যেকটি তাত্ত্বিক আলোচনা ও প্রত্যেকটি রায় প্রকাশ করার সাথে সাথে এই ধরনের ঘোষণা দেয়ার ব্যবস্থা করা কঠিন।

মাওলানা থানভী (র) প্রণীত বয়ানুল কুরআন থেকে আমি কখনো কখনো উপকৃত হয়েছি। পাঠানকোটে থাকাকালে কিতাবটি আমার লাইব্রেরীতে ছিল। সেখানে আমার বিপুল পরিমাণ কিতাব থেকে গিয়েছিল। তার মধ্য থেকে যেগুলো নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এটি তার অন্তর্ভুক্ত। এখন ধীরে ধীরে সে ক্ষতি পূরণ করা হচ্ছে এবং নতুন করে কিতাবপত্র সংগ্রহ করার প্রচেষ্টা চালু আছে। ইল্‌মের ব্যাপারে আমার কোনো গোঁড়ামি নেই। পূর্ববর্তীদের সাথে সাথে সমকালীনদের থেকেও ফায়দা গ্রহণ করছি। আরবীর মত উর্দু বইয়ে জ্ঞান থাকলে তা থেকেও উপকৃত হচ্ছি।

আমি আপনার এ মতের সাথে আংশিকভাবে ঐক্যমত্য পোষণ করছি যে, অন্যান্য মাযহাবের আলেমদের কাছে শিক্ষা গ্রহণ ব্যতিরেকে ঐ মাযহাব সম্পর্কে পূর্ণভাবে ওয়াকিফহাল হওয়া যায়না। তবে এই অংশের সাথে একমত নই যে, এমনি ধরনের পূর্ণ জ্ঞাত হওয়া ছাড়া মূলত আলোচনা ও গবেষণাই বন্ধ হয়ে যাওয়া উচিত। যদি এ কথা সঠিক হয়, তাহলে আমাদের দীনী মাদ্রাসাগুলোতে হাদীস ও ফিকাহ্ শিক্ষাদানকালে হানাফী মাযহাবকে অন্যান্য মাযহাবের উপর প্রাধান্য দেয়ার জন্য যেসব আলোচনা করা হয়, তার কি কোনো মূল্য থাকে? অধিকন্তু ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মসমূহ কিংবা ইসলামী আইন ও অন্যান্য আইনসমূহের মুকাবিলায় যা কিছু আমরা লিখতে বা বলতে থাকি, সেগুলোও বৈধ হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে? কেননা, আমরা তো তাদের বই-পুস্তকগুলো তাদের উস্তাদের কাছে পাঠ্যক্রম হিসেবে পড়িনি। আমার ধারণা মতে এটাই সঠিক যে, কিতাবের মাধ্যমে যতোটুকুই গবেষণা করা সম্ভব তা করা উচিত। সংশোধনের জন্যে সমালোচনার উপর নির্ভর করতে হবে। তাছাড়া পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আইন-কানুনের ব্যাপারেও তো আমরা তাদের বই-পুস্তক পাঠ করেই কথা বলে থাকি। প্রতিটি বিষয় তো পাঠ্যক্রম হিসেবে পড়ি না। আমাদের লেখা সর্বস্তরের শিক্ষিত লোকের কাছে গিয়ে পৌছে। যে কোনো ব্যাপারেই কোনো ত্রুটি দেখা দিলে কোনো না কোনো সচেতন লোক তা ধরিয়ে দেন। এমনিভাবে সমগ্র তাত্ত্বিক বিষয়ে তথ্যগত ত্রুটিমুক্ত ও ভুল সংশোধিত হতে থাকে এবং জ্ঞানের উন্নতির সিলসিলা চালু থাকে। কেবলমাত্র ফিক্হ শাস্ত্র এমন ছোঁয়াচে কেন হবে যে, এর আলোচনা ও গবেষণার কাজ শুধুমাত্র এ

আশংকায় বন্ধ রাখা হবে, যাতে কোনো মাযহাবের ফিকাহর বিবরণ দিতে গিয়ে আমাদের ক্রটি না হয়ে যায়? মুতাক্কাদিমীন তথা পূর্ববর্তী আলেমগণের মধ্যে যদি এমনি ধরনের স্পর্শকাতর সাবধানতা থাকতো, তাহলে আমাদের কাছে তাদের এই অমূল্য গবেষণাসমূহ কিভাবে পৌঁছতো? অথচ তাদের এই গবেষণার মধ্যে অগণিত ফায়দার সাথে সাথে আপনার বর্ণনা মোতাবেক ক্রটিও আছে। আলোচনা ও গবেষণায় সতর্কতা অবলম্বন জরুরী। কিন্তু এতটা কড়া সতর্কতা নয় যাতে করে মূলত আলোচনা–গবেষণাই বন্ধ করে দিতে হয় অথবা এমন কড়া শর্ত আরোপ করা নয়, যা পূর্ণ করা অসম্ভব।

ইহ্সানের গুরুত্ব এবং তা লাভ করার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার কি উপায় আছে? আমার মতে এটাই তো আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। নিঃসন্দেহে আল্লাহর এ যমীন আগেও "মুহসিন"শূন্য ছিলনা এবং এখনো নেই। এসব লোক যেখানেই আছেন তাঁরা আল্লাহর রহমতের একটি নিদর্শন, তাঁদের সংস্পর্শ, সংসর্গ, সহযোগ ও সংগ আমাদের জন্যে সৌভাগ্যের প্রসূতি স্বরূপ। তবে আলোচনা দীর্ঘ হওয়ার ভয়ে আমি শুধু এতোটুকু আরয করবো যে, সাধারণত যেখানে এসব লোকদের বেশী পাওয়ার ধারণা করা হয়, সেখানে তাদেরকে খুব কম পাওয়া যায়। যেসব এলাকাকে 'তরীকতপন্থীগণ' এতোই হেয় প্রতিপন্ন করে থাকেন যে, সেখানেই ইহসানের আভা মাত্র দেখার আশা রাখেননা, সেখানেই ইহসান বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। তরীকতপন্থীদের মধ্যে যারা আত্মশুদ্ধি ও অন্যদের সংশোধনে সমধিক খ্যাতি লাভ করেছেন তাদের অনেকের সাথেই কোনো না কোনো উপায়ে আমাকে মুখোমুখি হতে হয়েছে। আমি তাঁদের মধ্যে এমন সব দুর্বলতা দেখেছি যা একজন সাধারণ লোকের মধ্যে থাকাও বাঞ্ছনীয় নয়, শুদ্ধিতে পারদর্শী লোকের জন্য তো দূরের কথা। অন্যদিকে অচেনা–অজানা লোক, যারা দুনিয়ার কাজ–কারবারে ব্যস্ত, আধ্যাত্মিক গুরুদের কাছে যারা হয়তোবা কোনো মর্যাদাই পায়না, তাদের মধ্যে এমন সত্যনিষ্ঠ লোক পাওয়া যায়, যাদের হৃদয় আল্লাহর ভয়ে সতত কম্পমান। তাঁরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সকল প্রকার লাভ বিসর্জন দিয়ে ক্ষতিকে গ্রহণ করে নেন। সত্য গ্রহণে ও অধিকার প্রদানে তাঁদেরকে স্বজনপ্রীতি ও স্বার্থ বিরত রাখতে পারেনা।

শারহে সিয়ারে কাবীর নিঃসন্দেহে ইসলামের আন্তর্জাতিক আইন–কানুনের উপর একটি সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ। আমি কিতাবটি ভালভাবে পড়েছি। এ ছাড়া মাবসূত ও অন্যান্য কিতাবের আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কীয় অধ্যায়গুলোও পাঠ করেছি। এসব কিতাবে দারুল কুফর ও দারুল ইসলামের সম্পর্কের উপর বিশদ আলোচনা রয়েছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, দারুল কুফরের মুসলমান অধিবাসী ও দারুল ইসলামের সম্পর্কের দিকটা এসব কিতাবে খুবই অপর্যাপ্ত। আমি পুনরায় আপনার কাছে আরয করবো, আগেকার

কিতাবসমূহে এ সম্পর্কে যেসব আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো আপনি আরেকবার পর্যালোচনা করে দেখুন এবং বর্তমান অবস্থার সাথে সেগুলোকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার চেষ্টা করুন। আমি আশা করি, এরপর আপনি নিজেই এগুলোকে অতৃপ্তিকর বলবেন। এর প্রকৃত কারণ হলো ফিক্হী ইজতিহাদের জন্যে আমাদের এখানে যে যুগটি ছিল সর্বোত্তম, সে যুগে সমস্ত মুসলমান দারুল ইসলামেরই অধিবাসী ছিল। কোনো বিরাট সংখ্যক মুসলমান অধিবাসীর দারুল কুফরের প্রজা হওয়ার ঘটনা খুবই বিরল ছিল। পরবর্তী সময়ে যখন বড় বড় মুসলিম রাষ্ট্র কাফিরদের করতলগত হয়, তখন ইজতিহাদের দ্বার প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। এ জন্যে আমাদের বিধানসমূহের এ অংশ ব্যাপক আলোচনার খুব বেশী মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে। তাছাড়া মুসলমানগণ বর্তমানের ন্যায় জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মুখোমুখি এর আগে কখনো হয়নি। এ রাষ্ট্রে সমগ্র অধিবাসীকে 'এক জাতি' ধরে নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ কাফিররা মুসলমানদের উপর শুধু নিজেদের তাহজীব ও তামাদ্দুন ও জীবন যাপনের বিধানসমূহই চাপিয়ে দেয়নি বরং তাদের নিজেদের ধ্যান–ধারণা, দর্শন ও অনুভূতিসমূহ পর্যন্ত চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে। এরূপ অমুসলিম জাতীয় রাষ্ট্রের ব্যাপারটি তো সেই দারুল কুফর থেকেও আরো জটিল যেখানে মুসলমানদেরকে 'যিম্মী জাতি', এর মর্যাদা দেয়া হয়েছে। আপনি যেভাবে ব্যাপারটি দেখছেন তার চেয়ে আরো গভীরভাবে প্রসংগটির উপর নজর দেয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

এ ব্যাপারে প্রকৃত অনুসন্ধানের বস্তু এটা নয় যে, গুপ্তচরবৃত্তির আশংকা কোথায় আছে আর সেগুলো কিভাবে বন্ধ করা যায়। বরং যে ولايت অভিভাবকত্বকে দারুল ইসলাম সরকার ও মুসলমান অধিবাসী এবং দারুল কুফরের অধিবাসীদের পারস্পরিক সম্পর্কসমূহ থেকে বাদ দেয়া হয়েছে তা কোন্ কোন্ অর্থে গৃহীত হয়েছে তা রদ করার বাস্তব প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল কি? আমি যে অর্থ ও সীমারেখা বর্ণনা করছি যদি তাতে আপনি আমার সাথে একমত না হন, তবে আপনি নিজেই বলুন, আপনি এর তাৎপর্য কি মনে করেন?

আপনার এ অভিযোগ অবশ্যই মূল্যবান যে, যখন দারুল ইসলাম নিজের দরজা হিজরতের জন্যে বন্ধ করে দেয়, তখন হিজরত ফরয হওয়ার আমলে দেয়া হুকুমসমূহ বর্তমানে কিভাবে প্রযোজ্য হবে? আমার পক্ষ থেকে এর জবাব হলো, এসব হুকুম তো নিঃসন্দেহে হিজরত ফরয করার আমলে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু বেলায়েত রহিত হওয়া হিজরত ফরয হওয়ার উপরে নির্ভরশীল নয়। বরং কেবলমাত্র দুটি দেশের পৃথক সত্তাই এর ভিত্তি। যদি আপনি আমার এ কথা স্বীকার না করেন, তাহলে কি আপনি বলতে চান, যখন দারুল ইসলামের সরকার সকল কুফুরী রাষ্ট্রের মুসলমান অধিবাসীদেরকে হিজরতের

দাওয়াত দিতে সক্ষম না হয় তবে সে অবস্থায় সে তাদের সমস্ত মুসলমান অধিবাসীদের অভিভাবক হবে? এ অবস্থায় দারুল ইসলামের মুসলমানরাও কি দারুল কুফরের মুসলমানদের অভিভাবক হবে? অথচ ব্যাপারটি এর উল্টো হওয়া উচিত। যে দারুল ইসলাম এতোই দুর্বল যে, নিজের নিকটবর্তী দারুল কুফরের মুসলিম অধিবাসীদেরকেও আশ্রয় দিতে সক্ষম নয়, সে যে তার 'বেলায়েতের' হক আদায় করতে অক্ষম তা সহজেই অনুমেয়। আসল ব্যাপার হচ্ছে, বেলায়েত রহিত হওয়ার মধ্যে যে সত্য ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে হিজরত ওয়াযিব হওয়া না হওয়ার সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। প্রকৃতপক্ষে এর বুনিয়াদ এই যে, একটি অমুসলিম রাষ্ট্রের অধীনস্থ মুসলমানের দায়িত্বভার মুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষে গ্রহণ করা কার্যত অসম্ভব। অধিকন্তু যদি মুসলিম সরকার তাদের অভিভাবক হওয়ার দাবী করে এবং অভিভাবকত্বের অধিকার আদায় করার জন্যে প্রতিবেশী অমুসলমান সরকারের সার্বভৌমত্বের উপর হস্তক্ষেপ করে অথবা অন্তত আদর্শিক দিক দিয়ে নিজের জন্যে এই হস্তক্ষেপের অধিকার সংরক্ষিত রাখে, তাহলে এ তৎপরতা তাকে ঐ সমস্ত অমুসলমান সরকারের সাথে একটি স্থায়ী সংঘাতে লিপ্ত করে দেবে, যাদের অধীনে মুসলমানরা বসবাস করছে।

আপনি সম্ভবত মনে করছেন যে, অভিভাবকত্ব রহিতকরণের হুকুম শুধুমাত্র দারুল কুফরে অবস্থানরত মুসলমানদেরকে হিজরত না করার শাস্তি স্বরূপ করা হয়েছে। এ কারণে আপনি অভিযোগ করেছেন, যখন আমরা তাদের জন্যে হিজরতের রাস্তা খুলতে পারছিনা, তখন তাদেরকে এ শাস্তি কেন দেয়া হবে? কিন্তু যে কথা আমি উপরে পেশ করেছি তার উপর যদি আপনি চিন্তা-ভাবনা করেন, তবে আমি আশা করি আপনার এ অভিযোগ দূর হয়ে যাবে। হিজরত ওয়াযিব হওয়ার পর হিজরত না করার শাস্তি আলাদা। কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় তা বর্ণনা করা হয়েছে। এসব শাস্তিকে (যা কেবলমাত্র হিজরত ওয়াযিব হওয়ার সাথে জড়িত) আন্তর্জাতিক আইনসমূহের স্বতন্ত্র ধারার সাথে (যার ভিত্তি শুধুমাত্র দেশের বিভিন্নতার উপর, হিজরত করা সম্ভব ও ওয়াযিব হোক বা না হোক) মিশিয়ে ফেললে বড় ধরনের ভুল বুঝাবুঝি হয়ে যেতে পারে।

বিদেশি বিশেষজ্ঞদের সেবা গ্রহণ এক জিনিস আর কাউকে নাগরিক অধিকার প্রদান করে এমন সব গোপন রহস্য ও দায়িত্বে অংশীদার বানানো যেগুলোতে শুধুমাত্র একজন নাগরিকই শরীক হতে পারে- সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বাইরের বিশেষজ্ঞদের নিকট থেকে ফায়দা হাসিল করতে শরীয়ত আমাদের বাধা দেয়না। তবে যে ব্যক্তি একটি অমুসলিম রাষ্ট্রের অধিবাসী- যার সমস্ত স্বার্থ দারুল কুফরের সাথে সংযুক্ত- তাকে আমাদের

এখানকার রাষ্ট্রদূত, মন্ত্রী, সেক্রেটারী ইত্যাদি বানানো অন্তত আমার জানা মতে তো কুরআনের দেয়া হিদায়াতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

বেলায়েত রহিতকরণের দ্বারা সাধারণভাবে সমতাহীনতার দাবি কি আমি কখনো করেছি, যার ফলে দারুল কুফরের কোনো সাইয়েদের আসাইয়েদ হয়ে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়! আমার দাবী তো এটাই যে, বিয়ে-শাদীতে যে সমতার উপর গুরুত্ব দেয়া হয় তা শুধু এমন সব লোকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ যাদের মধ্যে অভিভাবকত্ব, লেনদেন ও পারস্পরিক সম্পর্ক আছে। যেখানে মূলত অভিভাবকত্ব ও পারস্পরিক সম্পর্ক নেই, সেখানে বংশ ও অন্যান্য কারণে যদিও সমতা উপস্থিত থাকে তবুও তা বিয়ে-শাদীর জন্যে কোন উপযোগী ভিত্তি নয়। কারণ বৈবাহিক বন্ধনের দরুন স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে যে আইনানুগ অধিকার আরোপিত হয়, তার ভিত্তি সমতার উপর নয় বরং বেলায়েত তথা অভিভাবকত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি বেলায়েতই না থাকে, তাহলে তাদের অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সমতা কোনো সাহায্যই করতে পারেনা। দারুল কুফরের একজন সাইয়েদ দারুল ইসলামের একজন সাইয়েদা বংশ মর্যাদার দিক থেকে সমান। কিন্তু এ সমতা কি মহিলাটির মোহরানা, খোরপোশ ও অন্যান্য বৈবাহিক অধিকার প্রদানে সাহায্য করতে পারে?

এতদ্সত্ত্বেও আমি আগেও আরয করেছি, এখনো বলছি, আমার বক্তব্যের উদ্দেশ্য এটা নয় যে, দারুল ইসলাম ও দারুল কুফরের মুসলমানদের মধ্যে বিয়ে শাদী হওয়া হারাম। অথবা তাদের পূর্বেকার বিয়ে দু'দেশের ভিন্নতার কারণে নিজে নিজেই ভেঙে গেছে। কিংবা অদূর ভবিষ্যতে তাদের মধ্যে আদৌ বিয়ে অনুষ্ঠিত হতে পারবেনা। বরং আমি যা কিছু বলতে চেয়েছি তাহলো, স্বামী-স্ত্রী দুই ভিন্ন দেশের অধিবাসী হয়ে গেছে, তাদের পক্ষ থেকে যদি আমাদের আদালতে বিবাহ বিচ্ছেদের দরখাস্ত আসে, তবে তা বিবেচনা করা উচিত এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তোলা থেকে দূরে অবস্থান করাই বাঞ্ছনীয়।

বিনীত

আবুল আ'লা

[তরজমানুল কুরআন, যিলকদ-যিলহজ্জ ১৩৭০, সেপ্টেম্বর ১৯৫১]

বালেগা মেয়ের জন্যে নিজের বিয়ে নিজে করা কি বৈধ?

প্রশ্নঃ "হানাফী ও আহ্‌লে হাদীস আলেমদের মধ্যে অলী ছাড়া বালেগা মেয়ের বিবাহের ব্যাপারে সাধারণভাবে মতপার্থক্য আছে। হানাফীগণের মতে বালেগা মেয়ে অলীর অনুমতি ছাড়াই নিজের বিবাহ নিজে করতে পারে। এমনকি অলীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজের যেখানে ইচ্ছা সেখানে বিয়ে করতে পারবে। এতে অলীদের আপত্তি করার কোন অধিকার নেই। অন্যদিকে আহ্‌লে হাদীসের মতে এ ধরনের বিবাহ বাতিল গণ্য হবে। তারা বলেন, অলীর অনুমতি ছাড়া বিবাহ অনুষ্ঠিত হলে বিনা দ্বিধায় দ্বিতীয় বিবাহ করা যায়। উভয় দলের দলিল প্রমাণ যা আমার সামনে রয়েছে, সংক্ষিপ্তাকারে পেশ করছি। আমার আরয, এ ব্যাপারে আপনার গবেষণাপ্রসূত মতামত বিস্তারিত বর্ণনা করবেন।"

জবাবঃ প্রশ্নকারী প্রশ্নের সাথে উভয় দলের দলিলসমূহ সবিস্তারে উদ্ধৃত করেছেন। সুতরাং আমি প্রথমত সে সব দলিল এখানে তুলে ধরছিঃ

১

নিম্নলিখিত আয়াত ও হাদীসগুলো হানাফীদের দলিলঃ

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّ عَشْرًا فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِىْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ـ (البقرة : ٢٣٤)

"তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যাবে তাদের স্ত্রীরা চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষায় থাকবে। তারপর যখন তারা নিজেদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করবে, তখন যথারীতি নিজেদের জন্য যা করবে তাতে তোমাদের কোনো দায়–দায়িত্ব নেই।" (বাকারাঃ ২৩৪)

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ...... (البقره : ٢٣٠)

"অতপর যদি (তৃতীয় বার স্বামী তাকে) তালাক দিয়ে দেয় তবে এ স্ত্রী অন্য কোন স্বামী গ্রহণ করা ছাড়া তার জন্য হালাল হবেনা।" (বাকারাঃ ২৩০)

فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ـ (البقره : ٢٣٢)

অতপর তোমরা ঐসব মহিলাকে নিজেদের ইচ্ছামত স্বামী গ্রহণ করতে বাধা দিওনা যখন তারা প্রচলিত রীতিতে পরস্পর সম্মত হয়ে যায়।" (বাকারাঃ ২৩২)

عن نافع ابن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستامر واذنها سكوتها وفى رواية الثيب احق بنفسها من وليها - (نصب الرايه ج٣ ص١٨٢)

নাফে ইবনে জুবায়র হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ বিধবা নিজের ব্যাপারে নিজেই অলীর চাইতে অনেক বেশী ফায়সালার অধিকার রাখে। কুমারীদের অনুমতি নিতে হবে। তাদের মৌনতাই অনুমতির লক্ষণ। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে ছাইয়েবাহ তথা পূর্ব বিবাহিতা নারী নিজের বিবাহের ব্যাপারে অলীর চেয়ে বেশী অধিকার রাখে।" (নসবুর রায়াহ ৩য় খন্ডঃ ১৮২ পৃষ্ঠা)

عن ابى سلمة ابن عبد الرحمن قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت ان ابى انكحنى رجلا وانا كارهة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابيها لانكاح لك اذهبى فانكحى من شئت - (ايضًا)

"আবু সালমাহ ইবনে আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত একজন মহিলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, আমার পিতা এমন এক ব্যক্তির সাথে আমার বিবাহ দিয়েছেন, যাকে আমি পছন্দ করিনা। তিনি তার পিতাকে বললেনঃ বিবাহ দেয়ার ইখতিয়ার তোমার নেই। মেয়েটিকে বললেনঃ যাও, যাকে ইচ্ছা বিয়ে করো।" (উক্তগ্রন্থ)

روى من طريق مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة انها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر ابن زبير و عبد الرحمن غائب بالشام - فلما قدم عبد الرحمن قال و مثلى يفتات عليه؟ فكلمت عائشة

المنذر ابن زبير فقال ان ذالك بيد عبد الرحمٰن فقال عبد الرحمن ما كنت لِأَرُدَّ امرا قضيته فاستقرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذالك طلاق - (ايضا)

"মালিক আবদুর রহমান বিন কাসিম থেকে, তিনি নিজের পিতা থেকে আর তিনি হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আবদুর রহমানের কন্যা হাফসার বিবাহ মানযার ইবনে যুবায়রের সাথে দিয়ে দেন। বিবাহের সময় আবদুর রহমান সিরিয়ায় ছিলেন। তিনি ফিরে এসে বললেনঃ আমার মতকে কি উপেক্ষা করা যাবে? তখন হযরত আয়েশা (রা) মানযার ইবনে যুবায়েরের সাথে কথা বললেন। তিনি বললেনঃ আবদুর রহমানের হাতেই চূড়ান্ত ফয়সালার ভার ন্যস্ত। এ কথায় আবদুর রহমান হযরত আয়েশাকে (রা) বললেনঃ যে ব্যাপারে আপনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তাকে আমি কিছুতেই রদ করতে পারি না। সুতরাং হাফসাহ্ মানযাবের কাছেই থেকে যায় এবং এটা তালাক ছিলনা। (উক্ত গ্রন্থ)

اخرجه ابو داؤد والنسائى .... عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للولى مع الثيب امرٌ - (ايضا)

"আবু দাউদ ও নাসায়ী হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ বিবাহিত নারীর উপর অলীর কোনো এখতিয়ার নেই।" (উক্ত গ্রন্থ)

اخرجه النسائى واحمد..... عن عائشة قالت جاءت فتاة الى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله ان ابى زوّجنى ابن اخيه ليرفع بى من خسيسته قال فجعل الامر اليها فقالت انى قد اجزت ما صنع ابى ولكن اردت ان تعلم النساء انّ ليس الى الاباء من الامر شيئٌ -

"নাসায়ী ও আহমদ আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, একটি মেয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে আরয করলঃ ইয়া রসূলুল্লাহ! আমার পিতা তার ভ্রাতুষ্পুত্রের সাথে আমাকে শুধু এই উদ্দেশ্যে বিয়ে দেন যে, আমার সাহায্যে তিনি নিজেকে লাঞ্ছনা মুক্ত করবেন। তিনি বিয়ে অটুট রাখা বা ভেঙে দেয়ার ক্ষমতা মেয়েটিকে দিয়ে দিলেন। মেয়েটি বললঃ আমার পিতা যা করেছেন তাকে আমি বৈধ গণ্য করলাম। আমার ইচ্ছা শুধু এতটুকুই ছিলো যে, এ ক্ষেত্রে বাপের কোন ইখতিয়ার নেই সমস্ত মেয়েরা যেন তা জেনে রাখে।"

২

আহলে হাদীসের আলিমগণ নিজেদের মতের সমর্থনে নিম্নবর্ণিত হাদীসগুলো পেশ করে থাকেনঃ

عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل.. فان اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى لها.

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে মহিলা নিজের অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে, তার বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে... সুতরাং যদি বিরোধ হয়, তাহলে যে মেয়ের অভিভাবক নেই সরকারই তার অভিভাবক। (বুলুগুল মারাম)

عن ابو موسى عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولى - (ايضًا)

"আবু মুসা নিজের পিতা থেকে বর্ণনা করছেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "অলী ছাড়া বিবাহ হয়না।" (উক্ত গ্রন্থ)

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تُزَوِّجُ المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها

(سنن كبرىٰ للبيهقى)

"হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ একজন মহিলা (অলী হয়ে) অন্য মহিলাকে বিবাহ দিতে

পারেনা এবং কোনো মেয়ে নিজেই নিজের বিবাহের কাজ সম্পন্ন করতে পারেনা।" (সুনানে কোবরা লিলবায়হাকী)

قال عمر ابن الخطاب ايما امرأة لم ينكحها الولى او الولاة فنكاحها باطل -(ايضًا)

"হযরত উমর (রা) বলেছেনঃ যে মেয়ের বিবাহ অলী বা সরকার কর্তৃক সম্পন্ন হয়নি তার বিবাহ বাতিল।" (উক্ত গ্রন্থ)

عن عكرمة ابن خالد قال جعلت امرأة ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فانكحها فبلغ ذالك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها.

"ইকরামা ইবনে খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত। একজন পূর্ব বিবাহিত নারী নিজের (দ্বিতীয় বিয়ের) ব্যাপারটি এমন একজন লোকের উপর ন্যস্ত করেছিল যে তার অলী ছিলনা। অতপর লোকটি মেয়েটির বিয়ে দিয়ে দেয়। হযরত উমর (রা) এ কথা জানতে পেয়ে স্বামী ও বিবাহদানকারীকে দোররা মারার শাস্তি প্রদান করেন এবং বিয়ে বাতিল করে দেন। (উক্ত গ্রন্থ)

عن علي قال ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل لانكاح الا باذن ولي -(ايضًا)

"হযরত আলী (রা) বলেছেনঃ যে মেয়ে নিজের অলীর অনুমতি ছাড়া বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তার বিবাহ বাতিল। অলীর অনুমতি ব্যতীত কোনো বিবাহ নেই।" (উক্ত গ্রন্থ)

عن الشعبى ان عمر وعليًا رضى الله عنهما وشُريحًا ومسروقا رحمهما الله قالوا لانكاح الا بولي - (ايضًا)

ইমাম শাবী থেকে বর্ণিত। হযরত উমর (রা) ও হযরত আলী (রা) এবং শুরাইহ্ মাসরূক (রা) বলেছেন, অলী ছাড়া কোনো বিবাহ নেই। (উক্ত গ্রন্থ)

উপরোল্লিখিত দলিলসমূহের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে এটা সহজেই অনুমিত হয় যে, উভয় পক্ষেরই বক্তব্য যথেষ্ট জোরালো। এ কথা বলারও অবকাশ নেই যে উভয় পক্ষের মধ্যে কোনো এক পক্ষের অভিমত সম্পূর্ণ বাতিল। এবার প্রশ্ন হতে পারে, রসূল বাস্তবিকই কি দুটি স্ববিরোধী হুকুম দিয়েছিলেন? নাকি একটি

হুকুম অন্য একটি হুকুমকে রহিত করে দেন? আর নাকি উভয় হুকুম একত্র করে রসূলের আসল উদ্দেশ্য কি ছিলো তা জানা যেতে পারে?

প্রথম কথাটি (অর্থাৎ রসূলের সবিরোধী হুকুম দেয়া) তো স্পষ্টত বাতিল। কারণ শরীয়তের সমগ্র কাঠামো শরীয়ত প্রণেতার পূর্ণ জ্ঞানের প্রমাণ আর তাঁর থেকে স্ববিরোধী হুকুম জারী হওয়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয় কথাটিও বাতিল। কেননা মানসুখ (রহিত) হওয়ার কোনো দলিল বা পূর্বাভাস নেই। এবার শুধু তৃতীয় অবস্থাটিই থাকে। এ অবস্থাটির উপর আমাদের চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। আমি উভয় পক্ষের দলিলসমূহ একত্র করার পর শরীয়ত প্রণেতার যে উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছি তা হলোঃ

১. বিবাহের ব্যাপারে আসল দু'পক্ষ হলো বর ও কণে। বর আর কণের অভিভাবকরা নয়। এ জন্যে ঈজাব ও কবুল বর ও কণের মধ্যেই হয় থাকে।

২. বালেগা মেয়ের (কুমারী বা অকুমারী) বিবাহ তার সম্মতি বা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত হতে পারেনা, বিবাহদানকারী বাপই হোক না কেন। যে বিবাহে মেয়ের সম্মতি নেই, সেখানে মূলত ঈজাবই অনুপস্থিত। তাহলে এরূপ বিবাহ কিভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে?

৩. কিন্তু শরীয়ত প্রণেতা এটাও বৈধ করেননি যে, মেয়েরা নিজেদের বিবাহের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী হয়ে যাবে। নিজেদের অভিভাবকের সম্মতির বিরুদ্ধে তারা যে ধরনের পুরুষকে ইচ্ছা বিবাহ করে স্বামীর মর্যাদায় নিজের খান্দানে আশ্রয় দেবে। এ জন্যে মেয়ের বিবাহের ব্যাপারে শরীয়ত প্রণেতা তার নিজস্ব সম্মতির সাথে সাথে অভিভাবকের সম্মতিকেও জরুরী বলে সাব্যস্ত করেছেন। অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া যেখানে ইচ্ছা সেখানে নিজেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া মেয়েদের জন্য যেমন ঠিক নয়, তেমনি মেয়ের সম্মতি ছাড়া যেখানে ইচ্ছা সেখানে তাকে বিবাহ দিয়ে দেয়াও অভিভাবকের উচিত নয়।

৪. যদি কোনো অভিভাবক কোনো মেয়ের বিবাহ নিজেই দিয়ে দেয়, তবে এ বিবাহ মেয়ের সম্মতির উপর ঝুলন্ত থাকবে। যদি মেয়েটি তা কবুল করে তবে বিবাহ বৈধ হবে আর না কবুল করলে ব্যাপারটি আদালতের কাঠগড়ায় আসা উচিত। আদালত অনুসন্ধান করে দেখবে এ বিবাহে মেয়ের সম্মতি আছে কিনা? যদি মেয়ের সম্মতি নেই প্রমাণিত হয় তাহলে আদালত তা বাতিল ঘোষণা করবে।

৫. যদি কোনো মেয়ে অলীর অনুমতি ছাড়া বিবাহ নিজেই সম্পন্ন করে তার বিবাহ অলীর অনুমতির উপর ঝুলানো অবস্থায় থাকবে। অলী মঞ্জুর করলে বিবাহ অপরিবর্তিত থাকবে। আর মঞ্জুর না করলে এ ব্যাপারটিও আদালতে আসা উচিত। আদালত অনুসন্ধান করে দেখবে অলীর অস্বীকার ও অভিযোগ করার

বুনিয়াদ কি। যদি বাস্তবিকই যুক্তিসঙ্গত কারণে ঐ পুরুষ লোকটির সাথে নিজের ঘরের মেয়ের জুড়ি অপছন্দনীয় হয় তাহলে এ বিবাহের বিচ্ছেদ ঘটাতে হবে। আর যদি প্রমাণিত হয় যে, মেয়ের বিবাহের ব্যাপারে অলী জ্ঞাতসারেই অনীহা করেছে অথবা অবৈধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে টালবাহানা করতে থেকেছে এবং এ অবস্থায় মেয়েটি অনন্যোপায় হয়ে নিজের বিবাহ নিজেই সম্পন্ন করে নিয়েছে, তাহলে এমন অলীকে অসৎ ক্ষমতা সম্পন্ন ঘোষণা করা হবে এবং আদালতের পক্ষ থেকে বিবাহ বৈধ হওয়ার সনদপত্র দেয়া হবে।

هٰذا ما عندى والله اعلم بالصواب-

এটাই আমার অভিমত। প্রকৃত সত্য আল্লাহ ভালো জানেন।

বিয়েতে কুফু

প্রশ্নঃ তর্জমানুল কুরআনের যিলকদ-যিলহজ্জ ১৩৭০ সংখ্যায় মাওলানা যাফর আহমদ উসমানী সাহেবের জবাবে একস্থানে আপনি এমন অস্পষ্ট বক্তব্য রেখেছেন যা বরদাশ্ত করার উপযোগী নয়। সম্মানিত মাওলানা আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন একজন সাইয়েদ হিন্দুস্তানে থেকে যাওয়ার কারণে কি সাইয়েদ থাকবেনা, নাকি তাঁতী হয়ে যাবে? আমি আশ্চর্য হয়ে যাই যখন দেখি যে, আপনিও এই অনৈসলামী তারতম্যকে নিম্নস্বরে চাপাকণ্ঠে এ বলে স্বীকার করে নিলেন যে "দারুল কুফরের একজন সাইয়েদ দারুল ইসলামের একজন সাইয়েদ বংশ মর্যাদার দিক থেকে সমান ঠিকই।" আপনার শব্দাবলী অস্পষ্ট। আপনিও কি কুফুর মাসয়ালাটিকে ইসলামে জায়েয মনে করেন? যদি জবাব হ্যাঁ সূচক হয় তবে কুরআন ও হাদীসের দলিল পেশ করে আমাকে নিশ্চিন্ত করবেন। বুঝতে পারছিনা দুনিয়ার কাজকর্ম ও পেশা মানবতার উঁচু-নীচু মর্যাদা নির্ণয়ে কেমন করে প্রবেশ করলো। সমগ্র মানব জাতি আদমের (আ) সন্তান। হযরত দাউদ (আ) যদি লোহা-লক্কড়ের কাজ করে থাকেন তাহলে কি তিনি কামার গণ্য হবেন?

জবাবঃ আপনি কুফুর মাসয়ালা সম্পর্কে যে অভিযোগ করেছেন তার সাথে আমি একমত নই। ব্যাখ্যার পদ্ধতির মধ্যে মত পার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু স্বয়ং কুফুর মাসয়ালাটি তো বুদ্ধি ও বর্ণনা উভয় দিক দিয়েই প্রমাণিত। বিস্তারিত আলোচনা থেকে বিরত থেকে শুধু এতটুকুই বলতে চাই বিবাহে কুফু নির্ভরযোগ্য হওয়া সম্পর্কে চারজন ইমামই ঐক্যমত পোষণ করেছেন। এ মাসয়ালার ভিত্তি হচ্ছে বিভিন্ন হাদীস। যেমনঃ

لا تنكحوا النساء الا الاكفاء - (دارقطنی، بیهقی)

কুফুর (সমতার) ভিত্তি ছাড়া তোমরা মেয়েদেরকে বিবাহ দিওনা। [রাদেকুতনী ও বায়হাকী]

يا على ثلاث لا تؤخرها۔ الصلوة اذا اتت، والجنازة اذا حضرت ، والايم اذا وجدت كفاءً ۔(ترمذى، حاكم)

"হে আলী! তিন কাজে বিলম্ব করা উচিত নয়। এক. নামায, যখন তর সময় হয়। দুই. জানাযা, যখন তা তৈরী হয়ে যায় এবং তিন. অবিবাহিতা মেয়ে, যখন তার কুফু মিলে যায়।" [তিরমিযী ও হাকেম]

تخيروا لنطفكم وانكحوا الاكفاءَ ۔

"নিজের বংশ সৃষ্টির জন্যে ভালো স্ত্রী তালাশ করো। মেয়েদের বিবাহ এমন পুরুষদের সাথে দাও যাদের সাথে কুফু হয়।"

(এ হাদীসটি হযরত আয়েশা (রা) আনাস (রা) উমর বিন খাত্তাব (রা) প্রমুখ থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে)।

ইমাম মুহাম্মদ কিতাবুল আসারে হযরত উমরের (রা) এ কথাকেও উল্লেখ করেছেনঃ

لأمنعن فروج ذوات حساب الا من الاكفاء ۔

আমি ভদ্র ঘরের মেয়েদের কুফু ছাড়া বিবাহ দিতে অবশ্যই নিষেধ করবো।

এগুলো হলো এ মাসয়ালার বর্ণনামূলক দলিল। আর বুদ্ধিবৃত্তিক দলিল সুস্পষ্টভাবে এ কথাই দাবী করে যে, কোনো মেয়েকে কোনো ছেলের সাথে বিবাহ দেয়ার সময় ছেলে ও মেয়ের মধ্যে জুড়ি হবে কি হবেনা তা যাচাই করে দেখতে হবে। যদি জুড়ি না হয়, তাহলে আশা করা যায়না যে, উভয়ের বিবাহিত জীবন শান্তিপূর্ণ হবে। যুক্তি ও বর্ণনার ভিত্তিতেও বিবাহের উদ্দেশ্য এটাই স্থিরিকৃত হয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও সহানুভূতি থাকবে। এবং একে অপরের কাছে পাবে অনাবিল শান্তি। আপনি নিজেই চিন্তা করে দেখুন একটি অসম ও বেমিল দম্পতির বিবাহোত্তর জীবন থেকে এ উদ্দেশ্য লাভ করার আশা কতটুকু করা যায়? এমন কোনো বুদ্ধিমান লোক আছে কি যে নিজের মেয়েকে বিবাহ দেয়ার সময় সমতা বা মিল তথা তাদের মিলেমিশে জীবন নির্বাহ করার বিষয়টা সামনে রাখেনা? আপনি কি ইসলামী সাম্যের অর্থ এ বুঝেছেন যে, প্রত্যেক স্ত্রী লোককে প্রত্যেক পুরুষের সাথে এবং প্রত্যেক পুরুষকে প্রত্যেক স্ত্রী লোকের সাথে কোন প্রকার সামঞ্জস্য ছাড়াই শুধুমাত্র এ জন্যে বিবাহ দিতে হবে যে, তারা মুসলমান?

ফকীহগণ এ জুড়ির তাৎপর্য নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন। ছেলেমেয়ের মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয়ে সমতা থাকতে হবে সেগুলো তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ

পদ্ধতিতে বর্ণনা করছেন। এসব ব্যাখ্যা বিবৃতির মধ্যে কোনো কোনো ফিকাহবিদদের সাথে আমরা মত-বিরোধ করতে পারি। আবার কারো কারো সাথে একমত পোষণ করতে পারি। তবে মোটামুটিভাবে সাধারণ জ্ঞানের দাবী হলো সারা জীবনের অংশীদারী ও বন্ধুত্বের জন্যে যে দুটি সত্তার একটিকে অপরটির সাথে জুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে, তাদের মধ্যে চরিত্র, দীন, বংশ, সামাজিক নিয়ম পদ্ধতি, মানমর্যাদা, আর্থিক অবস্থা ইত্যাদির সব কিছুর সাদৃশ্য দেখতে হবে। এসব বিষয়ে যদি পুরোপুরি সমতা না হয়, তবে অন্তত এতটা ব্যবধান যেন না থাকে, যার কারণে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সাথে ভালবাসা ও সম্প্রীতির বন্ধন স্থাপন করতে অক্ষম হবে। এটা মানব সমাজের একটি বাস্তব সমস্যা এবং এক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী।

সমগ্র আদম সন্তান এক ও সমান হওয়ার দৃষ্টিভংগি আপনি এখানে প্রয়োগ করতে চাইলে লক্ষ লক্ষ পরিবার ধ্বংস হয়ে যাবে। হ্যাঁ, যদি আপনি এ কথা বলেন যে, নিছক বংশ ও কৌলিণ্য ভিত্তিতে গোত্র ও উঁচু-নীচু হওয়ার ধারণা একটি জাহেলী কল্পনা বিলাস মাত্র। তাহলে এ কথায় আমি অবশ্যই আপনার সাথে একমত। যারা কুফুর ফিকহী নীতি নির্ধারণ বিকৃত করে হিন্দুদের মত কিছু উঁচু কিছু নীচু জাত-পাত ঘোষণা করে রেখেছে তাদের বিরুদ্ধে আমারও তেমনি অভিযোগ, যেমন আপনার। [তরজমানুল কুরআন, যিলহজ্জ ১৩৭১, সেপ্টেম্বর ১৯৫২]

শেগার বিবাহ

প্রশ্নঃ মুসলমানদের মধ্যে সাধারভাবে প্রথা হয়ে গেছে যে, দু' ব্যক্তি পরস্পর ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিবাহ অদলবদলের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ করে থাকে। কখনো কতিপয় লোক মিলিত হয়ে এভাবে অদলবদল করে থাকে। যেমন, যায়েদ বকরের ছেলের সাথে বকর উমরের ছেলের সাথে এবং উমর যায়েদের মেয়ের সাথে নিজেদের ছেলেমেয়েদের বিবাহ দিয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে মুহরের পরিমাণ সাধারণত একই হয়ে থাকে। কোনো কোনো আলেম এ প্রথাকে শেগার বলেন এবং বলা হয় যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেগার নিষেধ করেছেন বরং হারাম ঘোষণা করেছেন।

বর্তমান অবস্থায় একজন গরীব লোক এ পন্থা অবলম্বন করতে বাধ্যও হয়। কারণ অন্য লোক যেমন সহজভাবে তার মেয়েকে গ্রহণ করতে তৈরী থাকে। সে রকম সহজ উপায়ে তার ছেলেকে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করতে তৈরী থাকেনা।

মেহেরবানী করে এ মাসয়ালাটির স্বরূপ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবেন।

জবাবঃ আমাদের দেশে সাধারণভাবে বদল বিবাহের যে পদ্ধতি চালু আছে তা প্রকৃতপক্ষে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিষিদ্ধ শেগার বিবাহেরই সংজ্ঞায় পড়ে। শেগারের তিনটি অবস্থা আছে যার সবগুলোই নাযায়েজ।

১. এক ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে এ শর্তের উপর নিজের মেয়ে দিয়ে দেয় যে, সে প্রথম ব্যক্তিকে তার পরিবর্তে নিজের মেয়ে দিয়ে দেবে। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি মেয়ে অপর মেয়ের 'মোহর' ধার্য হবে।

২. শর্ত তো অদলবদলেরই। তবে উভয়ের মোহর সমান সমান (যেমন ৫০/৫০ হাজার টাকা) ধার্য করা হয়। উভয় পক্ষের মধ্যে সমান অর্থের বিনিময় শুধু কল্পনা মাত্র। উভয় মেয়েই বাস্তবে এক কপর্দকও পায়না।

৩. অদলবদলের ব্যাপারটি উভয় পক্ষের মধ্যে শুধুমাত্র মৌখিকভাবেই গৃহীত হয়না বরং একটি মেয়ের বিবাহে অন্য মেয়ের বিবাহ শর্ত হিসেবে পরিগণিত হয়।

উপরোল্লিখিত তিনটি অবস্থার যে অবস্থায় গ্রহণ করা হোক তা শরীয়ত বিরোধী হবে। প্রথম অবস্থা নাজায়েয হওয়া সম্পর্কে সমস্ত ফিকাহবিদগণ একমত। অবশ্যি অবশিষ্ট দু'অবস্থা সম্পর্কে মতভেদ আছে। কিন্তু আমি শরয়ী দলিলসমূহের ভিত্তিতে নিশ্চিত যে, তিনটি অবস্থাই নিষিদ্ধ শেগারের আওতাভুক্ত। তিনটি অবস্থার মধ্যে সামাজিক ফিতনার এমন সব কারণ সমভাবে বিদ্যমান যার কারণে শেগার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। [তরজমানুল কুরআন, রজব, শাবান-১৩৭১, এপ্রিল-মে ১৯৫২]

বাকদানের শরয়ী বিধান

প্রশ্নঃ শরীয়তের দৃষ্টিতে বাকদানের মর্যাদা কি? লোকেরা এটাকে ঈজাব-কবুলের মর্যাদা দিয়ে থাকে। যদি মেয়ের বাপ-মা নির্ধারিত কথা রদ করে দেয়, তাহলে আত্মীয়তার ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতা পর্যন্ত ঘটে যায়। এমতাবস্থায় যদি বাপ-মা সংশ্লিষ্ট মেয়ের বিবাহ অন্যত্র দিয়ে দেয়, তাহলে কি তা ঠিক হবে?

জবাবঃ বাকদান নিছক এই মর্মে একটি উক্তি ও অংগীকার যে, ভবিষ্যতে এ মেয়ের বিবাহ অমুক ব্যক্তির সাথে দেয়া হবে। এটা যথার্থ অর্থে বিবাহ নয়। অবশ্য উভয় পক্ষের মধ্যে এক ধরনের চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়, যা ভংগ করা ঠিক নয়। তবে সংগত কারণ থাকলে কোনো চুক্তি ভংগ করা যায়। কথাবার্তা ও অংগীকারের পর উভয় পক্ষের কোনো এক পক্ষের কাছে দ্বিতীয় পক্ষের এমন কোনো দোষ যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে, যে সম্পর্কে আগে জানা ছিলনা, বা গোপন

রাখা হয়েছিল, তাহলে নিঃসন্দেহে এ কথাবার্তা ও অংগীকার বাতিল করা যাবে। কিন্তু এ ধরনের কোনো সংগত কারণ ছাড়া অনর্থক বাতিল করা অথবা কোনো অযৌক্তিক কারণে চুক্তি ভংগ করা কখনো জায়েয নয়। অন্যান্য চুক্তি ভংগের মত এটাও একটা চুক্তি ভংগ, এ জন্য মানুষকে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহী করতে হবে। [তরজমানুল কুরআনঃ মুহররম–সফর ১৩৭২, অক্টোবর–নভেম্বর ১৯৫২]

হস্তমৈথুন

প্রশ্নঃ এক ব্যক্তি পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করেছে। যৌন উত্তেজনা অত্যন্ত প্রবল। এখন এই উত্তেজনা প্রশমিত করার জন্যে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে।

এক. তাকে বিয়ে করতে হবে। কিন্তু যে মেয়েটির সাথে তার বাকদান হয়েছে, সে এত অল্পবয়স্কা যে, এখনো কমপক্ষে আরো তিন–চার বছর অপেক্ষা করতে হবে।

দুই. তাকে নিজের খান্দানের বাইরে অন্যত্র বিয়ে করতে হবে। কিন্তু বাইরে বিয়ে করলে সমগ্র খান্দানই তার বিরোধী হয়ে যাবে বরং তার খান্দানের সাথে তার সম্পর্কোচ্ছেদেরও আশংকা রয়েছে।

তিন. সে সাময়িকভাবে কোনো একটি মেয়েকে বিয়ে করে নেবে এবং নিজের খান্দানের প্রস্তাবিত মেয়েটির সাথে বিয়ে হয়ে যাবার পর পূর্বের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেবে। কিন্তু এ অবস্থা ও 'মুতার' মধ্যে কোনো বিশেষ তফাত নেই।

চার. উত্তেজনা প্রশমিত করার জন্যে তাকে অনবরত রোযা রাখতে হবে। কিন্তু সে একজন শ্রমজীবী। সারাদিন তাকে পরিশ্রমের কাজ করতে হয়। রোযা রেখে এত বেশী মেহনত করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

পাঁচ. সর্বশেষ পন্থা হিসেবে যিনা থেকে বাঁচবার জন্যে তাকে হস্তমৈথুনের পন্থা অবলম্বন করতে হয়। এ পরিস্থিতিতে সেকি এ পন্থা অবলম্বন করতে পারে?

জবাবঃ হস্তমৈথুন সম্পর্কে ফকীহগণের মধ্যে তিনটি মত আছেঃ

১. এটি একটি মোবাহ কর্ম এবং এর বিরুদ্ধে কিছু বলতে হলে বড়জোর এতটুকু বলা যায় যে, এ কাজ উন্নত নৈতিকবৃত্তির বিরোধী হবার কারণে এটি একটি মাকরূহ ও অপছন্দনীয় কাজ। এই অভিমতের সমর্থকরা এ যুক্তি পেশ করেন যে, হাদীস ও কুরআনের কোথাও এ কাজটিকে হারাম বলে উল্লেখ করা হয়নি। উপরন্তু আল্লাহ বলেছেনঃ ওয়া কাদ ফাস্‌সালা লাকুম মা হাররামা আলাইকুম "আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্যে যেসব বস্তু হারাম করেছেন,

সেগুলো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।" কাজেই হারামের ফিরিস্তিতে যখন এর উল্লেখ নেই তখন এটি হালাল। ইবনে হাযম মুহাল্লা গ্রন্থে পূর্ণ দলিল প্রমাণাদিও সনদসহ এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন এবং এ কথাও উল্লেখ করেছেন যে, হাসান বসরী, আমর ইবনে দীনার ও মুজাহিদ এ কাজের বৈধতার পক্ষপাতী ছিলেন এবং আতা একে নিছক মাকরূহ মনে করতেন (১১ খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৯২-৯৩)। আল্লামা আলুসী রুহুল মাআনী গ্রন্থে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের নিম্নোক্ত অভিমতটি উদ্ধৃত করেছেনঃ 'প্রয়োজনকালে এ কাজটি সিংগা লাগিয়ে রক্তক্ষরণ করার ন্যায় জায়েয' (১৮ খন্ড, পৃষ্ঠা ১০)। তবে হাম্বলী ফিকাহর কোনো নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে আমি ইমাম আহমদের এ ফতোয়াটি দেখিনি।

২. এটি একটি হারাম কর্ম। কিন্তু যদি যিনার ফিতনায় লিপ্ত হবার আশংকা থাকে এবং তা থেকে বাঁচবার জন্যে কেউ এভাবে যৌন আকাংখা চরিতার্থ করে, তাহলে আশা করা যায় যে, তাকে আযাব দেয়া হবেনা। এটি হচ্ছে হানাফীদের অভিমত। রদ্দুল মুখতার গ্রন্থে বলা হয়েছে, এ কাজটি হারাম এবং এ কাজে ব্রতী হলে আযাব ভোগ করতে হবে। তবে যিনার আশংকায় যদি কেউ এতে ব্রতী হয়, তাহলে "আশা করা যায়, তাকে এ জন্যে আযাব দেয়া হবেনা।" রোযা ও (দন্ডবিধি অধ্যায়) আল্লামা আলুসী এরই কাছাকাছি ইবনে হুমামের একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন (ঐ গ্রন্থে) এবং আল্লামা ইবনে আবেদীন এরই সাথে সামঞ্জস্যশীল ফকীহ আবুল লায়সের একটি অভিমত উদ্ধৃত করেছেন। এই মতের সপক্ষে কোনো বিশেষ আয়াত বা হাদীস নেই বরং ইসলামের একটি সাধারণ নীতি থেকে এটি গৃহীত হয়েছে। যেমন অক্ষম ও অস্বাভাবিক অবস্থায় হারাম বস্তু ব্যবহারের অনুমতি আছে এবং দুটি নাযায়েজ কাজ অপরিহার্য হয়ে গেলে তাদের মধ্য থেকে অপেক্ষাকৃত কম নাযায়েজ কাজটি অবলম্বন করার নীতি ইসলামে স্বীকৃত।

৩. এটি হচ্ছে একটি সম্পূর্ণ হারাম কাজ। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালিক এ মতের পক্ষপাতী। তাঁরা সূরা মুমিনুনের নিম্নোক্ত আয়াতটি থেকে এর প্রমাণ পেশ করেছেনঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ إِلَّا عَلَى
أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ
غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاءَ ذَالِكَ
فَاُولٰئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ - (المؤمنون : ٥-٧)

"আর যারা নিজেদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে স্ত্রী ও দাসীদের ছাড়া তারা তিরস্কারের যোগ্য নয়। অতপর যারা এগুলো ছাড়া অন্য পথ (যৌন আকাংখা চরিতার্থ করার জন্যে) তালাশ করে, তারাই সীমা লংঘনকারী।"

এই আয়াত থেকে তাঁরা প্রমাণ করেন যে, বিবাহিত স্ত্রী ও দাসীদের সাথে ছাড়া আর কোন পদ্ধতিতে যৌন আকাংখা চরিতার্থ করা কুরআনের দৃষ্টিতে হারাম– এ ব্যাপারে যিনা, হস্তমৈথুন, পুংমৈথুন, প্রাণী মৈথুন বা অন্য কোনো পদ্ধতি সবই সমপর্যায়ভুক্ত। নিম্নলিখিত হাদীসগুলোও এর সমর্থকঃ

ناكح اليد ملعون -

"নিজের হাতের সাহায্যে বিবাহকারী অভিশপ্ত' এবং

عذب الله تعالى امة كانوا يعبثون بمذاكيرهم -

"আল্লাহ্ তাআলা এমন সব লোকদেরকে আযাব দিয়েছেন যারা নিজেদের যৌনাংগের সাথে খেলা করতো।"

এ হাদীস দুটিতে আল্লামা আলুসী রুহুল মাআনী গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। ইবনে কাছীর এ আয়াতটির তাফসীরে আর একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন কিন্তু সাথে সাথে বলে দিয়েছেন যে, হাদীসটি হচ্ছে 'গরীব'[১] *এবং এর সনদে একজন বর্ণনাকারী অপরিচিত।*

হাদীসটি নিম্নরূপঃ

سبعة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم ويدخلهم النار في اول الداخلين الا ان يتوبوا ومن تاب تاب الله عليه - الناكح يده والفاعل والمفعول به، ومدمن الخمر، والضارب والديه حتى يستغيثا، والموذى جيرانه حتى يلعنوه، والناكح حليلة جاره

"সাত প্রকার লোকের দিকে আল্লাহ্ তাআলা কিয়ামতের দিন কোনো প্রকার দৃষ্টিপাত করবেননা। তাদেরকে পাক করবেননা। তাদেরকে অন্য লোকদের সাথে একত্রিত করবেননা এবং তাদেরকে সর্বপ্রথম জাহান্নামে প্রবেশকারীদের মধ্যে শামিল করবেন। তবে যদি তারা তওবা করে, আর যে ব্যক্তি তওবা করে আল্লাহ তাআলা তাকে মাফ করে দেন। তারা হলোঃ ১. নিজের হাতের সাহায্যে

---

১. *যে হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা কোনো পর্যায়ে মাত্র একজন থাকে তাকে বলা হয় গরীব হাদীস।*

বিবাহকারী, ২. পুংমৈথুনকারী, ৩. পুংমৈথুনে সাহায্যকারী, ৪. পাক্কা শরাবী, ৫. নিজের পিতামাতাকে আঘাতকারী যার ফলে তারা ফরিয়াদ করে, ৬. প্রতিবেশীদেরকে কষ্টদানকারী যার ফলে তারা তার উপর অভিশাপ বর্ষণ করে, ৭. নিজের প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারকারী।"

এই অভিমতগুলো ও এগুলোর সপক্ষে প্রদত্ত যুক্তি–প্রমাণ পর্যালোচনা করলে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, প্রথম অভিমতটি অত্যন্ত দুর্বল বরং ভুল। কারণ কুরআনে হারাম বস্তুগুলোর বিস্তারিত বিবরণ থাকার অর্থ এ নয় যে, সমস্ত হারাম বস্তুর নাম ধরে উল্লেখ করা হয়েছে। বরং এর অর্থ হচ্ছে এই যে, কুরআনে হারাম ও হালাল সম্পর্কে মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। কাজেই যে বস্তুটি কুরআনে বর্ণিত কোন মূলনীতির আওতায় পড়ে, তার উপর ঐ মূলনীতিতে বর্ণিত নির্দেশ জারী হবে। তবে তাকে ওর আওতাবহির্ভূত করার জন্যে যদি কোনো যুক্তি–প্রমাণ থাকে তাহলে তার উপর ঐ একই নির্দেশ জারী হবেনা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কুরআন যখন এই সাধারণ নিয়ম বর্ণনা করছে যে, বিবাহিতা স্ত্রী ও দাসী ছাড়া অন্য কারুর সাথে যৌন কামনা চরিতার্থ করা সীমা অতিক্রম করার শামিল, তখন হস্তমৈথুনকে এ নির্দেশের আওতাবহির্ভূত করার পেছনে কি যুক্তি থাকতে পারে? এর জবাবে কেউ কেউ এ যুক্তি পেশ করেছেন যে, 'আরবে এ কাজটির প্রচলন ছিলনা এবং আরবী সাহিত্যেও এর কোনো উল্লেখ নেই। কাজেই এটি ফামানিবতাগা ওয়ারায়া যালিকা– 'যারা এ ছাড়া অন্য পথ তালাশ করে' তারা এর অন্তর্ভূক্ত নয়। কিন্তু এ যুক্তিটি যথার্থ নয়। কারণ প্রথমত আরবী সাহিত্যে এ জন্যে 'জলদে উমাইরা', 'হায্হাযাহ্' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং সাহিত্যে কোনো শব্দের ব্যবহার এ কথাই প্রমাণ করে যে, উক্ত ভাষাভাষীরা এ চিন্তা ও কর্মের সাথে পরিচিত ছিল। দ্বিতীয়ত, আরবরা এ কর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকলেও আল্লাহ্ তাআলা মানুষের সমস্ত কর্ম সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তিনি যেসব মূলনীতি বর্ণনা করেছেন তা কেবল ঐ যামানার আরবীরা যেসমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে অবগত ছিল সেগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে কেমন করে? এই যুক্তি–প্রমাণাদির পরিপ্রেক্ষিতে এ কর্মটি হারাম হওয়া সম্পর্কিত অভিমতটিই নির্ভুল। তবে বিবেকবুদ্ধি এ কথা বলে যে, এর হারাম হওয়া যিনা, পুংমৈথুন ও প্রাণী মৈথুনের সমপর্যায়ভুক্ত নয়। তাই কোনো ব্যক্তির যদি উল্লিখিত গুনাহর মধ্য থেকে কোনো একটিতে লিপ্ত হবার আশংকা থাকে এবং তা থেকে বাঁচবার জন্যে সে এই পদ্ধতিতে নিজের উত্তেজনা প্রশমিত করে, তাহলে তার সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, সম্ভবত আল্লাহ্ তাকে শাস্তি দেবেননা।

এখন যে বিশেষ ব্যক্তিটির সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে তার প্রসংগে আসা যাক। তাঁকে আমি সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তাআলার এ নসিহতটি স্মরণ করিয়ে দিতে চাইঃ

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ - (النور: ٣٣)

'যারা বিয়ে করার সুযোগ পায়না তাদের নিষ্কলুষ থাকার চেষ্টা করা উচিত, যথক্ষণ না আল্লাহ্ তাআলা নিজের মেহেরবানীতে তাদেরকে ধনী করে দেন। (আন্‌নূরঃ ৩৩)

অতপর আমি তাঁকে পরিষ্কার বলবো, একটি হারাম বস্তুকে হালাল করার জন্য আপনি নিজের যে অক্ষমতার কথা পেশ করেছেন, তা কোনোক্রমেই এমন পর্যায়ের নয়, যার ফলে একটি হারাম বস্তু হালাল হয়ে যেতে পারে। আপনি নিছক নিজের খান্দানের ভয়ে বিয়ে করছেননা অথচ ঐ খান্দান একটি যুবককে একটি অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়ের সাথে বাকদান করে তার অজ্ঞতার পূর্ণ প্রমাণ পেশ করেছে। এখন যদি আপনি বিয়ের সুযোগ পান কিন্তু খান্দানের অসন্তুষ্টির ভয়ে তা থেকে পিছিয়ে আসেন, তাহলে আপনি যে কোনো পর্যায়ের গুনাহ্ করেননা কেন আল্লাহ্ অবশ্যি আপনাকে পাকড়াও করবেন। কারণ আসলে আপনার কোনো অক্ষমতা নেই। বাহানাবাজি না করে সোজা চিন্তা করে দেখুন কাকে ভয় করা উচিত– আল্লাহ্‌কে না খান্দানকে? [তরজমানুল কুরআন, অক্টোবর–নভেম্বর ১৯৫২]

বোরকা কি পর্দার উদ্দেশ্য পূর্ণ করে

প্রশ্নঃ *আমি দীর্ঘদিন থেকে আপনার দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সাথে মানসিক ও আন্তরিক পর্যায়ে জড়িত আছি। পর্দা সম্পর্কে আপনার জ্ঞানগর্ব রচনাবলী পাঠ করে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। কিন্তু পরিশেষে দেখছি আপনি প্রচলিত বোরকারও সমর্থন করেছেন। এ ব্যাপারে মনে কিছুটা খট্‌কা জাগে। মেহেরবানী করে এর উপর আলোকপাত করে কৃতজ্ঞ করবেন।*

পর্দার উদ্দেশ্য হচ্ছে, নর–নারীর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের ক্ষেত্রে উচ্ছৃংখলতার গতিরোধ করা। বলা বাহুল্য, এ আকর্ষণ নর–নারী উভয়ের মধ্যে পাওয়া যায় (যদিও উভয়ের ক্ষেত্রে এর প্রকৃতিগত পার্থক্য অনস্বীকার্য)। এ জন্যেই পর্দার আসল প্রাণশক্তি দৃষ্টি আনত করার নির্দেশ নর–নারী উভয়কে দান করা হয়েছে। কিন্তু এ কথা সত্য যে, বোরকার আড়াল থেকে অধিকাংশ মহিলা 'দৃষ্টির যিনায়' লিপ্ত হয়ে থাকে। এর কারণ হলো, তারা এই মনে করে নিশ্চিন্ত

থাকে যে, তারা পুরুষদেরকে দেখছে কিন্তু পুরুষরা তাদেরকে দেখছেনা এবং তারা যে পুরুষদেরকে দেখছে এটা পুরুষরা টেরও পাচ্ছেনা। কাজেই এই ধরনের মেয়েদের মধ্যে লজ্জাশীলতা– যা নারী সমাজের আসল সম্পদ– অত্যন্ত কমে যায়।

উপরন্তু বোরকা পরিধান করে মধ্যবিত্ত পরিবারের কোনো মেয়ে নিজের কাজকর্ম যথাযথভাবে সম্পাদন করতেও পারেনা। সফরের সময় গাড়ী–বাস প্রভৃতিতে উঠা–নামা করা বোরকা পরিহিতা মহিলার জন্যে বিপদমুক্ত নয়।

পূর্ণাংগ পর্দার গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য। কিন্তু প্রচলিত বোরকার চাইতে অধিক উপযোগী কোনো পর্দা পদ্ধতির প্রচলন কি উত্তম হবেনা? দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, আজ থেকে কয়েক বছর আগে পর্যন্ত গ্রাম্য মেয়েরা নিজেদেরকে একটি চাদরের মধ্যে ঢেকে রাখতো। চাদরের মধ্য থেকে কোনো পুরুষকে অনবরত দেখার সাহস তারা করতে পারতোনা এবং তাদের নিকট থেকে অত্যন্ত উন্নত পর্যায়ের লজ্জাশীলতার পরিচয় পাওয়া যেতো। আমি মনে করি প্রচলিত বোরকার চাইতে ঐ চাদরেই চমৎকার 'পর্দা' হতো। আপনার অত্যধিক কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও আপনাকে কষ্ট দিতে প্রবৃত্ত হলাম।

জবাবঃ আপনার প্রশ্নের মধ্যে কয়েকটি বিষয়কে মিশ্রিত করে ফেলেছেন। এক একটি বিষয়কে পৃথক করে নিয়ে তার উপর পৃথকভাবে চিন্তা করে মত প্রতিষ্ঠিত করাই ভালো মনে করি। প্রথম যে বিষয়টির উপর চিন্তা করা দরকার তাহলো, দৃষ্টি আনত করার নির্দেশ ও নৈতিক শিক্ষা ছাড়া কি কোনো মহিলাকে কোনো পরপুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করা থেকে বিরত রাখা যেতে পারে? আপনি বোরকার নেকাবের উপর আপত্তি করেছেন, কারণ তা কোনো পুরুষকে নারীর উপর দৃষ্টিপাত করা থেকে বিরত রাখে বটে, কিন্তু নারীকে অবৈধ দৃষ্টি থেকে বিরত রাখেনা। কিন্তু এ দোষ কেবল নেকাবে নেই, চাদরেও আছে। মেয়েরা চাদরে মুখ ঢেকে বাইরে যাবার সময় পথ দেখার জন্যে চোখ দিয়ে সামনের দিকে দেখতে পারে কমপক্ষে এতটুকু অংশ খুলে রাখা উচিত, শরীয়ত এর অনুমতি দেয়। উপরন্তু এ দোষ অনেকের স্বভাবজাত। যেমন আপনারা পথ চলার সময় মানুষের দরজা–জানালার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। বরং যে জায়গা থেকেই কোনো মেয়ে বাইরে উঁকি দিতে পারে, তার প্রত্যেকটির মধ্যেও এ দোষ রয়েছে। আপনি নিজেই বলুন, এ পথগুলোকে আপনি কিভাবে বন্ধ করতে পারেন? শরীয়তও কি সত্যি এ সমস্ত পথ বন্ধ করার দাবী করে? উপরন্তু ঐ পর্দা ও ইসলাম গ্রন্থেই আমি এমন সব হাদীস উদ্ধৃত করেছি যাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে হযরত আয়েশাকে (রা) হাবশীদের খেলা দেখিয়েছিলেন। সেখানে আমি এ কথাও প্রমাণ করেছি যে, পুরুষদের জন্যে

মেয়েদের দেখা এবং মেয়েদের জন্যে পুরুষদের দেখা শরীয়তের দৃষ্টিতে সমান নয় এবং মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকেও এ দুয়ের অবস্থা সমান নয়।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, বোরকা নিজেই যদি আকর্ষণীয় ও উত্তেজনাময় না হয় এবং সাদাসিধে ধরনের ও সৌন্দর্যহীন হয়, তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তার বিরুদ্ধে কোনো আপত্তির অবকাশ আছে কি? এ বোরকা কি শরীয়তের কোনো দাবীই পূর্ণ করেনা? যদি পূর্ণ করে থাকে, তাহলে আমাদের নিকট অবৈধতার সপক্ষে কোনো যুক্তি আছে কি? তবে আপনার মতে যদি অন্য কিছু অপেক্ষাকৃত ভালোভাবে শরীয়তের উদ্দেশ্য পূর্ণ করে, এটি একটি স্বতন্ত্র কথা। এ জন্যে যদি তেমন কোনো বস্তু থাকে, তাহলে আপনি অবশ্যি তা পেশ করতে পারেন। কিন্তু বোরকাকে অবৈধ বলা কোনোক্রমেই ঠিক নয়।

বোরকা পরিধান করে চলাফেরা করা ও বাস-গাড়ী প্রভৃতি যানবাহনে উঠা-নামা করার ব্যাপারে যে সমস্ত অসুবিধার কথা আপনি বর্ণনা করেছেন বৈধতা ও অবৈধতা আলোচনার সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। আপনার মতে চাদরে এর চাইতে অসুবিধা অনেক কম বা মোটেই নেই, তাহলে আপনি মেয়েদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করুন। তারা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যদি একে অধিকতর সংগত বলে বুঝতে পারে, তাহলে একে গ্রহণ করবেনা কেন? [তরজমানুল কুরআন, জুন ১৯৫২]

মহিলাদের হজ্জের সফর

প্রশ্নঃ মাহরাম পুরুষ ছাড়া মহিলাদের হজ্জে যাওয়ার ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আপনি মেহেরবানী করে এ ব্যাপারে বিভিন্ন মাযহাবের বক্তব্য বিশদভাবে অবহিত করবেন। আপনার মতে কোন্ বক্তব্যটি প্রাধান্য লাভের উপযোগী তাও জানাবেন।

জবাবঃ মাহরাম পুরুষ ছাড়া মহিলাদের হজ্জে যাওয়ার প্রসংগটি একটি মতভেদপূর্ণ বিষয়। এ ব্যাপারে চারটি মতামত পাওয়া যায়। এখানে সংক্ষেপে সবগুলো বর্ণনা করছিঃ

১. মহিলাদের জন্যে কোনো অবস্থাতেই মাহরাম বা স্বামী ছাড়া হজ্জ করা উচিত নয়। এ মত ইবরাহীম নাখয়ী, তাউস, শা'বী এবং হাসান বসরী থেকে বর্ণিত। হাম্বলী মাযহাবেরও এটাই ফতওয়া।

২. যদি হজ্জের সফর তিনদিন তিনরাতের কম হয়, তাহলে মহিলা মাহরাম ছাড়া হজ্জে যেতে পারে। কিন্তু যদি তিনদিন কিংবা তার চেয়ে বেশী দিনের সফর হয় তবে স্বামী কিংবা মাহরাম ছাড়া যেতে পারবেনা। ইমাম আবু হানিফা (র) ও সুফিয়ান ছাওরী (রা) এ মত পোষণ করেছেন।

৩. যে মহিলার স্বামী কিংবা মাহ্‌রাম নেই, সে এমন লোকদের সাথে হজ্জে যেতে পারবে, যাদের চরিত্র ও নৈতিক জীবন সন্তোষজনক। ইবনে সিরীন, আতা, যুহরী, কাতাদাহ্ এবং আওযায়ী এ মত পোষণ করেছেন। ইমাম মালিক (র) এবং শাফেয়ীও (র) এ মত পোষণ করেন। ইমাম শাফেয়ী (র) "সন্তোষজনক সাথীদের" অতিরিক্ত ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, যদি কতিপয় স্ত্রীলোক নির্ভরযোগ্য হয় এবং তারা নিজেদের মাহ্‌রামদের সাথে যাচ্ছে, এমতাবস্থায় একজন স্বামী বিহীন অথবা মাহ্‌রাম বিহীন মহিলা তাদের সাথে যেতে পারে। তবে শুধুমাত্র একজন স্ত্রীলোকের সাথে তার না যাওয়াই উচিত।

৪. এ সবের বিপরীত পক্ষে ইবনে হাযম যাহিরীর (র) মত হলো মাহ্‌রামহীন স্ত্রীলোককে একাকীই হজ্জে যেতে হবে। যদি তার স্বামী থাকে এবং সে তাকে সাথে করে নিয়ে না যায়, তবে স্বামী গুনাহ্‌গার হবে। কিন্তু মহিলাটির জন্যে স্বামী ছাড়াই হজ্জে চলে যাওয়া যায়েজ।

আমি চারটি মতামতের মধ্যে তৃতীয় মতটিকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি। কারণ এতে একটি দীনী ফরয কাজ আদায় করারও অবকাশ থাকে, আবার যে আশংকার কারণে মাহ্‌রাম ছাড়া সফর করার নিষেধাজ্ঞা হাদীসে এসেছে তারও সম্ভাবনা থাকেনা। [তরজমানুল কুরআন, যিলহজ্জ ১৩৭১, সেপ্টেম্বর ১৯৫২]

বৈপিত্রেয় ভাইবোনদের উত্তরাধিকার

প্রশ্নঃ কুদুরী গ্রন্থে (ফারায়েয পরিচ্ছেদ, ইজব অধ্যায়) নিম্নবর্ণিত বাক্য আছেঃ

ان تترك المرأة زوجا و أمّا او جدة و اخوة من
امّ و اخا من اب و امّ فللزوج النصف وللام السدس
ولا ولاد الامّ الثلث ولا شيئ لاخوة للاب والأمّ -

"যদি কোনো মহিলার ওয়ারিশদের মধ্যে তার স্বামী, মা অথবা দাদী ও বৈপিত্রেয় ভাই এবং সহোদর ভাই থাকে, তাহলে স্বামী পাবে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক, মা এক-ষষ্ঠাংশ, বৈপিত্রেয় ভাইবোনেরা পাবে এক-তৃতীয়াংশ আর আপন ভাইয়েরা কিছুই পাবেনা।"

জিজ্ঞাসা হলো, এটাই কি হানাফীদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত? এবং এরই উপর কি ফতওয়া দেয়া হয়? এটা কি ন্যায়সংগত হলো যে, সহোদর ভাই বঞ্চিত হবে আর বৈপিত্রেয় ভাই ওয়ারিশ গণ্য হবে? এই সংগে 'কালালাহ' শব্দটির

আইনগত সংজ্ঞাও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করবেন। দাদী ও মায়ের জীবিত থাকা অবস্থাতেও কি একজন মৃতকে কালালাহ্ গণ্য করা যেতে পারে?

জবাবঃ আপনি কুদুরা থেকে যে মাসয়ালাটি উদ্ধৃত করেছেন, সে সম্পর্কে পূর্ববর্তী আলেমদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। যদি কোনো মহিলার মৃত্যুর পর তার স্বামী, মা, সহোদর ভাইবোন ও বৈপিত্রেয় ভাইবোন থাকে তবে হযরত আলী (রা), আবু মূসা আশয়ারী (রা) এবং উবাই বিন কা'বের (রা) ফতওয়া মতে স্বামী অর্ধেক, মা ষষ্টাংশ এবং বৈপিত্রেয় ভাইবোনকে এক-তৃতীয়াংশ দিতে হবে। আপন ভাইবোনেরা কিছুই পাবেনা। হানাফী আলেমগণ এ ফতওয়াই দিয়েছেন এবং এটাই তাদের চূড়ান্ত রায়। অপরদিকে হযরত উসমান (রা) এবং যায়েদ বিন সাবেতের (রা) মতে, এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি সহোদর ও বৈপিত্রেয় ভাইবোনদের মধ্যে সমান হারে বন্টিত হবে। হযরত উমর (রা) প্রথমত প্রথম মতের সমর্থক ছিলেন, কিন্তু পরে তিনি দ্বিতীয় মত গ্রহণ করেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে দুটি রিওয়ায়েতের উল্লেখ আছে। কিন্তু অধিকতর নির্ভরযোগ্য রিওয়ায়েত এটাই যে তিনিও দ্বিতীয় মতের সমর্থক ছিলেন। কাযী শুরাইহ্ এরই উপর ফতওয়া দিয়েছেন। ইমাম মালিক শাফেয়ী এবং সুফিয়ান ছাওরীরও (রা) এ মত। হানাফীদের দলিল হলো- বৈপিত্রেয় ভাইবোন 'যাবিল ফুরুয' (অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রথম প্রাপক) আর ভাইবোন 'আসাবা' (অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমিক প্রাপক)। আসাবার উপর 'যাবিল ফুরুযের' অগ্রাধিকার থাকে। সুতরাং যাবিল ফুরুযকে দেয়ার পর কিছু অবশিষ্ট না থাকলে আসাবা কিছুই পাবেনা। দ্বিতীয় দলের দলিল হলো, উভয়ের মাঝে মায়ের স্থান হওয়ার কারণে আপন ও বৈপিত্রেয় ভাইবোন যখন সমান সমান, তখন অংশ পাওয়ার ব্যাপারে সমান সমান না হওয়ার কোনো কারণ থাকতে পারেনা।

কালালাহর যে অর্থ হযরত আবু বকর (রা) বলেছেন এবং হযরত উমর (রা) যা গ্রহণ করেছেন তাহলোঃ

مـــن لا ولـــد لـــهٗ ولا والـــد -

অর্থাৎ সেই কালালাহ্ যার পুত্রও নেই, পিতাও নেই। এমনিভাবে মা কিংবা দাদীর অস্তিত্ব কোনো মৃতের কালালাহ্ হওয়ার বাধা নয়। [তরজমানুল কুরআন, যিলহজ্জ ১৩৭১, সেপ্টেম্বর ১৯৫২]

এতীম নাতির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া

প্রশ্নঃ দাদার জীবদ্দশায় পিতা মারা গেলে সে নাতি দাদার সম্পত্তির কোনো অংশ পায়না। এটা শরীয়তের একটা সর্বজন পরিচিত বিধান। সরকার বর্তমানে এ বিধানটি কার্যকর করে আসছেন। এ ব্যাপারে কত প্রকার মত আছে? এর মধ্যে

আপনি কোন্ মতটিকে ইসলামের মেযাজ ও প্রকৃতির নিকটতর মনে করেন? আর যদি আপনিও ঐ একই মতের অনুসারী হন, তাহলে এ ক্ষেত্রে যে অভিযোগটি উথাপিত হয়েছে আপনি তার কি জবাব দিবেন? অভিযোগ হচ্ছে, ইসলামী জীবন ব্যবস্থা এতীমকে সাহায্য–সহায়তা দান করার বিরাট দাবী নিয়ে এগিয়ে এসেছে, অথচ একজন এতীমকে নিছক এ জন্যই তার দাদার মীরাস থেকে বঞ্চিত করা হয় যে, সে তার পিতাকে তার দাদার মৃত্যু পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখতে পারেনি।

জবাবঃ মুসলিম ফকীহ্গণ সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, দাদার জীবদ্দশায় যে নাতির পিতা মারা যায় সে দাদার ওয়ারিশ হয়না, বরং এক্ষেত্রে ওয়ারিশ হয় তার চাচা। যদিও এখনো কুরআন ও হাদীসে আমি এমন কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ পাইনি যাকে ফকীহ্গণের এই সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের ভিত্তি বলে গণ্য করা যেতে পারে। তবুও প্রথম থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত উম্মতে মুসলিমার সকল ফকীহ্ এ ব্যাপারে একমত, এটা কোনো সামান্য কথা নয়। এই একটি বিষয়ই এ বিধানটিকে এত বেশী শক্তিশালী করে দেয় যে, এর বিরুদ্ধে কোনো মত প্রকাশ করা কঠিন। এমনিতে এ সিদ্ধান্তটি যথেষ্ট যুক্তিসংগত মনে হচ্ছে। কারণ নাতি অবশ্যি তার পিতার মাধ্যমেই দাদার সম্পত্তির অধিকারী হতে পারে। পিতাকে ডিঙিয়ে সরাসরি দাদার সম্পত্তিতে তার কোনো অধিকার নেই। এভাবে পুত্রবধূও স্বামীর মাধ্যমেই শ্বশুরের সম্পত্তির ওয়ারিশ হয়। স্বামীকে বাদ দিয়ে সরাসরি ওয়ারিশ হবার কোনো ক্ষমতা ও যোগ্যতা তার নেই। কোনো ব্যক্তির ছেলে তার জীবদ্দশায় মারা গেলে সে যদি অবিবাহিত হয়ে থাকে, তাহলে পিতার সম্পত্তিতে তার অধিকার খতম হয়ে যাবে, এটা নিশ্চয়ই আপনি মেনে নেবেন। পিতার মৃত্যুর পর তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে তার ঐ মৃত পুত্রের অংশও বের করা হবে এবং তার মীরাস তার মা ও ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হবে, এমনটি তো হবেনা। এমনিভাবে ঐ মৃত পুত্রের যদি কোনো স্ত্রী থেকে থাকে, তাহলে আপনি নিশ্চয়ই মানবেন যে, সে নিজের শ্বশুরের পরিত্যক্ত সম্পত্তির কোনো অংশ পাওয়ার হকদার হবেনা। সে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করুক বা না করুক তাতে কিছু আসে–যায়না। তাহলে কেবল তার সন্তান থাকার ক্ষেত্রে তার অংশ খতম হয়ে যাবেনা বরং তার সন্তান তা পাবে, এর উপর আপনি এত জোর দিচ্ছেন কেন?

আর এতীম নাতির লালন–পালনের ব্যাপারে শরীয়তের বিধান হচ্ছে, তার চাচা হবে তার অভিভাবক। তাকে লালন–পালন করা হচ্ছে তার চাচার উপর তার অধিকার। এ ছাড়াও শরীয়ত অসিয়াতের হুকুম দিয়েছে। এ হুকুম দেবার কারণ হলো, কোনো মৃত্যু পথযাত্রী যদি দেখে যে, তার মৃত্যুর পর সে

কিছু সম্পত্তি রেখে যাচ্ছে এবং তার পরিবারের মধ্যে কিছু লোক অভাবীও আছে, তাহলে সে তাদের জন্য অসিয়াত করতে পারে। এক–তৃতীয়াংশ সম্পত্তি সে অসিয়াত করতে পারে। তার যদি কোনো এতীম নাতি থাকে, কোনো নিঃসহায় বিধবা পুত্রবধূ থাকে, অথবা কোনো বিধবা ভাবী বা গরীব ভাই অথবা বিধবা বোন থাকে, তাহলে তাদের জন্য সে অসিয়াত করে যেতে পারে, এ সুযোগ এখানে তাকে দেয়া হয়েছে। আইনগত ওয়ারিশ ছাড়া পরিবারের মধ্যে আর যারা অভাবী ও সাহায্য গ্রহণের উপযুক্ত লোক রয়েছে, তাদের সাহায্যের ব্যবস্থা করার জন্য এ সুযোগ দেয়া হয়েছে। [তরজমানুল কুরআন, সেপ্টেম্বর ১৯৫১]

রমযানে কিয়ামুললাইল

প্রশ্নঃ মেহেরবানী করে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর জবাব দিয়ে বাধিত করবেনঃ

১. উলামায়ে কিরাম সাধারণত বলে থাকেন, প্রথম ওয়াক্তেই (অর্থাৎ ঈশার নামাযের পর পরই) তারাবীহ্‌র নামায পড়া উত্তম। তারাবীহ্‌র জামায়াত সুন্নাতে মুয়াক্‌কাদায়ে কেফায়াহ্‌। অর্থাৎ যদি কোনো এলাকায় জামায়াত সহকারে তারাবীহ্‌ আদায় না করা হয়, তবে এলাকাবাসী গুনাহ্‌গার হবে। যদি অন্তত দু'জন মিলেও মসজিদে তারাবীহ্‌ জামায়াত করে নেয়, তবু সকলের উপর থেকে জামায়াত ত্যাগ করার গুনাহ্‌ মাফ হয়ে যাবে। এসব কথা কি ঠিক? যদি ঠিক হয়, তবে হযরত আবু বকরের (রা) আমলে এরূপ করা হয়নি কেন? সে সময়ের মুসলমানদের ব্যাপারে কি বলা হবে? তারাবীহ্‌ জামায়াতের সাথে আদায় না করার কারণে তারা সকলেই কি গুনাহ্‌গার হয়েছিলেন?

২. তারাবীহ্‌র নামায প্রথম ওয়াক্তে শয্যা গ্রহণের আগেই পড়া কি জরুরী? সাহরীর সময় তারাবীহ্‌ আদায়কারী কি ফযীলত ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হবে? যদি বঞ্চিত হয়ে যায় তাহলে সাইয়্যেদুনা হযরত উমরের (রা) এ বক্তব্যের তাৎপর্য কি? "যারা ঘুমায় তারা ওদের থেকে উত্তম যারা দাঁড়ায়।"

৩. রমযানে তারাবীহ্‌ কি তাহাজ্জুদ থেকে উত্তম? যদি একজন লোক রমযানে ঈশার নামায পড়ে শুয়ে থাকে এবং তারাবীহ্‌র পরিবর্তে তাহাজ্জুদ নামায পড়ে [যখন তাহাজ্জুদের জন্য কুরআনে সুস্পষ্টভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে কিন্তু তারাবীহের এ মর্যাদা নেই] তাহলে তো তার গুনাহ্‌ হওয়ার অবশ্যম্ভাবী নয়! প্রকাশ থাকে যে, তারাবীহ্‌ ও তাহাজ্জুদ উভয়টি আদায় করা মুশকিল।

৪. তারাবীহ্‌র পর বিতরও কি জামায়াতসহ্ আদায় করতে হবে? নাকি এরূপও হতে পারে যে, তারাবীহ্‌র আগে বিতর পড়ে নেবে এবং রাতের শেষাংশে তারাবীহ্ আদায় করবে।

৫. তারাবীহ্‌র রাকাআতের সংখ্যা কত? সহীহ্ হাদীসে কি ৮/২০/৩৮/৪০ রাকাআত নবী মুস্তফা সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক প্রমাণিত নয়?

৬. কোনো সাহাবার কি এ অধিকার আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে জিনিসকে

ما زال بكم الذى رأيت من صنيعكم خشيت او يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا ايها الناس فى بيوتكم فان افضل صلوة المرء فى بيته الا الصلوة المكتوبة -

"তোমাদের আগ্রহ দেখে আমার আশংকা হচ্ছে এটা তোমাদের উপর ফরয না হয়ে পড়ে। হে লোকেরা! ফরয ছাড়া অন্যান্য নামায তোমাদের জন্যে ঘরে পড়াই উত্তম।"

এ কথা বলে রহিত করে দিয়েছেন, সে জিনিসকে তিনি পুনরায় রীতিমত জামায়াতের সাথে মসজিদে জারী করে দিবেন?

জবাবঃ তারাবীহ্ সম্পর্কে আমি যা কিছু জানি তার সারমর্ম হলোঃ

১. রসূল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যান্য সময়ের তুলনায় রমযানের সময় রাত্রি জাগরণের জন্য বেশী উৎসাহিত করতেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ জিনিসটি রসূলের অত্যন্ত প্রিয় ছিল।

২. সহীহ্ রিওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার রমযান মুবারকে তিন রাত তারাবীহের নামায জামায়াত সহকারে পড়িয়েছেন। তারপর এ কথা বলে জামায়াত পরিহার করেন, "আমার আশংকা হচ্ছে, এটা তোমাদের উপর ফরয হয়ে না পড়ে।" এতে প্রমাণিত হয় যে তারাবীহ্ জামায়াতসহ্ আদায় করা সুন্নত। এতে এটাও প্রমাণিত হয় যে, তারাবীহ্ ফরযের পর্যায়ে নয়। আরো প্রমাণিত হয় যে, রসূল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম চেয়েছিলেন লোকেরা একটি পছন্দনীয় পন্থায় তারাবীহ্ পড়তে থাকুক, তবে সম্পূর্ণ ফরযের মত যেন তাকে অপরিহার্য মনে না করে।

৩. সব রিওয়ায়েত একত্র করার পর সত্যের অধিকতর কাছাকাছি যে জিনিসটি জানা যায়, তাহলো হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে রমযান মাসে জামায়াতের সাথে যে নামায আদায় করেছিলেন, তা ছিল প্রথম ওয়াক্তে শেষ ওয়াক্তে নয়। আর তা ছিল আট রাকাআত, বিশ রাকাআত নয় (যদিও এক রিওয়ায়েতে বিশেরও উল্লেখ আছে কিন্তু সে রিওয়ায়েত আটের তুলনায় দুর্বল)। লোকেরা হুযুরের সাথে জামায়াতে নামায পড়ার পর ফিরে গিয়ে নিজের সামর্থ অনুযায়ী অতিরিক্ত কিছু রাকাআতও পড়ে নিতেন। সে অতিরিক্ত কত রাকাআত ছিল, এ সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট কথা পাওয়া যায়না। পরে হযরত উমর (রা) ২০ রাকাআত পড়ার প্রচলন করেন। সমগ্র সাহাবা তাঁর সাথে ঐক্যমত্য পোষণ করেন। এতে ঐ অতিরিক্ত রাকাআতের সংখ্যা বার ছিল এ কথাই বুঝা যায়।

৪. নবীর (স) আমল থেকে হযরত উমরের প্রাথমিক শাসনামল পর্যন্ত যথারীতি এক জামায়াতে সমস্ত লোকের তারাবীহ্ পড়ার প্রচলন ছিলনা। বরং লোকেরা নিজ নিজ ঘরে অথবা মসজিদে পৃথকভাবে ছোট ছোট জামায়াত আকারে তারাবীহ্ পড়ে নিতেন। হযরত উমর (রা) শুধু এতোটুকু করেছিলেন যে, ঐ ছোট ছোট জামায়াতের প্রথা দূর করে সকলকে এক জামায়াতে নামায আদায় করার আদেশ দেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই তিন বার জামায়াতে তারাবীহ্র নামায পড়িয়েছেন এ যুক্তির ভিত্তিতে হযরত উমর (রা) এ আদেশ দেন। এ কারণে এটাকে বিদায়াত বলা যায়না। এ কাজ যেন কখনো ফরয না হয়ে যায়, এ আশংকায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সিলসিলা বন্ধ করে দেন। হুযুরের ইন্তেকালের পর এটা ফরয ঘোষিত হবার এ আশংকা আর ছিলনা। এ কারণে হযরত উমর (রা) এটাকে একটি সুন্নাত ও ভালো কাজ হিসেবে জারী করেন। এটা হযরত উমরের (রা) গভীর ফিকহী পান্ডিত্যের একটি চমৎকার উদাহরণ। তিনি শরীয়ত প্রণেতা রসূলের (স) উদ্দেশ্যকে সঠিকভাবে বুঝেছেন এবং উম্মতের মধ্যে একটি সঠিক পন্থার প্রচলন করেন। সাহাবাদের মধ্যে কেউই এর উপর অভিযোগ না করা এবং নির্দিধায় এটা গ্রহণ করা এ কথা প্রমাণ করে যে, রসূলের উদ্দেশ্য যথাযথভাবে পূরণ করা হয়েছে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, "এটাকে ফরযের পর্যায়ে না নিয়ে যাওয়া।" অন্তত একবার হলেও তাঁর নিজের তারাবীহতে শরীক না হওয়ার প্রমাণ আছে, যখন তিনি আবদুর রহমান ইবনে আবদের সাথে বের হয়ে গেলেন এবং মসজিদে লোকদেরকে তারাবীহ্ পড়তে দেখে এটাকে সুন্দর কাজ বলে সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন।

৫. হযরত উমরের শাসনামলে যখন তারাবীহ্ যথারীতি জামায়াতের সাথে পড়ার প্রচলন শুরু হলো, তখন সাহাবাদের ঐক্যমতে বিশ রাকাআতই পড়া

হতো। হযরত উসমান (রা) এবং হযরত আলীর (রা) শাসনামলেও এর অনুসরণ করা হয়। তিনজন খলীফার উপর একমত হওয়া এবং সাহাবাদের এ ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ না করা এ কথা প্রমাণ করে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমল থেকেই লোকদের তারাবীহ্ বিশ রাকাআত পড়ার অভ্যাস ছিল। এ কারণেই ইমাম আবু হানীফা (র) ইমাম শাফেয়ী (র) এবং ইমাম আহমদ (র) বিশ রাকাআতের সমর্থক। ইমাম মালিকের (র) একটি রায় এর সপক্ষে রয়েছে। দাউদ যাহিরীও এটাকেই প্রতিষ্ঠিত সুন্নাত বলে গ্রহণ করেছেন।

৬. হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) এবং হযরত আবান ইবনে উসমান (র) বিশের পরিবর্তে ৩৬ রাকাআত পড়ার যে পন্থা শুরু করেন তার কারণ এটা ছিলনা যে, তাঁদের গবেষণা খলীফাদের গবেষণার খেলাফ ছিলনা। বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিলো, মক্কার বাইরের লোকেরা যেনো সওয়াবের দিক থেকে মক্কাবাসীর সমান হয়ে যায়। মক্কাবাসীদের নিয়ম ছিল তারাবীহর প্রত্যেক চার রাকাআতের পর তারা কাবা ঘরে তাওয়াফ করে নিত। এই দু'জন বুযুর্গ প্রত্যেক তাওয়াফের পরিবর্তে চার রাকাআত পড়া শুরু করেন। এ পদ্ধতি যেহেতু মদীনায় চালু ছিল আর ইমাম মালিক (র) মদীনাবাসীদের কাজকে সনদ মনে করতেন এ জন্যে তিনি বিশের পরিবর্তে ৩৬ রাকাআত পড়ার সমর্থনে ফতওয়া দেন।

৭. আলেমগণ যার ভিত্তিতে এ কথা বলেন, যেখানে একেবারেই তারাবীহর নামায জামায়াত সহকারে আদায় করা হয়না, সেখানকার সবাই গুনাহগার হবে তা এই যে, তারাবীহ্ ইসলামের এমন একটি সুন্নাত যা খুলাফায়ে রাশিদাহ্র আমল থেকে সমগ্র উম্মতের মধ্যে প্রচলিত আছে। এমন একটি ইসলামী রীতি পরিত্যাগ করা এবং গ্রামের সকলে মিলে ত্যাগ করা দীনের প্রতি সাধারণ উপেক্ষার বহিঃপ্রকাশ। এটাকে প্রশ্রয় দিলে সেখান থেকে ধীরে ধীরে সমস্ত ইসলামী রীতি-নীতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আশংকা আছে। এর বিরুদ্ধে আপনি যে অভিযোগ উথাপন করেছেন তার জবাব উপরে চার নম্বরে বর্ণিত হয়েছে।

৮. তারাবীহর জন্য উত্তম সময় কোন্টি ঈশার সময়, না তাহাজ্জুদের সময়? এ নিয়ে মতবিরোধ আছে। উভয়ের সপক্ষেই যুক্তি আছে। তবে শেষ প্রহরে আদায় করাকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। অবশ্য প্রথম প্রহরকে প্রাধান্য দেয়ার পিছনে এ কথা খুবই অর্থবহ যে, মুসলমানগণ সামষ্টিকভাবে প্রথম ওয়াক্তে তারাবীহ্ পড়তে পারে। শেষ রাতে তারাবীহ্ পড়তে গেলে অনেক লোক এ সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। আর এটা হবে তাদের জন্য বিরাট ক্ষতি। যদি কিছু সংখ্যক নেককার বুযুর্গ শেষ প্রহরের ফযীলত লাভের আশায় প্রথম ওয়াক্তে জামায়াতে শরীক না হয়, তাহলে সাধারণ লোকজনের এসব নেককার লোকদের সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করবে, অথবা তাদের শরীক না হওয়ার কারণে ওদের

তারাবীহ্ পরিত্যাগ করার আশংকা থাকে; অথবা এ অবস্থায় এসব সৎ ও নেককার লোকদেরকে নিজেদের তাহাজ্জুদ পড়ার কথা সরবে ঘোষণা করতে বাধ্য হতে হবে।

هذا ما عندى والعلم عند الله وهو اعلم بالصواب -

[তরজমানুল কুরআন, রজব-শাবান ১৩৭১, এপ্রিল-মে ১৯৫২]

দোয়ায় বুযুর্গদের অসীলা

প্রশ্নঃ আমি একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, অমুকের মর্তবা অথবা অমুকের বুযুর্গীর অসীলা অবলম্বন করে দোয়া করার শরীয়তসম্মত কোনো প্রমাণ আছে কিনা? আপনি জবাবে বলেছিলেন, যদিও তাসাওউফপন্থীদের এটা একটি সাধারণ রীতি কিন্তু কুরআন ও হাদীসে এর ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায়না। আমি এ ব্যাপারে একটি আয়াত ও হাদীস পেশ করছি। সূরা বাকারায় আহলে কিতাবের প্রসংগে বলা হয়েছেঃ

وَ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا -(البقرة : ٨٩)

"মুহাম্মদ (সা) এর আবির্ভাবের পূর্বে ইহুদীরা কাফিরদের উপর বিজয়ী হওয়ার জন্যে দোয়া করতো।" এ আয়াতের তাফসীরে ইমাম রাগেব 'মুফরাদাতে' বলেছেনঃ

اى يستنصرون الله ببعثة محمد -

"মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের অসীলা ধরে দোয়া করতো।"

و قيل كانوا يقولون انا لننصر بمحمد عليه السلام على عبدة الاوثان -

এটাও বলা হয়েছে যে, ইহুদীরা বলতো, "মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসীলায় মূর্তিপূজকদের মুকাবিলায় আমাদের বিজয় দান কর।"

وقيل يطلبون من الله بذكره الظفر -

"এ কথাও বলা হয়েছে যে, তারা রসূলের (স) স্মরণের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে বিজয়ের প্রার্থনা করতো।"

তিরমিযী শরীফের দাওয়াত অধ্যায়ে একটি হাসান সহীহ গরীব হাদীস বর্ণিত আছে যে, একজন অন্ধ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন, আমার কষ্ট দূর করে দেয়ার জন্যে আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। রসূল (স) বললেনঃ যদি তুমি চাও তবে আমি দোয়া করব। আর যদি সবর করতে পার তবে সবর কর। সবর করা তোমার জন্যে উত্তম। লোকটি বললোঃ আপনি দোয়া করুন। তিনি তাকে ভালোভাবে উযূ করতে বললেন এবং এ দোয়া পড়ার উপদেশ দিলেনঃ

اللّٰهم انى اسئلك واتوجّه اليك بنبيك محمد نبى الرحمة - انى توجهت بك الىٰ ربى فى حاجتى هٰذه لتقضى لى - اللهم فشفعه فىّ -

"হে আল্লাহ! আমি তোমার রহমতের নবী মুহাম্মদের অসীলায় তোমার কাছে প্রার্থনা করছি এবং তোমার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করছি। আমার এ প্রয়োজন ও অভাবের জন্য হে পরওয়ারদেগার! আমি তোমার প্রতিই মনোনিবেশ করছি, যাতে তুমি আমার মনোবাসনা পূর্ণ কর। কাজেই হে আল্লাহ! আমার জন্যে নবীর শাফায়াতকে মঞ্জুর কর!"

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে কি প্রমাণিত হয়না যে, দোয়ায় সাইয়েদুল মুরসালীনের মহত্ত্বে অথবা 'নবীর মর্যাদায়' কিংবা 'নবীর তোফায়েলে' অথবা 'হুযুরের বরকতে' বলা সঠিক এবং জায়েয?

জবাবঃ আমার মতে উল্লিখিত আয়াতের এ অর্থ ঠিক নয় যে, ইহুদীরা রসূল (সা)–এর আগমনের পূর্বেই তাঁর অসীলা ধরে কাফিরদের মুকাবিলায় বিজয় লাভ করার দোয়া করতো। বরং এর সঠিক অর্থ সেটাই যা ইমাম রাগেবের প্রথম দুটি উক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে এবং নির্ভরযোগ্য রিওয়ায়েত দ্বারাও সমর্থিত হয়েছে। সে অর্থ হলো, "রসূলের আগমনের পূর্বে ইহুদীরা তাদের কিতাবে প্রাপ্ত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর সূত্র ধরে এই দোয়া করতো। সে নবী যেন আসেন এবং তাঁর বদৌলতে আমরা কাফিরদের উপর জয়লাভ করতে পারি।" ইবনে হিশামের বর্ণনায় আছে, মক্কায় হজ্জের সময় মদীনা থেকে আগত কতিপয় লোকের সাথে যখন রসূলের প্রথম সাক্ষাৎ হয় এবং তাদের কাছে তিনি ইসলাম পেশ করেন তখন তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলোঃ

ياقوم تعلموا الله انه لنبى الذى توعدكم به اليهود فلا تسبقنكم اليه - (ج ٢ ص ٢٢)

"হে লোকেরা! জেনে রাখো, আল্লাহর কসম! ইনিই সেই নবী যার আগমন সম্পর্কে তোমাদেরকে ইহুদীরা ভয় দেখাতো। এরূপ যেন না হয়ে যায় যে, তোমাদের আগেই তারা তাঁর কাছে পৌঁছে যায়।"

অতপর ইবনে হিশাম আগে অগ্রসর হয়ে ঐ আয়াতের তাফসীর বর্ণনা করতে গিয়ে মদীনার বয়োজ্যেষ্ঠ আনসারদের এ কথা উল্লেখ করেনঃ

فينا والله وفيهم نزلت هذه القصة. كنا قد علوناهم ظهرًا فى الجاهلية ونحن اهل الشرك وهم اهل كتاب. فكانوا يقولون لنا ان نبيًّا يبعث الآن نتبعه قد اظل زمانه. لنقتلكم معه قتل عاد وارم فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم من قريش فاتبعناه وكفروا به -

"এ আয়াত আমাদের ও ইহুদীদের সম্পর্কেই নাযিল হয়। জাহেলী যুগে আমরা তাদের উপর বিজয়ী ছিলাম। আমরা ছিলাম মুশরিক আর তারা ছিল আহলে কিতাব। তারা আমাদের বলতো, শীঘ্রই একজন নবীর আবির্ভাব ঘটবে। তাঁর আগমনের সময় অত্যাসন্ন। আমরা তাঁর নেতৃত্বে তোমাদের এমন মার দেবো যেমন আদ ও ইরাম জাতিকে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু যখন আল্লাহ তাআলা রসূলকে কুরাইশ বংশে পাঠালেন, তখন আমরা তাঁর অনুসরণ করলাম আর তারা তাঁকে অস্বীকার করে বসলো।"

এবার আসুন আপনার উদ্ধৃত জামে তিরমিযীর হাদীসটির কথায়, যার প্রতিপাদ্য সম্পর্কে আপনিই বলছেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে দোয়া চাইলেন, আপনি দোয়া করুন। হুযুর (স) তাকে হিদায়াত করলেনঃ ঠিক আছে তুমি আল্লাহর কাছে দোয়া কর যে, "হে আল্লাহ! আমি তোমার নবীর মাধ্যমে তোমার দরবারে আমার উদ্দেশ্য নিয়ে হাযির হয়েছি। তুমি আমার জন্য তোমার নবীর সুপারিশ কবুল কর।" এর সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, নবী (স) নিজেও তার জন্য দোয়া করেছেন এবং তাকেও বলেছেন আমার মাধ্যমে তুমিও নিজের বাসনা পূর্ণ হবার জন্য দোয়া কর এবং আমার সুপারিশ কবুল হওয়ারও দোয়া কর। এটা দোয়া করার একটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক পদ্ধতি। এর উপমা এরূপ যেমন

কোনো ব্যক্তি আমাকে বললো, অমুক হাকিমের কাছে গিয়ে আমার জন্যে সুপারিশ করুন। আমি সুপারিশ করার সাথে সাথে তাকেও বললাম, তুমি নিজেও হাকিমের কাছে আরয কর যে, আমি তাকে সুপারিশকারী হিসেবে নিয়ে এসেছি। আপনি তাঁর সুপারিশ গ্রহণ করে আমার আকাংখা পূর্ণ করুন। এটা একটা ভিন্ন ধরনের ব্যাপার। পক্ষান্তরে সুপারিশের এটা একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন পন্থা যে, কেউ আমার কাছ থেকে অনুমতি না নিয়ে নিজেই হাকিমের কাছে চলে যায় এবং নিজের যে উদ্দেশ্য ও ইচ্ছায় হোক না কেন তা আমার সূত্রে পেশ করে। এই দ্বিতীয় পন্থাটিকে কিভাবে প্রথম পন্থার উপর অনুমান করা যায়? প্রথম পন্থার দলিল পেশ করে দ্বিতীয় পন্থাকে জায়েয করা কোনোক্রমেই ঠিক নয়। দ্বিতীয় পন্থা জায়েয হওয়ার জন্যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এমন কোনো কথা থাকতে হবে, যাতে তিনি নিজের নাম স্মরণকারীদের সকলকেই এভাবে সাধারণ অনুমতি দিয়েছেন যে, তারা নিজেদের ইচ্ছা মতো প্রত্যেকটি বাসনায় আমার অসীলা ধরে আল্লাহর কাছে চাইতে পারবে। [তরজমানুল কুরআন, জমাদিউল উলা ১৩৭২, ফেব্রু... ১৯৫৩]

কিসাস ও দিয়্যত (রক্তপণ)

__প্রশ্নঃ__ কিসাস ও দিয়্যত সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন পাঠালাম। এগুলোর জবাব দানে খুশী করবেন।

ক. নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশদের মধ্য থেকে যে কোনো ওয়ারিশ দিয়্যত নিয়ে কিংবা না নিয়ে যদি নিজের অধিকার থেকে হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেয়, তবে কি হত্যাকারী মৃত্যুদন্ড থেকে রেহাই পেতে পারে? এতে কম ও আধিক্যের পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা হবে কিনা? যেমন, তিন ছেলের মধ্যে একজন কিসাস মাফ করে দিল। বাকি দু'জন প্রতিশোধ নেয়ার উপর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এমতাবস্থায় বিচারককে কোন্ পন্থা অবলম্বন করতে হবে?

খ. যদি নিহতের ওয়ারিশগণ দিয়্যত নিতে উদ্যোগী হয়, কিন্তু হত্যাকারী নিজের দারিদ্রের দরুন দাবীকৃত দিয়্যত প্রদান করতে সম্পন্ন হয়, তাহলে এ অবস্থায় কি বিচারক তার (হত্যাকারীর) ওয়ারিশদেরকে দিয়্যত প্রদান করতে বাধ্য করতে পারেন? যদি পারেন তবে সেটা কি ওয়ারিশদের জন্যে নিরপরাধের শাস্তি তুল্য নয়?

গ. যদি হত্যাকারীর ওয়ারিশই না থাকে, বা যদি থেকেও থাকে তবে এমন গরীব যে দিয়্যত প্রদান করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও প্রদান করতে অক্ষম। এমতাবস্থায় হত্যাকারীকে কিসাস বা দিয়্যতের বিকল্প সাজা (সশ্রম কারাদন্ড

ইত্যাদি) দেয়া যাবে কিনা? যদি না দেয়া যায়, তাহলে এক্ষেত্রে কি উপায় অবলম্বন করা হবে?

ঘ. প্রচলিত আইনে হাইকোর্টে আপিল করার পরও যদি হত্যাকারীকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়, তবে পুনরায় প্রেসিডেন্ট কিংবা গবর্নর জেনারেলের সমীপে অনুকম্পার আবেদন করা যায়। এতে দন্ডের পরিবর্তনেরও সম্ভাবনা থাকে। ইসলামে এ পদ্ধতি কতটুকু জায়েয?

জবাবঃ *নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশদের কোনো একজনও যদি হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেয়, কিংবা দিয়্যত গ্রহণ করে, তবে কিসাস অবশ্যই রদ হয়ে যাবে এবং অবশিষ্ট ওয়ারিশগণ দিয়্যতের উপর রাযী হতে বাধ্য থাকবে। এ ব্যাপারে বেশী সংখ্যা ও কম সংখ্যার প্রশ্ন অবান্তর। প্রশ্ন থাকে শুধু এটা যে, যে ওয়ারিশ ক্ষমা কিংবা দিয়্যতের মাধ্যমে হত্যাকারীকে জীবিত থাকার অবকাশ দিল, কিসাসের অবস্থায় এ অনুমতিকে কিভাবে প্রয়োগ করা যাবে? উদাহরণ স্বরূপ যদি তিনজন ওয়ারিশের মধ্য থেকে একজন হত্যাকারীকে মাফ করে দেয়, তবে এর অর্থ এই যে, নিহত ব্যক্তির প্রাণ এক-তৃতীয়াংশ জীবিত থাকার অধিকার লাভ করেছে। এবার অবশিষ্ট দু'জন ওয়ারিশের দাবী অনুযায়ী তার জীবনের শুধুমাত্র দুই-তৃতীয়াংশের বিনাশ করতে হবে। এই এক-তৃতীয়াংশ বাঁচিয়ে রাখা কি সম্ভব? যদি এটা সম্ভবপর না হয়, তবে অবশিষ্ট দু'জন ওয়ারিশকে দিয়্যাত গ্রহণ করতে অবশ্যই বাধ্য থাকতে হবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) একটি মামলায় এরূপ রায়ই দিয়েছিলেন। হযরত উমর (রা) এর পরই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মাবসূতে বলা হয়েছেঃ*

قال ابن مسعود اری هذا فقد احيا بعض نفسه فليس للآخر ان يتلفه فامضى عمر القضاء على رأيه (ج ٢٦ صـ ١٥٨)

"ইবনে মাসউদ (রা) বলেনঃ আমার মতে একজন ওয়ারিশ যখন হত্যাকারীর একাংশ বাঁচার অধিকার দান করে, তখন অন্যদের এ দান খর্ব করার অধিকার থাকেনা। এ রায়ের পর হযরত উমর (রা) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।" (২৬ খন্ড, ১৫৮ পৃষ্ঠা)

খ. বিচারকের অবশ্যই অধিকার আছে তিনি হত্যাকারীর অভিভাবকদেরকে দিয়্যত প্রদানে বাধ্য করতে পারবেন। হামল ইবনে মালিকের বর্ণনায় পরিষ্কার উল্লেখ আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হত্যাকারীর অলীদেরকে সম্বোধন করে বলেছেনঃ قُوْمُوْا فَدُوْا *"যাও দিয়্যত আদায়*

কর।" এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, দিয়্যত আদায়ের দায়িত্বে হত্যাকারীর সাথে তার অভিভাবকরাও শরীক আছে। অবশ্যি এ বিষয়ে ফকীহদের মধ্যে মতবিরোধ আছে যে, দিয়্যত আদায়ের ব্যাপারে হত্যাকারীর অলী (অথবা আকেলাহ) কাদেরকে সাব্যস্ত করা হবে? শাফেয়ী মতাবলম্বীদের মতে আকেলাহ দ্বারা ওয়ারিশ কিংবা আসাবাহ (রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজন) বুঝানো হয়েছে। হানাফীদের মতে, এমন সব লোক আকেলাহ, যারা জীবন সংক্রান্ত ব্যাপারসমূহে একটি লোকের আশ্রয় ও সাহায্যকারী হতে পারে, সে আত্মীয় হোক, কিংবা সম পেশাজীবী ভাই হোক, অথবা চুক্তিপত্রের ভিত্তিতে একে অপরের সাহায্যকারী ব্যক্তি হোক না কেন। শাফেয়ীগণ যে রায় দিয়েছেন, তা শুধুমাত্র এমন সমাজের জন্যেই উপযোগী যেখানে গোত্রীয় পদ্ধতি চালু আছে। কিন্তু হানাফীদের রায় এমন সব সমাজেও প্রযোজ্য হতে পারে, যেখানে গোত্রের পরিবর্তে বংশীয় অথবা সামাজিক কিংবা তামাদ্দুনিক বন্ধনের ভিত্তিতে মানুষ একে অপরের সাহায্যকারী হয়। হানাফীদের রায় মোতাবেক একটি রাজনৈতিক দলও নিজের দলের একজন লোকের আকেলাহ হতে পারে। কারণ তারা জীবনের দিকগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারসমূহে একে অপরের সাহায্যকারী ও সহায়তাকারী হয়ে থাকে এবং সর্বোচ্চসীমায় দায়িত্ববোধে একে অপরের শরীক মনে করে থাকে। এ কারণেই যখন সমাজের বুনিয়াদিসমূহ গোত্রীয় পদ্ধতির তুলনায় অধিকতর বিস্তীর্ণ হয়ে গেল, তখন হযরত উমর (রা) একজন সৈনিকের দিয়্যাতে দায়িত্ব সমস্ত সৈন্যের উপর ন্যস্ত করেন। যেমন, ফতহুল কাদীরে উল্লেখ আছে–

فانه لما دوّن الدواوين جعل العقل على اهل الديوان وكان ذالك بمحضر من الصحابة رضى الله عنهم من غير نكير منهم-

"হযরত উমর (রা) যখন সামরিক আইন প্রতিষ্ঠা করেন, তখন দিয়্যত সমগ্র সেনাবাহিনীর উপর আরোপ করেন। তিনি সাহাবাদের একটি মজলিসে এ ফায়সালা দেন, কিন্তু তাঁরা এর উপর কোনো আপত্তি করেননি।" (৮ খন্ড, ৪২ পৃষ্ঠা)

এবার আসুন আপনার এ প্রশ্নে যে অলী বা আকেলাহর উপর দিয়্যত অর্পণ করা নিরপরাধকে শাস্তি দেয়ার সমার্থক নয় কি? আপনি নিজেই এর জবাব পেয়ে যেতেন যদি আপনি এ কথার উপর চিন্তা করতেন যে, একজন লোক সামাজিক জীবনে অবস্থান করেই হত্যার মত একটি সমাজ বিধ্বংসী কাজ সাধারণত নিজের সহায়তাকারীদের ছত্রছায়ায়ই সংঘটিত করে থাকে। হত্যাকারী যাদের সাহায্য ও সহানুভূতির উপর নির্ভর করে, তাদের যদি জানা থাকে যে, তার

এরূপ তৎপরতার দায় দায়িত্বে তাদেরও শরীক হতে হবে, তাহলে তারা নিজেরাই তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করবে এবং তাকে এমন আস্কারা দিবেনা যাতে সে অন্যের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারে। দিয়্যত আদায়ের দায়বহনকারী অলীর জন্যে 'আকেলাহ' শব্দটি যদি এ অর্থে গ্রহণ করা হয়ে থাকে, তাহলে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। আকল শব্দের অর্থ তো সবার জানা, অর্থাৎ বাঁধা ও বন্ধন। সম্ভবত প্রথম দিকে এ শব্দটি গ্রহণ করার সময় এ সাদৃশ্যটা সামনে ছিল যে, তারা এমন সব লোক যাদের কাজ হলো মানুষকে নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং তাদেরকে এমন বল্গাহীনভাবে ছেড়ে না দেয়া যাতে তারা হত্যা ও লুটতরাজে নেমে পড়ে।

গ. যদি হত্যাকারীর ওয়ারিশ না থাকে, অথবা তার নিকটতম অভিভাবক দিয়্যত আদায় করতে অক্ষম হয় তবে এমতাবস্থায় সঠিক পন্থা হলো, তার দিয়্যত আদায়ের দায়িত্ব অভিভাবক মহলের উপর অর্পণ করতে হবে। এমনকি অবশেষে তার দিয়্যতের বোঝা রাষ্ট্রীয় কোষাগারের উপর ন্যস্ত করতে হবে। কেননা, একজন নাগরিকের অভিভাবক ব্যাপকার্থে তার রাষ্ট্রই হয়ে থাকে। এ কথার ভিত্তি হলো রসূলের (স) সেই হাদীস যাতে তিনি একজন রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে বলেছেনঃ

من ترك كلا فالیّ ومن ترك مالا فلورثته

وانا وارث من لا وارث له اعقل له وارثه

(ابو داؤد كتاب الفرائض)

"কেউ যদি সহায়-সম্বলহীন সন্তান-সন্তুতি রেখে যায়, তবে তার দেখাশুনা করার দায়িত্ব আমার। আর যদি কেউ ধন-সম্পদ রেখে যায়, তবে তা উত্তরাধিকারীদের। যার ওয়ারিশ নাই আমি তার ওয়ারিশ। আমি তার পক্ষ থেকে বিদ্যত আদায় করব এবং ওয়ারিশও হবো।" (আবু দাউদ)

এ হাদীসের আলোকে রাষ্ট্র এমন প্রত্যেক নাগরিকের ওয়ারিশ যে বেওয়ারিশ মারা গেছে এবং এমন প্রত্যেক নাগরিকের আকেলাহ্ যার দিয়্যত আদায়কারী নেই। যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করলেও এরূপ হওয়াই উচিত। কেননা, রাষ্ট্র দেশে শান্তি ও নিরাপত্তার যিম্মাদার। যদি রাষ্ট্র হত্যা বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়, তবে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশগণের ক্ষতিপূরণ হয় রাষ্ট্রকে হত্যাকারীর ওয়ারিশ ও সহায়তাকারীদের থেকে আদায় করে দিতে হবে, নতুবা তার নিজেকে দিতে হবে।

দিয়্যত প্রদান না করার অবস্থায় হত্যাকারীকে বিকল্প দন্ড দেয়ার প্রমাণ কুরআন ও হাদীসের কোথাও আমি পাইনি। এ সম্পর্কে সালাফে সালিহীনদেরও কোনো নির্ভরযোগ্য বক্তব্যের উল্লেখ নেই।

ঘ. আদালতের চূড়ান্ত ফায়সালার পর কেউ দন্ডাদেশ মাফ করে দেবে কিংবা দন্ড পরিবর্তন করে দেবে, এ ধরনের ক্ষমতা কারোর অর্জিত হওয়া ইসলামী আদল ও ন্যায়বিচারের ধারণার সম্পূর্ণ বিরোধী। আদালত যদি আইনানুগ সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভুল করে থাকে, তবে আমীর কিংবা প্রেসিডেন্ট সরকারকে সাহায্য করার লক্ষ্যে প্রিভি কাউন্সিলের মতো একটি সর্বোচ্চ আদালত প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এর পরামর্শক্রমে নিম্ন আদালতে প্রাপ্ত অন্যায় বা ভুল সিদ্ধান্তের তদারকী করা যাবে। কিন্তু শুধু 'অনুকম্পার' ভিত্তিতে আদালতের রায়ের মধ্যে পরিবর্তন করা ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এটা আসলে এমন সব রাজা-বাদশাহের অনুকরণ, যারা নিজেদের ভিতর কিছুটা খোদায়ী কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বের দাবী করে। অথবা অন্যদের সামনে এর প্রদর্শনী করতে চায়। [তরজমানুল কুরআন, রমযান-শাওয়াল ১৩৭১, জুন-জুলাই ১৯৫২]

ভুলক্রমে হত্যা ও তার বিধান

প্রশ্নঃ একজন ওষুধ বিক্রেতা ভুলক্রমে একজন খরিদ্দারকে ভুল ওষুধ দেয়। ফলে খরিদ্দার মারা যায় এবং দু'টি নিস্পাপ শিশুও মারা যায় (যাদেরকে খরিদ্দার ঐ ওষুধ ক্ষতিকর নয় মনে করে দিয়েছিল)। ওষুধ বিক্রেতার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতাসারে এ ভুলটি হয়ে যায়। এখন রক্তপণ দেয়ার ও আল্লাহর কাছে ক্ষমা পাওয়ার উপায় কি? তাছাড়া রক্তপণ মাফ করার বৈধ কর্তৃপক্ষ কে?

জবাবঃ ইসলামী বিধানে হত্যা চার প্রকারঃ ১. ইচ্ছাকৃত, ২. অনিচ্ছাকৃত, ৩. ইচ্ছাকৃত সদৃশ, ৪. এমন হত্যা যা উল্লিখিত তিন প্রকারের কোনো প্রকারের আওতায় নয়। ওষুধ বিক্রেতা কর্তৃক যে কাজটি সংঘটিত হয়েছে, তা প্রথম তিন প্রকারের মধ্যে গণ্য হতে পারেনা। কেননা, এটা ইচ্ছা বা ইচ্ছাকৃত সদৃশ তো অবশ্যই নয়। এটা ভুলক্রমে হত্যাও নয়। কারণ ভুলক্রমে হত্যা হলো- কেউ কোনো মারণাস্ত্র দ্বারা অন্য কোনো বস্তু লক্ষ্য করে আঘাত করলো। কিন্তু সে অস্ত্র ভুলক্রমে বিদ্ধ হলো এমন একজন লোকের উপর যাকে হত্যা করার ইচ্ছা তার ছিলনা। এ হত্যাকান্ড চতুর্থ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, যেখানে কারোর ক্ষতি করা আদৌ উদ্দেশ্য নয় এবং জেনেশুনে কোনো ক্ষতিকর বস্তু ব্যবহারও করা হয়নি। বরং ভুলক্রমে কিংবা অবহেলায় মৃত্যু সংঘটিত হয়ে যায়।

কিন্তু ইসলামী ফিকাহবিদগণ এই চতুর্থ প্রকারের হত্যার শাস্তিও সেটাই সাব্যস্ত করেছেন যা ভুলক্রমে হত্যার জন্যে কুরআন সাব্যস্ত করেছে। অর্থাৎ যদি নিহত ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হয়, তাহলে হত্যাকারীকে কাফ্ফারা এবং রক্তমূল্য দুটোই দিতে হবে। কাফ্ফারার কথা তো স্বয়ং কুরআনেই উল্লেখ আছে। অর্থাৎ একজন মু'মিন ক্রীতদাসকে মুক্তি করা, অথবা অনবরত দু'মাস রোযা রাখা। আর রক্তমূল্যের কোনো পরিমাণ কুরআনে বর্ণিত হয়নি। অবশ্য মুতাওয়াতের হাদীসসমূহ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ভুলক্রমে হত্যার জন্যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একশত উট রক্তমূল্য হিসেবে নির্দিষ্ট করেছেন। এর মূল্য সে সময়ে ১০ হাজার দিরহামের সমান ছিল। (বর্তমান হিসাবে ১০ হাজার দিরহাম= ২২ সের ১২ $\frac{১}{২}$ ছটাক রূপা)

এ ক্ষেত্রে রক্তমূল্যের প্রসংগটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কুরআনে এর হুকুম দেয়া হয়েছে এবং পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, ভুলক্রমে হত্যার জন্যে আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা লাভের জন্যে কাফ্ফারার সাথে রক্তমূল্যও আদায় করা জরুরী। যদি আমাদের রাষ্ট্রীয় আইন ভুলক্রমে হত্যার জন্যে অন্য দন্ড দেয়, সেটা জেল-জরিমানা যাই হোক না কেন, তা কক্ষণো সেই কাফ্ফারা এবং জরিমানার বিনিময় হতে পারেনা, যা আখিরাতে একজন মুসলমানকে আল্লাহর দরবারে দায়িত্ব থেকে মুক্ত করার জন্যে জরুরী। এ জন্যে আমরা এখানে রক্তমূল্য প্রসংগটির নিয়ম-কানুনগুলো সবিস্তারে বর্ণনা করছি, যাতে মুসলমানগণ এ থেকে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হন।

১. শরীয়ত রক্তমূল্য পরিশোধ করার দায়িত্ব শুধুমাত্র হত্যাকারীর উপর ন্যস্ত করেনি, বরং তার 'আকেলাহ' কেও তার সাথে সমভাবে শরীক করেছে।

২. হানাফী ফকীহদের গবেষণা অনুযায়ী 'আকেলাহ' বলতে একজন লোকের সাহায্য ও সহায়তাকারী সবাইকে বুঝাবে। যদি সে কোনো সরকারী বিভাগের লোক হয়, তাহলে ঐ বিভাগের সকল চাকরিজীবী তার 'আকেলাহ'। অন্যথায়, শেষ পর্যন্ত সরকারের কোষাগার থেকে তার রক্তমূল্য আদায় করতে হবে।

৩. ভুলক্রমে হত্যার রক্তমূল্য আদায়ের ভার 'আকেলাহর' উপর ন্যস্ত করার উদ্দেশ্য এ নয় যে, এতে একজনের অপরাধে সকলকে শাস্তি দেয়া হয়। বরং তা এ উদ্দেশ্যে ন্যস্ত করা হয়েছে যে, এক ভাইয়ের উপর ঘটনাক্রমে যে গুনাহের বোঝা চেপে বসেছে তার দায়িত্ব আদায় করতে তার নিকট সম্পর্কীয় সবাই তাকে সাহায্য করবে এবং তার একার কাঁধে যেন এমন বোঝার চাপ না পড়ে যাতে তার কোমর ভেংগে যায়। উপরন্তু তার ভুলের কারণে যে পরিবারের জানের ক্ষতি হয়েছে তাদের ক্ষতিপূরণ লাভ সহজ হয়ে যায়। এটা এক ধরনের

সাদকাহ্ বা আল্লাহর পথে চাঁদা দেয়ার মতো। কোনো ধ্বংসাত্মক ভুল হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির সাহায্যের জন্য তার আত্মীয়-স্বজনের বৃহত্তম পরিসর থেকে এটা লাভ করা হয়। আমরা এটাকে নৈতিক বীমা বলেও আখ্যায়িত করতে পারি।

৪. 'আকেলাহ্' থেকে একই সংগে সম্পূর্ণ রক্তমূল্য আদায় করা যাবেনা, বরং তিন বছর সময়ের মধ্যে অল্প করে নিতে হবে। যদি আকেলাহর ব্যাপকতা সামনে রাখা হয়, তবে হয়তো প্রতি কিস্তিতে ১০/২০ পয়সার বেশী মাসিক চাঁদার বোঝা কারো উপর পড়বেনা।

৫. এ চাঁদা কেবলমাত্র পুরুষদের কাছ থেকে নিতে হবে। মেয়েরা আকেলাহর অন্তর্ভুক্ত নয়।

৬. রক্তমূল্যের ন্যায্য প্রাপক নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ। যে নিয়মে মীরাস বন্টিত হয়, সে নিয়মে এ অর্থও ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করতে হয়।

৭. নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশগণই রক্তমূল্য মাফ করে দেয়ার অধিকারী। আর এ ধরনের ক্ষমাকে কুরআনের ভাষায় ওয়ারিশদের পক্ষ থেকে হত্যাকারীর জন্য সাদকাহ্ বলা হয়েছে।

এসব হুকুমের উপর যদি কেউ চিন্তা-ভাবনা করে, তবে সে বিনা দ্বিধায় এ কথা বলতে বাধ্য হবে যে, এ পদ্ধতি নৈতিক ও তামাদ্দুনিক দিক থেকে বর্তমান রাষ্ট্রীয় বিধানের তুলনায় অনেক বেশী ভালো। এ পদ্ধতিতে একদিকে ষাট দিনের অনবরত রোযার কাফ্ফারা ঐ লোকটির মন পবিত্র করে দেয় যার অবহেলা অথবা ভুলের কারণে একটি জীবনের অবসান ঘটলো। অন্যদিকে এ কাফ্ফারাই আশপাশের সকলকে সচেতন করে দেয়, যাতে তারাও এরূপ ভুল ও অবহেলা থেকে বাঁচতে পারে। এতে একদিকে খুনের বদলা আদায় করার আদেশ দেয়া হয়েছে, যাতে ঐ খান্দানের চোখের পানি মুছে যায়, যাদের একটি লোক হত্যাকারীর ভুলের শিকার হয়ে মারা গেছে। অন্যদিকে এ খুনের বদলা (রক্তমূল্য) দেবার দায়িত্ব আকেলাহর উপর অর্পণ করে তা আদায়ের পদ্ধতিও সহজ করা হয়েছে। তারপর এ আদায়ের সামষ্টিক দায়িত্ব একদিকে আকেলাহকে সতর্ক করে দেয় যে, সে যেন নিজের লোকদেরকে পর্যবেক্ষণের মধ্যে রাখে। অন্যদিকে এটা প্রত্যেকটি লোকের মধ্যে এ অনুভূতিও সৃষ্টি করে যে, সে এক সহানুভূতিসম্পন্ন, সুখ-দুঃখের অংশ গ্রহণকারী ভ্রাতৃত্বের সাথে সম্পর্ক রাখে। এটা এমন ভ্রাতৃত্ব নয়, যাতে সুখে-দুঃখে কেউ কারো খোঁজ-খবর নেয়না। [তরজমানুল কুরআন, যিলহজ্জ ১৩৭১, সেপ্টেম্বর ১৯৫২]

বাধ্য হয়ে ঘুষ প্রদান

প্রশ্নঃ ১. 'বাধ্য হবার অবস্থা' বলতে কি বুঝায়? পরিবেশ ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাধ্য হবার অবস্থারও কি বিভিন্ন পর্যায় আছে?

২. বর্তমান পরিবেশ পরিস্থিতিতে মুসলমানদের জন্যে কি কোনো পর্যায়ে উৎকোচ বৈধ হতে পারে?

এই প্রশ্নের জবাব দানের সময় ঘুষের একটি পূর্ণাংগ পরিচয় দেবেন, যাতে করে জানা যায় যে কোন্ কোন্ ধরনের লেনদেন ঘুষের অন্তর্ভুক্ত।

জবাবঃ *শরীয়ত নির্ধারিত সীমারেখাগুলোর কোনোটির উপর কায়েম থাকতে গেলে যদি মানুষকে দুঃসহ ক্ষতি বা কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়, তবে তাকে 'ইয্তিয়ার' 'বাধ্য হবার অবস্থা' বলে। এ ব্যাপারে মানুষ ও মানুষের সহ্য ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য থাকে এবং অবস্থা ও পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতেও অনেক পার্থক্য হতে পারে। তাই কোন্ ব্যক্তি কখন কি অবস্থায় বাধ্য হয়, তার সিদ্ধান্ত একমাত্র সে ব্যক্তি গ্রহণ করতে পারে, যে এই অবস্থার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। তার নিজেকেই পূর্ণাংগ খোদাভীতি ও আখিরাতে জবাবদিহির অনুভূতিকে সম্মুখে রেখে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত যে, সত্যিই কি সে এতটা বাধ্য হয়ে পড়েছে, যার ফলে খোদা নির্ধারিত সীমারেখা ভংগ করা যেতে পারে?*

বর্তমান অবস্থায় বা অন্য যে কোনো অবস্থায় উৎকোচ গ্রহণ করা হারাম। তবে কেবল তখনই বাধ্য হবার কারণে তা জায়েয হতে পারে, যখন কোনো ব্যক্তি কোনো যালিমের নিকট থেকে নিজের বৈধ অধিকার আদায় করতে অক্ষম হয়, এই অধিকার ত্যাগ করা তার জন্যে অসহনীয় ক্ষতির কারণ হয় এবং উপরন্তু এমন কোনো কর্তৃপক্ষও থাকেনা যার নিকট অভিযোগ করে এই বৈধ অধিকার আদায় করা সম্ভবপর হয়।

উৎকোচের সংজ্ঞা হচ্ছেঃ যে ব্যক্তি কোনো কাজের পারিশ্রমিক পায় সে যদি ঐ কাজের জন্যে এমন লোকদের নিকট থেকে কোনো প্রকার সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে যাদের জন্যে বা যাদের সাথে ঐকাজের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্যে তাকে নিযুক্ত করা হয়েছে তবে তার এই সুযোগ-সুবিধা গ্রহণটাই উৎকোচ। তারা স্বেচ্ছায় ও সানন্দে তাকে এই সুযোগ-সুবিধা প্রদান করুক বা বাধ্য হয়ে দান করুক তাতে কোনো পার্থক্য নেই। যে সকল অফিসার বা সরকারী কর্মচারী উপহার-উপঢৌকনকে এই সংজ্ঞার বাইরে রাখার চেষ্টা করেন তাঁরা ভুল করেন। যে ব্যক্তি কোনো বিশেষ পদে অধিষ্ঠিত না থাকলে যে তোহ্ফা-উপহার কোনোক্রমেই লাভ করতোনা তা তার জন্যে অবৈধ। তবে কোনো বিশেষ পদে অধিষ্ঠিত হোক বা না হোক নির্ভেজাল ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে মানুষ যে তোহ্ফা লাভ করে তা নিঃসন্দেহে জায়েয। [তরজমানুল কুরআন, জুলাই ১৯৫২]

দারুল কুফরে অবস্থানরত মুসলমানদের সমস্যা

প্রশ্নঃ বৃটেনে অবস্থানকালে শরীয়তের হুকুম পালন করতে গিয়ে আমি নিম্নবর্ণিত অসুবিধার সম্মুখীন হই। মেহেরবানী করে সঠিক পথ-নির্দেশ দান করে কৃতজ্ঞ করবেনঃ

১. প্রথম সমস্যা নামায ও তাহারাত ব্যাপারে। সকাল ৯টায় আমাকে হোটেল থেকে বের হতে হয়। শহরে চলার সময় যদি প্রস্রাবের প্রয়োজন হয়, তবে সর্বত্র ইউরোপীয় কায়দায় নির্মিত প্রস্রাবখানায় দাঁড়িয়ে পেশাব করতে হয়। এতে পেশাবের ছিটেফোঁটা অবশ্যই কাপড়ে লেগে যায়। পরিষ্কারের জন্য শুধুমাত্র কাগজ পাওয়া যায়। বেলা ১টায় হয় যোহরের সময়। সে সময় কোনো সাধারণ স্থানে পানি পাওয়া যায়না। অবস্থানস্থলে আসা-যাওয়াতে কষ্ট করা ছাড়া অন্তত এক শিলিং খরচ হয়ে যায়। নামাযের জন্য কোনো পাক জায়গাও পাওয়া যায়না। হোটেলে যদিও পানি ও লোটা পাওয়া যায় কিন্তু প্যান্টের দরুন ইস্‌তিন্‌যা করা যায়না। অবশ্য উযু করা যায়। কিন্তু এতেও অসুবিধা আছে। পানি যমীনে পড়তে পারবেনা। হাত ধোয়া থেকে মাথামসেহ্ পর্যন্ত কাজ তো ভালোয় ভালোয় বেসিনে হয়ে যায়। কিন্তু পা ধোয়ার জন্যে পা বেসিনের উপর রাখতে হয় যা এখানকার সামাজিক দৃষ্টিতে খুবই দোষণীয়।

২. দ্বিতীয় অসুবিধা হলো, এখানকার লোকেরা সাধারণভাবে কুকুর পালে। সাক্ষাতের সময় প্রথমত কুকুরই অভ্যর্থনা জানিয়ে থাকে এবং কাপড়ে মুখ লাগায়। আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব। এমতাবস্থায় মোজা ও কাপড় কি বার বার ধুয়ে ফেলতে হবে?

৩. তৃতীয় অসুবিধা হলো, অফিসসমূহে সাধারণত মহিলা কর্মচারী থাকে। পরিচয়ের সময় তারা করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দেয়। যদি আমরা হাত না বাড়াই তবে তারা এটাকে নিজেদের অপমান মনে করে থাকে। এমনিভাবে রাস্তায় এমন ভিড় হয় যে, পায়ে হেঁটে চলার সময় যদি আমরা দৃষ্টি আনত রাখি, তবে ধাক্কা খাওয়ার যথেষ্ট ভয় থাকে।

৪. চতুর্থ কথা সিনেমা সম্পর্কে। এখানকার কোনো কোনো সিনেমায় শুধু দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের খবর দেখানো হয়। অথবা দুনিয়ার কোনো কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ সিনেমার পর্দায় প্রদর্শিত হয়ে থাকে। যেমন- সম্প্রতি কে, এল, এম-এর যে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়, তার বিধ্বস্ত হওয়ার অবস্থা ফিল্মে দেখানো হয়। এমনিভাবে কোনো কোনো সময় কার্টুন দেখানো হয়। এসব কার্টুনে এমন আকৃতি-প্রকৃতি দেখানো হয় যা দুনিয়ার কোথাও পাওয়া যায়না। এ ধরনের তথ্যমূলক ফিল্ম দেখা সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

জবাবঃ আপনার চিঠি পড়ে একজন লোক অনুমান করতে পারে যে, দীনী অনুভূতিসম্পন্ন মুসলমানকে দারুল কুফুরে অবস্থান করতে কি কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এতে লোকেরা এ কথাও বুঝতে পারবে যে, আমাদের ফকীহগণ মুসলমানদের জন্যে দারুল কুফুরে থাকা এবং বিবাহ-শাদী করা কেন মাকরূহ বলেছেন এবং কেন তারা এ শর্ত আরোপ করেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি প্রয়োজনের খাতিরে সেখানে গিয়ে থাকে, তাহলে তাকে বছরে অন্তত একবার অবশ্যই দেশে ফিরতে হবে। আপনি যেসব অসুবিধার কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলোর সমাধান সংক্ষিপ্তাকারে নীচে পেশ করা হলোঃ

১. যেখানে বসে পেশাব করা সম্ভবপর নয়, সেখানে দাঁড়িয়ে পেশাব করাতে ক্ষতি নেই। যদি সাবধানতা অবলম্বন করা যায় তাহলে পেশাবের ছিটে থেকে কাপড় পবিত্র রাখা যেতে পারে। যদি বাইরে কোথাও প্রস্রাব-পায়খানার পর পানি ব্যবহার করা সম্ভব না হয়, তবে টয়লেট পেপার ব্যবহার করবেন। পরে অবস্থানস্থলে এসে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলবেন। উযু যদি বাইরে করতে হয় এবং পা ধোয়া সম্ভব না হয়, তবে মোজার উপর অথবা মোজাসহ জুতার উপর মসেহ করবেন। নামায পড়ার জন্য জায়গা পাক আছে এ কথা জানা জরুরী নয়। বরং নাপাক হওয়া সম্পর্কে জ্ঞাত না হলে প্রত্যেক শুষ্ক জায়গাকে পাক মনে করবেন। শুধুমাত্র সন্দেহ ও ধারণার বশবর্তী হয়ে নামায কাযা করা ঠিক নয়। যদি মনের সংশয় দূর না হয়, তবে নিজেরই কোট খুলে কোথাও বিছিয়ে তার উপর নামায পড়ে নেবেন।

২. সে দেশে কুকুর থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া বড়ই দুষ্কর। আপনি যদি চেষ্টার পরও তা থেকে বাঁচতে না পারেন, তবে যে স্থানে কুকুরের মুখ লেগে গেছে সেখানে উযু করার সময় সন্দেহ দূর করার জন্যে শুধুমাত্র পানি ছিটে দিয়ে নিন।

৩. মহিলাদের সাথে সাক্ষাতের সময় অত্যন্ত ভদ্রতার সাথে তাদেরকে বলতে হবে মহিলাদের সাথে হাত মিলানো আমাদের সংস্কৃতিতে দোষণীয়। এ জন্যে যদি আমি হাত না মিলাই তবে আপনি খারাপ মনে করবেননা। দৃষ্টি সংযত করার অর্থ দৃষ্টি নীচু করা নয় বরং দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। আপনি অযথা ঘুরে ঘুরে মেয়েদেরকে দেখবেননা। একবার দৃষ্টি পড়ে গেলে দ্বিতীয়বার দৃষ্টি দেবেননা। দৃষ্টিকে সংযত রাখা কোনো কঠিন কাজ নয়। শুধুমাত্র দৃষ্টি কৌণিক বিন্দুকে একটু বদলে নিলেই যথেষ্ট।

৪. যে সিনেমায় তথ্যমূলক অথবা ঘটনাবলীর ফিল্ম দেখানো হয়, তা দেখায় ক্ষতি নেই। আমাদের দেশে তো সিনেমা হলে যাওয়াটাই একটি দোষণীয় কাজ। এ কারণে তথ্যমূলক কিংবা ঘটনামূলক ফিল্মও দেখার জন্যে ঐ খারাপ জায়গায় পা রাখা যেতে পারেনা। ইংল্যান্ডে আপনি ইচ্ছা করলে এ ধরনের

ফিল্ম দেখে নিতে পারেন। [তরজমানুল কুরআন, রমযান–সাবান ১৩৭১, জুন–জুলাই ১৯৫২]

মোজার উপর মসেহ করা

__প্রশ্নঃ__ মোজা এবং পদাবরণীর উপর মসেহ করা সম্পর্কে আলেমদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়। আমি বর্তমানে শিক্ষার উদ্দেশ্যে স্কটল্যান্ডের উত্তর অঞ্চলে অবস্থান করছি। শীতকালে এখানে প্রচন্ড শীত পড়ে। সব সময় পশমী পদাবরণী ব্যবহার করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ ধরনের পদাবরণীর উপর মসেহ করা যায় কি? মেহেরবানী করে শরীয়তের বিধানের ভিত্তিতে আপনার গবেষণা জানিয়ে কৃতজ্ঞ করবেন।

__জবাবঃ__ চামড়ার মোজার উপর মসেহ করা জায়েয। এর উপর প্রায় সকল আহলে সুন্নাত একমত। কিন্তু সুতা ও উলের মোজা সম্পর্কে আমাদের ফকীহগণ সাধারণত এ শর্ত আরোপ করেছেন যে, তা মোটা হতে হবে এবং এমন পাতলা যেনো না হয় যার তলদেশ দিয়ে পায়ের চামড়া নজরে আসে এবং কোনো প্রকার বন্ধন ছাড়াই যেনো আটকে থাকে।

শর্তগুলোর উৎস অনুসন্ধানে আমি আমার সম্ভাব্য প্রচেষ্টা চালিয়েছি। কিন্তু হাদীসে এমন কোনো কিছু পাওয়া যায়নি। হাদীস থেকে যা প্রমাণিত হয় তাহলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মোজা ও জুতার উপর মসেহ করেছেন। নাসায়ী ছাড়া সুনান গ্রন্থসমূহ ও মুসনাদে আহমদে মুগীরা ইবনে শু’বার রিওয়ায়েত উদ্ধৃত হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, মুহাম্মদ (সঃ) উযু করেছেন এবং مسح على الجورين والنعلين *মোজা ও জুতার উপর মসেহ করেছেন। আবু দাউদে বর্ণিত আছে, হযরত আলী (রা), আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), বারাআ ইবনে আযিব (রা), আনাস ইবনে মালিক (রা), আবু উমামাহ (রা), সহল ইবনে সা’দ (রা) এবং আমর ইবনে হারীস (রা) প্রমুখ মোজার উপর মসেহ করেছেন। অধিকন্তু হযরত উমর (রা) ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও এ কাজের বর্ণনা আছে। বরং বায়হাকী ইবনে আব্বাস (রা) ও আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে এবং তাহাবী আউস ইবনে আবু আউস থেকে এ বর্ণনাও করেছেন যে, হুজুর (স) শুধুমাত্র জুতার উপরই মসেহ করেছেন। এতে মোজার উল্লেখ নেই। আর এমন কাজ হযরত আলী (রা) করেছেন বলে উল্লেখ আছে। উপরোল্লিখিত বিভিন্ন রিওয়ায়েতের মাধ্যমে জানা যায় যে, শুধুমাত্র জুতা এবং মোজাসহ জুতার উপর মসেহ করাও তেমনিভাবে জায়েয, যেমন চামড়ার মোজার উপর মসেহ করা জায়েয। এসব রিওয়ায়েতের কোথাও রাসূল (স) ফকীহদের আলোচ্য শর্তাবলীর কোনো শর্তের কথা বর্ণনা*

করেননি। কোনো জায়গায় এ কথারও উল্লেখ পাওয়া যায়না যে, রসূল (স) এবং উপরোল্লিখিত সাহাবাগণ যেসব মোজার উপর মসেহ করেছিলেন, সেগুলো কোন্ ধরনের ছিল। এ কারণে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, যেহেতু শরীয়তের প্রবর্তক নন, সেহেতু তাদের আরোপিত শর্ত যদি না মানা হয়, তাহলে গুনাহ হতেপারেনা।

ইমাম শাফেয়ী (র) ও আহমদের (র) মতে, মানুষ এমন অবস্থায় মোজার উপর মসেহ করতে পারে যখন জুতা উপরে পরিধান করে। কিন্তু এখানে যেসব সাহাবার আছারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের কেউ এ শর্ত মেনে চলেননি।

মোজার উপর মসেহ করার ব্যাপারে চিন্তা–ভাবনা করে আমি যা কিছু বুঝেছি তাহলো, প্রকৃতপক্ষে এটা তায়াম্মুমের মত একটি অবকাশ। যখন কোন মু'মিন বান্দা তার পা ঢেকে রাখতে বাধ্য হয় অথবা বার বার পা ধোয়া তার জন্য ক্ষতিকর কিংবা কষ্টকর হয়, তখন তাকে এ সহজ পন্থা অবলম্বনের অবকাশ দেয়া হয়েছে। এই সুবিধার ভিত্তি এই অনুমানের উপর নয় যে, উযুর পর মোজা পরিধান করলে পা অপবিত্রতা থেকে নিরাপদ থাকবে, সুতরাং পা ধোয়ার প্রয়োজনীয়তা থাকবেনা। বরং এর ভিত্তি হলো, আল্লাহর সেই মহান রহমত, যা বান্দাকে অবকাশ প্রদানের প্রয়াসী। কাজেই এমন প্রত্যেক বস্তু যা শীত থেকে অথবা রাস্তার ধূলাবালি থেকে বাঁচার জন্যে কিংবা কোনো ক্ষতের হিফাজতের জন্যে মানুষ পরিধান করে থাকে এবং যা বার বার খোলা এবং পুনঃপরিধান করা কষ্টকর, তার উপর মসেহ করা যায়। সেটা পশমের পদাবরণী হোক কিংবা সুতার, চামড়ার জুতা হোক কিংবা ফ্রিমসের; অথবা কোনো কাপড়ই হোক না কেন, যা পায়ের সাথে লেপটে বাঁধা হয়েছে।

আমি যখন কাউকে উযু করার পর পা মসেহ করার জন্যে হাতকে পায়ের দিকে বাড়াতে দেখি, তখন আমার মনে হয় এই বান্দা যেন আপন রবকে বলছেনঃ "আদেশ দিলে এক্ষণি মোজা খুলে পা ধুয়ে নেবো। কিন্তু যেহেতু আপনিই অবকাশ দিয়েছেন, তাই মসেহ করেই ক্ষ্যান্ত হচ্ছি।" আমার মতে মোজা ইত্যাদির উপর মসেহ করার তাৎপর্যের এটাই প্রকৃত প্রাণসত্ত্বা। আর এই প্রাণসত্ত্বার দিক দিয়ে ঐ সমস্ত জিনিস সমান, যেগুলো ঐসব প্রয়োজন পূরণের জন্যে মানুষ পরিধান করে থাকে, যেগুলোর সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে মসেহ করার অবকাশ দেয়া হয়েছে। [তরজমানুল কুরআন, রমযান–শাওয়াল ১৩৭১, জুন–জুলাই ১৯৫২]

মেরু অঞ্চলে নামায রোযার সময়সূচী

প্রশ্নঃ আমার এক পুত্র ট্রেনিং গ্রহণের জন্যে বৃটেনে গিয়েছে। আজকাল সে উত্তর মেরুর নিকটবর্তী স্থানে অবস্থান করছে। সে নামায ও রোযার সময়সূচীর জন্যে একটি নীতিগত বিধান চায়। বৃষ্টি, মেঘ ও কুয়াশার আধিক্যের কারণে সেখানে সাধারণত সূর্য কম দেখা যায়। কখনো দিন খুব বেশী বড় হয়ে যায়, আবার কখনো খুব বেশী ছোট হয়ে যায়। অনেক সময় সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মধ্যে ২০ ঘন্টার ব্যবধান হয়। এ অবস্থায় কি ২০ ঘন্টা বা এর চাইতে বেশী সময় রোযা রাখতে হবে?

জবাবঃ যেসব দেশে ২৪ ঘন্টার মধ্যে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয়, দিন ও রাত ছোট হোক বা বড় হোক সেখানে নামায ও রোযার সময়সূচী কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত নিয়মানুযায়ী নির্ধারিত হবে। অর্থাৎ ফযরের নামায সূর্যোদয়ের পূর্বে, যোহরের নামায সূর্য মধ্য গগণে গিয়ে পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পর, আসরের নামায সূর্যাস্তের পূর্বে, মাগরিবের নামায সূর্যাস্তের পর এবং ঈশার নামায রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হবার পর পড়তে হবে। অনুরূপভাবে রোযা অবশ্যি সুবহে সাদিক দেখা দেবার পর শুরু হবে এবং সূর্যাস্তের পর মুহূর্তেই ইফতার করতে হবে। যেখানে যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও ঈশার মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব হবেনা, সেখানে দুই ওয়াক্তের নামায একত্রিত করে পড়ে নেবে।

আপনার পুত্র যে এলাকায় থাকে, তার নিজের সুবিধার জন্যে বৃটেনের আবহাওয়া বিভাগ থেকে সে এলাকার সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও মধ্যাহ্নের সময় জেনে নেয়া উচিত্। অতপর সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে নিজের নামাযের সময় নির্ধারণ করতে হবে।

রোযার জন্যে ওখানকার দিনের অত্যধিক দীর্ঘতা দেখে ঘাবড়াবার প্রয়োজন নেই। ইবনে বতুতা রাশিয়ার বুলগার শহর সম্পর্কে লিখেছেন, গ্রীষ্মকালে যখন তিনি সেখানে পৌছেন, তখন রমযান মাস ছিল এবং ইফতারের সময় থেকে নিয়ে সুবেহ সাদিক পর্যন্ত মাত্র দু'ঘন্টা সময় পাওয়া যেতো। এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে সেখানকার মুসলমানরা ইফতার করতো, আহার করতো এবং ঈশার নামাযও পড়তো। ঈশার নামাযের পর সামান্য সময় অতিবাহিত হতে না হতেই সুবহে সাদিক দেখা দিত এবং তারপর ফযরের নামায পড়া হতো। [তরজমানুল কুরআন, জুন–জুলাই ১৯৫২]

বৃটেনে অধ্যয়নরত ছাত্রের সমস্যা

প্রশ্নঃ এখানে এসে আমি কয়েকটি অদ্ভুত সমস্যায় পড়েছি। খাদ্যের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী অসুবিধা দেখা দিয়েছে। এখনো গোশ্ত খাওয়া বন্ধ রেখেছি।

কেবল শাক–সবজি খাচ্ছি। আপনি জানেন সবজি এখানে কেবল সিদ্ধ করাই পাওয়া যায় এবং তাও আলুর পরিমাণই বেশী। ডিম এমনিতেই কম পাওয়া যায়। উপরন্তু তা রেশনে নিতে হয়। সপ্তাহে দু'তিনটে ডিম পাওয়া যেতে পারে। লন্ডন ওকিং মসজিদের ইমাম ডাঃ আবদুল্লাহ সাহেবের সাথে সাক্ষাত করেছি। তিনি বলেনঃ কুরআন মজীদের দৃষ্টিতে চারটি বস্তু হারাম। এক. শুকরের গোশ্‌ত, দুই. রক্ত, তিন. মৃতের গোশ্‌ত, চার, আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে যে পশু যবেহ্ করা হয় তার গোশ্‌ত। অতপর তিনি আরো বলেছেন, এখানকার যবেহ্ পদ্ধতি সম্পর্কে বলা যায় যে, এই পদ্ধতিতে প্রধান শিরা কাটা হয়, যার ফলে সমস্ত রক্ত বের হয়ে যায়। চিকিৎসা শাস্ত্রের দৃষ্টিতে এই রক্ত বের হয়ে যাওয়া অপরিহার্য বলে এখানে বিশেষভাবে এদিকে দৃষ্টি রাখা হয়। তবে এ কথা সত্য যে, এখানে গলা সম্পূর্ণ কেটে ফেলে মন্ডুটাকে ধড় থেকে পৃথক করে দেয়া হয়। কিন্তু কুরআনে এ ব্যাপারে কোনো নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করা হয়নি। দ্বিতীয়ত, এখানে পশু যবেহ্ করার সময় কোনো নাম উচ্চারণ করা হয়না। বরং পণ্যদ্রব্য হিসেবে প্রতিদিন হাজার হাজার পশু যবেহ্ করা হয়। এ থেকে তিনি এ সিদ্ধান্তে পৌছেন যে, আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করা হলেও অন্য কারুর নাম উচ্চারণ করা হয়না। কাজেই গায়রুল্লাহর সাথে সম্পর্কিত না হওয়ার কারণে তা আহার করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে তাঁর সাথে অনেক আলোচনা হয়েছে কিন্তু আমার মন এই গোশ্‌ত জায়েয বলে স্বীকার করতে পারছেনা।

আবার খাদ্যের মধ্যে যে সুরুয়া (সুপ) পরিবেশন করা হয় তা কখনো কখনো কেবল সবজি থেকেই তৈরি করা হয়। কিন্তু আজই ঘটনাক্রমে তার মধ্যে এক টুকরো গোশ্‌ত পেলাম। অভিযোগ করায় জানা গেলো যে, কখনো কখনো গোশ্‌তের সাথে সবজি মিশিয়ে ঝোল তৈরি করা হয়। এখন সমস্যা হচ্ছে, যেখানে একশো দু'শো লোক নিশ্চিন্তে এসব খেয়ে চলছে, সেখানে দু'চার জনের কথা কেইবা শুনবে? তারপর মাখন, পনির ও মিষ্টি খাদ্যও দেয়া হয়। এগুলোতেও হারাম দুধ বা চর্বি মিশ্রণের ব্যাপারে প্রবল সন্দেহ রয়েছে। এছাড়াও বাবুর্চি হারাম খাদ্যে ব্যবহৃত চামচ হয়তো অন্যান্য খাদ্যের মধ্যেও ডুবিয়ে দিয়ে থাকবে। এই অদ্ভুত সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্যে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।

দ্বিতীয়ত, নামায সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। ফযরের নামাযের সময় ৬টা ৩৮ মিনিট পর্যন্ত থাকে। খোদার মেহেরবানীতে এ নামাযটি যথাযথভাবে আদায় করি। যোহরের নামাযের জন্যে সময় করে উঠা বড় কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। সাড়ে ১২টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত খাবার ছুটি পাওয়া যায়। এই এক ঘন্টার মধ্যে ক্লাস থেকে মেস পর্যন্ত যাওয়া–আসায় সময় লাগে এবং এ থেকে উযু ও নামাযের জন্যেও সময় বের করতে হয়। কিন্তু এতে বড় কষ্ট হয়। আসরের নামাযের জন্যে

আদতে সময়ই পাওয়া যায়না। কেননা সাড়ে ৪টার সময় অবসর পাওয়া যায় এবং সাড়ে ৪টা থেকে ৫টা পর্যন্ত নাস্তা দেয়া হয়। এই সময় ৪টা ৪৮ মিনিটে মাগরিব হয়ে যায়। নাস্তার পর সংগে সংগেই মাগরিবের নামায পড়ি কিন্তু আসরের নামাযটা আর পড়া হয়না। আমি জানতে চাই, যোহ্‌র ও আসর এবং মাগরিব ও ঈশার নামাযকে একত্রিত করে পড়ার নিয়মটি কেমন? ওকিং মসজিদের ইমাম সাহেব অনেক সময় দুই নামাযকে একত্রিত করে পড়েন।

এখানে আমরা বারজন ছাত্র এসেছি। তন্মধ্যে আমরা পাঁচজন ছাত্র ইসলামী বিধান মেনে চলার প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখি। আমাদের অবশিষ্ট সাথীরা আমাদেরকে বিভিন্ন উপায়ে বোকা বানায়। তবুও আল্লাহর মেহেরবানীতে আমি কখনও তাদের কথায় ঘাবড়াইনি বরং যথার্থ জ্ঞানলাভ করে তার উপর আমল করতে চাই এবং অন্যকে যুক্তিসংগত জবাবও দিতে চাই। এই বিষয়গুলি নিয়ে আমি হামেশা আল্লাহকে হাযির নাযির জেনে চিন্তা করেছি এবং হামেশা আশা করেছি যে, আল্লাহ্ আমাকে নির্ভুল পথে পরিচালিত করবেন। কিন্তু মানসিক দুর্বলতার কারণে হয়তো কখনো ভুল পথ অবলম্বন না করে বসি এজন্যে ভয় করি। এজন্যে আপনার নিকট প্রশ্ন করছি।

জবাবঃ আপনি যে বিষয়গুলো সম্পর্কে আমার অভিমত জানতে চেয়েছেন, সেগুলো সম্পর্কে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য নিম্নরূপঃ

১. যবেহকৃত পশুর গোশ্‌ত খাওয়ার ব্যাপারে কেবল তার প্রধান শিরা কেটে রক্ত বের করে দেয়াই যথেষ্ট নয় বরং আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে তাকে যবেহ করাও অপরিহার্য। কুরআনে বলা হয়েছে, 'যাকে যবেহ্ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করা হয়, তার গোশ্‌ত খেয়োনা।' বলা বাহুল্য, ইংল্যান্ডে যে সমস্ত পশু হত্যা করা হয়, সেগুলোর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়না। কাজেই সেগুলোর হালাল হবার কোনো কারণ নেই। এতে সন্দেহ নেই যে, সূরা মায়েদায় 'আহলে কিতাবের খাদ্য' আমাদের জন্য জায়েয গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ্ আমাদের জন্য যে সমস্ত বস্তু নাজায়েয গণ্য করেছেন, সেগুলোও আমরা আহলে কিতাবের হাত থেকে নিয়ে খেয়ে ফেলতে পারি। তাই ডাঃ আবদুল্লাহ্ সাহেবের মতের সাথে একমত হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে আপনার নিজের খাদ্যের ব্যাপারে যে সমস্ত সমস্যা দেখা যাচ্ছে তার সমাধান প্রয়োজন। এর একটি সমাধান এই, আপনি গোশ্‌ত জাতীয় খাদ্য খাবেননা, শাক–সবজি (VAGETABIAN DIET) খাবেন। ইংল্যান্ডে এর ব্যবস্থা আছে। আর যদি গোশ্‌তের কোনো টুকরো তার মধ্যে এসে পড়ে, তাহলে খাদ্য ব্যবস্থাপকের নিকট অভিযোগ করে তার পথ রোধ করুন। দ্বিতীয়ত, মন থেকে সংশয় দূর করুন। আপনার সম্মুখে দস্তরখানের উপর যে খাদ্যবস্তু পেশ করা হয়,

তার মধ্যে যদি কোনো হারাম বস্তু না থাকে, তাহলে নিশ্চিন্তে তা খেয়ে ফেলুন এবং এই ধরনের কোনো সন্দেহ পোষণ করে নিজের মানসিক পেরেশানি বৃদ্ধি করবেননা যে, হয়তো এর মধ্যে কোনো হারাম খাদ্যের চামচ ডুবিয়ে দেয়া হয়েছিল বা কোন হারাম পশুর চর্বি এর সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছিল। আপনার কর্মের ভিত্তি তত্ত্ব ও বিশ্বাসের উপর স্থাপিত হওয়া উচিত, সন্দেহ ও সংশয়ের উপর নয়। যে খাদ্যে হারাম বস্তু শামিল করা হয়েছে বলে আপনি নিশ্চিত কেবল সেই খাদ্যটিকে বর্জন করুন। তৃতীয়ত, গোশ্‌ত খাবার ইচ্ছা হলে মাছ রান্না করে খাবেন বা ইহুদীদের যবেহকৃত পশুর গোশ্‌ত সংগ্রহ করবেন। ইংল্যান্ডে ইহুদীদের যবেহকৃত পশুর গোশ্‌ত সংগ্রহ করা কঠিন নয়।

২. নামাযের ব্যাপারে আপনার যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তার সমাধান হলো, যোহরের নামাযের সুন্নাত পড়ার সময় না পেলে কেবল ফরযটাই পড়ুন। আসরের নামাযের জন্যে কোনোক্রমে সময় পাওয়া সম্ভব না হলে মাগরিবের সাথে তাকে কাযা পড়ুন। দুই ওয়াক্তের নামায একত্রিত করে পড়ার ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। এক দলের মত যোহর ও মাগরিবের শেষ সময়ে আসরকে যোহরের সাথে ও ঈশাকে মাগরিবের সাথে মিলিয়ে পড়া যেতে পারে। দ্বিতীয় দলের মতে এক ওয়াক্তের নামাযের সাথে অন্য ওয়াক্তের নামায আগে–ভাগেও পড়া যেতে পারে। কিন্তু প্রায় সকল আহলে সুন্নাত আলেম দুই ওয়াক্তের নামায একত্রিত করে পড়ার অভ্যাস বানিয়ে নেয়াকে নাজায়েয গণ্য করেছেন। কারণ পাঁচ ওয়াক্তের নামায কার্যত তিন ওয়াক্তে পরিণত হয়। কাজেই আপনি এ কাজ থেকে বিরত থাকুন। তবে কখনো আসরের নামায পড়া সম্ভব না হলে তা কাযা পড়ে নেবেন।

আমি দুঃখিত যে, আমাদের সরকার যাদেরকে শিক্ষা লাভের জন্যে বাইরে পাঠায়, তাদের ধর্মীয় প্রয়োজন পূর্ণ করার কোনো ব্যবস্থা করেনা। সরকারী পর্যায়ে এর ব্যবস্থা করা হলে ইংল্যান্ডে আমাদের ছাত্রদের জন্যে হালাল খাদ্যের সংস্থান করা সম্ভব হতো এবং নামাযের জন্যেও তাদের নিকট থেকে সময় নেয়া যেতো। [তরজমানুল কুরআন, ডিসেম্বর ১৯৫০]

কম ক্ষতিকর বিপদগ্রহণ করার নীতি

প্রশ্নঃ আহওয়ানুল বালইয়াতাইন (দু'টি বিপদের মধ্যে কম ক্ষতিকর বিপদ) গ্রহণ করা সম্পর্কে দীর্ঘকাল থেকে আমার মনে খট্‌কা জাগছে। আজকাল এ বিষয়টিকে এমনভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে যার ফলে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

আমাদের মুসলমানদের প্রথম শ্রেণীর নেতৃবৃন্দের [যেমন দেওবন্দের আলেম সমাজ, মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী ও হযরত মাওলানা আবুল কালাম আযাদ] জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্যের সাথে বিরোধ এমন একটি প্রশ্ন যে সম্পর্কে আমি মনে মনে বার বার চিন্তা করে এসেছি। আমার মনে হয়েছে, এই আলেমগণের দৃষ্টিতে ইসলামী আন্দোলনের আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে ত্যাগ করা আহওয়ান (কম ক্ষতিকর) হয়ে থাকবে, তাই তারা একে ত্যাগ করেছেন। অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামীর নিকট এটি গ্রহণ করা আহওয়ান হয়ে থাকবে, কাজেই তারা একে গ্রহণ করেছে। আমি এই চিন্তার মধ্যে ছিলাম এমন সময় তরজমানুল কুরআনে মাওলানা মাদানীর একটি লেখা পড়লাম। তাতে যথার্থই এই স্বীকারোক্তি ছিল যে, তিনি আহওয়ানুল বালইয়াতাইনকে গ্রহণ করেছেন। এ লেখা পড়ে আমি বিস্মিত হলাম। কিছুদিন পর ভারতের 'আল-ইনসাফ' পত্রিকায় জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের পলিসি সম্পর্কে মাওলানার একটি বিবৃতি পাঠ করে আমি তার পূর্বোক্ত কথার মর্মোদ্ধার করতে পারলাম। বিবৃতিতে তিনি বলেছিলেনঃ কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট ছিল দু'টি বালা। তন্মধ্যে আহওয়ান (সহজতর) কংগ্রেসকে আমরা গ্রহণ করেছি।

আমি মনে করতাম, কুরআন যেখানে ইযতিরার (নিরুপায়) অবস্থায় শুকরের গোশ্ত খাওয়ার অনুমতি দিয়েছে, সেখানে বালইয়াতাইন হচ্ছে ঐ হারামটি ত্যাগ বা গ্রহণ করার দু'টি বিকল্প ব্যবস্থা। অর্থাৎ একদিকে মানুষ শুকরের গোশ্ত খেয়ে মৃত্যু থেকে বাঁচতে পারে বা অন্যদিকে শুকরের গোশ্ত না খেয়ে মৃত্যু বরণ করে পরিপূর্ণ ঈমানের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে। কিন্তু দু'টি হারাম বস্তুর মধ্যে একটিকে আহওয়ান মনে করে গ্রহণ করাই কি এর উদ্দেশ্য? যেমন, একদিকে শুকরের গোশ্ত ও অন্যদিকে শকুনের গোশ্ত আছে। এক্ষেত্রে অনাহারে মৃত্যুর মুখোমুখি দন্ডায়মান এক ব্যক্তি কি একথা চিন্তা করবে যে, শুকরের গোশ্ত অধিক গুরুপাক এবং শকুনের গোশ্ত লঘুপাক, কাজেই শকুনের গোশত হবে আহওয়ান?

জবাবঃ *আহওয়ানুল বালইয়াতাইন (কম ক্ষতিকর বিপদ) গ্রহণ করার অর্থ হলো, যখন দু'টি নাজায়েয কাজের কোনো একটিকে গ্রহণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তখন তাদের মধ্য থেকে অপেক্ষাকৃত কম নাজায়েয কাজটিকে গ্রহণ করা। এ ব্যাপারে প্রথম শর্ত হচ্ছে, ভালো ও সুকৃতির পথ যদি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকে এবং তা অবলম্বন করার কোনো সম্ভাবনাই না থাকে, তাহলে একমাত্র এহেন অবস্থায় মানুষের জন্যে আহওয়ানুল বালইয়াতাইন গ্রহণ করা জায়েয হতে পারে। অন্যথায় ভালো ও সুকৃতির পথের সামান্যতম সম্ভাবনা থাকলে যে ব্যক্তি স্বল্প হিম্মতের দরুন দু'টি নাজায়েয কাজের কোনো একটির মধ্যে নিজেকে*

নিক্ষেপ করে, সে গুনাহগার হবে। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, দু'টি নাজায়েয কাজের একটিকে এমনিতেই আহওয়ান মনে করলে হবেনা বরং শরীয়তের নীতির ভিত্তিতে বিচার করে দেখতে হবে যে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে কোন্ বিপদটিকে আহওয়ান (কম ক্ষতিকর) ও কোন্ বিপদটিকে আশাদ্দ (বেশী ক্ষতিকর) গণ্য করা যেতে পারে। যেমন, আমি আপনার পেশকৃত দৃষ্টান্তটিই পেশ করছি। মনে করুন এক ব্যক্তি ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছে এবং মৃত্যু থেকে রক্ষা পাবার জন্যে তার নিকট মাত্র দু'টি খাদ্য রয়েছেঃ একটি হচ্ছে, শুকরের গোশ্ত আর অন্যটি শকুনের গোশ্ত। এখন ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে তার নিকট শকুনের গোশ্তই আহওয়ান হবে। কারণ কুরআনে তার হারাম হবার ব্যাপারে স্পষ্ট উল্লেখ নেই বরং হাদীসে একটি মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে, শকুনও তার আওতায় পড়ে। অথবা যেমন কোনো শক্তিশালী যালেম কোনো নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করতে উদ্যত এবং আপনি ঐ নিরপরাধ ব্যক্তিকে আশ্রয় দিয়েছেন কিন্তু ঐ যালেমের সাথে লড়াই করে নিরপরাধীর প্রাণ রক্ষা করার শক্তি আপনার নেই। এ অবস্থায় ঐ যালেম এসে যদি আপনার নিকট নিরপরাধী কোথায় আছে জানতে চায়, তখন আপনার জন্যে মাত্র দু'টি পথ খোলা থাকে। অর্থাৎ আপনি মিথ্যা বলে তার প্রাণরক্ষা করতে পারেন অথবা তার সন্ধান দিয়ে তাকে হত্যা করার জন্যে পেশ করতে পারেন। [তরজমানুল কুরআন, এপ্রিল-মে ১৯৫২]

পোস্টমর্টেম, বক্ষ বিদীর্ণ এবং 'দিল' শব্দের কুরআনিক অর্থ

প্রশ্নঃ ১. ইসলামী রাষ্ট্রে কি পন্থায় মৃতদেহের POST MORTEM করা হবে? ইসলাম মৃতদেহকে অমর্যাদা করার অনুমতি দেয়না। পোস্টমর্টেম দুই ধরনের হয়ঃ এক, MEDICO-LEGAL. এটি মূলত অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে করা হয়। দুই, PATHOLOGICAL প্রয়োজনে। সম্ভবত ইসলামী রাষ্ট্রে প্রথমোক্ত বিষয়টির তেমন কোনো গুরুত্ব নেই। কিন্তু শেষোক্তটির প্রয়োজন অস্বীকার করা যেতে পারেনা। কারণ এভাবে রোগ নির্ণয়ে ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে অনেক নতুন তথ্য সংযোজিত হতে পারে।

২. শুনেছি রসূলুল্লাহর পবিত্র বক্ষ বিদীর্ণ করা হয়েছিল এবং তাঁকে সকল প্রকার কলুষতামুক্ত করা হয়েছিল। নবুয়্যতের চাহিদা পূর্ণ করা ও নিষ্পাপ সত্তার গুণাবলী সৃষ্টি করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। অন্যথায় বলা যায়, তাঁর দিল যেনো অধিকতর রওশন হতে পারে এবং ভালো ও পবিত্র চিন্তা হৃদয়ে স্থান লাভ করতে ও গুনাহর চিন্তার পথ রুদ্ধ হতে পারে, এই ছিল এর উদ্দেশ্য। এ কথা কতদূর সত্য?

৩. এই সংগে 'খাতামাল্লাহু আলা কুলুবিহিম' থেকে এ চিন্তার উদয় হয় যে, সম্ভবত 'দিলই' সকল ধারণা চিন্তার AGENCY । সম্ভবত তৎকালে হাকিম জালিনুসের মতবাদ অনুযায়ী 'দিল'কে চিন্তার উৎসস্থল (ORIGINATOR OF THOUGHT) মনে করা হতো। কিন্তু আধুনিক কালে চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, 'দিল' (HEART) কেবল রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া জারী রাখার একটি অংগ বিশেষ। আর সব রকমের চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা, আবেগের কেন্দ্র হচ্ছে মস্তিষ্ক। এ বিষয়টি জানার পর যখনই 'দিলে'র সাথে এমন কোনো বস্তুর সংযোগ দেখানো হয় যার সম্পর্ক মূলত মস্তিষ্কের সাথে, তখনই দেখা দেয় জটিলতা।

জবাবঃ ১. পোস্টমর্টেম সম্পর্কে আমি এখনো কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারিনি। এ কথাও মানি, এমন অনেক প্রয়োজন আছে যে জন্যে এ কাজটি অপরিহার্য, কিন্তু এ সত্ত্বেও এ ব্যাপারে মনে ভীষণ ঘৃণার সঞ্চার হয় এবং চরম প্রয়াজনীয় অবস্থা ও অনিবার্য কারণ ছাড়া শরীয়তের নির্দেশাবলীর মধ্যে আমি এর কোনো অবকাশ দেখিনা। বলা বাহুল্য, এটি তেমন কোনো জটিল সমস্যা নয়। ইসলামী রাষ্ট্রে বিশেষজ্ঞগণ পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে এ সমস্যার সমাধান করতে পারবেন।

২. রসূলুল্লাহর (সঃ) পবিত্র বক্ষ বিদীর্ণ করার বিষয়টি 'মুতাশাবেহাতে'র অন্তর্ভুক্ত। এটি বুঝা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই এর উপর গবেষণার ভিত্তি স্থাপন করা যেতে পারেনা।

৩. দিল শব্দটি ANATOMY ও PHYSIOLOGY তে যে অর্থে ব্যবহৃত হয় সাহিত্যে ঠিক সে অর্থে ব্যবহৃত হয়না। সাহিত্যে 'মস্তিষ্ক' REASON এর প্রতিনিধিত্ব করে এবং বিপরীত পক্ষে 'দিল' আবেগ, অনুভূতি, ইচ্ছাশক্তি ও সংকল্পের কেন্দ্র রূপে স্বীকৃত। আমরা হর-হামেশা বলে থাকি, আমার দিল মানছেনা, আমার দিলে এ চিন্তার উদয় হলো, আমার দিল চায় ইত্যাদি। ইংরেজীতে *Qualities of head and heart* শব্দটির ব্যবহার অত্যন্ত বেশী। এ শব্দগুলো বলার সময় কোনো ব্যক্তিও শবব্যবচ্ছেদ বিদ্যার দিল মনে করেনা। হতে পারে, জালিনুসের সাথে যে মতবাদের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে তারই আওতায় এর পথচলা শুরু হয়েছে। কিন্তু সাহিত্যে যেসব শব্দের ব্যবহার শুরু হয়, তা অনেক সময় নিজের প্রারম্ভিক অর্থের উপর কায়েম থাকেনা। [তরজমানুল কুরআন, এপ্রিল-মে ১৯৫২]

পোস্টমর্টেম ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের অন্যান্য সমস্যা

প্রশ্নঃ আগের পত্রের জবাবে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারিনি। আপনি লিখেছেন,

পোস্টমর্টেমের প্রয়োজনীয়তাও স্বীকৃত। আবার প্রয়োজনীয় অবস্থা ও অনিবার্য কারণ ছাড়া শরীয়তের বিধানের মধ্যে এর অবকাশ দেখিনা। কিন্তু সমস্যা হলো, চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে যে রোগীর রোগ নির্ণয় সম্ভব হয়নি অথবা রোগ নির্ণীত হওয়া সত্ত্বেও চিকিৎসা ব্যর্থ হয়েছে কমপক্ষে তার লাশের পোস্টমর্টেম করা একান্ত প্রায়োজন। অনুরূপভাবে চিকিৎসা আইনের (MEDICO-LEGAL) দৃষ্টিতেও অপরাধের স্বরূপ নির্ণয়ের জন্যে পোস্টমর্টেম অপরিহার্য। উপরন্তু এনাটমি, ফিজিওলজি এবং অপারেটিভ সার্জারির শিক্ষাও মানবদেহের সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়। শরীয়তের বিধান অনুযায়ী এই সব অবস্থাকে চরম প্রয়োজনীয় অবস্থা বলা যায় কিনা?

আপনি লিখেছেনঃ আজকাল অ্যালকোহলকে একটি চমৎকার মিশ্রণ হিসেবে ওষুধ তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ওষুধ প্রশাসনকে যখন মুসলমান বানানো হবে, তখন অ্যালকোহলের ব্যবহার বন্ধ করা হবে। রাসায়নিক পরিভাষায় অ্যালকোহল শব্দটি নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু হিসেবে পরিচিত নয়। বরং রসায়নশাস্ত্রে এটি বস্তুর একটি বিশেষ গ্রুপের নাম। এর মধ্যে নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু ছাড়া আরো বহু বস্তু রয়েছে। তাহলে কি ঐসব বস্তুর ব্যবহারও নাজায়েয হবে? এছাড়া দেহের বহির্দেশেও অ্যালকোহল ব্যবহার করা হয়। কারণ অ্যালকোহল কেবল রাসায়নিক মিশ্রণেই সাহায্য করেনা, এটা জীবাণুনাশকও বটে। এ ধরনের ব্যবহারও কি নিষিদ্ধ?

তাফহীমুল কুরআনের একস্থানে আপনি এ কথাও লিখেছেন যে, মুসলমান চিকিৎসকরা ওষুধ তৈরির ক্ষেত্রে অ্যালকোহলের পরিবর্তে মধু ব্যবহার করতো। উপরন্তু আপনি সেখানে এ পরামর্শও দিয়েছেন যে, মধুমক্ষিকাকে ট্রেনিং দিয়ে বিশেষ গাছ–গাছড়া থেকে রস সংগ্রহ করা যেতে পারে। আধুনিক শিল্পোন্নতির যুগে আপনার মধুকে অ্যালকোহলের বিকল্প নির্ধারণ করা এবং মধুমক্ষিকাকে ট্রেনিং দানের পরামর্শ দেয়া আমার নিকট বোধাগম্য নয়।

এখন আমি সংক্ষেপে কয়েকটি প্রশ্ন করছি, এগুলোর জবাব দেবেনঃ

১. রোগী বাঁচাবার জন্যে তার দেহে রক্ত প্রবেশ করানো কোনো কোনো আলেমের মতে নাজায়েয। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?

২. মানুষের বা পশুর পেশাব, রক্ত বা গোশ্‌ত থেকে অনেক ওষুধের উপাদান সংগ্রহ করা হয়। তিমি মাছের চামড়ার নিচের শক্ত অংশ দিয়েও নানা প্রকার ওষুধ তৈরি করা হয়। এই ধরনের ওষুধ শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয কিনা?

৩. ডাক্তারীর ফি নির্ধারণ বা এর দাবী করা জায়েয কি? অথবা এটি কি রোগীর ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া উচিত?

৪. বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ইসলাম কতটুকু পথ–নির্দেশ দেয়?

৫. খাদ্য ও ওষুধের হালাল–হারামের ব্যাপারে শরীয়তের নির্দেশ কি?

৬. মুসলিম ডাক্তারগণ চিকিৎসা বিজ্ঞানকে ইসলামের অনুগত করার ক্ষেত্রে কি খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন?

জবাবঃ *১. ইতিপূর্বেই বলেছি, পোস্টমর্টেম সম্পর্কে আমার নিজের মনে অনেক দ্বিধা–সংশয় আছে। এ ব্যাপারে কোনো চূড়ান্ত কথা বলা আমার পক্ষে কঠিন। এ বিষয়টির দুটি ভিন্ন দিক আছে। এদের দাবী পরস্পরবিরোধী।*

একদিকে শরীয়তের বিধান মৃত ব্যক্তির দেহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাকে মর্যাদা সহকারে দাফন করার তাগিদ দেয় এবং সে মুসলমান হলে তাকে গোসল ও কাফন দিয়ে জানাযার নামায পড়ার নির্দেশ দেয়। [সম্ভবত ডাক্তার ও আগাগোড়া বিজ্ঞানী ধরনের লোকদের কথা বাদ দিলে] মানুষের সূক্ষ্ম মানবিক অনুভূতিও শরীয়তের এ বিধানসমূহকে সমর্থন করে। কোনো ব্যক্তি কি সানন্দে এটা বরদাশত করতে পারেন যে, তার পিতা, পুত্র, স্ত্রী, বোন ও মাতার মৃতদহ ডাক্তারের হাতে সোপর্দ করা হবে এবং তারা এগুলো কাটাকুটি করবে? অথবা এগুলো মেডিকেল কলেজের ছাত্রদেরকে দেয়া হবে এবং তারা এদের এক একটি অংশ পর্যবেক্ষণ করে হাড়গুলো শুকিয়ে রেখে দেবে। অনুরূপভাবে কোনো জাতিও নিজেদের নেতৃবৃন্দের মৃত্যুর পর তাদের দেহ পোস্টমর্টেম করতে প্রস্তুত হবেনা। সাম্প্রতিককালে গান্ধীজী ও মরহুম লিয়াকত আলী খান গুলীবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ করেন। 'চিকিৎসা আইনের' দৃষ্টিতে তাঁদের মৃতদেহ পোস্টমর্টেম করে মৃত্যুর কারণ নির্ণয় করা অপরিহার্য ছিল। কিন্তু তা করা হয়নি কেন? কেবল এ জন্যে করা হয়নি যে, জাতীয় আবেগ–অনুভূতি সম্মানীয় নেতৃবৃন্দের মৃতদেহ কাটাকাটি করা বরদাশত করতে প্রস্তুত ছিলনা। এ হলো বিষয়টির একদিক।

অন্যদিকে চিকিৎসা ও আইনগত কারণে পোস্টমর্টেম করা জরুরী। চিকিৎসাশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখার শিক্ষা ও চিকিৎসা বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণার জন্যে এর প্রয়োজন অস্বীকার করা যেতে পারেনা। এবং হত্যা মামলায় মৃত্যুর কারণ নির্ধারণের প্রশ্নে আইনও কিছুটা এর দাবী করে।

এই দুটি বিপরীতমুখী দাবীর মধ্যে আপোষ করা একটি অত্যন্ত জটিল প্রশ্ন। এই সমস্যাটির যে সমাধান আমাদের দেশে করা হয়েছে তা আমার নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় ও ঘৃণার্হ। অর্থাৎ এখানে ধনী ও গরীব এবং যার পরিবার–পরিজন আছে ও যার কেউ নেই, তাদের জন্যে দুটি পৃথক নৈতিক মানদন্ড ও দুটি ভিন্ন ভিন্ন কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। কাজেই এর অবশ্যি অন্য কোনো সমাধান খুঁজতে হবে। কিন্তু সে সমাধানটি কি? এ ব্যাপারে আমার চিন্তাশক্তি কোনো সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছতে সম্পূর্ণ অক্ষম। এ বিষয়টি সম্পর্কে এমন কোনো মজলিসে চিন্তা গবেষণা করা প্রয়োজন, যেখানে দীনী

আলেমগণ থাকবেন এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান ও আইন বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিগণও থাকবেন। সম্ভবত তারা সম্মিলিতভাবে এর কোন সমাধান তালাশ করতে সক্ষম হবেন।

২. অ্যালকোহল সম্পর্কে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হলো, বিভিন্ন প্রাকৃতিক বস্তুতে যে আংশিক অ্যালকোহল মজুদ থাকে অথবা একটি বিশেষ পর্যায়ে পৌঁছে তার মধ্যে যে অ্যালকোহল সৃষ্টি হয়ে যায়, সে অ্যালকোহলের কথা আমি বলছিনা। বরং বিভিন্ন বস্তু থেকে যে অ্যালকোহল বের করে নেয়া হয় এবং একটি নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তার কথাই বলছি। এ বস্তুটির আসল উপাদানই যেহেতু নেশা সৃষ্টিকারী, তাই এর ভেতরের ব্যবহার জায়েয নয়। কোনো ওষুধে যে অনুপাতে অ্যালকোহল ব্যবহার করা হয়, তার ফলে তা কার্যত নেশা সৃষ্টি করুক বা না করুক তাতে কোনো পার্থক্য সূচিত হয়না। তবে এর বাহ্যিক ব্যবহার জায়েয হতে পারে।

আপনি নিজের শিল্পের দৃষ্টিতে কি এ কথা বলতে পারেন যে, যে সমস্ত ওষুধ খাওয়া ও পানকরা হয়, সেগুলোর মধ্যে কোনো বস্তু অ্যালকো-হলের বিকল্প হতে পারেনা? এবং এর ব্যবহার কি নিতান্ত অপরিহার্য? আমার বন্ধুদের মধ্যে এমন অনেক ডাক্তার আছেন যারা অ্যালকোহল সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভংগিকে সমর্থন করেন। তাঁরা বলেন এর অন্য বিকল্প আছে। বরং তাঁদের অনেকেই ভেতরের ওষুধসমূহে এর ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছেন।

৩. মধু সম্পর্কে আমি তাফহীমুল কুরআনে যা কিছু লিখেছিলাম, মধু ও অ্যালকোহলের তুলনা করা তার উদ্দেশ্য ছিলনা। আমার বক্তব্য ছিল, মুসলমানদের মধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রচলন হবার পূর্বে যখন এ শিল্পটি অমুসলিমদের হাতে ছিল, তখন ওষুধ সংরক্ষণের জন্যে তারা হালাল-হারামের পার্থক্য না করে সব রকমের বস্তু ব্যবহার করতো। কিন্তু এ বিজ্ঞানটি যখন মুসলমানদের করায়ত্ত হলো, তখন তারা হালাল বস্তুর দিকে দৃষ্টি দিলেন। ওষুধকে তার আসল অবস্থার উপর কায়েম রাখার জন্যে তাদের নিকট একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ছিল মধু। মধু দীর্ঘকাল পর্যন্ত খারাপ হয়না এবং অন্যান্য বস্তুকেও তার মধ্যে সংরক্ষিত রাখে। পরে এ বিজ্ঞানটি যখন আবার এমন সব লোকের করায়ত্ত হলো যারা হালাল-হারামের মধ্যে পার্থক্য করেনা, তখন পুনর্বার অবাধে এর মধ্যে হারাম বস্তুর ব্যবহার হতে লাগলো। অ্যালকোহল হচ্ছে এ হারাম বস্তুগুলোর অন্যতম।

দ্বিতীয় যে কথাটির সাথে আপনি একমত হতে পারেননি, ওষুধ প্রস্তুত শিল্পের সর্বাত্মক উন্নতি সত্ত্বেও বিশেষজ্ঞগণ সেদিকে দৃষ্টি দিতে পারেন। আমি এ কথা বলছিনা যে, সমস্ত পদ্ধতি বাদ দিয়ে একমাত্র মধুমক্ষিকার উপর নির্ভর

করা হোক বরং আমি বলছি যে, মধুমক্ষিকাও ওষুধ নির্মাণ শিল্পের উৎকৃষ্ট খাদেমে পরিণত হতে পারে।

৪. প্রাণ বাঁচাবার জন্যে মানুষের দেহে রক্ত প্রবেশ করানো আমার মতে জায়েয। আমি বুঝিনা, একে হারাম বলার কি কারণ থাকতে পারে? সম্ভবত একে রক্তপান ও রক্ত আহারের উপর কিয়াস করে কেউ হারাম বলে থাকবে। কিন্তু আমার মতে শরীরে রক্ত প্রবেশ করানো এবং রক্তপান ও রক্ত আহারের মধ্যে পার্থক্য আছে। খাদ্য হিসাবে রক্তপান ও রক্ত আহার নিঃসন্দেহে হারাম। কিন্তু প্রাণ বাঁচাবার জন্যে রোগী বা আহত ব্যক্তির দেহে রক্ত প্রবেশ করানো 'ইযতিরার' অবস্থায় মৃত বা শুকরের গোশ্ত খাওয়ার ন্যায় জায়েয।

৫. বিভিন্ন প্রাণী থেকে ওষুধ তৈরি করা সম্পর্কে আপনি যে প্রশ্ন করেছেন তার জবাব হলো, নীতিগতভাবে হারাম বা মৃত প্রাণী থেকে গৃহীত অথবা হালাল প্রাণীর কোনো নাপাক বা হারাম বস্তু থেকে গৃহীত যে কোনো বস্তুই হারাম। এবং নীতিগতভাবে কোনো মানুষকে বাঁচাবার জন্যে কোনো হারাম বস্তুর ব্যবহার যদি অপরিহার্য হয়, তাহলে একমাত্র ঐ অবস্থায়ই তা জায়েয হতে পারে। এই নীতিদ্বয়ের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম প্রস্তুতকারকদের ওষুধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর নিজেদেরকেই মত প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কারণ নিজেদের শিল্প সম্পর্কে তাঁরা নিজেরা ভালো জানেন। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে, মুসলমানদের মধ্যে বর্তমান যে সকল ওষুধ প্রস্তুতকারকও চিকিৎসা বিজ্ঞানে পারদর্শী ব্যক্তি আছেন, তাঁরা গবেষক, আবিস্কারক বা উদ্ভাবক নন এবং ওষুধ প্রস্তুত শিল্পও তাঁদের আয়ত্তাধীন নয়। মুসলিম বিশেষজ্ঞ ও গবেষকদের শিল্প-জ্ঞান বেশী দূর অগ্রসর হয়না। অন্যেরা (যারা কার্যত আল্লাহর কোনো কিতাব এবং কোনো নবীর শরীয়তের অনুগত নয়) নিজেদের গবেষণা ও আবিস্কার উদ্ভাবনের মাধ্যমে যা কিছু বের করেছেন এরা কেবল সে সম্পর্কে অবগত হন, অতপর অন্যেরা যা কিছু যেভাবে তৈরি করে পাঠিয়ে দেন এরা কেবল সেগুলো ব্যবহার করেন। এদের এতটুকু যোগ্যতাও নেই যে, অমুসলিমরা যদি হারাম পদ্ধতিতে কোনো রোগের ওষুধ তৈরি করে থাকেন, তাহলে এরা নিজেদের গবেষণার মাধ্যমে তার কোনো বৈধ বিকল্প তৈরি করতে পারেননা বা গবেষণা করে কমপক্ষে এ কথা বলতে পারেননা যে, এর কোনো বিকল্প পাওয়া যেতে পারেনা, কাজেই এর ব্যবহার অপরিহার্য। এ অবস্থায় আমাদের ন্যায় এই শিল্প সম্পর্কে অজ্ঞ লোকদের নিছক হারাম-হালালের আলোচনা করে লাভ কি?

তিমি মাছ জায়েয। এই ধরনের একটি মাছ সাহাবাগণ তাঁদের যুদ্ধ সফরে খেয়েছেন এবং রসূল (স) তাকে জায়েয গণ্য করেছেন।

৬. ডাক্তারদের ফি নীতিগতভাবে জায়েয। তবে ডাক্তাররা সাধারণত তাদের ফি'র ব্যাপারে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তা গুনাহ, জুলুম ও ভীষণ নির্যাতনের পর্যায়ে যায়। তাই আমার মতে সরকারের পক্ষ থেকে সকল ডাক্তারের পর্যাপ্ত বেতন নির্ধারিত করা উচিত আর তাঁরা বিনামূল্যে রোগীদের চিকিৎসা করবেন।

৭. বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ অধ্যয়নের ব্যাপারে ইসলাম কি পথ প্রদর্শন করে? এ প্রশ্নের জবাবে একটি বিস্তারিত প্রবন্ধ লেখার প্রয়োজন। কিন্তু আমি সংক্ষেপে এ সম্পর্কে আপনার জন্যে কতিপয় ইংগিত প্রদান করছি।

বিজ্ঞানের যে কোনো বিভাগকেই নিন না কেনো, তা বিশ্বজাহানের কোনো একটি বস্তুর মৌলিক উপাদান ও বৈশিষ্ট এবং তার উপর কার্যকরী প্রাকৃতিক আইনসমূহ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করতে চায়। এই গবেষণা ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় মৌলিক গুরুত্বের অধিকারী। এক, এই গবেষণাকারী ব্যক্তি প্রথমে সামগ্রিকভাবে বিশ্বজাহান সম্পর্কে (যার কোনো একটি বস্তুর উপর সে নিজের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে) একটি নির্ভুল ও পূর্ণাঙ্গ ধারণা পোষণ করবেন। দুই, তিনি নিজেই নিজের আসল অবস্থা ও মর্যাদা এবং নিজের সীমারেখা যথাযথভাবে বুঝে নেবেন। এই বিষয় দুটি ছাড়া পৃথক পৃথক বস্তুর গবেষণা (যা অবশ্যি কেবল পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণলব্ধ বাস্তব ঘটনাবলী পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকেনা বরং কোনো না কোনো দার্শনিক মতবাদের জন্ম দেয়) মানুষকে কালেভদ্রে কোনো সঠিক পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। বাস্তব আবিষ্কার-উদ্ভাবনের কথা বাদ দিলে দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর ফল যদি কিছু থাকে, তাহলো, এই ধরনের গবেষণা মানুষ ও বিশ্ব সম্পর্কে আমাদের চিন্তাকে পূর্ণতা দান ও পরিস্ফুট করার পরিবর্তে তাকে অসম্পূর্ণ ও বিকৃত করে যেতে থাকবে।

ইসলাম আসলে আমাদের এ প্রয়োজনটিই পূর্ণ করে। কতিপয় মৌলিক বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপনের পরই সে আমাদেরকে সকল প্রকার গবেষণার জন্যে অগ্রসর হতে বলে। সে বলে, এই বিশ্বজগতকে খোদাহীনতা বা বহুখোদার যুদ্ধক্ষেত্র মনে করে গবেষণার কাজ শুরু করোনা। বরং এই বিশ্বজগতকে এই দৃষ্টিতে দেখো যে, এটি একজন স্রষ্টারই সৃষ্টি, এক সর্বশক্তিমান সত্তার রাজত্ব এবং এক মহাজ্ঞানীর জ্ঞানের প্রকাশ। দ্বিতীয়ত, নিজেকে (এবং সামগ্রিকভাবে মানব জাতিকে) স্বাধীন ও সকল প্রকার জবাবদিহি থেকে মুক্ত বা নেহাত অক্ষম অথবা সর্বক্ষমতাসম্পন্ন মনে করে গবেষণা শুরু করোনা। বরং এই হিসেবে গবেষণা শুরু করো যেন বিশ্বজাহানের রাজত্বের তুমি একজন প্রজা, তোমাকে কিছুটা ক্ষমতা দান করা হয়েছে এবং এই ক্ষমতার যথার্থ বা ভুল প্রয়োগের ব্যাপারে তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে।

সকল প্রকার গবেষণা–অনুসন্ধানের জন্যে এটি হচ্ছে একটি প্রারম্ভিক বিন্দু। গবেষণাকালে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মানুষ যে সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়ের সম্মুখীন হয়, সেগুলোর ব্যাপারে ইসলাম কেবল এতটুকুই দাবী করে যে,- আমাদের গৃহীত সিদ্ধান্ত যেনো আল্লাহর কিতাবে উল্লিখিত সত্যের বিরোধী না হয়। মনে করুন, যদি কোথাও কোনো প্রত্যক্ষ সত্য (OBSERVED FACTS) থেকে আমরা এমন কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে যাচ্ছি বলে মনে হয়, যা আল্লাহর কিতাবের সুস্পষ্ট বর্ণনা বিরোধী, তাহলে সেখানে আমাদের পর্যবেক্ষণ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতির মধ্যে কোনো গলদ রয়েছে কিনা তা গভীরভাবে নিরীক্ষণ করা উচিত। মনে রাখবেন, প্রমাণিত সত্য ও আল্লাহর কিতাবের সুস্পষ্ট বাণীর মধ্যে এ রূপ সংঘর্ষ বাঁধতে পারেনা বরং গবেষণা অনুসন্ধান থেকে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যার মধ্যে এ সংঘর্ষ লাগতে পারে। এ অবস্থায় আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা নয় বরং গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করা উচিত। কারণ গবেষণা–অনুসন্ধানের সময় বিভিন্ন মতবাদ থেকে গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষ সত্যের ন্যায় কোনো নিশ্চিত বস্তু নয়।

এই নীতিগত কথাগুলো অনুসন্ধান করার পর এখন নিজের গবেষণার পথ অনুসন্ধান করা আপনার নিজের দায়িত্ব।

৮. ওষুধ ও খাদ্যের মধ্যে কোন্ বস্তুগুলো পাক ও কোন্‌গুলো নাপাক এ কথা জানার জন্য আপনাকে কিছু হাদীস ও ফিকাহ্ অধ্যয়ন করা উচিত। কুরআনের বিধান জানার জন্যে তাফহীমুল কুরআন থেকে যথেষ্ট সাহায্য পাবেন। কিন্তু তবুও মৌলিক ও খুঁটিনাটি বিধান ও বিষয়সমূহ সম্পর্কে অবগত হবার জন্যে হাদীস ও ফিকাহ্ অধ্যয়নের প্রয়োজন। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে এখনো মেডিকেল কলেজে শরীয়তের বিধানসমূহ শিক্ষা দেবার প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। হবেই বা কেমন করে, আমাদের প্রধান শিক্ষক মহোদয় (ইংরেজ) যাকে অপ্রয়োজনীয় মনে করেছেন তাকে আমরা কেমন করে প্রয়োজনীয় মনে করতে পারি!

৯. মুসলমান চিকিৎসকগণ চিকিৎসা শাস্ত্রকে কেমন করে মুসলমান বানিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে একজন সুপন্ডিত চিকিৎসকই বিস্তারিত আলোচনা করতে পারেন। আমি এ সম্পর্কে কেবল সংক্ষেপে একটি কথা বলতে পারি। প্রথম যুগের মুসলিম চিকিৎসকগণ নিছক অন্ধ অনুসারীর ন্যায় এই শাস্ত্রকে অমুসলিম শিক্ষকদের নিকট থেকে হুবহু গ্রহণ করেননি বরং একে ইসলামে দীক্ষিত করেছিলেন। তাঁদের এ কর্মকান্ড কেবল ব্যবস্থাপত্রের উপর 'তিনিই আরোগ্যদাতা' শব্দ দুটি লিখে দেয়া পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিলনা। তাঁরা চিকিৎসা শাস্ত্র সম্পর্কে যে সমস্ত বই লিখেছেন, সেগুলো দেখলে পরিষ্কার জানা যায় যে, সেগুলো খোদাপরস্ত লোকদের দ্বারা লিখিত। আল্লাহর প্রশংসা ও রসূলের উপর

দরুদ ও সালাম দিয়ে তাঁরা বই শুরু করেছেন এবং মাঝে মাঝে বিভিন্ন স্থানে আল্লাহর বিজ্ঞানময়তা, অসীম ক্ষমতা, সৃষ্টি মহিমা এবং বিশ্বজাহান ও প্রাণী জগতের মধ্যে তাঁর নিশানীসমূহের দিকে ইশারা করেছেন। তাঁদের বইগুলোর অবস্থা বর্তমান যুগের চিকিৎসা বিজ্ঞানের বইগুলোর ন্যায় নয়। এসব বইতে কোথাও ইশারা–ইংগিতেও আল্লাহর নাম উল্লেখ করা হয়না। ফলে পূর্বে যেখানে প্রথমে এনাটমি ও ফিজিওলজিতে রোগের কারণ ও ওষুধের গুণাবলী বিষয়ে পড়াশুনা করার সাথে সাথেই একজন ছাত্রের আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাঁর স্রষ্টা, জ্ঞানী ও পরিচালক হবার উপর বিশ্বাস বেড়ে যেতো, সেখানে এখন এই সমস্ত বিষয় পড়ার সময় একটি নির্ভেজাল বস্তুবাদী মানস ও দৃষ্টিভংগি আপনা–আপনি গড়ে উঠতে থাকে। তবে যদি কোনো ছাত্র কোথাও বাইরে থেকে আল্লাহর প্রতি ঈমান সংগে করে এনে থাকে এবং এখানে এনাটমি, ফিজিওলজি প্রভৃতি পড়ার সময় নিজের চেষ্টায় আল্লাহর নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষ করতে থাকে, তাহলে সে কথা স্বতন্ত্র।

সেকালে আমাদের চিকিৎসকগণ এ পদ্ধতি নির্ধারণ করেছিলেন যে, দীনী ইলমের শিক্ষা সমাপ্তির পর ছাত্রদেরকে চিকিৎসা শাস্ত্রের শিক্ষা দিতেন। একজন ছাত্র দেশের সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর চিকিৎসা শিক্ষায়তনে প্রবেশ করতো। দীনী ইলম হতো এই মাধ্যমিক শিক্ষার অপরিহার্য অংশ। তাই আমাদের এখানাকার চিকিৎসকরা নিছক চিকিৎসক হতেননা বরং তাঁরা দীনী আলেমও হতেন। বর্তমানে অবস্থা দাঁড়িয়েছে ঠিক এর উল্টো। অর্থাৎ বর্তমানে মেডিকেল কলেজের শেষ বর্ষের একজন ছাত্র হালাল ও হারামের প্রারম্ভিক তথ্যও অবগত নন।

উপরন্তু আমাদের সেকালের চিকিৎসকগণের অধিকাংশই মুত্তাকী ও আবেদ হতেন। লোভ–লালসা ছাড়াই জনসেবা করতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা ফী এবং সর্বাবস্থায় ওষুধের মূল্য গ্রহণ করতে বিরত থাকতেন। তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন ছিল অত্যন্ত নিষ্কলুষ। তাই চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষার সমগ্র পরিবেশ পবিত্র, নিষ্কলুষ ও দীন প্রভাবিত হতো। আর শিক্ষকদের উন্নত চরিত্র ও উৎকৃষ্ট গুণাবলী স্বতস্ফূর্তভাবে ছাত্রদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতো। এ জন্যে কৃত্রিম উপায়ে ছাত্রদেরকে দীনদার ও সচ্চরিত্র বানাবার জন্যে চেষ্টা করতে হতোনা।

এই সংগে ওষুধ প্রস্তুত শিল্পে তাঁরা যে সংস্কার সাধন করেছিলেন তা আমি আগেই বর্ণনা করেছি। তাঁরা হারাম বস্তুগুলো একমাত্র তখনই ব্যবহার করতেন, যখন রোগীর চিকিৎসার জন্যে সেগুলোর ব্যবহার একান্ত অপরিহার্য প্রমাণিত হতো। অন্যথায় সাধারণত তাঁরা নিজেদের ওষুধসমূহকে হারাম ও নাপাক বস্তুর মিশ্রণ থেকে দূরে রেখেছিলেন। [তরজমানুল কুরআন, অক্টোবর–

নভেম্বর ১৯৫২]

অ্যালকোহলের বিভিন্ন পর্যায় ও তার বিধান

প্রশ্নঃ আপনি তরজমানুল কুরআনের একস্থানে অ্যালকোহল মিশ্রিত বস্তুগুলোর হালাল ও হারাম হওয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এ প্রসংগে কতিপয় বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রয়োজন। প্রাকৃতিক বস্তুসমূহ বিশেষ পদ্ধতিতে দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যাবার পর তার মধ্যে অ্যালকোহল সৃষ্টি হয়। অন্য কথায় যে বস্তু থেকে অ্যালকোহল হাসিল করার উদ্দেশ্য থাকে তার মধ্যে অ্যালকোহল সৃষ্টির যোগ্যতা সৃষ্টি করতে হয়। তার মধ্যে এই যোগ্যতা সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত অ্যালকোহলের ছিটেফোঁটাও তার মধ্যে মজুদ থাকেনা। অবশ্যি একথা স্বতন্ত্র যে, কোনো কোনো বস্তুর মধ্যে অ্যালকোহলের যোগ্যতা বেশি আছে, কোনোটির মধ্যে কম এবং কোনোটির মধ্যে আদতে এর যোগ্যতাই নেই। যে সমস্ত বস্তু থেকে শরাব তৈরী হয় সেগুলোর মধ্যে এ যোগ্যতা পুরোপুরিই বর্তমান। এই ধরনের যোগ্যতাসম্পন্ন প্রাকৃতিক বস্তুসমূহের মধ্যে পঁচনশীলতার মাধ্যমে যদি অ্যালকোহল বা নেশা সৃষ্টি করা হয়, তাহলে সেগুলো কি হারাম হয়ে যাবে?

জবাবঃ যে সব বস্তু উদ্দেশ্যমূলকভাবে অ্যালকোহল সৃষ্টি করার জন্যে পঁচানো হয়, তার মধ্যে অ্যালকোহলের গুণাবলী সৃষ্টি হবার পর তার ব্যবহার নাজায়েয। তবে যে বস্তু আপনা-আপনি পঁচনশীলতার পর্যায় অতিক্রম করে তার ব্যবহার বড় জোর মাকরুহ হতে পারে। যেমন আংগুর ও আখ যখন লালচে হয়ে যায়, তখন তার মধ্যে অ্যালকোহল সৃষ্টি হতে থাকে। এ অবস্থায় সেগুলোর ব্যবহার হারাম বলা ঠিক হবেনা। তবে কোনো প্রাকৃতিক বস্তু যদি বিকৃত হয়ে এমন পর্যায়ে পৌছে যায় যা খেয়ে নেশা সৃষ্টি হয়, তাহলে তার ব্যবহার অবশ্যি নাজায়েয হবে। [তরজমানুল কুরআন, মে-জুন ১৯৫৩]

হারামকে হালাল করার জন্যে বাহানাবাজি

প্রশ্নঃ যায়েদের উপর সরকারের পক্ষ থেকে নাজায়েয ট্যাক্স চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। তাকে বাধ্য হয়ে তা পরিশোধ করতে হলো। এই ক্ষতি পূরণের জন্যে যায়েদ এই বাহানা তালাশ করলো যে, ব্যাংকে বা পোষ্ট অফিসে তার যে টাকা জমা আছে তার উপর সে সূদ গ্রহণ করবে। এ কাজ কি যথার্থ হবে?

জবাবঃ এই ধরনের বাহানা করে সূদ নেয়া জায়েয নয়! বরং দ্বিগুণ গুনাহ। মনে করুন, যদি সরকারের কোনো ট্যাক্স অবৈধ হয়ে থাকে এবং আপনি বাধ্য

হয়ে তা দিয়ে থাকেন, তাহলে এটি হচ্ছে সরকারের পক্ষ থেকে আপনার উপর একটি যুলুম। কিন্তু আপনি সরকারের ব্যাংক বা পোস্ট অফিস থেকে যে সূদ আদায় করবেন, তা সরকার নিজের পকেট থেকে দেয়না বরং জনগণের নিকট থেকে ট্যাক্স বা সূদ হিসেবে আদায় করে এবং তার কিয়দংশ নিজের কাছে রেখে বাকিটুকু যারা তার কাছে নিজেদের ধন জমা করে রাখে তাদেরকে দেয়। সরকারের কাছ থেকে এই সূদ আদায় করে আপনি তাকে কি শাস্তি দিলেন? এ শাস্তি তো আপনি দিলেন অন্যান্য নাগরিকদেরকে। ব্যাপারটি যেন ঠিক তেমনি যেমন এক ব্যক্তি আপনার কোনো জিনিস চুরি করেছে এবং আপনি তাকে সাজা দেবার জন্যে বের হয়ে তার ঘরে অন্যের যেসব জিনিস রক্ষিত ছিল তার মধ্য থেকে কিছুটা তুলে আনলেন। [তরজমানুল কুরআন, মে-জুন ১৯৫৩]

ইসলাম ও সিনেমা নাটক

প্রশ্নঃ আমি একজন ছাত্র। জামায়াতে ইসলামীর বইপত্র আমি সব পড়েছি। আল্লাহর ফযলে এর ফলে আমার চিন্তা ও কর্মের মধ্যে সুস্পষ্ট বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সিনেমাটোগ্রাফীর ব্যাপারে আমি বহুদিন থেকে বিপুল আকর্ষণ অনুভব করছি। এ সম্পর্কে অনেক তথ্যও সংগ্রহ করেছি। আমার চিন্তা ও মতবাদের মধ্যে পরিবর্তন আসার পর আমি শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্ভব হলে এ শিল্পটাকে দীনী ও নৈতিক ক্ষেত্রে কাজে লাগাবার আন্তরিক ইচ্ছা পোষণ করি। মেহেরবানী করে ইসলামে এর কোনো অবকাশ আছে কিনা জানাবেন। জবাব যদি ইতিবাচক হয়, তাহলে চলচ্চিত্রের পর্দায় নারীর ভূমিকা দেখাবার কোনো জায়েয পদ্ধতি সম্ভবপর কিনা তাও জানাবেন।

জবাবঃ ইতিপূর্বে কয়েকবার আমি এ অভিমত ব্যক্ত করেছি যে, সিনেমা আসলে কোনো নাজায়েয বস্তু নয়। তবে তার নাজায়েয ব্যবহার তাকে নাজায়েয করে দেয়। সিনেমার পর্দায় যে ছবি দেখা যায় তা আসলে 'ছবি' নয় বরং পরছায়া, যেমন আয়নার মধ্যে পরছায়া দেখা যায়। কাজেই তা হারাম নয়। ফিলমের মধ্যে যে প্রতিচ্ছবি দেখা যায়, তা যতক্ষণ না কোনো কাগজ বা অন্য কোনো জিনিসের উপর ছেপে নেয়া হয়, ততক্ষণ তাকে ছবি আখ্যা দেয়া যায়না। তাকে তেমন কোনো কাজে ব্যবহারও করা যেতে পারেনা যা থেকে বিরত থাকার জন্যই শরীয়তে ছবিকে হারাম গণ্য করা হয়েছে। এসব কারণে আমার মতে সিনেমা আসলে সিনেমা হিসেবে মুবাহ।

এবার এ শিল্পটি শেখার ব্যাপারে বলা যায়, এ ক্ষেত্রে এমন কোনো কারণ নেই যার ভিত্তিতে আপনাকে এ থেকে বিরত থাকতে বলবো। এ ব্যাপারে আগ্রহ থাকলে আপনি এটা শিখতে পারেন। বরং ভালো ও কল্যাণমূলক কাজে একে

ব্যবহার করার নিয়ত থাকলে অবশ্যি এটাকে আয়ত্ত করে ফেলুন। কারণ এটা আল্লাহর বিভিন্ন শক্তির অর্ন্তগত একটা বড় শক্তি। আমরা অন্যান্য প্রাকৃতিক শক্তিগুলোর সাথে একেও সত্যের সেবা ও কল্যাণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চাই। আল্লাহ এ দুনিয়ায় যতগুলো জিনিস পয়দা করেছেন সবই মানুষের কল্যাণ ও সত্যের সেবার উদ্দেশ্যে পয়দা করেছেন। এর চাইতে বড় দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে যে, শয়তানের দাসরা একে শয়তানী কাজে খুব ভালোভাবে ব্যবহার করছে আর আল্লাহর বান্দারা একে আল্লাহর কাজে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকছে।

ফিলমকে ইসলামী ও কল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করার ব্যাপারে বলা যেতে পারে যে, অশ্লীলতা, নগ্নতা, অপরাধপ্রবণতা ও যৌন আবেদন মুক্ত চিত্র এবং সততা, সৎবৃত্তি ও কল্যাণকামিতার শিক্ষা দেয়াই যেসব চিত্রের আসল উদ্দেশ্য তেমন ধরনের কোনো সামাজিক, নৈতিক, সংস্কারমূলক ও ঐতিহাসিক চিত্র নির্মাণের ব্যাপারে বাহ্যত কোনো দোষ দেয়া যায়না। কিন্তু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে এর মধ্যে বড় বড় দুটি দোষ দেখা যায়। এ দোষ দুটির সংশোধন কোনোক্রমেই সম্ভব নয়।

এক. নারীর চরিত্র বিবর্জিত কোনো সামাজিক চিত্র নির্মাণ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। আর চিত্রের মধ্যে নারী চরিত্র রাখতে হলে দুটি অবস্থায় সম্ভবপর। একটি হচ্ছে, এ চিত্রে নারীই অভিনয় করবে আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, নারীর ভূমিকায় কোনো পুরুষ অভিনয় করবে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এর কোনোটিই জায়েয নয়।

দুই. কোনো সামাজিক নাটক অভিনয় ছাড়া মঞ্চায়িত হতে পারেনা। আর অভিনয়ের মধ্যে একটি বিরাট নৈতিক ত্রুটি ও ক্ষতি রয়েছে। অভিনেতা দিনের পর দিন বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করতে করতে অবশেষে নিজের ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পূর্ণ না হলেও বেশির ভাগ হারিয়ে বসে। এভাবে চলচ্চিত্রায়িত নাটকগুলোকে আমরা সমাজ সংস্কার ও ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসারে ব্যয় করতে চাইলেও সেখানে অবশ্যি আমাদের একদল লোককে এ উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে তৈরি করতে হবে, তারা অভিনেতার পেশা গ্রহণ করে নিজেদের ব্যক্তিগত চরিত্র বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হবে। অর্থাৎ অন্য কথায় বলা যায়, তারা নিজেদের ব্যক্তিত্বকে কোরবানী করে দেবেন। আমি জানিনা, সমাজের কল্যাণের স্বার্থে অথবা অন্য কোনো পবিত্রতর ও উন্নততর স্বার্থে কোনো মানুষের কাছ থেকে তার ব্যক্তিত্বকে কোরবানী বা বিসর্জন দেবার দাবী কেমন করে করা যেতে পারে। ধন, প্রাণ, আরাম-আয়েশ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতি প্রত্যেকটি বস্তুই কোরবানী করা যেতে পারে এবং পবিত্রতর ও উন্নততর উদ্দেশ্যে এগুলো কোরবানী করা উচিতও। কিন্তু পূর্বোক্ত কোরবানীটি অন্য কারোর জন্য দাবী করা তো দূরের কথা

আল্লাহ্‌ নিজেও নিজের জন্য এ দাবী করেননি।

এসব কারণে আমার মতে সিনেমার শক্তিকে চলচ্চিত্রায়িত নাটকের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারেনা। তারপর প্রশ্ন দেখা দেয় এ শক্তিটিকে আর কোন্‌ কাজে ব্যয় করা যেতে পারে? এক্ষেত্রে আমার জবাব হচ্ছে, নাটক ছাড়া আরো বহু বিষয় রয়েছে যেগুলো ফিলমে দেখানো যেতে পারে। নাটকের তুলনায় এগুলো অনেক বেশী উপকারী ও কল্যাণমুখীও। যেমন–

ভৌগোলিক চলচ্চিত্রের মাধ্যমে আমরা দেশের জনগণকে পৃথিবীর এবং এর বিভিন্ন অংশের ও এলাকার অবস্থার এমন ব্যাপক ও বিস্তারিত জ্ঞান দান করতে পারি যার ফলে মনে হবে যেন তারা সারা দুনিয়া সফর করে এসেছে। অনুরূপভাবে আমরা বিভিন্ন জাতির ও বিভিন্ন দেশের জনগণের জীবনের অসংখ্য দিক তাদের সামনে তুলে ধরতে পারি, যা থেকে তারা অনেক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে এবং তাদের দৃষ্টি ভংগিও হয়ে উঠবে ব্যাপকতর।

সৌর বিজ্ঞানের অদ্ভুত বিস্ময়কর আবিষ্কার ও পর্যবেক্ষণগুলো আমরা এমন আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে তুলে ধরতে পারি যা একবার দেখার পর লোকেরা যৌন আবেদনমূলক ফিলমের কথা ভুলে যাবে। আবার এ ফিলমগুলোকে এত বেশী শিক্ষণীয় করাও যেতে পারে যার ফলে মানুষের মনে তাওহীদ ও আল্লাহ্‌র ভয় চিরকালের জন্য দাগ কেটে বসে যাবে।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগকে আমরা সিনেমার পর্দায় এমনভাবে পেশ করতে পারি যার ফলে জনগণ তার মধ্যে বিপুল আকর্ষণ অনুভব করবে এবং তাদের বিজ্ঞানের জ্ঞান আমাদের দেশের লোকদেরকে বিজ্ঞানের গ্রাজুয়েটের পর্যায়ে উন্নীত করবে।

আমরা পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য রক্ষা ও নাগরিক দায়িত্বের শিক্ষা দিতে পারি বড়ই আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে। এর ফলে আমাদের গ্রামীণ ও শহুরে জনগণের তথ্য–জ্ঞানের পরিসরই কেবল বেড়ে যাবেনা বরং তারা পৃথিবীতে মানুষের মতো বাঁচতেও শিখবে। এ প্রসংগে দুনিয়ার উন্নত দেশগুলোর ভালো ভালো ও প্রয়োজনীয় নমুনাও আমরা লোকদেরকে দেখাতে পারি। এ সব থেকে তারা নিজেদের ঘর–গৃহস্থালী, পল্লী ও সমাজ জীবনকে সুষ্ঠু ও সুশৃংখলভাবে পরিচালিত করার শিক্ষা পাবে।

আমরা বিভিন্ন শিল্প পদ্ধতি, বিভিন্ন কারখানার কাজ, বিভিন্ন জিনিস তৈরি করার কৌশল ও উন্নত কৃষি পদ্ধতি সিনেমার পর্দায় দেখাতে পারি। এর ফলে আমাদের শিল্পজীবী ও কৃষিজীবী জনতার জ্ঞানের বহর বেড়ে যাবে এবং তাদের কাজের মানও অনেক উঁচুতে উঠবে।

সিনেমার মাধ্যমে আমরা বয়স্ক শিক্ষার কাজও হাতে নিতে পারি। এ কাজটিকে আমরা এত বেশী আকর্ষণীয় করতে পারি যার ফলে অশিক্ষিত জনতা

এটাকে আর ঝামেলা মনে করবেনা।

এর মাধ্যমে আমরা জনগণকে যুদ্ধ শিক্ষা দিতে পারি, সিভিল ডিফেন্স, গেরিলা যুদ্ধ, শহরের পথে ঘাটে ও গলিতে প্রতিরক্ষামূলক ও বিমান আক্রমণ থেকে প্রতিরক্ষার এমন শিক্ষা দিতে পারি যার ফলে নিজের দেশের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে তারা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া স্থল, বিমান ও নৌযুদ্ধের যথার্থ চিত্রও তাদের সামনে তুলে ধরা যেতে পারে। এতে তারা যুদ্ধের সম্ভাব্য অবস্থা সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই অবহিত হতে পারে।

এ ধরনের আরো বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিনেমাকে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু প্রথম অবস্থায় রাষ্ট্রীয় শক্তি ও তার উপায়-উপকরণ এর পেছনে না থাকলে এর মধ্যে কোনোটাই সফলকাম হতে পারবেনা। এজন্য প্রথম প্রয়োজন হচ্ছে প্রেম ও যৌন আবেদনমূলক চলচ্চিত্রগুলো প্রথমেই বন্ধ করে দিতে হবে। কারণ এ মাদক নেশা জবরদস্তি না ছাড়াতে পারলে অন্য কোনো পানীয় তাদের মুখে রুচবেনা। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনটি হচ্ছে প্রথম অবস্থায় শিক্ষামূলক কল্যাণধর্মী ফিলম নির্মাণ করতে হবে সরকারের নিজের টাকায় এবং তা জনগণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর যখন ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে ফিলমটি সফলকাম হবে, তখনই বেসরকারী পুঁজি এগিয়ে আসবে। [তরজমানুল কুরআন, আগস্ট ১৯৫২]

নযরানা ও ইসালে সওয়াব

প্রশ্নঃ *মেহেরবানী করে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোর জবাব দিয়ে বাধিত করবেন।*

১. শরীয়তের দৃষ্টিতে নযরানা ও ফাতেহাখানি কোন্ পর্যায়ভুক্ত?

২. একজন দোকানদার তার দ্রব্য-সামগ্রী কি এমন এক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করতে পারে যার অর্থোপার্জনের উপায়-উপকরণ সম্পূর্ণরূপে হারাম বলে সর্বসমক্ষে পরিচিত?

জবাবঃ

১. একমাত্র আল্লাহর জন্য যে নযরানা ও নিয়ায মানা হয় তা সম্পূর্ণরূপে জায়েয এবং প্রতিদান ও সওয়াব লাভের উপযোগী। আর কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহর পথে কিছু খরচ করে খাদ্য, বস্তু বা অন্য কোনো দানের আকারে এ উদ্দেশ্যে যে, আল্লাহ তা কবুল করে নিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কোনো মৃত আত্মীয়ের গুনাহ মাফ করে দেবেন অথবা ঐ আল্লাহর পথে খরচ বা দানের সওয়াব ঐ আত্মীয়কে বখশে দেবেন, তাহলে এ কাজটিকে নাজায়েয বলা যায়না। তবে তার এ কাজটি তার মৃত আত্মীয়ের জন্য কতটুকু সুফলদায়ক তা অবশ্যি আল্লাহর মর্জির উপর নির্ভরশীল। তিনি চাইলে মৃতের জন্য সুফল-

দায়ক করতে পারেন অন্যথায় তা অবশ্যি খরচ ও দানকারীর জন্য যে সুফলদায়ক তাতে তো কোনো সন্দেহ নেই। যদি কুরআন তিলাওয়াত বা অন্য কোনো দৈহিক ইবাদত করে কোনো ব্যক্তি এই দোয়া করে যে, এর সওয়াব যেন তার অমুক মৃত আত্মীয়ের খাতে পৌঁছে যায়, তাহলে সওয়াব পৌঁছবার এ পদ্ধতিটি যথার্থ কিনা তা নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। কোনো কোনো ইমামের মতে এ পদ্ধতিটি জায়েয আবার অনেকের মতে জায়েয নয়। বিভিন্ন শরয়ী যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে আমি শেষোক্ত মতটিকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকি।

যদি আল্লাহর জন্যে কোনো আর্থিক বা দৈহিক ইবাদত করা হয় এবং বুযুর্গানে দীনের মধ্য থেকে কারোর নামে এ উদ্দেশ্যে এর সওয়াব রেসানী করা হয় যে, ঐ বুযুর্গ এতে খুশী হবেন এবং আল্লাহ্ তাআলার কাছে তিনি হাদীয়া প্রেরণকারীর জন্য সুপারিশ করবেন, তাহলে এটা এমন একটা সংশয়িত কাজ, যেখানে জায়েয-নাজায়েয বরং গুনাহ্ ও ফিতনার সীমান্ত পরস্পরের সাথে মিশে যায়। কোনো পরহেযগার ব্যক্তি নিজকে এ বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করবে, এ পরামর্শ আমি দেবোনা।

আর যে খাদ্য সুস্পষ্টভাবে কোনো বুযুর্গের নামে রান্না করা হয় এবং যার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয় যে, এটি অমুক বুযুর্গের নিয়ায বা সিন্নী এবং যার সম্পর্কে রান্নাকারীও সুস্পষ্টভাবে নিয়ত করেন যে, এটি একটি নযরানা, অমুক বুযুর্গের রূহের উদ্দেশ্যে তা পাঠানো হচ্ছে, উপরন্তু যার সম্পর্কে আমাদের দেশে নানা ধরনের আদব ও মর্যাদা প্রদর্শনের পদ্ধতি নির্ধারিত রয়েছে, যার প্রতি অমর্যাদা প্রদর্শনের বিভিন্ন পদ্ধতি নিষিদ্ধ গণ্য হয়েছে এবং ঐ সব নিয়ায ও নযরানার বরকত ও সুফলের উপর গভীর ভক্তি-শ্রদ্ধাপূর্ণ বিশ্বাস সর্বজনবিদিত, সেগুলোর হারাম ও গুনাহ্ হবার এবং তাওহীদ বিশ্বাসের বিপরীত হবার ব্যাপারে আমার কোনো প্রকার সন্দেহ্ নেই।

২. হারাম উপার্জনকারী যদি কোনো দোকানদারের কাছ থেকে কোনো জিনিস কিনতে চায়, তাহলে দোকানদার তার কাছে সে জিনিসটি বিক্রি করতে পারে। দোকানদারের কাছে হালাল পথে দাম পৌঁছে যাচ্ছে। দোষ ও হারাম পয়সার মধ্যে নয় বরং পয়সা উপার্জনের পদ্ধতির মধ্যে থাকে। যে ব্যক্তির কাছে হারাম পদ্ধতিতে পয়সা এসেছে তা তার ঐ পদ্ধতির কারণেই হারাম হয়ে গেছে। অন্য এক ব্যক্তি ঐ পয়সা লাভ করেছে হালাল পদ্ধতিতে। কাজেই তার ঐ পয়সা হারাম হবার কোনো কারণ নেই। [তরজমানুল কুরআন, আগস্ট ১৯৫২]

মাথার চুলের বৈধতা ও অবৈধতা

প্রশ্নঃ কোনো কোনো প্রশ্নের জবাবে আপনি বলেছেন, ইংরেজী প্যাটার্নের চুল কাটা আপনি পছন্দ করেননা। কারণ এটা অমুসলিম জাতিদের পদ্ধতি। তবুও

আপনি শরীয়তের দৃষ্টিতে একে আপত্তিকর মনে করেননা। কিন্তু কোনো কোনো আলেম এ ধরনের চুল কাটাকে নাজায়েয গণ্য করেন। আপনি যদি তরজমানুল কুরআন পত্রিকার মাধ্যমে এ ব্যাপারে আপনার অনুসন্ধানলব্ধ তথ্য ও তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন তাহলে আমরা উপকৃত হবো।

জবাবঃ মাথার চুল সম্পর্কে শরীয়তের বিধান এছাড়া আর কিছুই নয় যে, হাদীসে কাযা–এর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। 'কাযা' [আ–১৯০] কিছু চুল চেঁছে ফেলা ও কিছু চুল রেখে দেবার নাম। মূলত. এটিই নিষিদ্ধ। এ কাজ থেকে দূরে থাকা একান্ত জরুরী। বাকি অন্যান্য ধরনের চুল কাটা অবৈধ হবার কোনো কারণ নেই। কাজেই সেগুলো সব জায়েয। কেউ চাইলে সারা মাথা ন্যাড়া হতে, সারা মাথার চুল ছাঁটতে, কিছু ছাঁটতে ও কিছু না ছাঁটতে, কানের অর্ধেক পর্যন্ত রাখতে, কানের লতি পর্যন্ত রাখতে বা তার নিচে পর্যন্ত রাখতে পারে। এগুলো জায়েয হবার কারণ হচ্ছে, নীতিগতভাবে যা কিছু নিষিদ্ধ নয় তা মুবাহ।

কেউ কেউ কিছু ছাঁটা ও কিছু না ছাঁটাকেও 'কাযা'র অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু এটি ঐ শব্দটির সুস্পষ্ট অর্থ ও লক্ষ্য নয়। রসূলুল্লাহ (স) তো হুবহু এ জিনিসটি নিষিদ্ধ করেননি। আসল নিষিদ্ধ হচ্ছে কিছু ন্যাড়া হওয়া ও কিছু রেখে দেয়া। কিছু ছেঁটে ফেলা ও কিছু রেখে দেয়া নিষিদ্ধ নয়। যদি কোনো ব্যক্তি এর একটিকে অন্যটির উপর কিয়াস করে, তাহলে তার কিয়াসের উপর তার নিজেরই আমল করা উচিত অথবা সেই ব্যক্তির আমল করা উচিত যে তার কিয়াসকে সহীহ ও যথার্থ মনে করে। অন্য কোনো ব্যক্তি যে তার কিয়াসের সাথে একমত নয়, তাকে সে তার কিয়াস মেনে নিতে বাধ্য করতে পারেনা এবং সে নিজের কিয়াস ও ইজতিহাদের মাধ্যমে রসূলের হুকুমের যে অর্থ বর্ণনা করেছে অন্য ব্যক্তি তা মেনে চলছেনা বলে সে তাকে গুনাহগারও গণ্য করতে পারেনা।

অনেকে এ ধরনের চুল কাটাকে 'তাশাব্বুহ'র (অন্য জাতির সাথে সাদৃশ্য) অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। কিন্তু তারা ভুলে যান, রসূলুল্লাহ (স) যে তাশাব্বুহকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন তা কেবল এমন অবস্থায় হতে পারে যখন কোনো ব্যক্তি সামগ্রিকভাবে নিজের চেহারা–সুরতকে কাফিরদের মতো করে নেয়। অমুসলিমদের ফ্যাশান, লেবাস, আচার–আচরণের এক অংশকে গ্রহণ করে নিলে তাকে তাশাব্বুহ বলা যায়না। অন্যথায় এর কি ব্যাখ্যা করা যাবে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই রূমী জুব্বা পরেছিলেন, কিসরাওয়ানী

কাবা পরেছিলেন, শালওয়ার–যা ইরান থেকে সবেমাত্র আরবে পৌঁছেছিল–তিনি তা পছন্দ করে নিয়েছিলেন এবং হযরত উমর (রা) বুরনুস পরেছিলেন, যা খৃষ্টান দরবেশরা পরতো? কাজেই আংশিক তাশাব্বুহের কারণে কাউকে গুনাহগার বা ফাসিক গণ্য করা বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে বড় বড় গোঁফের ব্যাপারে যেভাবে তা মাজুসীদের (অগ্নি উপাসক) রীতি বলে নিষিদ্ধ গণ্য করা হয়েছে চুলের ব্যাপারেও যদি তেমনি করে বলা হতো, তাহলে অবশ্যি এ ধরনের চুল ছাঁটা গুনাহ্ বলে গণ্য হতো।

এখানে আমি সুস্পষ্টভাবে একটা কথা বলে দিতে চাই। আমি নীতিগত–ভাবে মনে করি এবং এ নীতির উপর আমি দৃঢ়ভাবে অটল যে, আল্লাহ ও রসূলের সুস্পষ্ট নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করার কারণেই কেবলমাত্র এক ব্যক্তিকে গুনাহগার গণ্য করা যেতে পারে। কিয়াস ও ইজতিহাদ–ইসতিম্বাতের মাধ্যমে যে আহকাম স্থিরিকৃত হয়, তার বিরুদ্ধাচরণ করলে কোনো ব্যক্তিকে গুনাহগার বলা যায়না। তবে যে ব্যক্তি ঐ কিয়াস ও ইসতিম্বাতকে মেনে নেয়, সে যদি কার্যক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহলে অবশ্যি সে গুনাহগার হবে। অনুরূপভাবে আমি এ কথাও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, হারাম কেবল–মাত্র সেই বস্তু বা বিষয়টি যেটিকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল সুস্পষ্ট ভাষায় হারাম গণ্য করেছেন অথবা যেটি করতে তাঁরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিষেধ করেছেন বা যে কাজে লিপ্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাঁরা শাস্তির বিধান শুনিয়েছেন অথবা নাস্ (আল্লাহ ও রসূলের সুস্পষ্ট বাণী)–এর ইশারা ও দাবী থেকে যার হারাম প্রকট হবার ব্যাপারে 'ইজমা' অনুষ্ঠিত হয়েছে। আর কিয়াস ও ইজতিহাদের মাধ্যমে যেগুলো হারাম গণ্য হয়েছে এবং শরয়ী দলিলের (যুক্তি–প্রমাণ) ভিত্তিতে যেগুলোকে দুই বা দুয়ের অধিক মতের অবকাশ রয়েছে, সেগুলো সাধারণভাবে হারাম নয়, বরং কেবলমাত্র সেই ব্যক্তির জন্য হারাম যে ঐ কিয়াস ও ইজতিহাদকে নির্ভুল ও সহীহ্ মনে করে। আমার মতে উম্মতের বিভিন্ন দলের পরস্পরকে ফাসিক ও গোমরাহ বলার পেছনে যে কারণগুলো সক্রিয় রয়েছে তার মধ্যে এ সত্যটিকে ধামাচাপা দেবার প্রবণতাই অন্যতম। [তরজমানুল কুরআন, সেপ্টেম্বর ১৯৫২]

ঘর ভাড়ায় কালোবাজারী

প্রশ্নঃ *আমি যে ঘরে থাকি, সে ঘরটি আমার আগে একজন ভাড়াটে দু'মাসের নোটিশে ঘর ছেড়ে দেয়ার শর্তসহ মাসিক পয়তাল্লিশ টাকায় মালিক থেকে ভাড়া নেয়। আমার ভাই উক্ত শর্তে ঐ ভাড়াটে থেকে ঘরটি নেয় এবং আমিও তার সাথে বসবাস করতে থাকি। দু'মাস পর ঘরের মালিক আমার*

কথায় আমার নামে রশীদ প্রদান করতে থাকেন। আট মাস পর্যন্ত আমরা বরাবর পঁয়তাল্লিশ টাকা হারে মাসিক ভাড়া প্রদান করতে থাকি। অতিরিক্ত ভাড়া আমাদের জন্যে খুবই কষ্টকর ছিল। কয়েকবার ইচ্ছা করেছিলাম রেন্ট কন্ট্রোলে দরখাস্ত করে ভাড়া নেবার ব্যবস্থা করবো। কিন্তু তা করতে মনে সায় দেয়নি। সেপ্টেম্বর মাসে মালিককে হোয়াইট ওয়াস ইত্যাদি করার জন্যে বলা হলে এগুলো ভাড়াটের দায়িত্ব বলে তিনি জবাব দেন। আশেপাশের লোকেরা তাকে রাযী করানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি তার নীরবতা ভংগ করে বলেন, দু'মাস পরে বলবো। (সম্ভবত ঘর খালি করে দেয়ার ধমক এর মধ্যে নিহিত ছিল) এ বিষয়ে কথা কাটাকাটি হয়। ফলে আমি রেন্ট কন্ট্রোলারের কাছে ভাড়া নির্দিষ্ট করার জন্য দরখাস্ত পেশ করি। সেখান থেকে ষোল টাকা এগার আনা মাসিক ভাড়া নির্ধারিত করে দেয়া হয়। কিন্তু আমার বিবেক এতে এখনো সায় দিচ্ছেনা।

যার মাধ্যমে ঘর ভাড়া নিয়েছিলাম তার এবং তার বন্ধু-বান্ধবদের অনুরোধে পঁয়ত্রিশ টাকা মাসিক ভাড়া দেবার কথা আমি স্বীকার করি। তবে শর্ত হলো যতদিন ইচ্ছা ততদিন আমি এ বাসায় থাকবো। কিন্তু যদি মালিক কখনো ঘর খালি করতে বলে, তাহলে পুনরায় ষোল টাকা এগার আনা হিসেবে মাসিক ভাড়া প্রথম থেকে ধার্য হবে এবং অতিরিক্ত আদায়কৃত টাকা মালিক ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে। বর্তমানে এ শর্ত মানতে মালিক রাযী নয়। তবে তাকে মানতেই হবে।

এখন প্রশ্ন হলো, ইসলামের দৃষ্টিতে কোন্ পন্থা আমার জন্যে সঠিক হবে? আমি কি মাসিক পঁয়তাল্লিশ টাকা হারে দিতে থাকবো, নাকি ষোল টাকা এগার আনা? তাছাড়া মালিক ঘর ছেড়ে দেয়ার দাবী করলে ঘর ছেড়ে দেয়া আমার জন্যে জরুরী কি? তার দাবী অস্বীকার করা আমার জন্যে জায়েয হবে কি? যেহেতু আমি জানি তার নিজের ঘরের প্রয়োজন নেই বরং শুধু ভাড়া বৃদ্ধির জন্যে অন্য ভাড়াটেকে ঘর দেয়ার উদ্দেশ্যেই সে ঘর খালি করাবে। প্রকাশ থাকে, বাসা-বাড়ির অস্বাভাবিক স্বল্পতার কারণে পঁয়তাল্লিশ টাকার স্থলে পঞ্চাশ টাকার ভাড়াটেও পাওয়া যেতে পারে।

আমাকে পরিষ্কার এবং দ্ব্যর্থহীন জবাব দিতে হবে। জবাবে এ কথা লেখার প্রয়োজন নেই যে, আমি মালিককে উপদেশ দেবো কিংবা তার যুলুম তুলে ধরবো। কারণ এগুলো নিরর্থক হবে।

জবাবঃ বর্তমান অবস্থায় বড় শহরে বাড়ির মালিকরা বাসার স্বল্পতার কারণে লোকদের বিশেষত মুহাজিরদের প্রয়োজনের সুযোগে চরমভাবে অবৈধ ফায়দা লুটার কাজে লিপ্ত। তাদের সাথে যদি কেউ চুক্তিপত্রও করে তবে তা

সন্তুষ্টি ও আগ্রহের ভিত্তিতে নয়। বরং একজন অভাবগ্রস্ত লোক যে পরিস্থিতিতে সূদের উপর ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়, সেও তেমনি বাধ্য হয়। এ ধরনের চুক্তিপত্রের কোনো নৈতিক মর্যাদা ও মূল্য নেই। প্রকৃতপক্ষে এরূপ চুক্তিপত্র এ কারণে হয়ে থাকে যে, সরকারের পক্ষ থেকে ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং ন্যায়ানুগ শর্তাবলীর ভিত্তিতে লোকদের প্রয়োজনসমূহ পূর্ণ করার কোনো ব্যবস্থা নেই। এখন যদি সরকার ন্যায়ভিত্তিক ভাড়া নির্ধারণের কোনো ব্যবস্থা করে থাকে, তবে তা থেকে আপনি এবং অন্যান্য লোক ফায়দা গ্রহণ না করার কোনো কারণ নেই। যে ঘরের ভাড়া সুবিচারের ভিত্তিতে ষোল টাকা হয়, সে ঘরের ভাড়া যদি মালিক পঁয়তাল্লিশ কিংবা পঞ্চাশ টাকা আদায় করে, তবে সে অবশ্যই লুটেরা। এ ক্ষেত্রে তার এমন কোন্ নৈতিক অধিকার আছে যার ভিত্তিতে তাকে আপনার সমীহ করতেই হবে? তাহলে আগামীতে যে ব্যক্তি খাদ্যশস্যের ঘাটতির সুযোগে কালোবাজারি শুরু করে দেবে এবং ১০ টাকা মণ দরে কেনা শস্য ৮০ টাকা দরে বিক্রি করতে থাকবে, তাকেও কি তাহলে মালিকানা অধিকারের সম্মান দেখাতে হবে? যদি আমরা সরকারের সহায়তায় এমন লোকদেরকে যথাযথ মূল্যে নিজেদের মাল বিক্রি করতে বাধ্য করতে পারি, তাহলে তা করবোনা কেন? [তরজমানুল কুরআন, রবিউল আউয়াল-সানী ১৩৭০, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৫১]

শিকার করা ও শিকার খেলার মধ্যে পার্থক্য

প্রশ্নঃ *বিত্তবানরা আজকাল যেভাবে শিকার খেলায় মত্ত হয়েছে তা দেখে মন অস্থির হয়ে ওঠে। আগের দিনে সম্ভবত লোকেরা শিকারকে জীবন রক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে থাকবে। কিন্তু আজকাল এটা চিত্তবিনোদনের মতো একটা মাধ্যম ও খেল-তামাশায় পরিণত হয়েছে। কোনো কোনো লোক বনে কিংবা ক্ষেত-খামারে জাল পেতে খরগোশ ধরে। তারপর সেগুলো বস্তাবন্দী করে মাঠে নিয়ে আসে। সেখানে সেগুলোর পিছনে কুকুর লেলিয়ে দেয়। মাঠের খোলা জায়গায় খরগোশরা কোনো আশ্রয়স্থল পায়না। কুকুরের তাড়ায় তারা দৌড়ে কুলাতে পারেনা। তারপর কুকুর তাদেরকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে। আর এ দৃশ্য উপভোগ করে আমোদ-ফূর্তি করা হয়। এ কথাও জানতে চাই, বন্দুকের সাহায্যে শিকার করা কোন্ পর্যায়ভুক্ত। এ ব্যাপারে দ্বিতীয় পারার এ আয়াতটির তাৎপর্য কি?*

وَ اِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ -(البقرة: ٢٠٥)

"সে যখন কর্তৃত্ব লাভ করে, তখন সে পৃথিবীতে তার সমস্ত প্রচেষ্টা নিয়োজিত করে বিপর্যয় সৃষ্টি এবং শস্যক্ষেত ও মানব বংশ ধ্বংস করার কাজে। অথচ আল্লাহ্ বিপর্যয় মোটেও পছন্দ করেন না।" [বাকারাঃ ২০৫]

তাছাড়া "তাকবীর পড়ে শিকারের উপর কুকুর ছেড়ে দিলে কিংবা বন্দুক চালালে তাতে যদি শিকার যখম হয়, তবে যবেহ্ ছাড়া মরে গেলেও তা হালাল।" ফিকাহের কিতাবে উল্লিখিত মতামত সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

জবাবঃ *শিকারকে চিত্তবিনোদন হিসেবে গ্রহণ করা আমার মতে মাকরূহ্। অবশ্য শিকার করা জায়েয। শিকার করা ও তামাশা করার মধ্যে পার্থক্য এই যে, শিকার খাওয়ার জন্যে করা হয়– তা প্রয়োজনে কিংবা অপ্রয়োজনে হলেও তা জায়েয। আর যে শিকার নিছক চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে করা হয় এবং যাতে অনর্থক পশু পাখির জীবন নাশ হয়, তা নাজায়েয না হলেও মাকরূহ্ অবশ্যই।*

যদি শিকারী কুকুর কিংবা অন্য কোনো শিকারী জন্তু আল্লাহর নাম নিয়ে কোনো জানোয়ার শিকারের জন্যে ছেড়ে দেয়া হয় এবং সে জানোয়ারটি ঐ শিকারী জন্তুর আক্রমণে মারা যায় কুরআনের দৃষ্টিতে তা খাওয়া জায়েয। যদি তীর আল্লাহর নাম নিয়ে ছোঁড়া হয় এবং ঐ তীরের আঘাতে জন্তুর মৃত্যু হয়, তাহলে তা খাওয়া হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী জায়েয। প্রথমটির দলিল সূরা মায়েদার প্রথম রুকুতে উল্লিখিত হয়েছে। আর দ্বিতীয়টির দলিল হাদীসে শিকার অধ্যায়ে পাওয়া যাবে। বন্দুক সম্পর্কে আপনি যা কিছু লিখেছেন ফিকাহের কিতাবে তার উল্লেখ নেই। [তরজমানুল কুরআন, রজব–শাবান ১৩৭১, এপ্রিল–মে ১৯৫২]

ইসলামী আইনের উৎস এবং ব্যাখ্যা ও ইজতিহাদ

প্রশ্নঃ *বৈরুতের আইন শাস্ত্রের অধ্যাপক ডঃ মাহমাসানী পাকিস্তান সরকারের দাওয়াতে এদেশে আসেন। তিনি করাচীতে ইসলামী আইন সম্পর্কে একটি বক্তৃতা করেন। আরব জাহানে আইনের ক্রমবিকাশের তিন যুগ–খিলাফতের যুগ, উসমানী আমল ও আধুনিক যুগের উল্লেখ করে তিনি যুগের পরিবর্তনশীল চাহিদা অনুযায়ী ইসলামী আইনের মধ্যে পরিবর্তন সম্ভব কিনা, সে সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাঁর আলোচনার সারকথা ছিল, ইসলামী আইনের দুটি অংশ– একটি হচ্ছে নির্ভেজাল ধর্মীয় এবং অন্যটি হচ্ছে সামাজিক! ধর্মীয় আইনের মধ্যে কোনো পরিবর্তন সম্ভবপর নয়। কারণ সেগুলো অপরিবর্তনীয় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যেমন– তাওহীদ, ইবাদত প্রভৃতি। আর সামাজিক আইনের উৎস দু'টি– একটি হচ্ছে ইজতিহাদ এবং অন্যটি হচ্ছে কুরআন ও হাদীস। ইজতিহাদ*

প্রত্যেক যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তিত হয় এবং পরিবর্তিত হওয়া উচিত। হাদীসের ব্যাপারে সর্বপ্রথম প্রশ্ন হচ্ছে নির্ভুল ও অনির্ভুলের। অতপর নির্ভুল হাদীসও দুই প্রকারঃ বাধ্যতামূলক (Obligatory) ও ইচ্ছাধীন বা পরামর্শ ভিত্তিক (Permissive)। কাজেই অবশেষে কুরআন অথবা নির্ভুল বাধ্যতামূলক হাদীসের উপর প্রতিষ্ঠিত বিধানসমূহের আলোচনায় আসতে হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, ঐ দুটি বস্তুর- অর্থাৎ কুরআন ও নির্ভুল হাদীসের সমাজের পরিবর্তনশীল প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন ব্যাখ্যা (Interpretation) করা যেতে পারে কি? ডঃ মাহমাসানী বলেনঃ এ ব্যাপারে ফকীহগণ দুটি দলে বিভক্তঃ ১. সংখ্যাগরিষ্ঠের মত হলো, কুরআনের আয়াত ও নির্ভুল হাদীসের নতুন অর্থ করা যেতে পারেনা, ২. সংখ্যালঘিষ্ঠের বক্তব্য হলো, আইন একটি সমাজ বিজ্ঞান, কাজেই সমাজের মধ্যে পরিবর্তনের সাথে সাথে আইনেরও পরিবর্তন হওয়া উচিত। অন্যথায় যুগের সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হবে। ইসলাম সভ্যতা, প্রগতি ও জনকল্যাণমূলক ধর্ম এবং এ ব্যাপারে রক্ষণশীল মনোভাব গ্রহণ করলে তার এ বৈশিষ্ট থাকেনা। এ দাবীর প্রমাণ স্বরূপ তিনি নমুনা হিসেবে দুটি দৃষ্টান্ত পেশ করেন এবং বলেন যে, তাঁর Philosophy of Islamic Jurisprudence গ্রন্থে তিনি এ ধরনের বহু নযীর পেশ করেছেন।

প্রথম দৃষ্টান্তটি ছিল এইঃ একটি নির্ভুল হাদীসে গম ও যব পরিমাপ করার জন্যে তরল বস্তুর পরিমাপ নির্ণয় পাত্রের কথা উল্লিখিত হয়েছে। কারণ সে যুগে এরই প্রচলন ছিল। পরবর্তীকালে যখন তুলাদন্ডে ওজন করে এগুলো বিক্রি হতে থাকে, তখন এক ব্যক্তি ইমাম আবু ইউসুফকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, তুলাদন্ডে ওজনের মাধ্যমে যে চুক্তিগুলো সাধিত হয়েছে সেগুলো জায়েয। এ থেকে জানা যায়, প্রচলনের পরিবর্তন হলে হাদীসের ব্যাখ্যা বা প্রয়োগও পরিবর্তিত হতে পারে।

দ্বিতীয় যে দৃষ্টান্তটির সাহায্যে ডঃ সাহেব প্রমাণ পেশ করেছেন যে, পরিবর্তনশীল সামাজিক প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে কেবল হাদীস নয় বরং কুরআনের শব্দেরও নতুন ব্যাখ্যা করা যেতে পারে সেটি হচ্ছে এই যে, কুরআনে সাদকার ব্যয়ক্ষেত্র হিসেবে মুয়াল্লাফাতুল কুলুবেরও একটি অংশ নির্ধারিত হয়েছে। হযরত উমর (রা) যখন নওমুসলিমদেরকে সাদকার কিছু অংশ দিতে অস্বীকার করেন, তখন তারা কুরআনের আয়াত পেশ করে বলেন, এটি আমাদের অধিকার এবং কুরআন আমাদের জন্যে এ অধিকার নির্ধারণ করেছে, আপনি একে কেমন করে খতম করতে পারেন? জবাবে হযরত উমর (রা) বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হয়েছিল তখন ইসলাম ছিল দুর্বল, তাই তখন এর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এখন আল্লাহর মেহেরবানীতে ইসলাম শক্তিশালী, এখন আর এর প্রয়োজন নেই, কাজেই আমি তোমাদেরকে এর অংশ দেবোনা।

হাত কাটার বিষয়টিও এই ধরনের বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। এক ব্যক্তি বায়তুলমাল থেকে চুরি করেছিল এবং অন্য এক ব্যক্তি তার প্রভুর সম্পদ চুরি করেছিল। হযরত উমর (রা) তাদের দু'জনকে হাত কাটার শাস্তি দেননি। তাঁর যুক্তি ছিল এই যে, এই অর্থ-সম্পদে তাদের অংশ ছিল। অনুরূপভাবে দুর্ভিক্ষের সময়ে তিনি এ শাস্তি মূলতবী করেন।

ডঃ মাহমাসানী তাঁর বক্তৃতায় আইনের চারটি উৎস বর্ণনা করেন, কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস। তাঁর বক্তৃতা শুনার পর আমার মনে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো দেখা দিয়েছেঃ

১. উল্লিখিত চারটি উৎস ছাড়া আইনের আর কি কি উৎস আছে? কার্যকারণ, অন্য দেশের রীতি, প্রচলিত রীতি-রেওয়াজ, অভ্যাস, জাতীয় কার্যধারা, পূর্ববর্তিগণের পদ্ধতি, ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভকারী বিষয়, শাসকের নির্দেশ, সন্ধি-চুক্তি প্রভৃতিকে আইনের উৎসে পরিণত করা যায় কিনা? ফকীহগণ আইনের উৎসের তালিকায় এগুলোকে সংযোজিত করেননি সত্য, কিন্তু আলোচনা প্রসংগে আইনের উৎস হিসেবে তাঁরা এসবগুলোর উল্লেখ করেছেন। উপরন্তু খোলাফায়ে রাশিদীনের কর্মধারা থেকেও এটিই প্রমাণিত হয়েছে। যেমন, হযরত উমর (রা) কৃষি ও অর্থ বিষয়ক আইনে সিরীয়, মিসরীয় ও ইরানী আইনের আনুগত্য করেছেন। রেজিস্টার ও হিসেব রাখার পদ্ধতি তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করেন। অনৈসলামী রাষ্ট্র মুসলমান ব্যবসায়ীদের উপর যে পরিমাণ কর ধার্য করতো তিনিও অনৈসলামী রাষ্ট্রের ব্যবসায়ীদের উপর একই পরিমাণ কর ধার্য করেন। -তাহলে এ থেকে কি এ কথা প্রমাণ হয়না যে, কুরআন ও হাদীস নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে অন্যান্য দেশের আইন থেকেও উপকৃত হওয়া যায় এবং কেবল উপকৃতই নয় বরং হুবহু তা থেকে গ্রহণ করা যেতে পারে? কমপক্ষে হযরত উমরের (রা) কার্য এটিই প্রমাণ করে। আজ যদি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে সে কি পশ্চিম থেকে যা কিছু এসেছে সমস্তই ভুল, নিছক এই ভ্রান্ত চিন্তা ও বিদ্বেষের ভিত্তিতে পাশ্চাত্য দেশগুলোর রাজনৈতিক, সামাজিক, সাহিত্যিক, অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক উন্নতিকে বাদ দিয়ে নতুন করে নিজের উমারতের ভিত রচনা করবে? পশ্চিম থেকে যা কিছু এসেছে সবই নির্ভুল, এ চিন্তাটি যেমন ভুল পূর্বোক্ত চিন্তাটিও কি ঠিক ঐ একই পর্যায়ের ভুল নয়? দুটি চিন্তাই দুই প্রান্তিকতা দুষ্ট। কাজেই পশ্চিমের যে সমস্ত কথা শরীয়তের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল সেগুলোকে হুবহু বা রদবদল করে গ্রহণ করা কি সংগত নয়?

২. পূর্ববর্তী আলেম ও ইমামগণ যে সমস্ত ইজতিহাদ করে গেছেন, সে সমস্ত বিষয়ে যদি কোনো পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের অবকাশ না থাকে, তাহলে সেগুলো গ্রহণ করা হোক। অন্যথায় যুগের পরিবর্তিত প্রয়োজন অনুযায়ী তাঁদের

ইজতিহাদ যদি কোনো কোনো বিষয়ের সাথে খাপ খেতে না পারে, তাহলে আজকের ফকীহগণকে বর্তমান যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন করে ইজতিহাদ করতে হবে।

৩. কুরআন ও হাদীসের শব্দের মধ্যে কোন পরিবর্তন না করে সমাজ সংস্কৃতির পরিবর্তনশীল প্রয়োজন অনুযায়ী এই উৎস দুটির শব্দাবলীর ব্যাখ্যায় কোনো প্রকার পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পরিকর্তন করা যেতে পারে কিনা? যেমন মুয়াল্লিফাতুল কুলুবের দৃষ্টান্ত থেকে প্রমাণিত হয়। সংখ্যা কম হলেও এ ধরনের সমস্যা আজও সৃষ্টি হতে পারে। অন্য কথায়, কুরআনের আয়াত ও বাধ্যতামূলক হাদীসের উপর প্রতিষ্ঠিত বিধান ও বিষয়সমূহের মধ্যে যুগের প্রয়োজন এবং ঐ বিধানসমূহের কারণ পরিবর্তিত হবার পর ইসলামের প্রাণবস্তু ও মূল ভাবধারার নিকটবর্তী নতুন বিধান তৈরি করা যেতে পারে। ফকীহগণের সর্বসম্মত অভিমত হচ্ছে এই যে, প্রত্যেকটি বিধানের একটি কারণ থাকে এবং মূলত জনকল্যাণই অগ্রাধিকার লাভের যোগ্য।

যেমন কুরআনে যাকাতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কিন্তু তার কোনো হার উল্লিখিত হয়নি। হাদীসে যে হার উল্লিখিত হয়েছে তা সমকালীন প্রয়োজন অনুযায়ী ছিল। এখানে প্রশ্ন জাগে, যাকাত দেশের রেভিনিউ বা ট্যাক্সের মর্যাদা লাভ করে কি (অবশ্যি ইসলামী রাষ্ট্রে)? জবাব ইতিবাচক হলে এখানে দ্বিতীয় প্রশ্ন দেখা দেয় যাকাতের হার সম্পর্কে। অর্থাৎ আজকের অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ পুরাতন হারের দ্বারা সম্ভব হতে পারেনা।

এ প্রশ্নগুলো থেকে সরে গিয়ে আর একটি প্রশ্ন জাগে যে, কুরআন একটি 'কোড' কিনা? বাহ্যত আইনগত দিক দিয়ে কুরআন কি একটি সংশোধিত বিধানের (Amending code) পর্যায়ভুক্ত? আরবে প্রচলিত বহু রীতি-রেওয়াজ ও নিয়মকে কুরআন জারী রেখেছিল। সবগুলোর মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনেনি। কাজেই কুরআন একটি পরিপূর্ণ বিধান, এ কথা বলা কতদূর সত্য বা ভুল?

জবাবঃ আপনি যেসব বিষয়ে অভিমত প্রকাশের জন্যে লিখেছেন, সেগুলো সম্পর্কে আমার 'দাম্পত্য অধিকার' 'ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ', 'তাফহীমাত' ও 'ইসলামী আইন' পুস্তকে একটি পরিসরে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আপনি ঐ বইগুলো পড়ে দেখুন। এরপরেও যদি আপনার মনে কোন প্রশ্ন থাকে তবে তার উপর আলোকপাত করা যেতে পারে। এছাড়া আপনার প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত জবাব নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

১. কার্যকারণ, প্রচলিত রীতি, অভ্যাস, জাতীয় কর্মধারা, পূর্ববর্তিগণের পদ্ধতি, ব্যাপক বিস্তার লাভকারী বিষয়, শাসকের নির্দেশ, সন্ধি-চুক্তি ও অন্য

দেশের রীতি প্রভৃতি মূলত আইনের উৎস হতে পারেনা। বরং এগুলো ইজমা ও কিয়াসের আওতাভুক্ত হবে। আর ইজমা কিয়াস ও আইনের আসল উৎস নয় বরং কুরআন ও সুন্নাতের নির্দেশের অধীন। ইজমা বা কিয়াসের যুক্তি–প্রমাণের ভিত যখন কুরআন ও সুন্নাতের আদেশ–নিষেধ বা মুবাহ্ বিষয়ের উপর রাখা হয় একমাত্র তখনই তা নির্ভুল হতে পারে। আর যে কিয়াস ও ইজতিহাদের উপর ইজমা অনুষ্ঠিত হয় অথবা জনগণ একমত হয় সেটিই দেশের আইনে পরিণত হবে। মুবাহ্ বিষয়সমূহের ব্যাপারে আমরা অন্য দেশের রীতিনীতি থেকেও উপকৃত হতে পারি। নিজের দেশের প্রচলিত রীতি–রেওয়াজ ও নিয়মকেও অপরিবর্তিত রাখতে পারি, ব্যাপক বিস্তার লাভকারী বিষয়সমূহের প্রতিও নজর রাখতে পারি এবং অন্যান্য উৎসকেও কাজে লাগাতে পারি। তবে এখানে শর্ত হলো, যে আইনই রচনা করি না কেন, তা অবশ্যি সামগ্রিকভাবে ইসলামী জীবন দর্শনের সাথে সামঞ্জস্যশীল হতে হবে।

২. পূর্ববর্তী আলেমগণের ইজতিহাদ অপরবর্তনীয় আইন হিসেবে গণ্য হতে পারেনা এবং সেগুলো সম্পূর্ণত উপেক্ষণীয়ও নয়। নির্ভুল ও ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা হলো, সেগুলোর মধ্যে রদবদল করা যেতে পারে। কিন্তু তা করতে হবে কেবল প্রয়োজন পরিমাণ এবং সেই সাথে এই শর্তও থাকবে যে, যে কোনো রদবদল শরীয়তের দলিল প্রমাণের ভিত্তিতেই করতে হবে। উপরন্তু নতুন প্রয়োজনের জন্যে নতুন ইজতিহাদও করা যেতে পারে। কিন্তু তার জন্যে শর্ত হলো, এ ইজতিহাদের উৎস হবে আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাত এবং ইজতিহাদ তারাই করবেন যারা ইলম ও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টিসহ আল্লাহ্ ও রসূলের অনুসরণ ও আনুগত্যও করবেন। আর যারা আধুনিক যুগ–প্রবণতার নিকট পরাস্ত হয়ে দীনের মধ্যে কোনো প্রকার পরিবর্তন করতে চান, তাঁদের ইজতিহাদের অধিকার স্বীকার করতে আমরা মোটেই রাযী নই।

৩. নীতিগতভাবে এ কথা ঠিক যে, শরীয়তের বিধানসমূহ জারী ও প্রবর্তনের ব্যাপারে সমকালীন পরিবেশ পরিস্থিতির প্রতি নজর রাখা অপরিহার্য প্রয়োজন। উপরন্তু কুরআন ও হাদীসের শব্দাবলী ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট মতবিরোধের অবকাশ আছে, এ কথাও ঠিক। কিন্তু প্রশ্ন দেখা দেয় তখন, যখন সংক্ষিপ্ত আলোচনা ছেড়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনার পর্যায়ে পৌছুই। এখানে আমাদের সম্মুখে এমন অনেক বিস্তারিত আলোচনা আসে যার মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করি যে, পরিবর্তনপ্রিয় ব্যক্তিগণের প্রস্তাবাবলী বৈধতার সীমা অতিক্রম করে গেছে। যেমন এই যাকাতের ব্যাপারটিই নিন। আপনিও এটিকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ পেশ করেছেন। আমাদের মতে যাকাত দেশের সাধারণ রেভিনিউ বা ট্যাক্সের পর্যায়ভুক্ত নয় বরং এটি একটি আর্থিক ইবাদত এবং এ জন্যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (স) যে হার ও ব্যয়ক্ষেত্র নির্ধারণ করেছেন তার মধ্যে কোনো প্রকার

রদবদল হতে পারেনা। যে সমস্ত বস্তুর উপর যাকাত নির্ধারণ করা হয়েছে তাদের মধ্যেও কোনো হ্রাস–বৃদ্ধি সম্ভবপর নয়। তবে যদি কোনো বস্তুকে আল্লাহ্ তাঁর রসূলের নির্ধারিত বস্তুসমূহের উপর কিয়াস করা হয়, তাহলে সে কথা স্বতন্ত্র। আর রাষ্ট্রের প্রয়োজনের প্রশ্নে আমাদের অভিমত হলো, ইসলামী রাষ্ট্র জনগণের খেদমতের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব গ্রহণ করে, সেগুলো সম্পাদনের জন্যে সে জনগণের উপর প্রয়োজন মতো কর ধার্য করতে পারে। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হলো, ইনসাফের সাথে এই ট্যাক্স ধার্য করতে হবে এবং ঈমানদারীর সাথে ব্যয় করতে হবে।

৪. আপনার সর্বশেষ প্রশ্ন ছিল, কুরআন একটি 'কোড' কিনা? এর জবাব হলো, কুরআন 'কোড' নয় বরং একটি হিদায়াতের কিতাব। সমাজ সংশোধন ও সংগঠনের জন্যে এতে আইনগত নির্দেশাবলীও দান করা হয়েছে। এর মধ্যে আইনগত নির্দেশও আছে, নিছক এ জন্যে একে 'কোড' বলা ঠিক নয়। উপরন্তু একে 'পরিপূর্ণ কোড' বলা আরো বিরাট ভুল। সঠিকভাবে যে কথা বলা যেতে পারে তাহলো, কুরআন একটি পরিপূর্ণ হিদায়াতের গ্রন্থ। [তরজমানুল কুরআন, ডিসেম্বর ১৯৫০]

৩

অর্থনৈতিক সমস্যাবলী

জাতীয় মালিকানা

প্রশ্নঃ *যেহেতু জামায়াতে ইসলামী এবং আপনি ব্যক্তিগতভাবে জাতীয় মালিকানার ব্যাপারে একটি বিশেষ দৃষ্টিভংগি রাখেন, এ কারণে কতিপয় সংশয়িত ব্যাপার পেশ করছি। আশা করি আপনি এগুলোর সুরাহা করে সংশয় দূর করতে সাহায্য করবেন। বর্তমান যুগে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় মন-মগজ অবশ্যই প্রভাবিত। বিত্তিহীন (Have nots) ও বিত্তবানদেন (Haves) মধ্যে শ্রেণী সংগ্রামের অস্তিত্ব জাতীয় মালিকানার দৃষ্টিভংগিকে উদ্দীপিত করছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আপনি এবং জামায়াতে ইসলামী ভূমি ও শিল্প ইত্যাদিকে জাতীয়করণ (Nationalozation) করা সম্পর্কে এ কঠোর সিদ্ধান্তে কিভাবে পৌঁছলেন যে, ইসলাম এর বিরোধী? আপনি একজন আহবায়ক বা গবেষক হিসেবে আপনার মতামত প্রকাশ করতে পারেন ঠিকই, কিন্তু শেষ ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার আপনার নেই। একাজ ইসলামী ভিত্তিতে আলোচনা করে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছবে। এবার দেখতে হবে যে, জাতীয় মালিকানা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভংগি কি? সম্ববত আপনার মতে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যক্তির মালিকানা অধিকারসমূহে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি দেয়না। অথচ আমি মনে করি যে, ইসলামী সাহিত্য এই বিতর্কিত বিষয়গুলোতে আদৌ হাত দেয়নি।*

নিঃসন্দেহে এটা ঠিক যে, ইসলাম ব্যক্তি মালিকানার অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু এ থেকে ভূমি ও অন্যান্য সম্পদ (শিল্প ও কারখানা) জাতীয়করণ করা যাবে না, একথা বলা একেবারেই অন্যায়। কোনো অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া এক জিনিস এবং কোনো অধিকার লাভ করাকে অপিহার্য গণ্য করা ভিন্ন জিনিস। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জায়গীর ও পেনশন দিয়েছিলেন বলেই একথা প্রমাণিত হয়না যে, ইসলামী রাষ্ট্র জনগণের সমস্ত ভূমি নিজের নিয়ন্ত্রণে নিতে পারবেনা। কোনো কাজের কার্যত (Defacto) হওয়া এটা প্রমাণ করেনা যে, আইনতও সেটা অপরিহার্য। সম্ভবত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন কোনো হুকুম দিয়েছেন বলে প্রমাণ নেই যে, প্রত্যেক লোককে যমীন অথবা কারখানার মালিক হতে হবে। তাহলে যে বস্তু অত্যাবশ্যক নয় তা ত্যাগ করা কিভাবে নাজায়েয হয়?

কুরআনেই বলা হয়েছে যা কিছু যমীনে আছে সেগুলো তোমাদের জন্যে। আর ইসলামী সরকার নির্বাচিত সরকার হবার কারণে আল্লাহর আদেশক্রমে আমাদের সবার সরকার। যদি এরূপ সরকার সম্পদকে আমাদের সকলের জন্যে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়, তবে বাধা বিপত্তি ও বৈপরীত্যের

কোনো কারণ থাকতে পারে কি? কুরআন যেমন একটি বিশেষ সময়ের অবস্থার প্রেক্ষিতে দাস রাখার অনুমতি দিয়েছিল, ব্যক্তি মালিকানার ব্যাপারটিও অবিকল সেই একই ধরনের। কিন্তু এতে ক্রীতদাস রাখতেই হবে, এটা অপরিহার্য নয়।

আমার বক্তব্য হলো অধিকার স্বীকার করা অধিকার প্রবর্তনের সমার্থক নয়। যে অধিকার ফরযের পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে না এবং ইচ্ছাধীন হয় তা ইচ্ছা করলে সমস্ত মুসলমান বর্জন করতে পারে। আমার কাছে ব্যাপারটা এটা নয় যে, অতীত আমলে ভূমি প্রশাসনে কোন পদ্ধতি চালু ছিল। বরং আসল আলোচ্য বিষয় হলো, ইসলামী রাষ্ট্র কুরআন–হাদীসের দৃষ্টিতে অধিকাংশের রায় নিয়ে সমগ্র মুসলমানের গোটা ভূমি নিজের নিয়ন্ত্রণে এনে উত্তম পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদন করে যেন লোকদের মধ্যে বন্টন করতে পারে। বাকি থাকে ব্যক্তি মালিকানার অধিকার। এ অধিকার আগেও দুনিয়ার কেউ কখনো একেবারে নিশ্চিত করতে পারেনি আর ভবিষ্যতেও পারবেনা।

যদি ব্যক্তিদেরকে পুরোপুরি মালিকানা অধিকার দেয়া হয়, তাহলে রাষ্ট্র পংগু হয়ে যাবে। তখন সে না খাদ্য ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে, না লাইসেন্স পদ্ধতি চালু করতে পারবে আর না ব্যবসায়ের তদারকী করতে পারবে।

জাতীয় মালিকানার জন্যে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত জানার মাধ্যমে হিসাব যদি মজলিসে শুরা যথেষ্ট না হয় তবে গণভোটেরও (Refrendum) ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে যদি গোটা জাতি এ সিদ্ধান্ত দিয়ে দেয়, তাহলে এটাকে ইসলামের খেলাফ কিভাবে বলা যেতে পারে?

__জবাবঃ__ আপনি যেসব প্রশ্ন করেছেন, সেগুলোর বিস্তারিত জবাব একটি চিঠিতে দেয়া দুষ্কর। তবে আশা করি কতিপয় ইশারা–ইংগিত আপনার জন্যে যথেষ্ট হবে। আপনার এ ধারণা ঠিক যে, যেসব ব্যাপারে ভবিষ্যতের ইসলামী রাষ্ট্র অথবা পার্লামেন্টকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে, সেসব ব্যাপারে দীন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত একটি জামায়াত হিসেবে কোনো আগাম সিদ্ধান্ত নেয়ার আইনানুগ অধিকার আমাদের নেই। যদি আমরা এরূপ কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণও করি তবে এর কোনো আইনগত গুরুত্ব নেই। কিন্তু একটি জামায়াত হিসেবে আমাদের কি একথা বলারও অধিকার নেই যে, অমুক প্রচেষ্টা অথবা অমুক কর্মপদ্ধতি আমাদের মতে অনৈসলামী? আমাদের কি এ সিদ্ধান্ত নেয়ারও অনুমতি নেই যে, অমুক প্রস্তাব যদি কখনো আলোচনায় আসে, তাহলে আমরা তখন তার বিরোধীতা করবো? যদি আপনি স্বীকার করে নেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি বা দল, যে দীনের ব্যাপারে পারস্পরিক মত বিনিময় করার যোগ্যতা রাখে সে এমনিভাবের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকারও

রাখে? তাহলে আপনার জানা থাকা উচিত যে, আমরা এর চেয়ে বেশী আর কিছু করিনি। আমরা নিজেরাও জানি, এরূপ ব্যাপারসমূহে আমাদের সিদ্ধান্ত আগত দিনে ইসলামী রাষ্ট্রের মজলিসে শূরার ওপর কোনো বাধ্যবাধকতা আরোপ করবেনা।

এবার আপনি আসল বিষয়ে আসুন। জাতীয়করণের ব্যাপারে নীতিগত–ভাবে দু'টি প্রশ্ন ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখেঃ এক, সমস্ত উৎপাদন উপকরণে জাতীয়করণে কি ইসলামের সামাজিক দর্শনের (social philosophy) দৃষ্টিতে ঠিক তেমনিভাবে কাংখিত যেমন সমাজতন্ত্রের সামাজিক দর্শনের দৃষ্টিতে কাংখিত? অথবা যদি তা কাংখিত হয়ে থাকে, তাহলে কি অন্তত একথা বলা যেতে পারে যে, এরূপ করা ইসলামী সমাজ দর্শনের সামগ্রিক চেতনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? দুই, জাতীয় মালিকানার প্রকল্প বাস্তবায়িত করার জন্যে এটা কি ঠিক হবে যে, কোনো পার্লামেন্ট একটি আদেশ বলে ভূমি ও অন্যান্য উৎপাদন উপকরণ থেকে ব্যক্তি মালিকানা রহিত করে সমষ্টি মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে দেবে? অথবা এ সিদ্ধান্ত নেবে যে, সমস্ত মানুষ নিজের এরূপ সমস্ত মালিকানা সরকারের নির্ধারিত মূল্যে সরকারের কাছে অবশ্যই বিক্রি করে দেবে? প্রথম বিষয়টি সম্পর্কে আপনি আমার লেখা "ভূমির মালিকানা" বিধান গ্রন্থের শেষ অধ্যায়টি মনোযোগ সহকারে দেখুন। অধিকন্তু আমার কিতাব "ইসলাম ও আধুনিক ব্যাংকিং"ও পড়ে নিন। নাঈম ছিদ্দীকী সাহেবের "জাতীয় মালিকানা" নামীয় পুস্তিকাটির উপরও এক নজর বুলিয়ে নিলে ভালো হবে। এগুলো ভালো করে দেখার পরও যদি আপনার রায় এই হয় যে, উৎপাদন উপকরণগুলোকে একটি আলাদা পলিসি হিসেবে জাতীয় মালিকানায় নিয়ে নেয়া ইসলামের সামাজিক দর্শনের দৃষ্টিতে কাংখিত অথবা তার সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ, তাহলে মেহেরবানী করে আপনি আপনার দলিল পেশ করুন এবং সাথে সাথে আমাদের দলিলের সমালোচনা করে এগুলোর ভুলও সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরুন। একজন আইনজ্ঞ হিসেবে আপনি কি দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে এটা প্রমাণ করতে সক্ষম যে, ইসলামী শরীয়ত সমগ্র জনসমষ্টির নয় বরং কোনো এক ব্যাক্তিরই ব্যাক্তিগত মালিকানাকে এমনিভাবে রহিত করতে কিংবা তার নিজস্ব সম্পদ বিক্রি করতে বাধ্য করার অনুমতি দেয়? বিশেষ করে যখন রহিত করা অথবা বল প্রয়োগ করা এমন সামাজিক দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত, যা অবশ্যই কুরআন ও হাদীস থেকে অনুসৃত নয়, তখন কি এটা সম্ভবপর? [তরজমানুল কুরআন, যিলহজ্জ ১৩৬৯, অক্টোবর ১৯৫০]

ভূ–স্বামী, বর্গাচাষী ও সুবিচার

প্রশ্নঃ আমি একটি বিরাট জমিদারীর মালিক। কৃষকদের সাথে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী ব্যবহার করার ফায়সালা করেছি। এ উদ্দেশ্যে আমি যে কার্য–পদ্ধতি অবলম্বন করেছি সেগুলো সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে চাইঃ

১. আমি প্রত্যেক চাষীকে হালপিছু দশ–বারো একর জমি দিয়েছি। দীর্ঘকাল থেকে বেগার খাটার প্রচলন ছিল। আমি তা রহিত করে দিয়েছি। কেবলমাত্র সেচ ব্যবস্থাকে যাথাযথভাবে চালু রাখার দায়িত্ব কৃষকদের উপর সোপর্দ করা হয়েছে।

২. প্রত্যেকটি উৎপন্ন ফসলের এক–তৃতীয়াংশ আমি গ্রহণ করি। পানির ট্যাক্স সম্পূর্ণ চাষী পরিশোধ করে। আমি জমি মালিকানার ট্যাক্স আদায় করি। অন্যান্য যাবতীয় ট্যাক্স (কৃষি কর ছাড়া) বর্গার অনুপাতে সম্মিলিতভাবে আদায় করা হয়। ক্ষতির বোঝা কৃষকদের ঘাড়ে চাপানো হয়না।

৩. বীজশস্য সরবরাহের দায়িত্ব চাষীর আর উচ্চমূল্যের শস্যবীজের এক–তৃতীয়াংশ সরবরাহ করি আমি নিজে।

৪. প্রত্যেক উৎপন্ন ফসলের এক–তৃতীয়াংশ নেয়া ছাড়াও সমগ্র উৎপন্ন ফসল থেকে আবার পৃথকভাবে মণ প্রতি তিন সের করে নিয়ে থাকি। এছাড়া আর কোনো ধরনের কর আদায় করা বা বেগার খাটা অথবা পাহারা দেবার কাজ প্রভৃতি করিয়ে নেবার চেষ্টা করা হয়না।

৫. আমার কৃষি মজুরও আছে। তাদের কেউ কেউ চাষ করার পর ফসলের অংশ নেয়, কেউ কেউ নিছক বেতনে কাজ করে। ফসলের অংশ যারা নেয় তারা আমার বলদ নিয়ে আমার ক্ষেতে আমার ম্যানেজারদের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে। বীজশস্য আমি দিই। ফসল কাটার পর জমির মালিকানা হিসেবে এক–তৃতীয়াংশ এবং এছাড়াও সমগ্র ফসল থেকে মণ প্রতি তিন সের করে আমি নিয়ে থাকি। বাকি ফসলের অর্ধেক বলদের ব্যয়ভার হিসেবে নেয়া হয় এবং অবশিষ্ট অর্ধেক কর্মচারীদের কাজের বিনিময়ে দেয়া হয়।

৬. আমি উত্তরাধিকার সূত্রে জমির মালিকানা লাভ করেছি। আমার পূর্ব পুরুষরা সরকার অথবা অন্য জমিদারদের থেকে এ জমিগুলো কিনে নিয়েছিলেন। আমার কাছে কোনো সরকারী জায়গীর প্রভৃতি নেই।

মেহেরবানী করে আমার ব্যাপারটি একটু ভেবে দেখবেন। হয়তো আমার দেখাদেখি অন্যান্য জমি মালিকরাও তাদের জমি ব্যবস্থাপনার সংস্কারের প্রতি মনোযোগী হতে পারে।

জবাবঃ আপনি নিজের জমিদারীভুক্ত জমিগুলোর ব্যবস্থাপনায় শরীয়তের বিধান অনুযায়ী স্বেচ্ছা প্রণোদিত সংস্কারে এগিয়ে এসেছেন, এজন্য অবশ্যি আল্লাহ আপনাকে শ্রেষ্ঠ প্রতিদান দেবেন। ভালো হতো যদি অন্যান্য জমিদাররাও

এভাবে নিজেদের জমি ব্যবস্থাপনার সংস্কারে এগিয়ে আসতেন। নিজের সংস্কারমূলক ব্যবস্থাপনার যে বর্ণনা আপনি দিয়েছেন তার মধ্যে ১, ২, ৩, নম্বর সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন নেই। এগুলো জায়েয। তবে ৪ নম্বরের প্রথম অংশ ঠিক নয়। ওটা বদলে দিন। উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশের পর আবার সমগ্র শস্য থেকে মণ প্রতি তিন সের করে গ্রহণ করা আপনার সমগ্র বর্গা ব্যবস্থাটাকেই নাজায়েয করে দিচ্ছে। আপনি কেবল মাত্র আনুপাতিক হারে অংশ লাভ করার অধিকার রাখেন। ওজনের ভিত্তিতে একটি নির্ধারিত অংশ গ্রহণ করার অধিকার আপনার নেই।

৫ নম্বরে আপনি যে অবস্থা বর্ণনা করেছেন তাতে পারিশ্রমিক ও বর্গা ব্যবস্থা মিশ্রিত হয়ে গেছে। এর ফলে যুলুমের পথ খুলে যেতে পারে। যেসব জমিকে আপনি বর্গা চাষে দেবেন, সেগুলো আলাদা করে রাখুন আর যেগুলোয় দিনমজুর বেতন ভোগী কর্মচারী খাটিয়ে নিজে চাষ করবেন সেগুলোও আলাদা করুন। পারিশ্রমিক দিয়ে আপনি নিজে যে জমি চাষ করবেন তার কম-বেশী সমস্ত ফসল আপনার। সেখানে আপনার কর্মচারীরা কেবলমাত্র পারিশ্রমিকের অধিকারী হবে। আর ভাগ চাষে যে জমিগুলো দেবেন, সেগুলোর চাষাবাদে আপনার বা আপনার ম্যানেজার চাষীদের কাজে হস্তক্ষেপ করার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি চাষীদেরকে শুধুমাত্র জমি দেন বা সেই সংগে হাল ও বীজ দেন, এক্ষেত্রে অবশ্যই স্থিরকৃত আনুপাতিক হার অনুযায়ী উৎপন্ন ফসল থেকে কেবলমাত্র নিজের অংশটি নেবার অধিকারী আপনি হবেন।

৬ নম্বরে নিজের জমিদারীর যে মূলগত বর্ণনা আপনি দিয়েছেন তা যদি যথার্থ হয়ে থাকে, তাহলে আপনার মালিকানাও শরীয়তের দৃষ্টিতে যথার্থ বিবেচিত হবে। এ অবস্থায় জমি ব্যবস্থাপনার সংস্কারের দায়িত্ব আপনার উপর বর্তায়। আর এই সংগে শরীয়তের দৃষ্টিতে আর যে সমস্ত ওয়ারিশ আছে তাদের ন্যায্য অংশও তাদেরকে দিয়ে দেয়া আপনার দায়িত্ব।

প্রশ্নঃ আপনার জবাবের কিছু অংশ বুঝতে অক্ষম হবার কারণে আবার প্রশ্ন করতে বাধ্য হচ্ছি। আশা করি এবার বিস্তারিত জবাব দিয়ে বাধিত করবেন।

১. যদি বর্গাচাষে এক-তৃতীয়াংশ নেবার পর অতিরিক্ত মণ প্রতি তিন সের করে নেয়া ঠিক না হয়ে থাকে, তাহলে দ্বিতীয় পথ অবলম্বন করা যেতে পারে। অর্থাৎ আনুপাতিক অংশের পরিবর্তন করা যেতে পারে। যেমন $\frac{১}{৩}$ এর পরিবর্তে $\frac{২}{৫}$ বা $\frac{৩}{৫}$ এর আনুপাতিক হার নির্ধারণ করা যেতে পারে। অথবা শরীয়তের দৃষ্টিতে

অধিকতর সংগত অন্য কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে।

ভাগে চাষ ও নিজের কর্মচারীদের মাধ্যমে চাষ করার জমিগুলো পৃথক করার জন্য আমি আজই বলে দিয়েছি। বর্গা চাষের শরীয়ত নির্ধারিত পদ্ধতি বা অনুপাত সম্পর্কে জানাবেন।

২. আপনি বলেছেন, আমার কর্মচারী বা ম্যানেজার চাষীদের কাজে হস্তক্ষেপ করার কোনো প্রয়োজন নেই। প্রশ্ন হচ্ছে, তাদের কাজের তদারক না করলে তারা জমি মালিকের হক মেরে দেবে এবং প্রয়োজনীয় মেহনত করবেনা। কর্মচারীদের ব্যয়ভার আমি বহন করি। এর সাথে চাষীদের কোনো সম্পর্ক থাকেনা।

৩. আপনি বলেছেন, আমার জমিজমা বর্তমানে শরীয়ত অনুমোদিত যেসব ওয়ারিশ আছে তাদের মধ্যে বন্টন করে দিতে। এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য হচ্ছে, আমার আব্বার উপর যে অংশ শরীয়তের দৃষ্টিতে আদায় করা ওয়াজিব ছিল তা অবশ্যি তাঁর দায়িত্বভুক্ত ছিল। মরহুম আব্বাজান নিজের জীবদ্দশায় তাঁর সব ধরনের মালিকানা আমার নামে হেবার মাধ্যমে স্থানান্তরিত করে গেছেন। মৃত্যুর ছ'বছর আগে তিনি এ কাজ করে গেছেন। এ অবস্থায় আমার উপর কি কেবলমাত্র আমার পরবর্তী ওয়ারিশদের হক আদায় করা ওয়াজিব হবে, না আমার মরহুম আব্বাজানের ওয়ারিশদের হকও? যদি মরহুম আব্বাজানের ওয়ারিশদের হক আমি আদায় করতেও চাই তাহলেও আমার ভাইয়েরা এ ব্যাপারে আমার সহযোগী হবেনা আর আমি একা তাদের অধিকার পুরোপুরি আদায় করতে পারবোনা। আমি মনে করি, এ ব্যাপারটি ছিল মরহুম আব্বাজানের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত, আমার নয়।

জবাবঃ

১. উৎপন্ন ফসল থেকে জমি মালিক ও ভাগ চাষী আনুপাতিক হারে অংশ বন্টন করে নেবেন, ভাগের এ পদ্ধতিটি নীতিগতভাবে ঠিক। যেমন ধরুন আপনার কথামত মালিকের $\frac{২}{৫}$ এবং চাষীর $\frac{৩}{৫}$ অংশ। কিন্তু এ ব্যাপারে সুবিচারের তাগিদে অবশ্যই প্রত্যেক চাষীকে এমন পরিমাণ জমি দিতে হবে যাতে তার মানবিক প্রয়োজন পূর্ণ হয়। উপরন্তু আনুপাতিক অংশ নির্ধারণ করার সময় প্রচলিত নিয়মের প্রতি নজর না দিয়ে সুবিচারের প্রতি নজর রেখে দেখতে হবে ফসল উৎপাদনে আপনার ও আপনার চাষীর যথার্থ অংশ (Contribution) কতটুকু? এ ব্যাপারে কোনো বিশ্বজনীন আইন–কানুন বানানো সম্ভব নয়। কারণ প্রত্যেক এলাকার কৃষিগত অবস্থা এক রকম নয়। তবে আপাত–দৃষ্টিতে মনে হয়, আপনি যদি কেবল জমি দিয়ে থাকেন এবং হাল, জীব ও মেহনত সব হয়

চাষীর তাহলে এ অবস্থায় $\frac{২}{৫}$ ও $\frac{৩}{৫}$ ভাগটা সুবিচার ভিত্তিক হবেনা। যাই হোক আমাদের কাম্য হলো, জমি মালিকরা নিজেদের জমি ব্যবহারে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী নিজেদেরকে সংশোধন করে নেবেন এবং খোলা মনে যথার্থ সুবিচার কায়েম করার উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসবেন।

২. অবশ্যই আপনার তদারক করার অধিকার আছে। আপনি দেখতে পারেন ফসল ভাগ করার পূর্বে চাষী সম্মিলিত অংশ থেকে অবৈধভাবে কিছু গ্রাস করে ফেলছে কিনা, অথবা কৃষক হিসেবে সে নিজের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছে কিনা। কিন্তু এই তদারকী ব্যবস্থা এত বেশী অগ্রসর না হওয়া উচিত যার ফলে চাষী কেবলমাত্র কর্মচারী বা মজুরে পরিণত হয়ে যায় এবং আপনার তদারকী কর্মচারীরা পুরোপুরি নিজেদের হুকুম অনুযায়ী তাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়। নীতিগতভাবে একজন চাষী আপনার কর্মচারী বা মজুর নয়। বরং আপনার কারবারের ভাগীদার। আর একথা মেনে নিয়েই তার সাথে ব্যবহার করা উচিত। চাষীদের পক্ষ থেকে আমি যেসব অভিযোগ পেয়েছি তার মধ্যে এ অভিযোগও আছে যে, জমিদার ও তার কর্মচারীরা হরহামেশা তাদের মাথার উপর সওয়ার হয়ে থাকে এবং তাদের প্রত্যেকটি কাজে হস্তক্ষেপ করে। এ পদ্ধতির সংশোধনই আমার বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য।

৩. কোনো ব্যক্তি নিজের জীবদ্দশায় যে সম্পত্তি কাউকে হেবা করে দেয় (তবে শর্ত হচ্ছে মৃত্যুর আশংকায় নয়) তাতে মীরাস বন্টনের প্রশ্ন ওঠেনা। কিন্তু মৃত ব্যক্তি যে পরিত্যক্ত সম্পত্তি রেখে গেছেন, তা কম হোক বা বেশী হোক, মীরাসী আইনের ভিত্তিতে তা অবশ্যি বন্টন করতে হবে। মৃত ব্যক্তির উপর এ মীরাস বন্টনের কোনো দায়িত্ব বর্তায়না। বরং পরিত্যক্ত সম্পত্তিকে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী বন্টন করা উত্তরাধিকারীদের কাজ। ধরা যাক, অন্যান্য উত্তরাধিকারীরা যদি এমনটি করতে রাযী না হয়, তাহলে আপনি অন্তত এতটুকু করতে পারেন, আপনার নিজের ভাগে শরীয়তের দৃষ্টিতে যতটুকু পড়ে তার বেশী আপনি রাখবেননা এবং আপনার বাড়তি অংশ আপনি সেই ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করে দেবেন যারা শরীয়ত প্রদত্ত অংশ থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে।

হেবার ব্যাপারেও নিশ্চিতভাবে এটা জেনে নিতে হবে যে, এই হেবার পেছনে শরীয়ত নির্ধারিত পদ্ধতিতে মীরাস বন্টনের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো উদ্দেশ্য কার্যকর ছিল কিনা? [তরজমানুল কুরআন, অক্টোবর ১৯৫০]

সূদ ও জমি ভাড়ার মধ্যে পার্থক্য

প্রশ্নঃ টাকার সূদ ও জমির ভাড়ার মধ্যে পার্থক্য কি? বিশেষ করে এমন অবস্থায় যখন উভয় পুঁজির উপাদান (Units of Capital) একই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বছরে পাঁচ টাকা হারে সূদে একশো টাকা খাটানো হলো। অথবা পাঁচ টাকা ভূমি করের বিনিময়ে এক বিঘে জমি একজনকে দেয়া হলো। এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? উভয় ক্ষেত্রেই দ্বিতীয় পক্ষ লাভের মুখ দেখবে, না ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তা সম্পূর্ণ সংশয়িত। এর সাথে পুঁজি বিনিয়োগকারীর (Lender) কোনো সম্পর্ক নেই। অর্থ মালিক বা জমি মালিক লাভ–ক্ষতির অনেক উর্ধ্বে থাকে।

জবাবঃ জমি ভাড়ায় খাটাবার যে পদ্ধতিটি আমি জায়েয মনে করি তা আমার 'জমি মালিকানা সমস্যা' বইতে সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেছি। সেখানকার আলোচনা সামনে রেখে তার সাথে সূদের পার্থক্যটা বিচার করুন। ভাড়ায় যেসব জিনিস খাটানো হয়, সেগুলো সাধারণত এমন সব জিনিস হয় যেগুলো ভাড়াটের ব্যবহারের ফলে কিছু না কিছু ভাঙাচুরা বা নষ্ট হয়ে থাকে এবং মালিক কখনো সেগুলো আগের মতো অবিকৃত অবস্থায় ফেরত পেতে পারেনা। এ অবস্থাটা যেমন ফার্নিচার, বাড়ি, গাড়ি ইত্যাদির ব্যাপারে সত্য, তেমনি জমির ব্যাপারেও। জমি ভাড়ায় নিয়ে কেউ সেখানে ইঁটের পাঁজা পোড়াক, বুকস্টল লাগাক বা অন্য কোনোভাবে জমি ব্যবহার করুক না কেন আগের অবস্থায় কখনোই তা থাকবেনা। কিন্তু টাকার বেলায় একথা খাটেনা। টাকা হচ্ছে নিছক একটি ক্রয় মূল্যের নাম। একে কোনো ব্যক্তি ধার বা বন্ধক নিলে এর ভেঙেচুরে যাবার বা ঘসে–ক্ষয়ে যাবার কোনো প্রশ্ন দেখা দেয়না। টাকা যে ব্যক্তি ঋণ নেয়, সে আবার তা হুবহু ফেরত দিতে পারে। এভাবে কোনো ব্যক্তি শস্য ধার নিলে যতটা নিয়েছিল আবার ঠিক ততটাই ফেরত দিতে পারে। যে পরিমাণ শস্য ঋণ নিয়েছিল তার মধ্যে নষ্ট হবার বা ঘসে খারাপ হবার কোনো ব্যাপারই নেই। [তরজমানুল কুরআন, জানুয়ার–ফেব্রুয়ারী ১৯৫১]

ইসলামের ভূমি আইন সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন

প্রশ্নঃ জনৈক স্থানীয় আলেম জামায়াতের মেনিফেস্টো পড়ার পর দুটি প্রশ্ন করেছেন। মেহেরবানী করে সে দুটি জবাব দেবেন।

১. কৃষি সংস্কার প্রসংগে জায়গীর ফেরত নেবার ব্যাপারে নির্দিষ্ট সীমার অতিরিক্ত নেবার পক্ষে দলিল পেশ করুন। বিশেষ করে যেখানে হযরত যুবায়ের

রাদিয়াল্লাহ্ আনহুকে রসূলুল্লাহ্ (স) চাবুক নিক্ষেপের মাধ্যমে নির্দেশিত এলাকার জমি দিয়েছিলেন।

২. কৃষকদের উচ্ছেদের ব্যাপারে তো একথা সুস্পষ্ট যে, ফসল ফলার আগে তাদেরকে বেদখল করা যাবেনা। কিন্তু এছাড়া তাদেরকে জমি থেকে বেদখল করার কোনো কারণ দেখিনা। যদি অন্য কোনো পথ থাকে তাহলে দলিল সহকারে পেশ করবেন।

আর একজন প্রশ্ন করেছেন, কুরআন পড়ে জানা যায়, দুনিয়ার সৃষ্ট বস্তুগুলো থেকে প্রত্যেক ব্যক্তির উপকৃত হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে সাধারণের উপকারার্থে জমির মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে সোপর্দ করে দিলে তা কুরআনের উদ্দেশ্যের যথার্থ বাস্তবায়ন বলে মনে হয়।

জবাবঃ প্রথম প্রশ্নটির ব্যাপারে নীতিগতভাবে একথা জেনে রাখা উচিত যে, এক ব্যক্তি জমি কিনে বা উত্তরাধিকার সূত্রে জমির মালিকানা লাভ করে যেভাবে জমির উপর মালিকানা স্বত্ব কায়েম করে সরকার প্রদত্ত জায়গীরের উপর জায়গীরদারের মালিকানা স্বত্ব ঠিক সেভাবে কায়েম হয়ে যায়না। জায়গীরের ব্যাপারে সরকার সব সময় পুনর্বিবেচনা করার অধিকার রাখে। কোনো দান অসংগত বিবেচিত হলেই সরকার তা বাতিল করে দিতে পারে। এক্ষেতে সরকারী পদক্ষেপ সংশোধনের উর্ধ্বে নয়।

হাদীস ও আছার গ্রন্থগুলোতে এর কয়েকটি নযীর পাওয়া যায়। আবইয়ায ইবনে হাম্মাল মাযনীকে (রা) নবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারিব এলাকায় এমন একটি জমি দিয়েছিলেন যেখান থেকে লবণ বের হতো। পরে লোকেরা যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেখানে একটি বিরাট লবণের খনির অস্তিত্বের সন্ধান দিলো, তখন তিনি এ ধরনের জমি ব্যক্তি মালিকানায় দেয়া সামাজিক স্বার্থের পরিপন্থী বিবেচনা করে তা বাতিল করে দেন। এ থেকে কেবল এ কথাই জানা যায়না যে, সরকারী দান সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে বরং এই সংগে এ কথাও জানা যায় যে, কাউকে সংগত সীমার বেশী দেয়া সামষ্টিক স্বার্থ বিরোধী আর এই পর্যায়ে কাউকে কিছু দান করা হয়ে থাকলে তা পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে। আর একটি রিওয়ায়েত থেকেও একই কথা জানা যায়। তাতে বলা হয়েছে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহ্ আনহু হযরত তালহা রাদি আল্লাহ্ আনহুকে একটি জমি দান করার ফরমান লিখে দেন। কিন্তু তিনি বলেন, এই ফরমানে অমুক অমুক সাহাবার সাক্ষ্য নিয়ে নাও। তাদের মধ্যে হযরত উমর রাদি আল্লাহ্ আনহুও ছিলেন। হযরত তালহা (রা) হযরত উমরের (রা) কাছে গেলে তিনি এই ফরমানে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করেন এবং বলেনঃ

افهذا كله لك دون الناس؟

"এতগুলো জমি একা তোমাকে দেয়া হবে আর সবাইকে বঞ্চিত করে?" (দেখুন কিতাবুল আমওয়াল লিআবী উবাইদা, ২৭৫–৭৬ পৃষ্ঠা)

হযরত যুবায়ের রাদি আল্লাহু আনহু প্রসংগে বলা যায়, যে সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জমি দেন, তখন বিপুল পরিমাণ জমি অনাবাদী পড়ে ছিল। রসূলুল্লাহর (স) সামনে তখন এই জমিগুলো আবাদ করার সমস্যাই ছিল মুখ্য। তাই সে আমলে তিনি এইসব অনাবাদী জমির বিরাট বিরাট খন্ড লোকদেরকে দিয়েছিলেন।

জমি বেদখল করার ব্যাপারে সরকার এমন ধরনের আইন প্রণয়ন করার অধিকার রাখে যার মাধ্যমে একথা নিশ্চিত করে দেয়া যায় যে, যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া মালিক কখনো কোনো কৃষককে বেদখল করতে পারবেনা। এটা নাজায়েয হবার দলিল কি? যদি কোনো 'নাস' (আল্লাহ্ ও রসূলের নির্দেশ) এর বিরোধি না হয়, তাহলে এ অনুমতি এমনিতেই রাষ্ট্র প্রদানের সেই সব ইখতিয়ারের আওতাভুক্ত হয়ে যায়, যা তাকে দান করা হয়েছে জনগণের মধ্যে সুবিচার ও ন্যায়–নীতি কায়েম করার এবং সামষ্টিক ফিতনার পথ রোধ করার জন্যে। বর্তমানে যেখানে আমাদের দেশের জনগণের বৃহত্তর অংশের জীবন ধারণ জমির উপর নির্ভরশীল, সেখানে মালিকদেরকে এত অবাধ ও ব্যাপক ক্ষমতা দান করা কোনোক্রমেই জনস্বার্থের অনুকূল নয়, যার ফলে তারা নিজেদের খেয়াল–খুশীমত যে কোনো কৃষককে কোনো সংগত কারণ ছাড়াই যে কোনো সময় জমি থেকে উচ্ছেদ করতে পারে। এর অর্থ দাঁড়াবে, কোনো কৃষক কখনো কোথাও নিশ্চিন্তে বসতে পারবেনা। এভাবে লাখো লাখো কৃষিজীবী মানুষের জীবন সব সময় দোদুল্যমান ও ঝুলন্ত অবস্থায় থাকবে।

কুরআন অধ্যয়নের পর তা থেকে অদ্ভুত ফলশ্রুতি আপনি পেশ করেছেন। কুরআন থেকে আপনি বের করেছেন মালিকানা ব্যবস্থা রাষ্ট্রের হাতে সোপর্দ করে দিতে হবে। আমি খুবই খুশী হতাম যদি জানতে পারতাম কুরআনের কোন্ কোন্ আয়াত থেকে এগুলো বের হয়েছে। আপনি আমার 'ভূমির মালিকানা বিধান' বইটির প্রথম দুটি অধ্যায় ঐ আলেম সাহেবের সামনে রাখুন, যাতে তিনি সেখানে প্রদত্ত জবাবে যে প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেছে তার পুনরাবৃত্তি না করেন। অথবা সেই প্রশ্নগুলোর পুনরাবৃত্তি করতে চাইলে অন্তত সেখানে তার যে জবাব দেয়া হয়েছে তার সাথে কোন্ কোন্ ব্যাপারে তিনি একমত নন, যেন জানিয়ে দেন। তাহলে এভাবে আমার ও তাঁর অনেকটা সময় অপচয়ের হাত থেকে বাঁচবে। [তরজমানুল কুরআন, জুন ১৯৫১]

শরয়ী বিধানের কৃত্রিম দাবীদার

প্রশ্নঃ মিয়া মমতাজ দৌলাতানা এবং অন্যান্য মন্ত্রীবর্গের সাম্প্রতিক বক্তৃতা–বিবৃতিতে প্রভাবিত হয়ে ভূমি মালিকগণ নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্যে শরীয়তের আইন জারী করার দাবী উথাপন করেত প্রস্তুত হচ্ছে। তাদের অধিকার হরণ করবে এমন কোনো স্কীম মেনে নিতে তারা রাযী নয়। ক্যাম্বেলপুরে এই ধরনের লোকেরা একজোট হয়ে "শরয়ী আইনের দাবীদার" নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছে। তারা ক্যাম্বেলপুর জেলায় এ দাবী উথাপন করবে এবং অন্যান্য জেলায়ও এ আন্দোলনের বিস্তৃতির চেষ্টা করবে। সংগঠনটি এ উদ্দেশ্যে "শরয়ী আইন দাবীদারদের সংগঠনের দাবী" শিরোনামে একটি বিজ্ঞাপন এবং পাঞ্জাবের এম,পি,দের নামে একটি স্মারকলিপি ছাপিয়েছে। বর্তমান অবস্থায় এসব লোক আমাদের উদ্দেশ্য অর্থাৎ আল্লাহর বিধান জারী করার ব্যাপারে আগ্রহী হবে বলে আমরা আশা করি। এ পরিস্থিতিতে আমরা তাদের সাথে মিলিত হয়ে কাজ করতে পারি কিনা সে সম্পর্কে আমাদের পরামর্শ দিবেন।

জবাবঃ এ ধরনের "শরয়ী আইনের দাবীদার"দের সাথে কোনো প্রকার সহযোগিতা করা এবং তাদের কাজে অংশগ্রহণ করার প্রশ্নই উঠেনা। কেননা এরা পূরা শরীয়তকে বৃদ্ধাংগুলি প্রদর্শন করে কেবল কোনো একটি ব্যাপারে শরয়ী বিধানের দাবী এ কারণে করছে যে, এ প্রসংগে শরীয়তের বিধানটি তাদের স্বার্থ ও প্রবৃত্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এসব লোককে আপনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিন, তাদের সাথে আমাদের মিলিত হওয়া সম্ভব নয়। কারণ তারা আল্লাহর বিধান জারী ও প্রতিষ্ঠা হোক তা চায় না বরং শরীয়তকে তারা নিজেদের স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার বানাতে চায়। যদি তারা সত্যিই শরীয়তের সমর্থক ও দাবীদার হয়ে থাকে তাহলে শরীয়তের পূর্ণ প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠার দাবী নিজেদের প্রোগ্রামে শামিল করুক। এবং বাস্তব জীবনে বিশেষত নিজেদের জমিদারী ব্যবস্থাপনায় শরীয়তের অনুসরণ করে দৃষ্টান্ত কায়েম করুক। যদি তারা এ কাজ করে, তাহলে তাদের সাথে সহযোগিতা করা এবং তাদের কাজে অংশ গ্রহণ করার ব্যাপারে চিন্তা করা যেতে পারে, অন্যথায় নয়। [তরজমানুল কুরআন, রমযান ১৩৭০, জুলাই ১৯৫১]

ক্রেডিট পত্রের মাধ্যমে ব্যবসায়

প্রশ্নঃ জনৈক আমদানীকারক বিদেশ থেকে পণ্যদ্রব্য আমদানী করার জন্যে ব্যাংকে শতকরা ১০ ভাগের উপর লেটার অব ক্রেডিট খোলেন এবং পরে ঐ

বুককৃত পণ্যদ্রব্য তিনি নিজে যে শর্তে বুক করেন সেই শর্তানুযায়ী বিক্রি করেন। অর্থাৎ শতকরা ১০ ভাগ ক্রেডিটপত্রসহ।

উপরোল্লিখিত শর্তাদির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সুস্পষ্ট শর্ত এই ছিলো যে, উল্লিখিত পণ্য যদি চুক্তিনামায় লিখিত সময়ের মধ্যে জাহাজে (Ship) উঠানো না হয় বা কোনো জরুরী অবস্থার কারণে আদতে পণ্যদ্রব্যই বাতিল হয়ে যায় তাহলে ক্রেতা ক্রেডিটপত্র ফেরত নিয়ে বিষয়টির ইতি টানবেন (কার্যত এমনটিই হয়ে থাকে)।

অর্থাৎ পণ্যদ্রব্য জাহাজ বোঝাই না হওয়া অবস্থায় ক্রেতা ঐ পণ্যের লাভ-লোকসানের দাবী করেনা বরং যদি পণ্যদ্রব্য বুক হয়ে যায়, তাহলে সে তার লাভ-ক্ষতির দায়িত্ব নেয়। অন্যথায় ক্রেডিটপত্র ফেরত নেয়া হয় এবং পণ্যদ্রব্য বাতিল হয়ে যায়। এ পণ্যদ্রব্য বিভিন্ন স্থানে বিক্রি হয়ে গেলেও এর মধ্যে কোনো পার্থক্য সূচিত হবেনা।

এ কর্মপদ্ধতির মধ্যে এমনকি গলদ ও ত্রুটি আছে যার ফলে শরীয়তের দৃষ্টিতে একে নাজায়েয বলা হয়? প্রায় প্রতি মাসে আমরা এ ধরনের লাখো লাখো টাকার কারবার করে থাকি। কিন্তু এ পদ্ধতিটি জায়েয কিনা এ নিয়ে এখন আমরা বিরাট সমস্যায় পড়েছি। জনৈক 'আলেম' এর সপক্ষেও রায় দিয়েছেন।

জবাবঃ আপনি যে বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন তার দুটি ভিন্ন ভিন্ন রূপ আছে, প্রত্যেকটির অবস্থা ভিন্নতর।

এক. আপনি একটি পণ্যদ্রব্য ব্যাংকের মাধ্যমে বুক করালেন। পরে আপনার ও অন্য একজন ব্যবসায়ীর মধ্যে অনুষ্ঠিত পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে ঐ বুকিং তার নামে স্থানান্তরিত হলো। এ অবস্থাটি কেবল একটি শর্ত সাপেক্ষে জায়েয, তা হচ্ছে এই যে, এই বুকিং মুনাফাসহ বিক্রি করা হোক বা না হোক বা নিছক এক নাম থেকে অন্য নামে স্থানান্তরিত হোক, সর্বাবস্থায় তা এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে অন্য ব্যক্তির দিকে পুরোপুরি স্থানান্তরিত হতে হবে। অর্থাৎ ক্রেডিটপত্র প্রথম ব্যক্তির পরিবর্তে দ্বিতীয় ব্যক্তির নামে খোলা হবে এবং ঐ পণ্যদ্রব্যের সাথে প্রথম ব্যক্তির কোনো প্রকার সম্পর্ক থাকবেনা। দ্বিতীয় ব্যক্তিই তার প্রত্যেকটি বিষয়ের যামিন হবেন। প্রথম ব্যক্তির এই বিষয়ের সাথে কোনো দায়িত্ব জড়িত থাকবেনা।

দুই. পণ্যদ্রব্য বুক করাবার পর তা এখানে পৌছার ও আপনার হস্তগত হবার আগেই আপনি তাকে নিজের সামগ্রী হিসেবে মুনাফার ভিত্তিতে অন্যের হাতে বিক্রি করে দিলেন এবং ক্রেডিটপত্র নিয়ে নিলেন দ্বিতীয়জন তৃতীয়জনের হাতে বিক্রি করলেন এবং তৃতীয়জন চতুর্থজনের হাতে বিক্রি করলেন। পণ্যদ্রব্য

এখনো অদৃশ্য রয়ে গেছে অথচ প্রত্যেকে তার উপর নিজের নিজের মুনাফা লাগিয়ে বিক্রি করে ক্রেডিটপত্র নিয়ে নিতে থাকলেন। এ অবস্থায় পণ্য জাহাজ বোঝাই না হবার বা বাতিল হবার কারণে যদি এক ব্যক্তি ক্রেডিটপত্র ফেরত দেবার ক্ষমতাই রাখে এবং প্রত্যেকে এ ওয়াদাও করে যে, পণ্য বাতিল হলে কেউ লাভ–লোকসানের দাবী করবেনা, তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে এ ক্রয়–বিক্রয়টি নিষিদ্ধ। এর নিষিদ্ধ হবার সপক্ষে হাদীস বলেঃ

لا تبع ما ليس عندك ۔ (احمد، ترمذی، ابوداؤد)

"এমন কোনো বস্তু বিক্রি করোনা যা প্রকৃতপক্ষে তোমার নিকট নেই।" –(মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজা)

اذا اشتريت شيئًا فلا تبعه حتى تقبضه ۔ (احمد)

"যখন তোমরা কোনো বস্তু ক্রয় করো, তখন সেটাকে নিজের হস্তগত করার পূর্বে কোথাও বিক্রি করোনা।" –(আহমদ)

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى ۔ (احمد، مسلم)

"রসূলুল্লাহ (স) শস্য ক্রয় করার পর তা পুরোপুরি ওজন করার আগে অন্যত্র বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।" –(আহমদ, মুসলিম)

كانوا يتبايعون الطعام جزافًا باعلى السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه حتى ينقلوه

"লোকেরা বাজারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শস্যের স্তূপ ক্রয় করতো এবং সেখানেই তা বিক্রি করে দিতো। রসূলুল্লাহ (স) নির্দেশ দেন, শস্য সে স্থান থেকে স্থানান্তরিত না করা পর্যন্ত অন্যত্র বিক্রি করা যাবেনা।" –(বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)

এই হাদীসগুলো থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, কোনো বস্তু ক্রয় করে হস্তগত করার আগে অন্যত্র বিক্রি করা নিষিদ্ধ।

এর নিষিদ্ধ হবার পেছনে যুক্তি হলো, প্রথমত এই ধরনের কেনা–বেচার মধ্যে বিবাদের সম্ভাবনাই অধিক। দ্বিতীয়ত এই অবস্থায় কোনো প্রকার সত্যিকার তামাদ্দুনিক খেদমত ছাড়াই এক ব্যক্তির নিকট থেকে অন্য ব্যক্তি একটি অদৃশ্য বস্তুকে মুনাফার পর মুনাফা লাগিয়ে ক্রয়–বিক্রয় করে যেতে থাকে, এমনকি ব্যবহারকারীদের (Consumers) নিকট পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে তার দাম ভীষণভাবে বেড়ে যায়। এই পণ্য তৈরী, সংগ্রহ বা যোগান

দেবার ব্যাপারে অনেক বিক্রেতার সত্যিকার কোনো ভূমিকা না থাকা সত্ত্বেও তারা মাঝখান থেকে মুনাফা লুটেন এবং এর ফলে অযথা পণ্যের দাম বেড়ে যায়। [তরজমানুল কুরআন, জুলাই ১৯৫১]

ব্যবসায় ও সততা

প্রশ্নঃ নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর জবাব দেবেন।

১. আমার জেনারেল মার্চেন্টের দোকান আছে। জেনারেল মার্চেন্টের দোকানে সব রকমের জিনিস বিক্রি হয়। বিশেষ করে পাউডার, ক্রীম, লিপস্টিক, নেলপলিশ, সেন্ট, আতর, রেশমী গেঞ্জি, টুথ ব্রাস, টুথ পেস্ট, শেভিং সেট, সাজ-সরঞ্জামাদি, ছেলেদের খেলনা, অলংকারাদি প্রভৃতি বিক্রি হয়। উপরোল্লিখিত বস্তুগুলো কি নাজায়েয? অথবা শরীয়তের দৃষ্টিতে ঐ বস্তুগুলো বিক্রয় করা কি নিষিদ্ধ? অনেকে মনে করেন, ঐ বস্তুগুলো বিলাসিতাপূর্ণ জীবন যাপনের সহায়ক। কাজেই ওগুলোর ব্যবহার অমিতব্যয়িতার অন্তর্ভুক্ত, ওগুলোর বিক্রয় ও ব্যবহার থেকে বিরত থাকা উচিত। এ কথা কি সত্য?

২. শরীয়ত কি লাভের পরিমাণ নির্ধারিত করেছে? যদি নির্ধারিত করে থাকে, তাহলে তা কত? আর যদি নির্ধারিত না করে থাকে, তাহলে কি পরিমাণ লাভ করা যেতে পারে? (উল্লেখযোগ্য যে, এমন অনেক জিনিস আছে যাতে অতি সামান্য লাভ হয় বা সেগুলো ক্রয়মূল্যে বা তার চাইতে কিছু কম মূল্যে বিক্রি করতে হয়।)

৩. এযুগে নারীর বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রত্যেকটি ব্যবসায় শুরু করা হয়, আল্লাহর মেহেরবানীতে এ অভিশাপ থেকে আমি বেঁচে আছি। কিন্তু বিলাত থেকে যে জিনিসগুলো আসে বা এদেশের লোকেরা যে জিনিসগুলো তৈরি করে, সেগুলোর উপর বিভিন্ন ভংগীতে নারীচিত্র শোভিত থাকে। লেবেল ছিঁড়ে ফেললে জিনিসটি বিক্রি করা কঠিন বরং অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় কি করা যায়? অনেক বন্ধু অভিযোগ করেন, তুমি ছবি কেনাবেচা করো এবং এ কাজটি হারাম।

৪. শরীয়ত কি সওদা এক দামে বিক্রি করার শর্ত আরোপ করে? যদি এ শর্ত আরোপ না করে থাকে, তাহলে দর-দাম করা কি জায়েয?

৫. দোকানে বেপর্দা মেয়েরাও আসে এবং আধা নেকাবধারী মেয়েরাও। ইসলামের নির্দেশ হচ্ছে, পর নারীর উপর দ্বিতীয় বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করা গোনাহ। অথচ এখানে তাদের সাথে কথাবার্তাও বলতে হয়। মেয়েদেরকে যদি দোকানে আসতে না দিই, তাহলে তাও সংগত নয়, কারণ আধুনিক পরিবেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষদের পরিবর্তে মেয়েরা কেনাকাটা করতে আসে।

৬. সাধারণত দোকানদাররা দুই ধরনের খাতা রাখে। একটি হচ্ছে তার নিজের খাতা এবং অন্যটি হচ্ছে ইনকাম ট্যাক্স অফিসারকে দেখাবার খাতা। এ পদ্ধতি কি জায়েয? অন্যথায় ব্যবসায়ীরা কি করবে? আমাদের বাজারের নয় অন্য এক বাজারের জনৈক ব্যবসায়ীকে আমি জানি, তিনি এক বছরের পূর্ণাংগ হিসাব ইনকাম ট্যাক্স অফিসারের সম্মুখে পেশ করেন, তিনি একটি পয়সার হিসাবও হেরফের করেননি। কিন্তু অফিসার সাহেব ট্যাক্স ছাড়াও আরো বিপুল পরিমাণ অর্থ তাঁর উপর চাপিয়ে দেন এবং সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, তিনি যে হিসাব দেখিয়েছেন তা সত্য নয়। এ অবস্থায় কি করা উচিত?

জবাবঃ আপনার প্রশ্নগুলোর ক্রমিক জবাব নীচে প্রদত্ত হলোঃ

১. জেনারেল স্টোরে আপনি যে সমস্ত বস্তু বিক্রি করেন (যেগুলোর একটি ক্ষুদ্র তালিকাও আপনি দিয়েছেন) তন্মধ্যে কোনো একটিও প্রকৃতপক্ষে হারাম নয়। এগুলোর ব্যবহার জায়েযও হতে পারে, আবার নাজায়েযও হতে পারে। এ বস্তুগুলো কে কিভাবে ব্যবহার করবে, দোকানদার হিসাবে এ বিষয়টি দেখা আপনার কর্তব্য নয়। আপনার জন্যে কেবল এটা দেখাই যথেষ্ট যে, আপনি কোনো হারাম জিনিস বিক্রি করছেননা এবং বিকিকিনির ব্যাপারে কোনো হারাম পদ্ধতিরও আশ্রয় নিচ্ছেননা।

২. শরীয়ত লাভের জন্যে কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করেননি। কোনো ব্যবসায়ে কি পরিমাণ লাভ করা উচিত এবং কি পরিমাণ করা অনুচিত এটা প্রচলিত নিয়ম ও সুবিচারের পরিচিত ধারণার ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে হবে।

৩. দোকানদার হিসেবে আপনি বাইরে থেকে যে সমস্ত জিনিস আনান অথবা দেশের শিল্পপতিদের নিকট থেকে ক্রয় করেন, সেগুলোর উপর নারীচিত্র শোভিত থাকাই আপনার জন্যে সেগুলোর বিকিকিনি হারাম হয়ে যাবার পক্ষে যথেষ্ট কারণ বলে বিবেচিত হতে পারেনা। আপনি নিজে ইচ্ছাকৃতভাবে ঐ বস্তুগুলোর উপর ঐ ছবিগুলো লাগাননা এবং না আপনার ফরমায়েশ অনুযায়ী কারখানা মালিকরা ওগুলো লাগান। বরং এটি হচ্ছে একটি সাধারণ আপদ, আমরা সবাই বাধ্য হয়ে এর মধ্যে নিক্ষিপ্ত হচ্ছি। আপত্তিকারীদের একথা বলাও ঠিক নয় যে, এভাবে আপনি ছবির ব্যবসা করছেন। আসলে আপনি ছবি বিক্রি করেননা বরং সেই সমস্ত জিনিস কিনে বিক্রি করেন, যেগুলোর উপর কারখানা মালিকরা দুনিয়ার বিকৃত রুচি অনুযায়ী ছবি লাগিয়ে রেখেছে।

৪. এক দামে সওদা বিক্রি করতে হবে এমন কোনো হুকুম শরীয়ত দেয়নি। খদ্দেরের সাথে আলাপ-আলোচনা করে আপনি কম-বেশী দরেও বিক্রি করতে পারেন। কিন্তু এ জন্যে মিথ্যা বলা ও মিথ্যা কসম খাওয়া জায়েয নয়। খদ্দেরকে

একথা বিশ্বাস করাবার চেষ্টা করবেননা যে, এ জিনিসটি আপনি এত দামে কিনেছেন, অথচ জিনিসটি তার চাইতে কম দামে আপনি কিনেছেন। বা এ কথা বিশ্বাস করাবার চেষ্টা করবেননা যে, এতে আপনার কোনো লাভ থাকেনা, অথচ তাতে আপনার লাভ থাকে।

৫. মেয়েরা বেপর্দা হয়ে আপনার দোকানে আসলে তাদের আসা বন্ধ করা বা তাদের হাতে সওদা বিক্রি করতে অস্বীকার করা আপনার কর্তব্য নয়। তবে দৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত করা আপনার জন্যে ফরয। চোখে চোখ রেখে কথা বলবেননা। তাদের সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা বা কথাবার্তা উপভোগ করার চেষ্টা করবেননা। তাকওয়ার এই একটি অংশের উপরই যদি আপনি আমল করতে পারেন, তাহলে ইনশাআল্লাহ নিজের দোকানে বসে বসেই আপনি অলীর মরতবায় পৌঁছে যাবেন। এই একটি মাত্র মুজাহিদা খানকার বহুতর মুজাহিদার চাইতে শক্তিশালী।

৬. এই বিকৃত পরিবেশে যে ব্যক্তি চোর ও জালিয়াত নয় তাকেও চোর ও জালিয়াত মনে করা হয়। কারণ ব্যবসায়ে কোনো ব্যক্তি সত্যনিষ্ঠ ও ঈমানদারও হতে পারে, একথা দুনিয়া বর্তমানে বিশ্বাস করতে রাযী নয়, কাজেই এই বিকৃতির যুগে যারা সত্যনিষ্ঠ ও ঈমানদারীর পরিচয় দিতে চায়, তাদেরকে এর শাস্তি লাভের জন্যে প্রস্তুত থাকা উচিত। মিথ্যাচারী ও অসৎ লোকেরা উৎকোচ দিয়ে নিজেদের অপরাধের অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে কিন্তু সত্যনিষ্ঠ ও ঈমানদার লোকদের জন্যে এখানে দ্বিগুণ শাস্তির ব্যবস্থা আছে। একটি হচ্ছে ঈমানদারী ও সত্যনিষ্ঠার শাস্তি এবং অন্যটি উৎকোচ না দেবার। এ শাস্তি ভোগ করার হিম্মত না থাকলে সমগ্র দুনিয়া যে বিকৃতিতে নিপতিত হয়েছে আপনিও তার মধ্যে নিপতিত হবেন। দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্য থেকে একটির নির্বাচন ছাড়া গত্যন্তর নেই। [তরজমানুল কুরআন, জুলাই ১৯৫৭]

সাপ্লাই ব্যবসা সংক্রান্ত প্রশ্ন

প্রশ্নঃ *ব্যবসায় সম্পর্কিত ব্যাপারে আমাদের এমন কতিপয় অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় যে সম্পর্কে আমি পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারিনা। মেহেরবানী করে কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে এ বিষয়গুলোর উপর আলোকপাত করুন।*

১. জমিদার ও গ্রাম্য ব্যবসায়ীরা কার্পাসের ওজন, শ্রেণী (QUALITY), দর ও যে সময়ের মধ্যে তা পৌঁছে দেয়া হবে তা স্থির করে সওদা করে যায়। কিছু অগ্রিমও দেয়া হয়। মৌখিক বা লিখিত আকারে এ সবকিছু স্থিরীকৃত হয়। পণ্য দেখা হয়না এবং দেখা সম্ভবও হয়না। ঐ সব শর্তানুযায়ী আমরা যে পরিমাণ কার্পাস ক্রয় করি তা কারখানা মালিকের নিকট নির্ধারিত সময়ের মধ্যে

পৌছে দিতে স্বীকৃত হই। কিন্তু সাধারণত কারখানা মালিক কোনো অগ্রিম মূল্য দেয়না।

২. অনেক সময় যখন আমাদের কোনো পণ্য কেনা থাকেনা (অর্থাৎ কোনো পণ্যের সওদা তখনো পর্যন্ত করা হয়না) তখন পূর্বাহ্নেই পণ্যের কোয়ালিটি, ওজন, দর প্রভৃতি লিখে এবং সময় নির্ধারিত করে কারখানা মালিকের সাথে সওদা করে নিই। পরে পণ্য ক্রয় করে চুক্তি মাফিক সরবরাহ করি। এই উভয় অবস্থায়ই দর পূর্বাহ্নেই নির্ধারিত হয়।

৩. দর নির্ধারিত না করেই কারখানা–মালিককে আমরা পণ্য সরবরাহ করতে থাকি। তার সাথে চুক্তি হয়, আমরা দুশো বা হাজার মণ পণ্য সরবরাহ করবো এবং একটি সময় নির্দিষ্ট করে নিই, তার মধ্যে দরও নির্ধারণ করার জন্যে চুক্তিবদ্ধ হই। যেদিন দরের বাজারে তেজীভাব দেখি সেদিন আমরা দর নির্ধারণ করি। অনেক সময় পণ্য পৌছে দেবার পর দর নির্ধারণ করার জন্য আমরা দু'মাসও সময় নিয়ে থাকি। পণ্য পৌছে দেবার পর কারখানা মালিকরা আমাদেরকে কিছু অগ্রিম অর্থাৎ উপস্থিত বাজার দর হিসেবে ৬০ বা ৬৫ ভাগ দাম প্রদান করে। দর নির্ধারিত হবার পর সমুদয় অর্থ প্রদান করে।

৪. কার্পাস উঠার পর থেকেই এ ধরনের সওদা শুরু হয়। অনেকে কার্পাস উঠার দু–চার মাস আগে থেকেই এ ধরনের সওদা করে থাকে।

জবাবঃ আপনি সাপ্লাই ব্যবসা সম্পর্কে যে সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করেছেন নিচে সংখ্যার ক্রমানুসারে সেগুলো সম্পর্কিত বিধান বর্ণনা করলাম।

প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায় (বাইয়ে সালাম) অগ্রীম ব্যবসায়ের একটি শর্ত অনুপস্থিত। অর্থাৎ সওদা ঠিক হবার সাথে সাথেই সম্পূর্ণ দাম অগ্রিম আদায় করা। 'সালাম' ব্যবসাকে ক্রটিহীন করার জন্যে এটি অপরিহার্য। যেহেতু এ দুটি অবস্থায় এ শর্তটি অনুপস্থিত, তাই এ বিষয়গুলো 'সালাম' ব্যবসায়ের সীমা বহির্ভুত।

তবে আমার মতে এ ব্যাপারটি জায়েয। কারণ এটি আসলে 'ব্যবসায়' সংক্রান্ত বিষয় নয় বরং 'চুক্তি' সংক্রান্ত বিষয়। অর্থাৎ উভয় পক্ষ পরস্পরের মধ্যে এই চুক্তি করে যে, এক পক্ষ একটি নির্ধারিত সময়ে বা একটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে একটি বিশেষ শ্রেণীর, বিশেষ পরিমাণ পণ্য একটি বিশেষ মূল্যে অন্য পক্ষকে সরবরাহ করবে। অন্য পক্ষ অংগীকার করে যে, সে ঐ সব শর্তে ঐ পণ্য ক্রয় করবে। এই ধরনের চুক্তি করা জায়েয এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে এতে কোনো দোষ নেই। তবে এখানে শর্ত হলো, চুক্তিকারীদেরকে চুক্তির নিয়তেই এ কার্য করতে হবে। তাঁরা এ কথা মনে করতে পারবেনা যে, এক পক্ষ পণ্য বিক্রয় করছে এবং অন্য পক্ষ তা ক্রয় করছে।

তৃতীয় অবস্থাটি আমার মতে ঠিক নয়। কারণ সেখানে মূল্য সংক্রান্ত বিষয়টিকে লটকিয়ে রাখা হয়। এ বস্তুটি কেবল চুক্তির ক্রটিহীনতার পরিপন্থীই নয় বরং এর মধ্যে বিবাদের সূত্রও নিহিত। এর মধ্যে এ আশংকা নিহিত যে, উভয় পক্ষই মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারটিকে এমন সময় পর্যন্ত পিছিয়ে দেবার চেষ্টা করবে, যখন বাজার দর তার নিজের স্বার্থের সর্বাধিক অনুকূল হবে। এভাবে তাদের রেষারেষি অতি সহজে বিবাদের রূপ পরিগ্রহ করতে পারে।

কার্পাস উঠবার পর যে সওদা করা হয় সে ব্যাপারে যথার্থ পদ্ধতি হচ্ছে সোজাসুজি ব্যবসায়িক লেনদেন করা। অর্থাৎ বিক্রেতার নিকট যে পরিমাণ পণ্যদ্রব্য থাকবে তা দেখিয়ে দিয়ে তিনি নির্ধারিত মূল্যে তা বিক্রয় করে দেবেন এবং ক্রেতা পণ্যদ্রব্য দেখার পর স্থিরীকৃত মূল্যে তা ক্রয় করে নিজের হস্তগত করবেন। [তরজমানুল কুরআন, সেপ্টেম্বর ১৯৫১]

কর্মচারীদের অধিকার

প্রশ্নঃ এখানকার একটি প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন ও চাকরি সম্পর্কিত অন্যান্য নিয়মাবলী সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভংগির ব্যাপারে আমাকে প্রশ্ন করেছিল। কুরআন, হাদীস ও ফিকাহ্র কিতাবসমূহ সম্পর্কে আমার যতদূর পড়াশুনা আছে তা থেকে এ ব্যাপারে কোনো সমাধান বের করতে পারলামনা। তাই আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি, আপনি এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ এবং খিলাফতে রাশিদার জামানা ও পরবর্তীকালের সৎ সুলতানগণের কার্যাবলী সুস্পষ্টভাবে পেশ করবেন। নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোর জবাব চাচ্ছিঃ

১. প্রত্যেক কর্মচারীর বছরে কতদিন সবেতন ছুটি নেয়ার অধিকার আছে?

২. বছরে কতদিন আকস্মিক (Casual) ছুটি নেয়ার অধিকার আছে?

৩. অসুস্থকালের বেতন পাবে কিনা?

৪. কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণের ব্যাপারে কোন্ নীতি অবলম্বিত হবে?

৫. কর্মচারীদের পরিবারে লোক সংখ্যা বাড়লে বেতন বেড়ে যাবে কিনা?

৬. ছুটি লাভের জন্যে লিখিত অনুমতির প্রয়োজন আছে কিনা?

৭. উচ্চপদস্থ ও নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের অধিকার সমান হবে, নাকি তাদের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য থাকবে?

জবাবঃ আপনার প্রশ্নগুলো সম্পর্কে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করা ও বিস্তারিত জবাব দেয়ার প্রয়োজন। কিন্তু আমি বাধ্য হয়ে সংক্ষিপ্ত জবাবের উপরই নির্ভর করছি। শরীয়তে শ্রমিক ও কর্মচারীদের অধিকার সম্পর্কে লিখিত বিস্তারিত বিধান আকারে কিছু না থাকলেও আমাদেরকে এমন সব নীতি দান করা হয়েছে যার আলোকে আমরা বিস্তারিত বিধান রচনা করতে পারি। খিলাফতে রাশিদার

আমলে এই নীতিগুলোর ভিত্তিতে সরকারী ও বেসরকারী কর্মচারীদের সাথে যে ব্যবহার করা হতো হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থসমূহে তার বিস্তারিত বিবরণ কোথাও একত্রিত নাই বরং বিভিন্ন অধ্যায়ে ও খন্ডে তা ছড়িয়ে আছে। এই বিস্তারিত অধ্যায়সমূহেও সম্ভবত খুব কমই আপনার প্রশ্নাবলীর জবাব পাওয়া যাবে। আমি বর্তমানে প্রচলিত রীতি ও ইসলামের সর্বজনবিদিত ন্যায়-নীতির উপর নির্ভর করে আপনার প্রশ্নাবলীর সংক্ষিপ্ত জবাব দিচ্ছি।

ছুটির ব্যাপারে এই পরিচিত পদ্ধতিটিই সংগত মনে হচ্ছে যে, সারা বছরে নিয়মিত এক মাসের ছুটি পাওয়া উচিত এবং বছরে সবেতন ১৫ দিন আকস্মিক ছুটি পাওয়া উচিত। এর বেশী ছুটি নিতে হলে একটি বিশেষ সীমার মধ্যে বিনা বেতনে তা দেয়া যেতে পারে।

যত দীর্ঘদিনের অসুস্থতা হোকনা কেন অসুস্থকালে প্রত্যেক কর্মচারীর পূর্ণ বেতন পাওয়া উচিত। কোনো নিয়োগকর্তা (Employer) যদি এটা মঞ্জুর না করে, তাহলে তাকে অসুস্থ কর্মচারীদের চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করা উচিত অথবা তাদের বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত এবং অসুস্থ কর্মচারী ও তার পরিবারের ভরণ পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত। কর্মচারীর বেতন নির্ধারণের ব্যাপারে কতিপয় বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। যেমন, তার কাজের ধরন, তার নিজের যোগ্যতা, যে ধরনের কাজে নিযুক্ত সে ধরনের যোগ্যতা-সম্পন্ন লোকের জীবন যাপনের জন্যে অপরিহার্য প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ ও তার পারিবারিক দায়িত্বসমূহ।

সাধারণ নিয়োগকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কর্মচারীর পরিবারের লোকদের সংখ্যা বৃদ্ধির আনুপাতিক হারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বেতন বৃদ্ধি করা সহজসাধ্য নয়। তবে সরকারকে এ দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত অথবা বড় বড় ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকেও এজন্যে বাধ্য করা যেতে পারে।

ছুটির জন্যে অনুমতির ব্যাপারটিও একদিক দিয়ে লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়াবলীর সাথে সামঞ্জস্যশীল। তাই নীতিগতভাবে লিখিত আবেদন ও লিখিত অনুমতির বাধ্যবাধকতা থাকাই বাঞ্ছনীয়। তবে প্রাইভেট চাকরির ক্ষেত্রে একজন কর্মচারীর সম্পর্ক ব্যক্তিগতভাবে একজন মালিকের সাথে স্থাপিত হয়। তাই সেখানে মৌখিক অনুমতির অবকাশ থাকতে পারে।

বেতনের পার্থক্য ছাড়া অন্যান্য অধিকারের ক্ষেত্রে নীতিগতভাবে উচ্চপদস্থ ও নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠিত থাকা উচিত। [তরজমানুল কুরআন, জানুয়ারী ১৯৫৩]

কমিশন ও নীলাম

প্রশ্নঃ নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর জবাব প্রয়োজনঃ

১. অনেক এজেন্ট পণ্য সাপ্লাই করার সময় দোকানদারকে বলেন, যদি পণ্য বিক্রি করে আমাকে টাকা দেন, তাহ্লে শতকরা ২০ ভাগ কমিশন দেবো আর যদি নগদ মূল্য দেন, তাহ্লে শতকরা ২৫ ভাগ কমিশন দেবো। এই ধরনের কমিশন দান ও গ্রহণ কি জায়েয?

২. মুসলমান নীলামকারী যখন দেখে, অন্য কেউ দর হাঁকছেনা এবং এর ফলে তার সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা আছে, তখন কি দর হেঁকে পণ্যদ্রব্যকে এই বলে নিজের আয়ত্তাধীন রাখা জায়েয যে, অন্য সময়ে আবার একে নীলাম করা হবে? উপরন্তু সে কি নিজের লোক লাগিয়ে দিতে পারে? তারা মূল্য বাড়াবার জন্য দর হাঁকতে থাকবে এবং নিজের মনমাফিক দর পাওয়ার পর বিক্রি করে দেবে।

জবাবঃ আমার জানা মতে নগদ ক্রয় করলে বেশী কমিশন এবং বাকি ক্রয় করলে কম কমিশন দেয়া নাজায়েয নয়। এজেন্ট (বা মালিক) দোকানদারকে পণ্য সরবরাহ করার সময় যে কমিশন দেয় তা আসলে তার মুনাফার একটি অংশ হয়, তা থেকেই সে দোকানদারকে কমিশন দেয়। সওদার পর্যায়ভেদের পরিপ্রেক্ষিতে এই অংশকে কমবেশী করার অধিকার তার আছে। এর মধ্যে সূদের সাথে সামঞ্জস্যশীল কোনো বস্তু আছে বলে আমি মনে করিনা। তবে বাকির মেয়াদের পরিপ্রেক্ষিতে যদি কমিশন কম-বেশী করা হয় তাহ্লে তাতে সূদের সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি হয়।

নীলামকারী যদি দেখে যে, কোনো পণ্যের উপর ডাক এমন পর্যায়ে উঠছেনা পণ্যের মালিক যে ডাকে বিক্রয় করতে রাযী হতে পারে, তাহ্লে নিজের পণ্য বিক্র না করা তার জন্যে জায়েয। কিন্তু এজন্যে ধোকা ও প্রতারণার পথ অবলম্বন করা সংগত নয়। তাকে একথা প্রকাশ করে দেয়া উচিত যে, অন্য লোকের যে দ্রব্য সে নীলাম ডেকে বিক্রি করছে বা নিজের যে ক্রীত দ্রব্য এভাবে সে বিক্রি করছে, তার উপর তার আকাংখিত সর্বনিম্ন পর্যায়ে দর না উঠলে সে তা বিক্রি করবেনা। খদ্দেরদের মধ্যে নিজের লোক বসিয়ে রেখে দর হাঁকা বা নিজে খদ্দের সেজে দর হাঁকা প্রতারণারই নামান্তর। [তরজমানুল কুরআন]

৪

মতবিরোধ

মুহাম্মদ (স)—এর পরে নবুয়্যত দাবী

প্রশ্নঃ তরজমানুল কুরআন (জানুয়ারী–ফেব্রুয়ারী)এর ২৩৬ পৃষ্ঠায় আপনি লিখেছেনঃ "আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে, আল্লাহ্ তাআলা কখনো মিথ্যাকে সমৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠা দান করেননা। আমি সব সময় এ নীতি অনুসরণ করে এসেছি... যাদেরকে আমি সততা ও বিশ্বস্ততা থেকে বেপরোয়া এবং আল্লাহর ভীতিশূন্য পাই, তাদের কথার কখনো জবাব দিইনা... আল্লাহ্ তাদের থেকে বদলা নিতে পারেন... এবং দুনিয়াতেই ইনশাআল্লাহ্ তাদের "হাটে হাঁড়ি ভেঙে যাবে।"

আমি নিবেদন করছি, আমি আহমদী জামায়াতের বইপত্র পড়েছি এবং তাদের কাজের সাথেও জড়িত থেকেছি। সে প্রসংগেই আমি নিম্নলিখিত প্রশ্ন ক'টি রাখছি।

এক. এটা কেবল আপনারই অভিজ্ঞতা নয় বরং কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেনঃ 'আল্লাহ্ মিথ্যাবাদীকে ভালোবাসেননা।' আর 'মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।' আবার এমন ধরনের মিথ্যাবাদীদের উপর যারা আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ-(الحاقه : ٤٤)

"এ নবী যদি নিজে কোনো কথা বানিয়ে আমার কথা বলে চালিয়ে দিতো।"

তাদের শাস্তি হচ্ছে তাৎক্ষণিক পাকড়াও এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ।

لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ.

"তাহলে আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং ঘাড়ের রগ কেটে দিতাম।" (আল হাক্কাহঃ ৪৫–৪৬)

এ অবস্থায় যদি মীর্যা গোলাম আহমদ মিথ্যুক হয়ে থাকেন, তাহলে কি কারণে (ক) এখনো আল্লাহ্ তাআলা তাকে পাকড়াও করেননি? তার দলের সদস্য সংখ্যা তো বেড়ে চলেছে এবং মীর্যা সাহেবের মিশনের যা মুসলমানদের কাছে গোমরাহ্ বলে পরিচিত– শক্তি বৃদ্ধি হচ্ছে কেন? আবার বর্তমানে এ দলটির শিকড় দেশের বাইরেও মজবুত হয়ে গেছে। মীর্যা সাহেব যে বাণী এনেছিলেন তারপর আজ ষাট বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে, আমরা আর কতদিন আল্লাহর ফয়সালার অপেক্ষা করবো? বর্তমানে তারা উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করে চলেছে। যেসব দল ও ব্যক্তি দলটির বিরোধিতা করছে তারা কেন তাদের বিরোধিতা পরিহার করছেনা এবং বিষয়টি আল্লাহর হাতে সোপর্দ করছেনা?

দুই. তরজমানুল কুরআনের ২৪২ পৃষ্ঠায় আপনার দলের একজন জার্মান সমর্থক বার্লিনে আহমদী জামায়াতের সাথে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে সহযোগিতার প্রসংগ উত্থাপন করেছেন। যদি আপনিও তাদের ইসলাম প্রচারের

কাজকে সঠিক মনে করে থাকেন, তাহলে পাকিস্তানে তাদের সাথে সহযোগিতা করছেননা কেন?

জবাবঃ *আপনি একজন নবুয়্যতের দাবীদারের ব্যাপারটিকে এত হালকাভাবে দেখছেন। এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি মোটেই উপযোগী নয়। আমি যা কিছু লিখেছিলাম তা ছিল আমার বিরুদ্ধে কতিপয় স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির আরোপিত একটি সুস্পষ্ট মিথ্যা অভিযোগ সম্পর্কিত। এ কথাকে আপনি প্রয়োগ করছেন এমন একজন লোকের ব্যাপারে যিনি নবুয়্যতের দাবী করেছেন। আপনার জানা উচিত একজন নবুয়্যতের দাবীদারের ক্ষেত্রে দুটি অবস্থার যে কোনোটি অবশ্যি সত্য। যদি তার দাবী সত্য হয়ে থাকে, তাহলে তাকে যে মানেনা সে কাফির। আর যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তাহলে তাকে যে মানে সে কাফির। এত বড় একটা নাযুক ব্যাপারে সিদ্ধান্ত কি আপনি কেবল এতটুকু কথার উপর করতে চান যে, "আল্লাহ্ তাআলা এখনো তাকে পাকড়াও করেননি, তার দলের শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে আর "আমরা আর কতদিন আল্লাহর ফয়সালার অপেক্ষা করবো?" এর অর্থ কি তাহলে এটাই ধরে নিতে হবে যে, কোনো ব্যক্তি নবুয়্যতের দাবী করার পর তার দল যদি উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করতে থাকে এবং আপনার প্রস্তাবিত প্রতীক্ষার মেয়াদের মধ্যে আল্লাহ্ তাকে পাকড়াও না করেন, তাহলে কেবল এতটুকু কথাই তাকে নবী হিসেবে মেনে নেবার পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হবে? আপনার মতে নবুয়্যত যাচাই করার মানদন্ড কি এটাই?*

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ-(الحاقه: ٤٤)

থেকে আপনি যা প্রমাণ করতে চেয়েছেন তা আসলে মূলগতভাবেই ভ্রান্ত। এ আয়াতে যে কথা বলা হয়েছে তাহলো, মুহাম্মদ (স), যিনি আসলে আল্লাহর নবী, যদি আল্লাহর অহী ছাড়া কোনো কথা নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে আল্লাহর নামে পেশ করতে থাকেন, তাহলে তাঁর শ্বাসনালী কেটে দেয়া হবে। এ থেকে যে ব্যক্তি আসলে নবী নয় এবং মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নিজেকে নবী বলে পেশ করছে তার শ্বাসনালীও কেটে দেয়া হবে এ অর্থ গ্রহণ করা ঠিক নয়। এছাড়াও এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা যে নবুয়্যতের দাবীদারের শ্বাসনালী কেটে দেয়া হবেনা সে সত্য নবী আর যার শ্বাসনালী কেটে দেয়া হবে সে ভন্ড নবী– এ কথাকে মিথ্যা ও সত্য নবী বেছে নেয়ার মানদন্ড হিসেবে পেশ করেননি। কুরআনের আয়াতকে এভাবে টেনে–হিঁচড়ে বিকৃত অর্থ করার পদ্ধতি নিশ্চয় আপনার নিজস্ব কায়দা নয়, বরং মীর্যা সাহেবের দলের কাছ থেকেই এটা আপনি রপ্ত করেছেন। এ দলটির দিলে যে আল্লাহর ভয় নেই এ থেকেই তা প্রমাণ হয়।

নবী মুহাম্মদ (স)–এর পর যে ব্যক্তি নবুয়্যতের দাবী করবে তার কথাকে আপনার পেশকৃত মানদন্ডে যাচাই করা হবেনা। বরং তার কথাকে পরম নিশ্চিন্তে প্রত্যাখ্যান করা হবে। কারণ কুরআন ও হাদীস এ ব্যাপারে দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য রেখেছে। সেখানে বলা হয়েছে, রসূলে করীম (স)–এর পর আর কোনো নবী আসবেননা। মীর্যা সাহেব ও তার অনুসারীরা নবুয়্যতের দরজা উন্মুক্ত থাকার সপক্ষে যেসব যুক্তি পেশ করে থাকেন, সেগুলো সম্পর্কেও আমি অবহিত। কিন্তু আপনাকে আমি জানিয়ে দিতে চাই ঐ যুক্তিগুলো কেবলমাত্র একজন অজ্ঞ বা স্বল্প জ্ঞানসম্পন্ন লোককেই প্রভাবিত করতে পারে। একজন তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি তাদের যুক্তিগুলো দেখার পর কেবলমাত্র তাদের মূর্খতা সম্পর্কেই নিঃসন্দেহ হতে পারে।

তরজমানুল কুরআনে জার্মানীর যে চিঠি ছাপা হয়েছে তার অর্থ এ নয় যে, ঐ চিঠির সব কথাকে আমরা হুবহু সত্য বলে মনে করি। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ঐ চিঠির মাধ্যমে আমাদের দেশের মুসলমানদের সামনে জার্মানীর নওমুসলিম ভাইদের অবস্থা তুলে ধরা এবং তাদেরকে সাহায্য করার জন্যে মুসলমানদের মনে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করা। তারা সদ্য ইসলাম গ্রহণ করেছে। ইসলামী দুনিয়ায় কত রকমের ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে তা তারা কেমন করে জানবে? তারা তো এখন ইসলামের নামে যেখান থেকে যা কিছু পাবে তা থেকে নিজেদের তৃষ্ণা মিটাবার চেষ্টা করবে। ইসলাম সম্পর্কে নির্ভুল তত্ত্বজ্ঞান সমৃদ্ধ বইপত্র তাদের হাতে তুলে দেয়ার দায়িত্ব তো এখন আমাদের। অন্যথায় অজ্ঞতার কারণে তারা যে কোনো ফিতনার শিকার হয়ে যেতে পারে।

প্রশ্নঃ *আপনার জবাব পেয়েছি। দুঃখের বিষয়, তা আমার সংশয় নিরসন করতে পারেনি। আমি তো আপনারই কথা "আল্লাহ নিজেই মিথ্যাবাদীকে শাস্তি দেবেন" –তুলে ধরে এর আলোকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, মীর্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, যাকে সব মুসলমানই মিথ্যাবাদী মনে করে, তার উপর আল্লাহর শাস্তি আসছেনা কেনো এবং আল্লাহ কিভাবে এতদিন ধরে নিজের বান্দাদের গোমরাহ হওয়া প্রত্যক্ষ করে যাচ্ছেন?*

আমি মীর্যা সাহেবের লেখা প্রায় পঁচিশখানা বই অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করেছি। এরপর এর বিরুদ্ধে লেখা মুসলিম আলেমগণের কয়েকখানা বইও পড়েছি। অবশ্য আমি স্বীকার করছি, এ প্রসংগে আপনার কোনো বই আমি পড়তে পারিনি। তবে আলেমগণের বইগুলো সম্পর্কে আমার সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া নিম্নরূপঃ

তারা মীর্যা সাহেবের লেখা বিকৃত করে তার ভুল অর্থ গ্রহণ করেছেন এবং তা মীর্যা সাহেবের উপর আরোপ করেছেন।

যে বিষয়ে তারা লেখনী চালিয়েছেন, সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান তারা রাখেননা। পরে আমি তাদের সাথে পত্র যোগাযোগ করি। কিন্তু তাদের অধিকাংশই নীরবতা অবলম্বন করেন। মীর্যা সাহেবের বইপত্র থেকে আমি সাধারণত যা কিছু বুঝেছি তা হচ্ছেঃ মীর্যা সাহেব নিজে এবং তার বাণীসমূহ নবী করীম (স)-এর প্রেমে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। এরই ভিত্তিতে আমি মীর্যা সাহেবের দাবীর দিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম। আর এখন আমার কাছে এ কথা প্রমাণিত সত্য যে,

এক. মীর্যা সাহেবের দাবীসমূহ কুরআন ও হাদীসের বিরোধী নয়।

দুই. মীর্যা সাহেবের নবুয়্যত রসূলে করীম (স)-এর মর্যাদা লাঘব করছেনা বরং যদি মূসা (আ)-এর বদৌলতে নগরে নগরে নবী হতে পারে, তাহলে মুহাম্মদ (স)-এর মর্যাদার বদৌলতে গ্রামে গ্রামে এমন লোক হতে হবে যারা বলবে 'আমরা শরীয়তে মুহাম্মদীর উপর আমল করে আল্লাহর সাথে কথা বলার সৌভাগ্য লাভ করেছি।' মীর্যা সাহেব নিজেই বলেছেনঃ

"আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি উৎসারিত ও ঝর্ণাধারাটি
মুহাম্মদী কামালিয়াতের সমুদ্রের একটি বারিকণা মাত্র।"

এখন আপনি আবার আমাকে মীর্যা সাহেবের দাবী যাচাই করার অনুমতি দিয়েছেন। মেহেরবানী করে আপনি কি মীর্যা সাহেবের কোনো একটি দাবীকে কুরআন করীমের আলোকে মিথ্যা প্রমাণ করে আমাকে সঠিক পথ গ্রহণে সাহায্য করবেন?

জবাবঃ আগের চিঠিটাই আপনার সংশয় নিরসন করতে পারতো যদি আপনি যথার্থই সংশয় নিরসন করতে চাইতেন। আমি তরজমানুল কুরআনে যা কিছু লিখেছিলাম তা ছিল সেই সব লোকদের সম্পর্কে যারা আমার প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করছে। আর এ ব্যাপারে আল্লাহর উপর আস্থা প্রকাশ করা হয়েছিল যে, তিনি নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদীদেরকে শাস্তি দেবেন। কিন্তু আপনি একে একজন নবুয়্যতের দাবীদারের দাবী যাচাই করার মানদন্ড হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আবার মানদন্ডও এমনভাবে গ্রহণ করেছেন যে, যদি দেখা যায় নবুয়্যতের দাবীদার শাস্তি পাচ্ছেনা, তাহলে তাকে অবশ্যি সত্য নবী বলতে হবে। দুনিয়ায় যে শাস্তি পেয়ে যাবে সে মিথ্যাবাদী ও গোমরাহ আর যে শাস্তি পাবেনা সে সত্যবাদী ও সৎ পথপ্রাপ্ত- সত্যিই কি লোকদের সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী এবং সৎ পথপ্রাপ্ত বা গোমরাহ হবার জন্য এটা কোনো সঠিক মানদন্ড?

আপনি অদ্ভুত কথা বলেছেন যে, মীর্যা সাহেবের নবুয়্যতের দাবী করার পর ষাট বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, আর কতদিন অপেক্ষা করা যায়। নবুয়্যতের দাবীর সত্যতা যাচাই করার জন্যে আপনি একটি অদ্ভুত মানদন্ড পেশ করেছেন।

আপনার মতে একজন মিথ্যা দাবীদারের কোন্ ধরনের শাস্তি পাওয়া উচিত– কথাটা একটু বিস্তারিতভাবে বলুন। যদি আপনি মনে করে থাকেন, গায়েব থেকে হাত এসে তার কণ্ঠনালী কেটে দিয়ে যাবে, তাহলে আমি বলবো, এ শাস্তি তো রসূলুল্লাহ (স)–এর জীবদ্দশায় মিথ্যা নবুয়্যতের দাবীদার মুসায়লামা কাযযাবকেও দেয়া হয়নি। যদি আপনি মনে করে থাকেন, যে নবুয়্যতের দাবীদার মানুষের হাতে নিহিত হবে সেই মিথ্যাবাদী বলে প্রমাণিত হবে, তাহলে সেসব নবীদের সম্পর্কে আপনি কি বলেন, যাদের নবুয়্যতের সত্যতা আল্লাহ্ তাআলা নিজেই ঘোষণা করেছেন সেই সঙ্গে এ কথাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাদের নিজেদের জাতিরাই তাদেরকে হত্যা করেছে? আপনি নিশ্চয়ই কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত দু'টি পড়েছেনঃ

١. قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ - (ال عمران : ١٨٣)

٢. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ - (النساء : ١٥٥)

এ আয়াতগুলোর আলোকে আপনার নিজের চিন্তাধারার নতুন করে পর্যালোচনা করা উচিত বলে আমি মনে করি। নবুয়্যতের দাবীকে এ ধরনের মানদন্ডে যাচাই করা যায়না। নবুয়্যতের ব্যাপারে যে বিষয়টির পর্যালোচনা করতে হবে তা হচ্ছে এই যে, তাঁর পূর্বেকার আল্লাহর বাণীর আলোকে তাঁর স্থান কোথায়? তিনি কি এনেছেন? তাঁর জীবনধারা কেমন? এ মানদন্ডে যে ব্যক্তি পুরোপুরি উতরোবে না, তাকে কেবলমাত্র আপনি চর্মচক্ষে এ দুনিয়ায় শাস্তি পেতে দেখছেননা বলেই সত্য নবী বলে মেনে নেবেন, এটা একটা মারাত্মক ভ্রান্তি।

উপরে আমি যে তিনটি মানদন্ডের কথা বলেছি তার মধ্যে থেকে প্রথমটির কষ্টিপাথরে নবুয়্যতের দাবীদারের দাবী যাচাই হয়ে পুরোপুরি নির্ভেজাল প্রমাণিত হয়ে না এলে শেষোক্ত মানদন্ড দুটোতে যাচাই হবার প্রশ্নই উঠেনা। কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকেই যখন একথা প্রমাণ হয়ে যায় যে, নবী মুহাম্মদ (স)–এর পর আর কোনো নতুন নবী আসবেনা, তখন রসূলে করীম (স)–এর পর আগমনকারী নবী কি এনেছেন এবং তিনি কেমন লোক তা দেখার কোনো প্রয়োজনই থাকেনা। যদিও আমার দৃষ্টিতে মীর্যা সাহেব দ্বিতীয় ও তৃতীয় মানদন্ডের প্রেক্ষিতেও নবুয়্যতের মর্যাদা থেকে এত দূরে অবস্থান করছেন যে, নবুয়্যতের দরজা যদি খোলা থাকতো তাহলেও অন্ততপক্ষে কোনো সুবিবেচক

ব্যক্তি তাঁকে নবী বলে ধারণা করতে পারতোনা। কিন্তু কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন সিদ্ধান্তের পর এ আলোচনাকে আমি অপ্রয়োজনীয় বরং আল্লাহ্ ও রসূলের মোকাবিলায় চরম ধৃষ্টতা মনে করি।

যদি জিজ্ঞেস করেন, নবুয়্যতের দরজা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে কুরআন ও হাদীসে এর সপক্ষে কি যুক্তি আছে, তাহলে একটি পত্রে এ জবাব দেয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তাআলা যদি আমাকে সময়–সুযোগ দেন, তাহলে ইনশাআল্লাহ্ এ বিষয়বস্তুর উপর আমি একটি বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখবো। অন্যথায় সূরা আহ্যাবের তাফসীরে তো এ প্রসংগ আসবেই তখন আলোচনা করা যাবে।[১]

খতমে নবুয়্যতের বিরুদ্ধে কাদিয়ানীদের আর একটি যুক্তি

প্রশ্নঃ তাফহীমুল কুরআনে সূরা আলে ইমরানের

وَاَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ ......

আয়াতের ব্যাখ্যায় ৬৯ নম্বর টীকায় আপনি লিখেছেনঃ "এখানে এতটুকু কথা আরো বুঝে নিতে হবে যে, হযরত মুহাম্মদ (স)–এর পূর্বে প্রত্যেক নবীর কাছ থেকেই এ অংগীকার নেয়া হয়েছে আর এরই ভিত্তিতে প্রত্যেক নবীই তাঁর পরবর্তী নবী সম্পর্কে তাঁর উম্মতকে অবহিত করেছেন এবং তাঁকে সমর্থন করার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু নবী মুহাম্মদ (স)–এর কাছ থেকে এ ধরনের কোনো অংগীকার নেয়া হয়েছিলো অথবা তিনি নিজের উম্মতকে পরবর্তীকালে আগমনকারী কোনো নবীর খবর দিয়ে তার উপর ঈমান আনার নির্দেশ দিয়েছিলেন, কুরআন ও হাদীসের কোথাও এর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায়না।"

এ বাক্যগুলো পড়ার পর মনের মধ্যে এ কথায় উদয় হলো যে, নবী মুহাম্মদ (স) এ কথা বলেননি ঠিক কিন্তু কুরআন মজীদের সূরা আহ্যাবে একটি অংগীকারের উল্লেখ এভাবে করা হয়েছে–

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ .... (الاحزاب : ٧)

এখানে মিনকা (তোমার নিকট থেকে) শব্দটির মাধ্যমে নবী করীম (স)–কে সম্বোধন করা হয়েছে। আর এখানে যে অংগীকারের কথা বলা হয়েছে তা সূরা আলে ইমরানে উল্লিখিত হয়েছে। সূরা আলে ইমরান ও সূরা আহ্যাব এ উভয় সূরায় উল্লিখিত আয়াতগুলোয় অংগীকারের উল্লেখ থেকে বুঝা যায় অন্য

১ কয়েক পৃষ্ঠা পরেই 'খতমে নবুয়্যতের আকীদা সম্পর্কে গবেষণামূলক আলোচনা' শীর্ষক নিবন্ধে এ আলোচনা আসছে। –(সংকলক)

নবীদের কাছ থেকে যে অংগীকার নেয়া হয়েছিল নবী মুহাম্মদ (স)-এর থেকেও সেই একই অংগীকার নেয়া হয়েছে।

আসলে আহমদীয়াদের একটি বই পড়ার পর আমার মনে এ প্রশ্ন জেগেছে। সেখানে ঐ সূরা দুটোর উল্লিখিত আয়াতগুলোকে একটির সাহায্যে অপরটির ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ সঙ্গে "মিনকা" শব্দটির উপর বিরাট আলোচনা করা হয়েছে।

জবাবঃ

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّيْنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ... (الاحزاب : ٧)

সূরা আহযাবের এ আয়াতটি (৭ নং আয়াত) থেকে কাদিয়ানীরা যে যুক্তি পেশ করেন, তা যদি তারা আন্তরিকতার সাথে পেশ করে থাকেন, তাহলে তা তাদের মূর্খতা ও অজ্ঞতার পরিচায়ক। আর যদি ইচ্ছা করে লোকদের ধোঁকা দেবার উদ্দেশ্য করে থাকেন তাহলে তাদের গোমরাহী সুস্পষ্ট হয়ে যায়। তারা সূরা আলে ইমরানের وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّيْنَ এই একাশি নম্বর আয়াতটি থেকে একটি বক্তব্য গ্রহণ করেছেন। তাতে নবীগণ ও তাদের উম্মতদের কাছ থেকে আগামীতে আগমনকারী কোনো নবীর আনুগত্য করার অংগীকার নেয়া হয়েছে। আবার দ্বিতীয় একটি বক্তব্য নিয়েছেন সূরা আহযাবের উপরোল্লিখিত আয়াত থেকে। এখানে অন্যান্য নবীগণের সাথে সাথে রসূলে করীম (স)-এর থেকেও অংগীকার নেয়ার কথাও বলা হয়েছে। অতপর দুটোকে জুড়ে তারা নিজেরাই তৃতীয় বক্তব্যটি বানিয়ে ফেলেছেন যে, নবী করীম (স) থেকেও আগামীতে আগমনকারী কোনো নবীর উপর ঈমান আনার ও তাকে সাহায্য-সহযোগিতা দান করার অংগীকার নেয়া হয়েছিল। অথচ যে আয়াতে আগামীতে আগমনকারী নবীর থেকে অংগীকার নেয়ার কথা বলা হয়েছে, সে আয়াতের কোথাও আল্লাহ তাআলা এ কথা বলেননি যে, এ অংগীকারটি হযরত মুহাম্মদ (স) থেকেও নেয়া হয়েছে। আর যে আয়াতে হযরত মুহাম্মদ (স) থেকে একটি অংগীকার নেয়ার কথা বলা হয়েছে, সেখানে কোথাও এ কথা বলা হয়নি যে, এ অংগীকারটি ছিল আগমনকারী কোনো নবীর আনুগত্যের সাথে জড়িত। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, দুটো পৃথক বক্তব্যকে জুড়ে তৃতীয় একটি বক্তব্য, যা কুরআনের কোথাও নেই, কোন্ দলিলের ভিত্তিতে তৈরি করা হলো?

এমনটি হলে এর তিনটি দলিল বা ভিত্তি হতে পারতোঃ এক. যদি এ আয়াতটি নাযিল হবার পর নবী করীম (স) সাহাবাদেরকে একত্রিত করে ঘোষণা করতেনঃ "হে লোকেরা! আল্লাহ আমার কাছ থেকে এ মর্মে অংগীকার

নিয়েছেন যে, আমার পর যে নবী আসবেন আমি তার উপর ঈমান আনবো এবং তাকে সাহায্য–সহযোগিতা দান করবো। কাজেই আমার অনুসারী হবার কারণে তোমরাও এ অংগীকার করো।" কিন্তু সমগ্র হাদীস গ্রন্থগুলোর কোথাও আমরা এ বক্তব্য সম্বলিত একটি হাদীসও দেখিনা। বরং বিপরীত পক্ষে এমন অসংখ্য হাদীস দেখি, যেগুলো থেকে নবী করীম (স)–এর উপর নবুয়্যতের সিলসিলা খতম হয়ে গেছে এবং তাঁর পরে আর কোনো নবী আসবেনা এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। এ কথা কি কোনোদিন কল্পনাও করা যেতে পারে যে, নবী করীম (স)–এর থেকে এমন ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংগীকার নেয়া হয়েছে আর তিনি তাকে এভাবে অবহেলা করে গেছেন বরং উলটো এমন সব কথা বলেছেন যার ভিত্তিতে তাঁর উম্মতের বিরাট অংশ আল্লাহ্ প্রেরিত কোনো নবীর উপর ঈমান আনা থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে?

কুরআনে যদি সকল নবী ও তাঁদের উম্মতদের থেকে একটি মাত্র অংগীকার নেয়ার উল্লেখ থাকতো, তাহলে সেটি এ বক্তব্য গ্রহণের দ্বিতীয় দলিল বা ভিত্তি হতে পারতো। আর সে অংগীকারটি হচ্ছে পরবর্তীকালে আগমনকারী নবীর উপর ঈমান আনা। সমগ্র কুরআনে এটি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো অংগীকারের উল্লেখ থাকতোনা। এ অবস্থায় এ যুক্তি পেশ করা যেতে পারতো যে, সূরা আহযাবের উল্লিখিত আয়াতেও এ একই অংগীকারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এ যুক্তি পেশ করারও কোনো অবকাশ এখানে নেই। কুরআনে একটি নয়, বহু অংগীকারের কথা উল্লিখিত হয়েছে। যেমন সূরা বাকারা দশম রুকু'তে বনী ইসরাঈল থেকে আল্লাহর বন্দেগী, পিতা–মাতার সাথে সদ্ব্যবহার ও পারস্পরিক রক্তপাত থেকে বিরত থাকার অংগীকার নেয়া হয়েছে। সূরা আলে ইমরানের ১৯ রুকু'তে সমস্ত আহলে কিতাবদের থেকে এ অংগীকার নেয়া হয়েছেঃ আল্লাহর যে কিতাব তোমাদের হাতে দেয়া হয়েছে তোমরা তার শিক্ষাবলী গোপন করবেনা বরং তাকে সাধারণ্যে ছড়িয়ে দেবে। সূরা আরাফের ২১ রুকু'তে বনী ইসরাঈল থেকে অংগীকার নেয়া হয়েছেঃ আল্লাহর নামে হক ছাড়া কোনো কথা বলবেনা আর আল্লাহ প্রদত্ত কিতাবকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরবে এবং তার শিক্ষাগুলো মনে রাখবে। সূরা মায়েদার প্রথম রুকু'তে মুহাম্মদ (স)–এর অনুসারীদেরকে একটি অংগীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, যা তারা আল্লাহর সাথে করেছিল। তা হচ্ছে, "তোমরা আল্লাহর সাথে শ্রবণ ও আনুগত্যের অংগীকার করছো।" এখন প্রশ্ন হচ্ছে সূরা আহযাবের সংশ্লিষ্ট আয়াতে যে অংগীকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেই অংগীকারটি কি ছিল তা যখন বলা হয়নি তখন সেখানে এ সমস্ত অংগীকারের মধ্য থেকে কোনো একটিকে গ্রহণ না করে বিশেষ করে সূরা আলে ইমরানের ৮১ আয়াতে উল্লিখিত অংগীকারটি গ্রহণ করা হবে কেন? এ জন্যে অবশ্যি একটি ভিত্তির প্রয়োজন। আর এ ভিত্তি

কোথাও নেই। এর জবাবে যদি কেউ বলে যে, উভয় ক্ষেত্রে যেহেতু নবীদের থেকে অংগীকার গ্রহণের কথা হয়েছে, তাই একটি আয়াতের সাহায্যে অন্যটির ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তাহলে আমি বলবো, নবীদের উম্মতের থেকে অন্য যতগুলো অংগীকার নেয়া হয়েছে কোনোটাই সরাসরি নেয়া হয়নি বরং নবীদের মাধ্যমেই নেয়া হয়েছে। এ ছাড়াও গভীরভাবে কুরআন অধ্যয়নকারী ব্যক্তিমাত্রই জানেন, প্রত্যেক নবীর থেকে আল্লাহর কিতাব মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরার ও তার বিধানসমূহের আনুগত্য করার অংগীকার নেয়া হয়েছে।

তৃতীয় দলিল বা ভিত্তি হতে পারতো সূরা আহযাবের পূর্বাপর আলোচনা। সেখানে যদি এ কথার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত থাকতো যে, এখানে অংগীকার বলতে পরবর্তীকালে আগমনকারী নবীদের উপর ঈমান আনার অংগীকার বুঝানো হয়েছে, তাহলে এ বক্তব্য গ্রহণ করা সঙ্গত হতো। কিন্তু এখানে ব্যাপারটি তো সম্পূর্ণ উল্টো। পূর্বাপর আলোচনা প্রসংগে বরং এ অর্থ গ্রহণের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করছে। সূরা আহযাব শুরু করা হয়েছে এ বাক্যটির মাধ্যমে–

"হে নবী! আল্লাহকে ভয় করো এবং কাফির ও মুনাফিকদের আনুগত্য করোনা আর তোমার রব যে অহী পাঠান সেই অনুযায়ী কাজ করো এবং আল্লাহর উপর আস্থা স্থাপন করো।" এরপর নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, জাহেলিয়াতের যুগ থেকে পালক পুত্র নেয়ার যে পদ্ধতি চলে আসছে তা এবং তার সাথে সম্পর্কিত সব রকমের কুসংস্কার ও রীতি–রসম নির্মূল করে দাও। তারপর বলা হচ্ছে, রক্তহীন সম্পর্কের মধ্যে কেবলমাত্র একটি সম্পর্কই এমন আছে যা রক্ত সম্পর্কের চাইতেও মর্যাদাসম্পন্ন। সেটি হচ্ছে, নবী ও মু'মিনদের মধ্যকার সম্পর্ক। এ সম্পর্কের কারণে নবীর স্ত্রীগণ মু'মিনদের নিকট তাদের মায়েদের ন্যায় মর্যাদাসম্পন্ন এবং মায়েদের ন্যায় তাদের জন্যে হারাম। এছাড়া অন্য সমস্ত ব্যাপারে কেবল রক্ত সম্পর্কই আল্লাহর কিতাব অনুসারে বিবাহ হারাম হওয়া ও মীরাস লাভের অধিকারী হবার জন্যে স্বীকৃত। এ বিধান নির্দেশ করার পর আল্লাহ তাআলা হামেশা সমস্ত নবীদের থেকে এবং সেই অনুযায়ী নবী করীম (স) থেকেও যে অংগীকারটি নিয়েছেন সে কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। এখন একজন সাধারণ বিবেকবান ব্যক্তি মাত্রই দেখতে পারেন যে, এ আলোচনা প্রসংগে কোথায় পরবর্তীকালে আগমনকারী একজন নবীর উপর ঈমান আনার অংগীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার অবকাশ রয়েছে? এখানে তো কেবল সেই অংগীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ারই অবকাশ রয়েছে যাতে আল্লাহর কিতাবকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরার, তার বিধানসমূহ মনে রাখার, সেগুলো কার্যকর করার এবং জনসমক্ষে তা প্রকাশ করার জন্যে সকল নবীকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে। এরপর একটু সামনে অগ্রসর হয়ে আমরা দেখছি আল্লাহ তাআলা নবী করীম (স)–কে পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন, আপনি

নিজে আপনার পালকপুত্র যায়েদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করে জাহেলিয়াতের সেই ভ্রান্ত ধারণা নির্মূল করে দিন যার ভিত্তিতে লোকেরা পালকপুত্রকে নিজেদের ঔরসজাত পুত্রের ন্যায় মনে করতো। কাফির ও মুনাফিকরা এর বিরুদ্ধে একের পর এক আপত্তি উত্থাপন করে অপপ্রচারে লিপ্ত হলে আল্লাহ্ তাআলা ধারাবাহিকভাবে সেগুলোর জবাব দেনঃ

এক. মুহাম্মদ (স) তোমাদের মধ্য থেকে কোনো পুরুষের পিতা নন, যার ফলে তার (সেই পুরুষের) তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তাঁর উপর হারাম হতে পারে।

দুই. আর যদি এ কথা বলো যে, সে তার জন্যে হালাল হয়ে থাকলেও তাকে বিয়ে করার এমন কি প্রয়োজন ছিল? তাহলে এর জবাব হলো, তিনি হচ্ছেন আল্লাহর রসূল। আল্লাহ্ যে কাজটি খতম করতে চান, তার নিজের অগ্রসর হয়ে সেটি খতম করে দেয়াই হচ্ছে তাঁর দায়িত্ব।

তিন. এ ছাড়াও এটি করা তাঁর জন্যে আরো বেশী প্রয়োজন ছিল এ জন্যে যে, তিনি নিছক রসূল নন বরং তিনি শেষ রসূল। জাহেলিয়াতের এ রীতি-রসমগুলোর তাকেই বিলোপ সাধন করে যেতে হবে। কেননা তাঁর পরে তো আর কোনো নবী আসবেননা, যিনি এগুলোর বিলোপ সাধন করবেন।

এই শেষের বক্তব্যটি আগের বক্তব্যের সাথে মিলিয়ে পড়লে যে কেউ নিশ্চয়তার সাথে এ কথা বলবে যে, এই পূর্বাপর বক্তব্যের মধ্যে নবী করীম (স)-কে যে অংগীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে পরবর্তীকালে আগমনকারী কোনো নবীর উপর ঈমান আনার অংগীকার নয়।

এবার বিবেচনা করুন, আলোচ্য আয়াতটি থেকে কাদিয়ানীদের বিবৃত অর্থ গ্রহণ করার জন্যে এ তিনটি দলিলই হতে পারতো। অথচ এ তিনটি ভিত্তির প্রত্যেকটিই তাদের বক্তব্যের সাথে সম্পর্কহীন বরং তার বিপরীত। এছাড়া তাদের কাছে যদি চতুর্থ কোনো যুক্তি ও ভিত্তি থাকে, তাহলে তা তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন। আর এ তিনটি যুক্তির জবাবও তাদের কাছ থেকে নিন। অন্যথায় ন্যায়সংগতভাবে এ কথা মনে করা হবে যে, তারা মূর্খতা ও অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে, অথবা আল্লাহর ভয়কে মন থেকে সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত করে সরল-প্রাণ জনসাধারণকে গোমরাহ্ করার জন্যে আয়াতের এ অর্থ গ্রহণ করেছে। যা হোক, আমি এটা বুঝতে পারছিনা যে, মীর্যা সাহেব যদি নবী হয়ে থাকেন, তাহলে এখনো তার "সাহাবা"দের যুগ শেষ হয়নি অথচ তার সমগ্র উম্মত বর্তমানে "তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীন"-এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এরপরও তাদের অবস্থা এই যে, তার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত লোকেরা প্রকাশ্যে আল্লাহর কিতাব থেকে এ ধরনের ভুল ও মিথ্যা যুক্তি পেশ করে যাচ্ছে অথচ এ মূর্খতার বিরুদ্ধে সমগ্র উম্মতের মধ্যে একটি আওয়াজও বুলন্দ হচ্ছেনা। [তরজমানুল কুরআন, রমযান-শাওয়াল ১৩৭১ হিজরী, জুন-জুলাই ১৯৫২]

সুন্নী শিয়া মতপার্থক্য

প্রশ্নঃ একজন দীনদার শিয়া আত্মীয়ের মাধ্যমে আমি শিয়া মাযহাবের অনেকগুলো বই পড়ে ফেলেছি! শিয়া–সুন্নী মতপার্থক্যের মধ্যে নামাযের ক্ষেত্রে যে মতপার্থক্য আছে তা আমার মনে সবচাইতে বেশী উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। আমার সংশয়গুলো আপনার সামনে রাখছি। আশা করি বিস্তারিত জবাব দিয়ে এ অবস্থা দূর করার চেষ্টা করবেন।

নামাযে দাঁড়াবার ধরন সম্পর্কেই আমি সন্দেহে আছি। নামায হচ্ছে ইসলামরে প্রথম স্তম্ভ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলা, দাঁড়ানো অবস্থায় হাত বাঁধা বা ছেড়ে দেয়া নিয়ে চার ইমামের মধ্যেই মতবিরোধ রয়েছে। তারপর দুঃখ হয়, রসূলের সুস্পষ্ট বাণীঃ

"আমি তোমাদের মধ্যে দুটো ভারী জিনিস রেখে যাচ্ছি– আল্লাহর কিতাব ও আমার পরিবারবর্গ।" বর্তমান থাকা সত্ত্বেও সুন্নী ইমামগণ মতবিরোধ দূর করার জন্যে আহলে বায়াতের দিকে ফিরে যাননি। অথচ ইমাম আযম (র) ও ইমাম মালিক (র) ইমাম যাফর সাদেকের (র) সমসাময়িকও ছিলেন। এভাবে রসূলের পরিবারবর্গকে বাদ দিয়ে দীনের সমস্ত কাজ আহলে বায়াতের বাইরের লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। দীনী মাসায়েলের ক্ষেত্রে আহলে বায়াতের কাছ থেকে তথ্য–প্রমাণাদি নেয়া তো দূরের কথা তাদের থেকে হাদীসও রিওয়ায়েত করা হয়নি। অথচ কথায় বলে "ঘরের লোকই ঘরের খবর অধিক জানে।" এ প্রবাদ অনুযায়ী দীনের মূল উৎস ছিলেন আহলে বায়াতের ইমামগণ। ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম মালিক (র) নিছক রিওয়ায়েতের উপর নির্ভর করেছেন। অন্যদিকে ইমাম জাফর সাদিক (র) তাঁর পিতা ইমাম বাকেরকে (র), তিনি পিতা যয়নুল আবেদীনকে (র) এবং তিনি পিতা হোসাইনকে (র) নিজ চোখে দেখেছেন যে নামাযে তারা কিভাবে দাঁড়াতেন। কথায় বলে, চোখে দেখা আর কানে শুনা এক কথা নয়। আহলে বায়াতের ইমামদের মতামত ও কার্যকলাপকে অগ্রাহ্য করার কারণে সুন্নীদের মধ্যে মতবিরোধের প্রসার ঘটেছে।

জবাবঃ আপনার প্রশ্নটা তো কেবল নামায সম্পর্কে। কিন্তু এ প্রসংগে এসে আপনি নিজের সংশয়ের যে ভিত্তিগুলো বর্ণনা করেছেন তা অনেক দূরে পৌঁছে গেছে। তাই ঐ ভিত্তিগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

আপনার সংশয়ের ভিত্তি হচ্ছে এ হাদীসটি– "আমি তোমাদের মধ্যে দুটো ভারী জিনিস রেখে যাচ্ছি.....।" এ হাদীসটি সম্পর্কে সর্বপ্রথম আপনার জেনে রাখা উচিত, এ হাদীসটি বিভিন্ন শব্দ সম্বলিত হয়ে বিভিন্ন সনদ পরম্পরায়

বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে কোনোটি দুর্বল আবার কোনোটি শক্তিশালী। হযরত যায়েদ ইবনে আরকামের (র) মাধ্যমে সহীহ মুসলিমে যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে সেটির সনদ সবচাইতে শক্তিশালী এবং তা অধিকতর বিস্তারিতও। সে হাদীসটিতে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গাদীরেখুম নামক স্থানে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেনঃ "হে লোকেরা! আমি একজন মানুষ। আল্লাহর দূত (মৃত্যুর পয়গাম নিয়ে) হয়তো খুব শিগগির এসে যেতে পারেন এবং আমি তাঁর ডাকে সাড়া দেবো (অর্থাৎ দুনিয়া থেকে বিদায় নেবো)। আমি তোমাদের মধ্যে দুটো ভারী জিনিস রেখে যাচ্ছি। এর মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে, আল্লাহর কিতাব। যার মধ্যে রয়েছে হিদায়াত ও আলো। কাজেই তোমরা আল্লাহর কিতাবকে গ্রহণ করো এবং তাকে মজবুত করে ধরো।" এ প্রসংগে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত সাহাবাদেরকে কিতাবুল্লাহর বিধান মেনে চলার ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। অতপর বলেনঃ "আর দ্বিতীয় জিনিসটি হচ্ছে আমার আহলে বায়াত। নিজের আহলে বায়াতের ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।" এ হাদীসটিতে কোথাও এমন কোনো ইংগিত দেয়া হয়নি যে, আল্লাহর কিতাবের পর আর আছে কেবলমাত্র আহলে বায়াত, তাদের কাছ থেকেই তোমাদেরকে দীন শিখতে হবে এবং একমাত্র তাদেরই আনুগত্য করতে হবে। বরং এ হাদীসটি থেকে জানা যায়, ঐ দুটি জিনিসকে "দুটি ভারী জিনিস" বলা হয়েছে দুটি পৃথক অর্থে। আল্লাহর কিতাবের ভারী হবার কারণ, এটি হচ্ছে হিদায়াতের উৎস এবং তাকে বাদ দেয়া বা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া গোমরাহী ছাড়া আর কিছুই নয়। আর আহলে বায়াতকে ভারী বলার কারণ হচ্ছে এই যে, পৃথিবীতে সবসময়ই মানব জাতির নেতাদের আহলে বায়াত বা পরিবারবর্গ তাদের অনুসারীদের জন্য মহাপরীক্ষা প্রমাণিত হয়েছে। কোথাও তাদের প্রতি ভক্তি–শ্রদ্ধা প্রকাশের ব্যাপারে এত বেশী বাড়াবাড়ি করা হয়েছে যে, ভক্তির আতিশয্যে তাদেরকে মাবুদে পরিণত করা হয়েছে। আবার কোথাও এত বেশী কড়াকড়ি করা হয়েছে, যার ফলে তাদেরকে যুলুম–নির্যাতনের শিকারে পরিণত করা হয়েছে। এভাবে নিজেদের নেতা ও নবীর পরিবারবর্গের প্রতি যে স্বাভাবিক শ্রদ্ধাবোধ থাকে তাকে জোর করে দাবিয়ে রাখাই হয় মূল উদ্দেশ্য। এ প্রেক্ষাপটেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ আমার আহলে বায়াতের ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি অর্থাৎ তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো এবং বাড়াবাড়ি ও অতি কড়াকড়ি করা থেকে বিরত থাকো।

দ্বিতীয়ত, তর্কের খাতিরে যদি মেনেই নেয়া যায় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের ইতরাত বা আহলে বায়াতের (এই দুটো শব্দই হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে) কাছ থেকে দীন শেখার নির্দেশ দিয়েছেন, তাহলে এ

শব্দগুলো বলতে কেবল আলীর (রা) আওলাদ বুঝানো হবে কেন? কুরআনের দৃষ্টিতে এর মধ্যে নবীর (স) স্ত্রীগণও অন্তর্ভুক্ত হবেন। এর মধ্যে জাফরের (রা), আকীলের (রা) আব্বাসের (রা) আওলাদ এবং সমগ্র বনী হাশিমও অন্তর্ভুক্ত হবেন– যাদের জন্যে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদকা খাওয়া হারাম করে দিয়েছেন। তৃতীয়ত, রসূলুল্লাহ্ (স) কেবল "তোমাদের মাঝে দুটি ভারী জিনিস রেখে গেলামই" বলেননি, তিনি এ কথাও বলেছেনঃ

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ -

"তোমরা আমার সুন্নাত এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের উপর চলো।" তিনি এও বলেছেনঃ

"আমার সাহাবারা নক্ষত্রমন্ডলীর মতো তাদের মধ্যে থেকে তোমরা যাকে অনুসরণ করবে, হিদায়াত লাভ করবে।" তাহলে রসূলের একটি বাণী গ্রহণ করা হবে আর অন্য সবগুলো বাদ দেয়া হবে এর কারণ কি? কেনোই বা আহলে বায়াতের সাথে সাথে খুলাফায়ে রাশেদীন এবং নবীর অন্যান্য সমস্ত সাহাবা থেকে ইল্‌ম হাসিল করা হবেনা? চতুর্থত, সুদীর্ঘ তেইশ বছর ধরে শত শত হাজার হাজার লোকের সাথে মিলে রসূলুল্লাহ (স) যে মহান কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন এবং লাখো লাখো লোক নিজেদের চোখে যে কাজগুলো দেখেছেন, সে ব্যাপারে জানার ও তথ্য সংগ্রহের জন্য কেবলমাত্র তাঁর পরিবারের লোকদের উপর নির্ভর করা হবে, আর যে বিপুল সংখ্যক লোক এ কাজে তাঁর সহযোগী ছিলেন এবং এগুলো দেখেছেন, তাদেরকে একেবারেই উপেক্ষা করা হবে, স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধিও কোনোক্রমেই একথা মেনে নিতে পারেনা। অথচ রসূলুল্লাহর (স) পরিবারের মধ্যে মেয়েরা কেবল তাঁর পারিবারিক ও সংসার জীবনই দেখার সুযোগ পেয়েছেন। আর পুরুষদের মধ্যে একমাত্র হযরত আলী (রা) ছাড়া আর দ্বিতীয় এমন কেউ ছিলনা যিনি হযরত আবু বকর (রা), হযরত উমর (রা), হযরত উসমান (রা), হযরত ইবনে মাসউদ (রা) ও অন্যান্য বহু সাহাবার মতো দীর্ঘকাল তাঁর সাহচর্য লাভ করেছেন। তাহলে একমাত্র আহলে বায়াতের মধ্যে এটাকে সীমাবদ্ধ করার কোনো যুক্তিসংগত কারণ থাকতে পারে কি?

এ প্রশ্নটি খন্ডন করতে গিয়ে একদল লোক তো বলেই বসেছে যে, মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া বাকি সব সাহাবাই ছিলেন (নাউযুবিল্লাহ্) মুনাফিক। কিন্তু একথা তো একমাত্র সেই বলতে পারে, যে চরম বিদ্বেষে একেবারে অন্ধ হয়ে গেছে। যে ইতিহাস ও ইতিহাস বিশ্লেষণের কোনো পরোয়াই করেনা। ইতিহাস যে তার কথাকে মিথ্যা প্রমাণ করছে, সেদিকে তার কোনো দৃষ্টিই নেই। তার

এই বক্তব্যে রসূল ও রসূলের (স) মিশন কিভাবে নিন্দিত হচ্ছে, সে ব্যাপারেও তার কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। কোনো বিবেকবান ব্যক্তি কি একথা চিন্তা করতে পারে যে, তেইশ বছর ধরে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের যে সব সাথীর উপর পূর্ণ আস্থাশীল ছিলেন এবং যাদের সহযোগিতায় আরবের এত বড় সংস্কারের দায়িত্ব সম্পাদন করলেন, তারা সবাই মুনাফিক ছিল? তাহলে রসূল (স) কি জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তাদের মুনাফিকী সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন? একথা সত্য হলে রসূলুল্লাহর (স) মানুষ চেনার ক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তা সংশয়দুষ্ট হয়ে পড়ে। আর যদি এটা মিথ্যা হয় এবং নিঃসন্দেহে মিথ্যা, তাহলে দীনের ইল্‌ম হাসিল করার ব্যাপারে এদের সবার তথ্য ও অনুসন্ধান নির্ভরযোগ্য হবেনা কেন?

আপনার মনে দ্বিতীয় যে সংশয়টি জেগেছে তার পেছনে সবচেয়ে বেশী শক্তি যুগিয়েছে একটি বড় ভুল ধারণা। আপনার মনে কেউ এ ভুল ধারণা বসিয়ে দিয়েছে যে, সুন্নী ইমামগণ দীনী মাসায়েলের অনুসন্ধান ও গবেষণার ক্ষেত্রে আহলে বায়াতের দারস্থ হননি। তারা আহলে বায়াতের কাছে কোনো বিষয় জিজ্ঞেসই করেননি। তাদের কাছ থেকে হাদীস রিওয়ায়েত করেননি। না, একথা ঠিক নয়, বরং বলতে গেলে এ ধরনের ভুল শিয়া ইমামগণই করেছেন। তাঁরা একতরফা ইল্‌ম হাসিল করেছেন এবং তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে একটি মাত্র মাধ্যমের (অর্থাৎ তাদের থেকে যাদেরকে তারা আহলে বায়াত বলে জানেন) উপর নির্ভর করেছেন। অন্য সব মাধ্যম সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়েছেন। কিন্তু আহলে সুন্নাতের ইমামগণ এ ভুলটি করেননি। তাঁরা আহলে বায়াতের কাছে যে ইল্‌ম ছিল তা নিয়েছেন আবার অন্য সাহাবাদের কাছে যে ইল্‌ম ছিল তাও সংগ্রহ করেছেন। এরপর তারা যাচাই–বাছাই করার পর নিজেদের অনুসন্ধান পদ্ধতি অনুযায়ী কোন্ বিষয়ে কোন্ পদ্ধতি বেশী নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য তা নির্ণয় করেছেন।

যেমন ইমাম আবু হানীফার (র) কথাই ধরুন। তিনি যেখানে একদিকে অন্যান্য সাহাবা ও তাবেয়ীনদের থেকে ইল্‌ম হাসিল করেন, সেখানে অন্যদিকে ইমাম বাকের (র), ইমাম জাফর সাদিক (র), ইমাম যায়েদ ইবনে আলী ইবনে হোসাইন (র) ও ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হানীফা (র) থেকেও ইল্‌ম হাসিল করেন। অন্যান্য ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণও এই একই পথে চলেন। হাদীসের এমন কোনো গ্রন্থ আছে কি যেখানে আহলে বায়াতের নেতৃস্থানীয়দের রিওয়ায়েত নেই?

কিন্তু এই দাবীটি মোটেই ন্যায়সংগত নয় যে, নামায বা অন্য কোনো জিনিস কেবলমাত্র সেটিই গ্রহণ করতে হবে যা ইমাম জাফর সাদিকের (র) কাছে ছিল, যেহেতু তিনি ইমাম বাকের (র) থেকে এবং ইমাম বাকের (র)

ইমাম যয়নুল আবেদীন (র) থেকে আর ইমাম যয়নুল আবেদীন (র) ইমাম হোসাইন (রা) থেকে এবং তিনি হযরত আলী (রা) থেকে আর হযরত আলী (রা) তা রসূলে করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে নিয়েছিলেন। প্রশ্ন হচ্ছে এই একটি মাত্র মাধ্যমের উপর ভরসা করে বসে থাকা কেন? আরো তো হাজার হাজার লোক সে সময় ঘটনাস্থলে ছিলেন। তারা নামায পড়তে এবং অন্যান্য কাজ করতে হাজার হাজার তাবেয়ীকে এবং এই তাবেয়ীগণ হাজার হাজার সাহাবাকে এবং এই সাহাবাগণ সবাই রসূলকে (স) নিজেদের চোখে এসব কাজ করতে দেখেছিলেন। তাহলে তাদের সবাইকে বাদ দিয়ে একমাত্র আহলে বায়াতের উপর নির্ভর করার কারণটা কি? "ঘরের লোকই ঘরের খবর অধিক জানে" –এটা কোনো কুরআনের আয়াত বা হাদীস নয় যে, এ প্রবাদ বাক্যের অনুসরণ করে নবীর জীবনের ব্যাপারে কেবল তাঁর ঘরের লোকদের জ্ঞানের উপর নির্ভর করা হবে? অথচ নবীর (স) জীবনের শতকরা নিরানব্বই ভাগ কেটেছে ঘরের বাইরে হাজার হাজার লাখো লাখো মানুষের সামনে এবং যার ফলে বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্নভাবে ও বিভিন্ন সময় হাজার হাজার লোকের সাথে তার কোনো না কোনো প্রকার লেনদেন, উঠাবসা বা অন্য কোনো প্রকার সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে।

আপনার সংশয়ের তৃতীয় কারণটা হলো, দীনী মাসায়েলের ক্ষেত্রে মতবিরোধ দেখে আপনি ঘাবড়ে গেছেন। আপনার ধারণা, যদি কেবল আহলে বায়াতের ইল্‌মের উপর নির্ভর করা হতো, তাহলে এ মতবিরোধগুলো হতোনা। এ ধারণা ঠিক নয়। মতবিরোধ এমন কোনো জিনিস নয় যে জন্য ঘাবড়ে যেতে হবে বা ভয় পেতে হবে। আর আহলে বায়াতের অনুসারীরাও মতবিরোধ থেকে নিষ্কৃতি পাননি। আপনি শিয়া সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ফেরকার আকীদা-বিশ্বাস ও তাদের ফিকাহভিত্তিক মাযহাব অধ্যয়ন করলে জানতে পারবেন সুন্নীদের এখানে যত মতবিরোধ আছে তাদের ওখানে মতবিরোধ তার চাইতে অনেক বেশী। অথচ তাদের প্রত্যেকেই নিজেদের পদ্ধতির উৎস হিসেবে গণ্য করেছে আহলে বায়াতের ইল্‌মকে। আসলে কোটি কোটি লোক যে দীনের অনুসারী এবং হাজার হাজার লাখো লাখো মানুষ যার উৎস অধ্যয়ন করে এবং তা নিয়ে গবেষণা চালায় ও চিন্তা-ভাবনা করে, তার মৌল বাণীগুলোর ব্যাখ্যা, তার বিধি-বিধানগুলোর বিস্তারিত রূপ ও তার খুঁটিনাটি বিষয়ের অনুসন্ধান ক্ষেত্রে কোনো কালেই পূর্ণ মতৈক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। এ ধরনের অবস্থায় মতবিরোধই স্বাভাবিক। কোনোভাবেই এর পথ রোধ করা যেতে পারেনা। কিন্তু এই অসংখ্য মতবিরোধের মধ্যে একটি মৌল ঐক্য রয়েছে। আর এ ঐক্যের ভিত গড়ে উঠেছে এমন সব মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস, মূলনীতি ও বড় বড় বিধানের উপর, যেগুলোর ব্যাপারে সবাই একমত। লোকেরা যদি ঐ ঐক্যের ভিত্তির উপর আসল

গুরুত্ব দেয় এবং ছোটখাটো মতবিরোধকে যথাস্থানে রাখে, তাহলে কোনো ক্ষতি হয়না। কিন্তু ঐ ছোটখাটো মতবিরোধ, যেগুলোর প্রশ্নে তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত, সেগুলো যখন মূল গুরুত্বের আসনে বসে, তখনই বিরোধ ও বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয়।

যেমন নামাযের কথাই ধরুন। আপনি তো বিশেষ করে নামাযের ব্যাপারেই প্রশ্ন করেছেন। এর মধ্যে ঐক্যের ভিত্তি হচ্ছে, নামাযে সকল মুসলমান একই আল্লাহর ইবাদত করে। এ নামায পড়ার জন্য তারা সেই পদ্ধতিকে স্বীকৃতি দেয়, যে পদ্ধতি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিখিয়েছেন। তারা সবাই পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয বলে মানে। সবাই একই কিবলার দিকে মুখ করে নামায পড়ে। নামাযের জন্য উযুকে শর্ত হিসেবে গণ্য করে। রুকূ, সিজদা, কিয়াম ও কুউদকে তার বাইরের কাঠামোর অংশ বলে স্বীকার করে। আর এ নামাযের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াত ও আল্লাহর যিকির করে। ঐক্যের এ ভিত্তির পর তাদের মধ্যে মতবিরোধ কোন্ সব বিষয়ের উপর তা একবার দেখা যাক। হাত কোথায় বাঁধা হবে? বাঁধা হবে না খোলা হবে? আমীন জোরে বলা হবে না আস্তে? ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়া হবে, নাকি হবে না.... ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব ছোটখাটো বিষয়ে যতগুলো মাযহাব আছে তারা প্রত্যেকেই প্রমাণ পেশ করে যে, তাদের এ পদ্ধতি তারা কোনো না কোনো সূত্রে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে লাভ করেছে। কার সূত্র কতটা শক্তিশালী বা দুর্বল তা বিচার করার আগে একথা দেখা দরকার যে, প্রত্যেকের কাছে তো রসূলের (স) বাণী রয়েছে। রসূল (স) ছাড়া অন্য কারোর বাণীর ভিত্তিতে কাজ করছি বলে তো কেউ দাবী করেনি। তাহলে যে কোনো একটি পদ্ধতির উপর যদি আমি (যেটার উপর আমি নিশ্চিত হতে পারি) আমল করি এবং অন্যদের পদ্ধতিগুলোকেও সত্য ভিত্তিক বলে মেনে নিই এবং ঐক্যের ভিত্তির উপর একমত হই, তাহলে তো কোনো সমস্যাই থাকেনা। [তরজমানুল কুরআন, জুন-জুলাই ১৯৫২]

মতবিরোধের বৈধ সীমা

প্রশ্নঃ আন্দোলনের সমর্থক হিসেবে আন্দোলনের সাহিত্য ও পত্র-পত্রিকা অধ্যয়ন করে যাচ্ছি। এ পর্যন্ত দেওবন্দের বুযুর্গ এবং অন্যান্য আন্দোলনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত ফত্ওয়ার যেসব জবাব পাকিস্তান ও ভারতের জামায়াতের আমীর ও অন্যান্য দায়িত্বশীলগণ দিয়েছেন সেগুলো পাঠ করেছি। আমাদের বুযুর্গদের অবস্থা দেখে খুব দুঃখ হয়। তবে আফসোস করা ছাড়া আর কোনো উপায় দেখছিনা।

আসলে কুফরী ও ফাসিকীর ফত্‌ওয়া শুধুমাত্র জামায়াতে ইসলামী ও বুযুর্গানে দেওবন্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং যখন আমরা আগেকার বুযুর্গ ও ইমামদের জীবনের, দিকে দৃষ্টি ফিরাই, তখন তাঁদের জীবনেও অনেক মতভেদ দেখি। যেমন একপক্ষে আছেন ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ইমাম ইবনে হাযম আন্দুলুসী, ইমাম ইবনে জাওযী প্রমুখ অন্যপক্ষে আছেন ইমাম ইবনে আরাবী, ইমাম গাযযালী, ইমাম ওয়ালী উল্লাহ্‌র মতো বুযুর্গগণ। এর মধ্যে প্রথম দল বলেছেনঃ লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌-এর তাৎপর্য হলো- "লা মা'বুদা ইল্লাল্লাহ্‌। দ্বিতীয় দল বলেছেন, "লা মাওজুদা ইল্লাল্লাহ্‌" হলো এর তাৎপর্য। প্রথম দল দ্বিতীয় দলের এই আকীদাকে কুফর ও নাস্তিক্যবাদ বলেছেন। দ্বিতীয় দল নিজেদের আকীদাকে তাওহীদের সর্বোচ্চ ও সম্পূরক পর্যায়ের মনে করে থাকেন। প্রশ্ন হলো, যে কালেমার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, সে কালেমা সম্পর্কে সমকালীন ইমাম ও উম্মতের আলেমগণের মধ্যে এ মতপার্থক্য কেন?

আশা করি আপনি এ বিষয়ে তরজমানুল কুরআনে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবেন।

জবাবঃ কোনো বিস্তারিত আলোচনার পরিবর্তে আপননার স্বস্তির জন্যে এতোটুকু বলা যথেষ্ট যে, কুরআন মজীদ কোনো প্রকার অস্পষ্টতা ও জড়তা ছাড়াই নিজের বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে। মানুষের হিদায়াতের জন্যে যে সত্য জানা জরুরী তা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কুরআনে উল্লিখিত হয়েছে। তবে মতবিরোধ হওয়ার বড় কারণ দু'টিঃ

এক. যখন কেউ কোনো কুরআনী সত্য নিজ ভাষায় ব্যাখ্যা করতে প্রবৃত্ত হয় এবং কুরআনের সীমা অতিক্রম করে নিজের ব্যাখ্যা পেশ করে তখন মতের পার্থক্য এবং অধিকাংশ সময় প্রচন্ড মতবিরোধিতা দেখা দেয়।

দুই. যখন লোকেরা এমন প্রশ্নের জবাব দান করা অপরিহার্য মনে করে যার দায়িত্ব আল্লাহ্‌ ও রসূল তাদের উপর অর্পণ করেননি, তখনই ঝগড়া-ফ্যাসাদের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়।

এতেও ঝগড়া বাড়তোনা যদি একজন নিজের বক্তব্য পেশ করে এবং অপরজন তা খন্ডন করে থেমে যেতেন। কিন্তু অতীতে এবং আজও এটাই দেখা যাচ্ছে যে, একজন লোক নিজের কথা ব্যক্ত করেই খ্যান্ত হননা বরং এটাকে কুরআনের কথা বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন এবং এ কথার অস্বীকারকারীকে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে কুরআন অস্বীকারকারী বলে ঘোষণা করে দেন। আর দ্বিতীয় জন এ কথা খন্ডন করেই খ্যান্ত হননা বরং প্রতিপক্ষকে গোমরাহ্‌ গোমরাহকারী এমনকি কাফির পর্যন্ত আখ্যায়িত করেন। তারপর প্রত্যেকের

অনুগামীরা নিজ নিজ নেতার কথাকে অমোঘ মনে করে মতবিরোধকে ষোল কলায় পরিপূর্ণ করে দেয়। এ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ফের্কার উৎপত্তি হয়। একে অপরের সাথে নামায, মসজিদ, বিবাহ্-শাদীর সম্পর্ক পর্যন্ত ছিন্ন করে ফেলে এবং নিজেদের বিশিষ্ট মাসায়েলের উপর কুফর ও ঈমানের ভিত্তি স্থাপন করে। যাবতীয় অনাসৃষ্টির এটাই প্রকৃত কারণ। অন্যথায় যদি নস্কে (কুরআন ও হাদীস) নসের জায়গায় রাখা হতো, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও উদ্ভাবনকে "নস্সদৃশ" বানানো না হতো এবং বিতর্ককে শুধুমাত্র মতপার্থক্যের সীমা পর্যন্ত থাকতে দেয়া হতো, তাহলে অধিকাংশ অনিষ্টকারিতা আদৌ প্রকাশ পেতোনা। সেসব প্রশ্নেরও উদ্ভব হতোনা, যেগুলো সম্পর্কে আপনি উদ্বিগ্ন।

আপনি যেসব বুযুর্গদের নাম উল্লেখ করেছেন এবং যাদের নাম উল্লেখ করেননি, তাদের মধ্যে যেসব বিষয়ে কঠোর মতপার্থক্য রয়েছে সেসব বিষয়ের অধিকাংশ ব্যাপারে আমিও একটি মত পোষণ করে থাকি। আমার এ মত অবশ্যই তাদের কারো মতের পক্ষে এবং কারো বিপক্ষে। তবে আমি সঠিককে সঠিক এবং ভুলকে ভুল বলেই খ্যান্ত হই। যাদের সাথে আমার মতবিরোধ রয়েছে তাদের ব্যাপারে আমি সীমা লংঘন করে কোনো হুকুম জারি করিনা। আমার বিতর্কের প্রক্রিয়াও এটা নয় যে, আমি বলবো, "আমার মতে অমুক ব্যক্তির অমুক কথায় এটা অনিবার্য হয় আর এটা কুফরী কিংবা ফাসিকী অথবা গোমরাহী। অতএব অমুক ব্যক্তি কাফির অথবা ফাসিক কিংবা গোমরাহ্ বা গোমরাহকারী!" এ ধরনের সমন জারী করাকে আমি সীমালংঘন মনে করি। কেননা আমাদের যুক্তির প্রেক্ষিতে যদি কারো কোনো কথায় একটি খারাপ কথা অনিবার্যরূপে সৃষ্টি হয়, তাহলে আমরা তাকে এ দোষ দিতে পারিনা যে, এ অনিবার্যতাও তার স্বেচ্ছাকৃত সৃষ্টি। এ কারণে তাকে সৃষ্টিকারী গণ্য করে তার উপর এমন হুকুম প্রয়োগ করা যা খারাপ কথা সৃষ্টিকারীর উপর প্রয়োগ করা যেতে পারে, কোনোক্রমেই বৈধ নয়। [তরজমানুল কুরআন, রজব-শাবান ১৩৭১, এপ্রিল-মে ১৯৫২]

শাফায়াতের সঠিক ধারণা

প্রশ্নঃ জনৈক মৌলবী সাহেব একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করেছেন। তাতে আপনার উপর খারিজী ও মু'তাযিলী হবার ফতোয়া লাগানো হয়েছে। এই ফতোয়ার ভিত্তি হলো, আপনি নাকি কিয়ামতের দিন রসূলুল্লাহর (স) পক্ষ থেকে উম্মতকে শাফায়াত করার কথা অস্বীকার করেন। এর সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে তরজমানুল কুরআনের ২৬ ভলিউমের ১ম-২য় সংখ্যার ৩০ পৃষ্ঠা থেকে। সেখানে 'যুদ্ধ করো আহলে কিতাবের সেই সব লোকদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহ ও

আখিরাতের দীনের উপর ঈমান আনেনি' আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছেঃ 'সেখানে কোনো প্রকার সুপারিশ প্রচেষ্টা, কোনো ফিদিয়া এবং কোনো বুযুর্গের সাথে সম্পর্কিত হওয়া কাজে লাগবে না।' এভাবে আপনার 'তাফহীমাত' গ্রন্থ থেকেও এই ধরনের বরাত দেয়া হয়েছে।

মেহেরবানী করে আপনি শাফায়াত সম্পর্কে আহলে সুন্নাতগণের আকীদা বর্ণনা করবেন। তাছাড়া রসূলুল্লাহ (স) কি হিসেবে তাঁর উম্মতের শাফায়াত করবেন? তিনি কি সকল উম্মতের জন্যে শাফায়াতকারী হবেন?

জবাবঃ *যারা অন্যের উপর ভ্রান্ত কথা চাপিয়ে দিয়ে সারা দুনিয়ায় তা ছড়িয়ে বেড়ায় এবং বক্তার বক্তব্যের আসল উদ্দেশ্য বিরোধ অর্থ করে বেড়ায় আল্লাহ তাআলা যেন তাদেরকে সুপথ দেখান। বিজ্ঞাপন প্রচারকারী বুযুর্গগণের দিলে সামান্য পরিমাণ খোদাভীতি থাকলে তাঁরা ইশতিহার ছাপার পূর্বে আমার কাছে লিখিতভাবে জিজ্ঞেস করতে পারতেন যে, তোমার এই বাক্যগুলোর অর্থ কি? এবং শাফায়াত সম্পর্কে তুমি কি আকীদা পোষণ করো? তাঁরা আমার যে বাক্যগুলোর বরাত দিয়েছেন, তন্মধ্যে একটি ইহুদী ও খৃষ্টানদের শাফায়াত সম্পর্কিত ভ্রান্ত আকীদার প্রতিবাদে লিখিত হয়েছে। এই ভ্রান্ত আকীদার কারণে কিভাবে আহলে কিতাবের লোকদের পরকালের প্রতি ঈমান বাতিল হয়ে গেছে, যার ফলে কুরআনে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে যে, তারা পরকালের প্রতি ঈমান রাখেনা, একথা বিবৃত করাই ছিলো সেই বাক্যটির আসল উদ্দেশ্য অন্য বাক্যটিতে রসূলুল্লাহ (স) তাঁর রিসালাতের শুরুতে মক্কায় মুশরিকদেরকে সম্বোধন করে যে সমস্ত শিক্ষামূলক বিষয় বর্ণনা করেছিলেন তার সংক্ষিপ্তসার বর্ণনা করা হয়েছে। উভয় বাক্যের কোথাও শাফায়াত সম্পর্কিত ইসলামের আকীদা বর্ণনা করার অবকাশ ছিলনা। কাফির ও মুশরিকদের শাফায়াতের কথা বর্ণনা প্রসংগে মু'মিনদের শাফায়াতের কথা কেমন করে বর্ণনা করা যেতে পারে? কাফির ও মুশরিকদের সম্পর্কে আমি যা কিছু লিখেছি তা কুরআনে এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ*

اِتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ـ (البقرة : ٤٨)

"ভয় করো সেই দিনকে, যেদিন কেউ কারো কোনো উপকারে আসবেনা, বিনিময় নিয়ে কাউকে ছেড়ে দেয়া হবেনা, সুপরিশ কোনো কাজে আসবেনা এবং অপরাধীরা কোনো সাহায্যও পাবেনা।" (বাকারাঃ ৪৮)

কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে শাফায়াত সম্পর্কিত ইসলামী আকীদা হলো, কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে সেই ব্যক্তিই শাফায়াত করতে পারবেন, যাকে এজন্যে আল্লাহ তাআলা অনুমতি দান করবেন এবং একমাত্র তার জন্যে করতে পারবেন যার জন্যে আল্লাহ অনুমতি দেবেন। এ প্রসংগে কুরআনের আয়াতগুলো দেখুনঃ

١- يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا -

১. "সেইদিন সুপারিশ কোনো কাজে আসবেনা তবে আল্লাহ যাকে অনুমতি দেন এবং যার জন্যে কথা শুনতে চান। [তোয়াহা–১০৯]

٢- لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ -

২. "সুপারিশ কোনো কাজে আসবেনা, তবে আল্লাহ যাকে অনুমতি দেন।" [সাবাঃ ২৩]

٣- مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ -

৩. "অনুমতি ছাড়া কে তার কাছে সুপারিশ করার সাহস রাখে?" [বাকারাঃ ২৫৫]

এই নীতি অনুযায়ী রসূলুল্লাহ (স) অবশ্যি আখিরাতে শাফায়াত করবেন। কিন্তু এ শাফায়াত তিনি আল্লাহর নির্দেশে করবেন। এবং সেই সকল ঈমানদারদের জন্যে করবেন যারা যথাসাধ্য সৎকর্ম করার প্রচেষ্টা চালানো সত্ত্বেও কিছু কিছু গুনাহ হয়ে গেছে। যারা জেনে–বুঝে খেয়ানত করে, অসৎ কর্ম, ব্যভিচার করে এবং কখনো আল্লাহকে ভয় করেনা, তারা রসূলুল্লাহর (স) শাফায়াত লাভের অধিকারী হবেনা। হাদীসে রসূলুল্লাহর (স) একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা উদ্ধৃত হয়েছে। সেখানে তিনি খেয়ানত যে কত বড় মারাত্মক অপরাধ সে সম্পর্কে বর্ণনা প্রসংগে বলেনঃ কিয়ামতের দিন এই খেয়ানতকারীরা খেয়ানতের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের বোঝা নিজেদের ঘাড়ে বহন করে আসবে এবং আমাকে ডেকে বলবে, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে সাহায্য করুন। কিন্তু আমি জবাবে বলবো, আমি তোমার জন্যে কিছুই করতে পারবোনা। আমি তো তোমার কাছে আল্লাহর পয়গাম পৌছিয়ে দিয়েছিলাম। (মিশকাতের 'কিসমাতুল গানায়মিল গুলনু ফীহা' অধ্যায় দেখুন।) [তরজমানুল কুরআন, নভেম্বর ১৯৫০]

নামাযের সুন্নত পন্থা

প্রশ্নঃ *ইতিপূর্বে আমি নামায পড়ার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত ছিলাম। কিন্তু আলহামদু লিল্লাহ, এখন আমি নামায পড়ছি। এ ব্যাপারে আমি বড়ই পেরেশানীতে আছি। যে পল্লীতে এখন আমি শিক্ষা লাভ করছি, সেখানকার*

অধিবাসীরা দেওবন্দী হানাফী। অন্যদিকে আমার গ্রামের লোকেরা আহলে হাদীস। এখন আমি আহলে হাদীসের পদ্ধতিতে নামায পড়লে এ পল্লীর লোকেরা আমাকে ওহাবী বলে টিট্‌কারী দেয়। ওদিকে আবার হানাফী পদ্ধতিতে নামায পড়লে আমার গ্রামের লোকেরা আমাকে মুকাল্লিদ বলে গালি দেয়। আপনার উপর আস্থা আছে বলেই এ ব্যাপারে আমি আপনার দ্বারস্থ হলাম। আমাকে সঠিক পথ-নির্দেশ দান করুন।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো একটি পদ্ধতিতেই নামায পড়েছেন। কিন্তু লোকেরা যে, বিভিন্ন পদ্ধতিতে নামায পড়ছে, ইসলামে এর স্থান কোথায়? আমি জানতে চাই কোন্ ফেরকা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদ্ধতিতে নামায পড়ছে? আর আমি কাদের পদ্ধতির অনুসারী হবো? আপনি কোন্ পদ্ধতিতে নামায পড়েন-আমি তাও জানতে চাই। এছাড়া আরেকটা প্রশ্ন হলো, গ্রামে জুমার নামায পড়া যায় কি?

জবাবঃ আহলে হাদীস, হানাফী, শাফেয়ী, মালিকী ও হাম্বলীগণ যেসব পদ্ধতিতে নামায পড়েন, তার সবগুলোই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত। তাদের প্রত্যেকেই নির্ভরযোগ্য হাদীস থেকে সেগুলো গ্রহণ করেছেন। এ জন্যই তাদের কোনো একটি দলের শ্রেষ্ঠ আলেমগণ কখনো একথা বলেননি যে, তাদের পদ্ধতি ছাড়া অন্য পদ্ধতিতে যারা নামায পড়ে তাদের নামায হয়না। এ ধরনের কথা বলা তো কেবল অজ্ঞ লোকদের কাজ। অজ্ঞ লোকেরাই তাদের পদ্ধতি ছাড়া অন্য পদ্ধতিতে কাউকে নামায পড়তে দেখলে তাকে দোষারোপ করে। এ ব্যাপারে আমরা গবেষণা অনুসন্ধান করে দেখেছি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন পদ্ধতিতে নামায পড়েছেন। তবে মতভেদ হতে পারে এ ব্যাপারটি নিয়ে যে, তিনি সাধারণত কোন্ পদ্ধতিতে নামায পড়তেন? যে দলের কাছে যে পদ্ধতিটা তাঁর সাধারণ পদ্ধতি বলে প্রমাণিত হয়েছে, সে দল সেই পদ্ধতিটাই অবলম্বন করেছে।

আমি নিজে হানাফী পদ্ধতিতে নামায পড়ি। কিন্তু আহলে হাদীস, হানাফী, মালিকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী সবার নামাযকে সহীহ ও সঠিক মনে করি। এদের সবার পেছনে আমি নামায পড়ে থাকি।

গ্রামে জুমার নামায পড়ার ব্যাপারটি চরম বিতর্কমূলক। হানাফীরা এটা জায়েয মনে করে। আহলে হাদীসরাও জায়েয মনে করে। আর অন্যান্য ফকীহগণ এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত পোষণ করেন। এ ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত জবাব বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবে। তাই বিস্তারিত জানার জন্য এ ব্যাপারে আমার 'তাফহীমাত' (নির্বাচিত রচনাবলী) ২য় খন্ড দেখুন। [তরজমানুল কুরআন, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৫১]

৫

সাধারণ বিষয়

আল্লাহর অস্তিত্বের জ্ঞান

প্রশ্নঃ কিছুদিন পূর্বে এক বন্ধুর সাথে আমার বিতর্ক হয়েছিল। প্রশ্ন ছিল, আল্লাহ্ আছে কি নেই? থাকলে কোথা থেকে এসেছে? আমাদের একজনেরও এ ব্যাপারে কোনো জ্ঞান ছিল না। তবুও প্রশ্নের প্রথম অংশ সম্পর্কে আমি বন্ধুকে নিশ্চিত করতে পেরেছি। দ্বিতীয় অংশটির কোনো জবাব দিতে পারিনি। কাজেই এ প্রশ্নটি এখন আমাকেই পেরেশান করে তুলেছে।

রসূলুল্লাহকেও (স) এ প্রশ্ন করা হয়েছিল বলে একটি বইয়ে পড়েছি। এর জবাবে তিনি বলেছিলেনঃ কতকগুলো কথা মানুষের চিন্তা ও অনুভবের উর্ধ্বে। এ প্রশ্নটিও তার অন্তর্ভুক্ত। রসূলুল্লাহর (স) এ বাণীর মাধ্যমে মানসিক নিশ্চিন্ততা লাভ করার জন্যে আমি অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু সফল হতে পারিনি। অনুগ্রহ করে আপনি আমাকে সাহায্য করুন।

আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, মানুষকে যথার্থ মানুষে পরিণত হতে হলে কোন্ নীতি অবলম্বন করতে হবে?

জবাবঃ যে প্রশ্ন আপনার মনকে অস্থির করে তুলেছে তার সামাধান তো কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। তবে যে কারণে আপনার অস্থিরতা তার সমাধান দেয়া অবশ্যি সম্ভব। এ জাতীয় বিষয় নিয়ে চিন্তা করার পুর্বে আপনি নিজের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতাকে (Limitation) ভালোভাবে বুঝে নিন। যখন বুঝতে পারবেন যে, মানুষের কি কি জানা সম্ভব আর কি কি জানা সম্ভব নয়, তখনই আপনি সেসব জিনিস জানতে চেষ্টা করা থেকে বিরত থাকবেন, যেগুলো মানুষের পক্ষে জানা অসম্ভব। আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে বড়জোর যতটুকু জানা মানুষের আয়ত্তের মধ্যে, তা হচ্ছে, বিশ্বজাহানের যাবতীয় বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করে মানুষ এই "সিদ্ধান্তে" পৌছতে পারে যে, আল্লাহ্ আছেন এবং তাঁর কার্যাবলী একথা প্রমাণ করে যে, তাঁর মধ্যে এই সমস্ত গুণের সমাবেশ হওয়া উচিত। এ "সিদ্ধান্ত"ও পূর্ণ জ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত নয় বরং নিছক একটি যুক্তিসংগত অনুমান ও শক্তিশালী ধারণার পর্যায়ভুক্ত। যে বস্তুটি এই অনুমান ও ধারণাকে শক্তিশালী করে তা হচ্ছে নিশ্চিত বিশ্বাস ও ঈমান। কিন্তু একে "পূর্ণজ্ঞানের" পর্যায়ে উন্নীত করার মতো কোনো মাধ্যম আমাদের কাছে নেই। এখন আপনি নিজেই চিন্তা করুন, তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কেই যখন আমরা পূর্ণ জ্ঞানের দাবী করতে পারিনা, তখন তাঁর সত্যিকার রূপ সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান আমরা কিভাবে লাভ করতে পারি? আল্লাহর সত্তা তো বিরাট বস্তু আমার তো এই দুনিয়ার "জীবনের" তাৎপর্য এবং এর উৎস (Origin) সম্পর্কেই বেখবর। এই শক্তির (Energy) কথাই ধরুন, যে সম্পর্কে আমাদের বিজ্ঞানীরা বলেন যে, এটিই বস্তুর (Matter) রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং এ থেকেই এই

বিশ্বজাহান অস্তিত্ব লাভ করেছে। কিন্তু এর তাৎপর্য আমরা জানিনা, এর উৎসও আমাদের অজ্ঞাত এবং কিভাবে এটি বস্তুর বিচিত্র রূপ পরিগ্রহ করেছে তাও আমাদের দৃষ্টি ও চিন্তা–সীমা বহির্ভূত। এই জাতীয় ব্যাপারে "কেন" ও "কেমন করে" প্রশ্ন উত্থাপন করে চিন্তা–গবেষণা করা নিজের মন–মস্তিষ্ককে এমন কাজে নিয়োজিত করার সমান যা সম্পাদন করার শক্তি ও মাধ্যম তার নিকট নেই। এই জাতীয় চিন্তা–গবেষণা মানুষকে ইতিপূর্বে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি এবং আজ আপনাকেও পৌঁছাতে পারবেনা। এর ফলে বিস্ময় বৃদ্ধি ছাড়া আর কোনো লাভ হয়না বরং এর পরিবর্তে আপনার জীবনের সাথে যে সমস্ত প্রশ্নের সম্পর্ক এবং যেগুলোর সমাধান সম্ভবপর সেগুলো সম্পর্কে চিন্তা–গবেষণা করুন আল্লাহ্ আছে কি নেই, থাকলে তাঁর গুণাবলী কি এবং আমাদের সাথে তাঁর সম্পর্ক কোন্ পর্যায়ের? এ প্রশ্নগুলো অবশ্যি আমাদের জীবনের সাথে সম্পর্ক রাখে এ ব্যাপারে কোনো না কোনো মতাবলম্বী হওয়া অপরিহার্য। কারণ এ ছাড়া আমরা নিজেরাই নিজেদের পথ নির্ণয় করতে সক্ষম হবোনা। তাছাড়া এ সম্পর্কে কোনো একটি মত প্রতিষ্ঠার জন্যে আমাদের কাছে যথেষ্ট মাধ্যমও আছে। কিন্তু আল্লাহ্ "কোথা থেকে এসেছেন?" –এ প্রশ্নের সাথে আমাদের জীবন সমস্যার কোনো সম্পর্ক নেই এবং এ সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছার মাধ্যমও আমাদের হাতে নেই।

আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে মানুষকে সত্যিকার মানুষে পরিণত হতে হলে কোন্ নীতিতে অগ্রসর হতে হবে? একটি পত্রে এ প্রশ্নের জবাব দান সম্ভবপর নয়। আমার বিভিন্ন বইতে এর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আমি বিস্তারিতভাবে লিখেছি। আপনি সেগুলো পড়ে নিন। বিশেষ করে এজন্যে আমার 'শান্তিপথ' 'ইসলাম ও জাহিলিয়াত', 'ইসলামের নৈতিক দৃষ্টিকোণ' এবং 'একমাত্র ধর্ম' বইগুলো অধ্যয়ন করুন। উপরন্তু 'ইসলাম পরিচিতি' থেকেও এ ব্যাপারে যথেষ্ট পথ নির্দেশিকা লাভ করতে পারেন। [তরজমানুল কুরআন, অক্টোবর ১৯৫০]

ঈমান ও কর্মের সম্পর্ক

প্রশ্নঃ ঈমান সৎকর্মের অংশ কিনা, এ সম্পর্কে পূর্ববর্তী ইমামগণের মধ্যে বিরাট মতভেদ রয়েছে। আমি কুরআন, হাদীস ও সীরাত গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করেছি। ইমামগণের বক্তব্য ও যুক্তি–প্রমাণও যথাসাধ্য পাঠ করেছি। এ ব্যাপারে আমার শিক্ষক এবং বুযুর্গদের সাথেও আলোচনা করেছি। কিন্তু এ প্রশ্নটির সন্তোষজনক জবাব লাভ করতে সক্ষম হইনি। আমি জানি, কতিপয়

ব্যক্তি নিছক মতভেদকে উস্কানি দেবার জন্যে এ প্রসংগ উত্থাপন করে। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য নিছক অনুসন্ধান ও মানসিক সন্তোষ লাভ ছাড়া আর কিছুই নয়।

জবাবঃ ঈমান ও কর্মের সম্পর্কের আলোচনাকে অনর্থক জটিল করে তোলা হয়েছে, নয়তো কথা একেবারে পরিষ্কার। এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা (র) একদিকে অগ্রসর হয়েছেন। এ দিকটি যথার্থই ন্যায়-সংগত ও নির্ভুল। কিন্তু আপত্তিকারীরা ঐ দিকটি উপেক্ষা করে অন্যদিক থেকে তাঁর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করেছেন। অনুরূপভাবে ইমাম বুখারী (র) এবং আরো অনেকে অন্যদিকে অগ্রসর হয়েছেন। এ দিকটিও নির্ভুল ও ন্যায়-সংগত। কিন্তু প্রতিবাদকারীরা অন্যদিক থেকে তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করে দিয়েছেন।

আসলে ঈমান আন্তরিক সাক্ষ্য ও মানসিক স্বীকৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়। এ শব্দটির অর্থের মধ্যে কর্ম প্রকাশ্যে শামিল নেই। আপনি নিজেই চিন্তা করুন, যখন কোনো ব্যক্তি বলেঃ আমি অমুক কথা মেনে নিয়েছি অথবা আমি অমুক কথা সমর্থন করি অথবা আমি অমুক কথার সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছি, তখন শ্রোতা এ বাক্যগুলোর কি অর্থ গ্রহণ করে? শ্রোতা কি মনে করে যে, এটা নিছক একটা আকীদা ও চিন্তার প্রকাশ? নাকি এর সাথে কোনো কর্মেরও যোগ আছে? বলা বাহুল্য, এ শব্দগুলো নিছক আকীদা ও চিন্তা প্রকাশ করার জন্যে বলা হয় এবং শ্রোতা এ শব্দগুলো শুনে কেবল এতটুকুই মনে করে যে, এ ব্যক্তির চিন্তাক্ষেত্রে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। কুরআন ও হাদীস থেকেও ঈমানের এই তাৎপর্য জানা যায়।

آمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ
الْمُؤْمِنُوْنَ - (البقرة : ٢٨٥)

"রসূল সেই জিনিসের উপর ঈমান এনেছে, যা তার প্রতি তার রবের পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে এবং মু'মিনরাও ঈমান এনেছে।" এ আয়াতটির ব্যাখ্যায় আল্লাহ তাআলা নিজেই বলেনঃ

كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ
لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ وَقَالُوْا سَمِعْنَا
وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ - (البقرة : ٢٨٥)

"সবাই ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাদের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর, তাঁর রসূলগণের উপর, (তারা বললোঃ) আমরা তাঁর

রসূলদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করিনা। এবং তারা বললোঃ আমরা শুনেছি ও আনুগত্য করেছি। হে আমাদের রব, আমরা তোমার মাগফিরাত চাই এবং তোমারই দিকে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।"

এই ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে মেনে নেয়া ও সমর্থক হওয়া ছাড়া ঈমানের আর কোনো তাৎপর্য নেই। উপরন্তু হযরত জিব্রীলের "ফাখ্বিরনী আনিল ঈমান" প্রশ্নের জবাবে রসূলুল্লাহ (স) বলেন, "আন তু'মিনা বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহী ওয়া রুসূলিহি ওয়াল ইয়াওমিল আখিরি ও তু'মিনা বিল কাদরি খায়রিহি ওয়া শাররিহি।"

নবীর (স) এ ব্যাখ্যাও ঈমানের অর্থ নিছক 'মেনে নেয়া' পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। এ কারণেই এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, কোনো ব্যক্তি ইসলামের কালেমা পড়ার পর অকস্মাৎ কোনো দুর্ঘটনায় পড়ে নামায পড়ার বা রোযা রাখার বা ইসলামের অন্য কোনো প্রকার কাজ করার আগে মৃত্যুমুখে পতিত হলে মু'মিন হিসেবেই মরবে, কাফির হিসেবে নয়।

এ গেলো এবিষয়টির একটি দিক, এর যথার্থতা সম্পর্কে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারেনা। এবার দ্বিতীয় দিকটিতে আসুন। যখন কোনো ব্যাক্তি বলেঃ আমি অমুক কথা মেনে নিয়েছি, তখন আপনি স্বভাবতই আশা করেন যে, এবার তার কর্মে ও ব্যবহারে ঐ স্বীকৃতির চিহ্ন ও ফল প্রকাশিত হবে। প্রত্যেক ব্যক্তির বিবেক-বুদ্ধি দাবী করে যে, কোনো কথাকে স্বীকার করার পর স্বীকারকারীর কাজে ও ব্যবহারে ঐ স্বীকৃতির অনিবার্য ফল ও বাস্তবচিত্র পরিস্ফুট হতে হবে। এমনকি যদি তা পরিস্ফুট না হয় বা এমন কোনো আলামত দেখা যায়, যা মূলতঃ অস্বীকৃতির আলামত বলে বিবেচিত হতে পারে, তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তি এ কথাই মনে করবে যে, এ ব্যক্তি যে কথা স্বীকার করার দাবী করছে আসলে সে তা স্বীকার করেনি। ব্যাপারটি কেবল এতটুকু নয়, বরং এটি একটি স্বীকৃত সত্য যে, দুনিয়ায় কোনো কথা স্বীকার করার ও স্বীকার করবার জন্য যে সমস্ত কাজ করা হয়, সেগুলোর উদ্দেশ্য নিছক মেনে নেয়া বা স্বীকার করানো হয়না বরং স্বীকৃতি দানকারীর কোনো কথার স্বীকৃতি প্রদান করার পেছনে এ উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল থাকে যে, স্বীকারকারী এই স্বীকৃতির দাবী পূরণ করবে। অন্যদিকে স্বীকারকারী যখন স্বীকৃতি দেয়, তখন প্রত্যেক বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এর এ অর্থই গ্রহণ করে যে, এবার এ ব্যক্তি এ স্বীকৃতির দাবী পূরণ করতে চায়। যেমন, যদি আপনি কোনো ব্যক্তির মুখ থেকে মদের অনিষ্টকারিতার স্বীকৃতি আদায় করার চেষ্টা করেন, তাহলে তাকে কার্যত মদ্যপান থেকে বিরত রাখাই হয় এর উদ্দেশ্য, নিছক অনিষ্টকারিতার মৌখিক স্বীকৃতি আদায় করা এর উদ্দেশ্য হয়না। উপরন্তু যখনই সে স্বীকার করে যে, মদ অবশ্যি একটি অনিষ্টকর বস্তু, তখন প্রত্যেক শ্রোতাই

একথা মনে করে এবং তার নিকট আশা করে যে, সে মদ্যপান ত্যাগ করবে। এমনকি এ স্বীকৃতির পর যদি কোনো ব্যক্তি তাকে মদ্যপান করতে দেখে, তাহলে সে সংগে সংগেই এই মত পোষণ করবে যে, ঐ ব্যক্তি তার স্বীকৃতি পরিহার করেছে। আল্লাহর দীনের ব্যাপারেও এই একই কথা। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল মানুষের কাছ থেকে কতিপয় সত্যের স্বীকৃতি আদায় করার যে চেষ্টা করেছেন নিছক মানুষের মেনে নেয়াই তার উদ্দেশ্য নয় বরং এই সত্যকে স্বীকার করার অবশ্যম্ভাবী ফল ও নিদর্শনসমূহ তাদের স্বভাব, চরিত্র, কর্ম, আচার-ব্যবহার এবং সমগ্র ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনে পরিস্ফুট করাও এর অপরিহার্য উদ্দেশ্য। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর পবিত্র কালামে এবং রসূলুল্লাহ্ (স) তাঁর হাদীসমূহে এই নিদর্শন ও ফলসমূহকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণনা করেছেন। এগুলো ঈমানের দাওয়াতের উদ্দেশ্য ও জীবনের অপরিহার্য অংশ। অতপর তিনি কেবল ঐ কাংখিত নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হননি বরং অনেক নিদর্শন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, যেসব লোকের মধ্যে এগুলোর প্রকাশ না হয় অথবা এগুলোর বিপরীতধর্মী নিদর্শন দেখা যায় তারা মু'মিন নয়। কুরআন ও হাদীসে এগুলোর অসংখ্য দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হয়েছে। কোনো জ্ঞানী এ সম্পর্কে অজ্ঞ নন এগুলোর প্রতি দৃকপাত করলে পরিষ্কার জানা যায় যে, ঈমান ও কর্মের মধ্যে একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। এ কথাটিকে যদি শাব্দিক দিক দিয়ে এভাবে ব্যাখ্যা করা হয় যে, "কর্ম ঈমানের অংগ", তাহলে হয়তো তা নির্ভুল হবেনা, কিন্তু কর্ম যে ঈমানের অবশ্যম্ভাবী নিদর্শন তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

নিঃসন্দেহে সতর্ক ফকীহগণ নিছক কোনো মুসলমানকে কর্ম পরিত্যাগ করার কারণে তার মধ্যে কুফরীর কোনো সুস্পষ্ট আলামত না থাকলে কাফির বলা থেকে বিরত থেকেছেন। কিন্তু আসলে এর কারণ হলো, কোনো ইসলামের দাওয়াত দানকারী যদি কর্মবিমুখ হয় (অর্থাৎ কার্যত যদি অনৈসলামী জীবন যাপন করে), তাহলে যেভাবে তার দিল্ ঈমানশূন্য থাকার সম্ভাবনা থাকে, অনুরূপভাবে তার চরিত্রের মধ্যেও থাকে এ প্রকাশের সম্ভাবনা। সুস্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া এই দুটি সম্ভাবনার মধ্য থেকে কোনো একটিকে নির্ধারিত করা কোনো বাহ্য দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই নিছক কর্মবিমুখতার কারণে কুফরী ফতোয়া দেয়া সতর্কতা বিরোধী কাজ। তবে আল্লাহ্ তাআলা মানুষের মনের মধ্যে যা কিছু আছে তার জ্ঞান রাখেন। কার মধ্যে ঈমানশূন্যতার কারণে কর্মবিমুখতার সৃষ্টি হয়েছে এবং কার কর্মবিমুখতা দুর্বল চরিত্র বা গাফলতির ফল, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। যে ব্যক্তির মধ্যে আসল ঈমানহীনতার কারণে কর্মবিমুখতার সৃষ্টি হয়েছে, সে অবশ্যি কাফির হবে, কিন্তু একথা জানা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার কাজ, যিনি সমগ্র অদৃশ্য বস্তু-বিষয়ের

জ্ঞান রাখেন। দুনিয়ার মুফতীরা একথা জানতে পারেননা। তবে এ ধরনের সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্যে যদি কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকে, তাহলে সেটা স্বতন্ত্র কথা।

এই হচ্ছে এ বিষয়ের আসল স্বরূপ। যারা এই আসল সত্যটি উপলব্ধি করতে পারেননি, তারা অদ্ভুত ধরনের বাড়াবাড়ি করছেন। অনেকে কর্মহীন মুসলমানদেরকে নিঃসন্দেহে কাফির আখ্যা দেন। অথচ কর্মহীনতার অন্যান্য কারণও হতে পারে এবং ঐ কারণগুলোর সম্ভাবনাই অধিকতর সুনিশ্চিত। আবার অনেকে সকল কর্মহীন মুসলমানকে কেবল ঈমানের নয় বরং জান্নাতের সুসংবাদও দান করেন। অথচ এটি প্রকাশ্যে গুনাহে উৎসাহদানের নামান্তর। প্রত্যেক খোদাভীরু মুসলমানকে খোদার সম্মুখে এ কাজের জবাবদিহির ভয় করা উচিত। [তরজমানুল কুরআন, ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩]

এক যুবকের প্রশ্ন

প্রশ্নঃ

১. আমাদের ইবাদত ক্রটিমুক্ত হচ্ছে কিনা এবং তা কবুল হচ্ছে কিনা, একথা আমরা কেমন করে জানতে পারি? কুরআন ও হাদীসের কোনো কোনো বাণী থেকে মনে নৈরাশ্যের সঞ্চার হয়। যেমন বলা হয়েছে যে, অনেক লোক নিজেদের নামায থেকে রুকূ ও সিজদা ছাড়া আর কিছুই পায়না বা যে ব্যক্তি নিজেকে আবেদ মনে করা হয় বলে আনন্দিত হয়, তার ইবাদত কেবল নষ্টই হয়ে যায়নি বরং তা শির্ক হিসেবে বিবেচিত হবে। এধরনের আরো বিভিন্ন সতর্কবাণীতে ইবাদত ব্যর্থ হবার ও শাস্তিদানের সংবাদ শুনানো হয়েছে। এগুলো সামনে রাখলে মন হতাশায় ভরে ওঠে।

যদি কোনো ব্যক্তি নিজের ইবাদতকে জানা দোষ-ক্রটি থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে এবং নিজের জানা মতে মুক্ত করেই নেয়, তারপরও তার ইবাদতে এমন কিছু ক্রটি থেকে যাবার আশংকা থাকে , যা সে কোনোক্রমেই জানতে পারেনা এবং এই ক্রটিই তার ইবাদতকে অর্থহীন করে দেয়। -ইসলাম এতই নাযুক প্রকৃতির যে, মানুষ হিসেবে তার দাবী পূর্ণ করা অসম্ভব মনে হয়।

২. তাওয়াজ্জুহ ও একগ্রতার অভাব কি নামাযকে অর্থহীন করে? নামাযকে কিভাবে এ অভাব থেকে মুক্ত করা যায়?

আরবী ভাষা না জানার কারণে নামাযে মনোযোগও একাগ্রতা সৃষ্টি হয়না এবং না হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ আমরা চিন্তা করি এক ভাষায় এবং নামায

পড়ি অন্য ভাষায়। আয়াতের অর্থ বুঝে নিলেও মন নিজের ভাষায় চিন্তা করা থেকে বিরত হয়না।

৩. আল্লাহর পক্ষ থেকে কেবল সেসব কর্মেরই প্রতিদানের ওয়াদা করা হয়েছে, যেগুলোর লক্ষ্য তাঁকে খুশী করা এবং যেগুলো এ লক্ষ্যকে কেন্দ্র করেই সম্পাদিত হয়। যেমন কারুর দারিদ্র ও অসহায়তার প্রতি করুণা করে যদি আমি তাকে সাহায্য করি এবং সাহায্য করার ব্যাপারে তার উপকার করেছি বলে তাকে আমার নিকট ঋণী মনে না করি, অথবা এর প্রতিদান স্বরূপ তার দ্বারা ভবিষ্যতে কোনো কাজ না করার বা কিছু প্রতিদান না নেবার চিন্তা করি এবং একমাত্র আল্লাহর জন্যই তাকে সাহায্য করি, তাহলে এও কি শিরকের পর্যায়ভুক্ত হবে? কারণ আমার মনের দয়ার্দ্র অনুভূতিই সর্বপ্রথম এ ব্যক্তিকে সাহায্য করার ব্যাপারে প্রেরণা যোগায়। যেমন আপনার মতে জাতির সেবার ক্ষেত্রে কোথাও জাতীয়তাবাদের রং সৃষ্টি হলে তা আর ইবাদতের পর্যায়ভুক্ত থাকেনা।

৪. আপনার 'পর্দা ও ইসলাম' বইটি পড়ে অনেক প্রশ্নের জবাব পেয়েছি। কিন্তু অনেক জটিল প্রশ্নের মীমাংসা পাওয়া যায়নি।

বর্তমান অবস্থা ও অর্থনৈতিক উপায়-উপকরণ যে ব্যক্তিকে বিবাহ করার অনুমতি দেয়না, সে এযুগে কিভাবে নিষ্কলুষ জীবন-যাপন করতে পারে? যে কোনো ব্যক্তির সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করে আমি এর নেতিবাচক জবাব পেয়েছি। আধুনিকতার বিষজর্জরিত পরিবেশে চক্ষু ও কর্ণ নিয়ন্ত্রণের দাবীকে কার্যকরী করা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলে মনে হয়। কোথায় দৃষ্টি আনত করবেন আর কোথায় কানে অংগুলি দেবেন? আবার কুচিন্তার আগমন রোধ করবেন কেমন করে? আমরা নিজেদের চিন্তার আগমন-প্রত্যাগমনের উপর কোনো প্রকার কর্তৃত্ব রাখিনা। আর যদি কর্তৃত্ব রাখার চেষ্টা করি, তাহলে এক প্রকার মানসিক বিশৃংখলা ছাড়া আর কিছুই অর্জিত হয়না। এটি আরো বেশী ক্ষতিকর। আত্মসংযম একমাত্র তার উপযোগী পরিবেশেই কার্যকরী ও উপকারী হতে পারে। কিন্তু যে পরিবেশের চতুর্দিক উত্তেজনা সৃষ্টির উপকরণে পরিপূর্ণ, সেখানে নিজের সাথে যুদ্ধ করা নিজের ব্যক্তিত্বকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়ার সমান। এক ব্যক্তি চলতি বছর চিকিৎসা শাস্ত্রে ডাঃ ডিগ্রী লাভ করবেন। তিনি বলেন, এ পরিবেশে যেহেতু বিবাহ করার সুযোগ নেই তাই একমাত্র স্বাভাবিক পদ্ধতিতে যৌন পরিতৃপ্তি লাভ করেই মানসিক বিশৃংখলা ও আত্ম-অমর্যাদর হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা যেতে পারে। মনস্তাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞগণও এই মতবাদের ধারক।

দয়া করে বলবেন কি অক্ষম অবস্থায় উপরোক্ত মতকে কার্যকরী করা কোন্ পর্যায়ের গুনাহ? আর যদি পুরোপুরি গুনাহ হয়ে থাকে, তাহলে ঐ অবস্থায়

যুক্তিসংগত ও উপযোগী নির্ভুল পন্থা কি হবে? আশা করি, মানুষের মনস্তাত্বিক অবস্থাকে সম্মুখে রেখেই আপনি এ বিষয়গুলোর উপর আলোকপাত করবেন।

জবাবঃ *১. ইসলাম নিঃসন্দেহে অত্যন্ত নাযুক প্রকৃতির। কিন্তু আল্লাহ তাআলা কোনো মানুষের উপর তার সামর্থের বেশী দায়িত্ব অর্পণ করেননা। কুরআন ও হাদীসে যে বস্তুগুলো সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তা ইবাদতকে বাতিল ও ওজনহীন করে দেয়, ইবাদতকে কঠিন কাজে পরিণত করা সেগুলোর উল্লেখের উদ্দেশ্য নয়। বরং মানুষকে ঐ দোষগুলো সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়াই এর উদ্দেশ্য। এর ফলে মানুষ ঐ ক্রটিগুলো থেকে তার ইবাদতকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করবে এবং ইবাদতের মধ্যে সত্যিকার প্রাণ সঞ্চার করার প্রতি লক্ষ্য দেবে। কারণ এই প্রাণ সঞ্চার করাই ইবাদতের মূল লক্ষ্য। ইবাদতের আসল প্রাণ হচ্ছে– আল্লাহর সাথে সম্পর্ক, একমাত্র আল্লাহর জন্যে ইবাদত করা, তাকওয়া ও ইহ্সান। ইবাদতের মধ্যে এই প্রাণ সঞ্চার করার চেষ্টা করুন। প্রদর্শনেচ্ছা, ফাসিকী ও সজ্ঞানে নাফরমানী করা থেকে বিরত থাকুন। এ সমস্ত বিষয় বিচার পর্যালোচনার দায়িত্ব আপনার নফ্স ও বিবেকের উপর। আপনার নফ্স ও বিবেক আপনাকে জানিয়ে দিতে সক্ষম হবে যে, আপনার নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও তাঁর আনুগত্য করার প্রবণতার পরিমাণ কত এবং ঐ ইবাদতগুলোকে আপনি ফাসিকী, প্রদর্শনেচ্ছা ও গুনাহ্ থেকে কতটা মুক্ত রাখতে পারছেন? আপনি নিজে যদি এই বিচার পর্যালোচনা করতে থাকেন, তাহলে ইনশাআল্লাহ্ আপনার ইবাদতসমূহ পর্যায়ক্রমে নির্ভেজাল ও নিখাদ হতে থাকবে এবং তা যে হারে নির্ভেজাল ও নিখাদ হতে থাকবে ঠিক সেই হারেই আপনার নফ্স ও বিবেক নিশ্চিন্ত হতে থাকবে। শুরুতে যে সমস্ত ক্রটি দেখা যাবে সেগুলোর ফলে ইবাদত ত্যাগ করে আপনাকে নিরাশ হয়ে বসে পড়লে চলবেনা বরং ইবাদতকে নির্ভেজাল করার জন্যে আপনাকে অনবরত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সাবধান থাকবেন, ইবাদতের মধ্যে ক্রটি দেখা দেবার ফলে যে নৈরাশ্যের সঞ্চার হয় তা আসলে শয়তানের প্ররোচনা। আপনাকে ইবাদত থেকে বিরত রাখার জন্যে শয়তান এভাবে আপনাকে প্ররোচিত করে। শয়তান তার এই গোপন অস্ত্রের সাহায্যে সদাচারী ব্যক্তিদেরকে প্রতারিত করার চেষ্টা করে। কিন্তু এই সব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ইবাদত কবুল হচ্ছে কিনা একথা জানার সাধ্য কোনো মানুষের নেই। আপনি যাঁর ইবাদত করছেন এবং যিনি আমার ও আপনার ইবাদত কবুল করার ক্ষমতা রাখেন একমাত্র তিনিই একথা জানতে ও এর ফায়সালা করতে পারেন। প্রতি মুহূর্তে তাঁর ক্রোধের ভয় করুন এবং তাঁর করুণার আশা করুন। আশা ও ভীতির মধ্যস্থলে মু'মিনের স্থান। ভীতি তাকে অপেক্ষাকৃত উত্তম বন্দেগী অনুষ্ঠানে বাধ্য করে*

আর আশা তাকে সান্ত্বনা দেয় যে, তার প্রভু কারুর পরিশ্রম ও প্রতিদান নষ্ট করেননা।

২. তাওয়াজ্জুহ ও চিত্তের একাগ্রতার অভাব নামাযকে অবশ্যি ত্রুটিযুক্ত করে, কিন্তু সজ্ঞানে যে একাগ্রতার অভাব সৃষ্টি হয় এবং অজ্ঞাতে যে একাগ্রতার অভাব সৃষ্টি হয় তার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। অজ্ঞাতে যে একাগ্রতার অভাব সৃষ্টি হয় তার জন্যে কোনো জবাবদিহি করতে হবেনা। তবে এখানে শর্ত হলো, নামাযের মধ্যে মনুষ যখনই কোনো প্রকার একাগ্রতার অভাব অনুভব করবে, তখনই তাকে আল্লাহর দিকে একাগ্র হবার চেষ্টা করতে হবে এবং এ ব্যাপারে গাফিলতি দেখালে চলবে না। আর সজ্ঞানে একাগ্রতার অভাব সৃষ্টি হলে, অনিচ্ছা সহকারে নামায পড়লে এবং নামাযের মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য কথা চিন্তা করলে নিঃসন্দেহে নামায ব্যর্থ হয়ে যাবে।

আরবী ভাষা না জানার কারণে যে একাগ্রতার অভাব সৃষ্টি হয়, তার ক্ষতি পূরণ করার জন্যে নামাযে যে সমস্ত দোয়া ও আয়াত পড়া হয়, সেগুলোর অর্থ যথাসাধ্য কণ্ঠস্থ করুন। এরপরও যে কমতি থেকে যাবে তার জন্য আপনাকে আল্লাহর নিকট দায়ী হতে হবেনা। কারণ আপনি আল্লাহ ও রসূলের হুকুম তামিল করছেন। আল্লাহ ও তাঁর রসূল যদি আপনাকে নিজের ভাষায় নামায পড়ার হুকুম দিতেন, কিন্তু এতদসত্ত্বেও আপনি আরবী ভাষায় নামায পড়তেন, তাহলে এ একাগ্রতার অভাবের জন্যে আপনাকে দায়ী করা যেতো।

৩. আপনার তৃতীয় প্রশ্নটি সুস্পষ্ট নয়। কারুর অসহায়তা ও দারিদ্রের প্রতি করুণাবশত যদি আপনি একমাত্র আল্লাহর জন্যে তাকে সাহায্য করে থাকেন, তাহলে এ কর্মটি অবশ্যি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যেই সম্পাদিত হবে। এর শিরকের পর্যায়ভুক্ত হবার কারণ কি? এটি কেমন করে আমার বক্তব্য বিরোধী হতে পারে? আপনার হৃদয়ের করুণা মিশ্রিত আবেগে আপনি যে কাজ করেছেন তা আল্লাহর প্রিয় কাজ এবং আল্লাহ পছন্দ করবেন বলেই তা করেছেন। অনুরূপভাবে আল্লাহর পছন্দনীয় পদ্ধতিতে আপনি যদি জাতির কোনো খেদমত করে থাকেন এবং আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে করে থাকেন, তাহলে তা হবে ইবাদতের পর্যায়ভুক্ত। জাতির জন্যে এমন কাজ করা যা আল্লাহ পছন্দ করেননা এবং এমন পদ্ধতিতে করা যা আল্লাহ প্রদত্ত পদ্ধতির বিরোধী, আমি তারই বিরোধিতা করি।

৪. আপনার এ প্রশ্নটি সেই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোর কারণে আমরা বর্তমান পংকিল পরিবেশের বিরুদ্ধে সামগ্রিক চেষ্টা-সংগ্রাম চালিয়ে যাবার প্রয়োজনের উপর বছরের পর বছর থেকে জোর দিয়ে আসছি। নিঃসন্দেহে বর্তমান পরিবেশে এক ব্যক্তির পক্ষে নিষ্কলুষ-নিষ্কলংক থাকা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু এই পরিবেশের দোষ-ত্রুটির অজুহাতে ব্যক্তি নিজের জন্যে

নৈতিক অপরাধের বৈধতার পথ বের করতে থাকবে, এটিও সমস্যার সমাধান নয়। বরং এর যথার্থ সমাধান হলো, আপনার মধ্যে এই পরিবেশের পংকিলতার অনুভূতি যত অধিক জাগবে তত অধিক দৃঢ়তার সাথে আপনাকে তার পরিবর্তনের জন্যে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এই প্রচেষ্টা চালানোকালে একজন যুবক পংকিল পরিবেশের যে সমস্ত বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয় সেগুলো দূর করার পদ্ধতি হলো, যে সমস্ত উত্তেজনা সৃষ্টিকারী বস্তু থেকে আপনি নিজেকে বাঁচাতে পারেন, সেগুলো থেকে বাঁচুন। যেমন, উলংগ ও নৈতিকতা বিরোধী চিত্র, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, বেপর্দা মেয়েদের দিকে সেচ্ছাকৃতভাবে তাকিয়ে থাকা বা তাদের সাথে উঠাবসা করা প্রভৃতি থেকে নিজেকে বাঁচাতে হবে। এরপরও যে সমস্ত অপ্রীতিকর অনিবার্য প্রবণতা অবশিষ্ট থেকে যায় সেগুলো এত বেশী উত্তেজনা সৃষ্টিকারী থাকেনা, যার ফলে আপনার তাকওয়ার বাঁধন ছিন্ন করতে উদ্যত হবার মতো পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে। আপনার যে ডাক্তার বন্ধু ও মনস্তত্ত্ব বিশেষজ্ঞদের কথা বলেছেন তাঁরা আসলে মানব-সভ্যতায় নৈতিকতার জন্যে যিনার বিপুল অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে অনবগত। তাঁরা যিনার অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে অবগত থাকলে কোনো ব্যক্তিকে সমাজের বিরুদ্ধে নিছক নিজের প্রবৃত্তির ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যে এতবড় মারাত্মক অপরাধ অনুষ্ঠানের পরামর্শ দিতেননা। তাঁরা কি কোনো ব্যক্তিকে এ পরামর্শ দেবার সাহস রাখেন যে, কারুর বিরুদ্ধে তোমার প্রতিশোধস্পৃহা সহ্যের সীমা অতিক্রম করলে তাকে হত্যা করে ফেলো? এবং কোনো বস্তু লাভ করার আকাংখা খুব বেশী পীড়াদায়ক হলে ঐ বস্তুটি চুরি করো? এই ধরনের পরামর্শ দেয়াকে যদি তাঁরা অবৈধ মনে করে থাকেন, তাহলে কোনো যৌন আকাংখা চরিতার্থ করার জন্যে যিনার পরামর্শ দেবার সাহস করেন কেমন করে? অথচ যিনা কোনোক্রমেই হত্যা ও চুরির চাইতে কম মারাত্মক অপরাধ নয়। এই অপরাধটির ভয়াবহতা উপলব্ধি করার জন্যে আপনি আর একবার আমার পর্দা বইয়ের যে অধ্যায়ে সামাজিক ক্ষেত্রে যিনার অনিষ্টকারিতা আলোচিত হয়েছে সেটি অধ্যয়ন করুন। [তরজমানুল কুরআন, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৫১]

মুসলিম সমাজে মুনাফিক

প্রশ্নঃ ইসলামের বিরুদ্ধে দুটি শক্তি প্রথম থেকেই সংগ্রাম চালিয়ে আসছে। একটি হচ্ছে কুফর এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে মুনাফিকী। কিন্তু কাফিরের তুলনায় মুনাফিক অধিক মারাত্মক দুশমন। কারণ এরা আস্তিনের মধ্যে লুকানো সাপের ন্যায় কপালে ভ্রাতৃত্ব ও ইসলাম প্রেমের লেবেল এঁটে ভেতরে ভেতরে মুসলমানদের শিকড় কাটার চেষ্টা করে। সম্ভবত এ কারণেই কাফির ও

মুনাফিক উভয়েই অবশেষে জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত হবে। কিন্তু মুনাফিকের শাস্তি কিছু অধিক 'কষ্টদায়ক' হবে বলে বলা হয়েছে (অবশ্যি মুনাফিক জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে। সূরা নিসা)। এদল সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা এভাবে তাঁর দ্ব্যর্থহীন সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেনঃ 'হে নবী! এই মুনাফিকের জন্যে তুমি মাগফেরাত চাও বা না চাও (উভয়ই সমান)। তুমি সত্তর বার মাগফিরাত চাইলেও আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে মাফ করবেননা' (সূরা তওবা)। কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তাআলা মুনাফিকদের বিভিন্ন প্রকারের কমবেশী ষাটটি নিশানী বর্ণনা করেছেন। এই নিশানীগুলোর আলোকে মুসলমান নামে পরিচিত এ অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক অধিবাসীকে বিচার করলে আমরা তাদের অধিকাংশকে মুনাফিকদের পর্যায়ভুক্ত দেখি। গুনাহগার মুসলমান অবশ্যি এই মুনাফিকদের দলভুক্ত নয়, কিন্তু গুনাহ্গার মুসলমান হচ্ছে তারা যারা কখনো মানবিক দুর্বলতার কারণে অসৎ কর্মানুষ্ঠানে ব্রতী হলেও সংগে সংগেই আল্লাহ্ ও কিয়ামতের চিন্তা তাদেরকে তওবা করতে উদ্বুদ্ধ করে, তারা লজ্জিত হয় এবং ভবিষ্যতের জন্যে নিজেদের সংশোধন করে নেয়। বিপরীতপক্ষে মুনাফিক তার অসৎকর্মের জন্যে যথার্থ লজ্জিত হবার পরিবর্তে সজ্ঞানে তা করে যেতেই থাকে।

আপনার দৃষ্টি ও অধ্যয়ন অধিকতর ব্যাপক। আপনি অনুগ্রহ্ করে বর্তমানে ইসলামের দাবীদারদের মধ্যে মুনাফিক, গুনাহগার ও মুত্তাকী মুসলমানদের আনুমানিক আনুপাতিক হার কত জানাবেন?

দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে, মুনাফিক দলের সাথে মুসলমানদের ব্যবহার সম্পর্কিত। কুরআনের দৃষ্টিতে এরা মুসলিম জামায়াত বহির্ভূত (এই মুনাফিকরা কসম খেয়ে খেয়ে বলে যে, তারা তোমাদের দলভুক্ত অথচ তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। সূরা তওবা) তারা কেবল মুসলিম মিল্লাত ববির্ভূতই নয় বরং তারা মুসলমানদের দুশমনও (এই মুনাফিকরা তোমাদের দুশমন, এদের থেকে সাবধান থেকো। সূরা মুনাফিকুনঃ ১)

যেহেতু এরা দুশমন, কাজেই নির্দেশ দেয়া হলোঃ এই দীনের দুশমনদের থেকে পুরোপুরি আলাদা হয়ে যাও। এই মুনাফিকদেরকে নিজেদের সাথী ও বন্ধুতে পরিণত করোনা এবং তাদের কাউকে নিজেদের বন্ধু বা সাহায্যকারী মনে করোনা (সূরা নিসাঃ ১২) মুনাফিকদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন না করা অবশ্যি এই বয়কটের অন্তর্ভুক্ত। আলাদা থাকার অন্য একটি পদ্ধতি বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছেঃ "হে নবী! আল্লাহকে ভয় করো এবং ঐ কাফির ও মুনাফিকদের কোনো কথা মেনে চলোনা।" (সূরা আহযাব)। অর্থাৎ নামাযের ব্যাপারে মুনীফকদের নীতি অনুসরণ করা চলবেনা এবং তাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বও গ্রহণ করা যাবেনা ইত্যাদি। আর একটি পদ্ধতিতেও বয়কটের প্রকাশ করা

প্রয়োজন– (ঐ মুনাফিকদের মধ্যে কেউ মৃত্যু মুখে পতিত হলে কখনো তার জানাযার নামায পড়োনা এবং তার কবরে গিয়ে মাগফিরাতের জন্যে দোয়াও চেয়োনা– সূরা তওবা)।

একজন মুসলমান হিসেবে এই আলাদা থাকার ব্যাপারে আপনি নিজে কি কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করেছেন? মুসলমানদের (যারা বর্তমানে সংখ্যালঘু) কি মুনাফিকদের (যারা বর্তমানে সংখ্যাগুরু) সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত? নাহলে পরিপূর্ণ প্রমাণ পেশ করার প্রয়োজন রয়েছে?

জবাবঃ বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে শতকরা কতজন কোন্ কোন্ ধরনের লোক আছে তা বলা কঠিন। কিন্তু পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমার নিজের অনুমান হলো, মুসলমানদের অধিকাংশকে মুনাফিক ঠাওরাবার ব্যাপারে আপনি অনেক বেশী বাড়াবাড়ি করেছেন। নিঃসন্দেহে আমাদের মধ্যে সৎ মুসলমানদের সংখ্যা অতি অল্প এবং এটিই আমাদের নৈতিক ও বস্তুগত অবনতির মূলীভূত কারণ। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ মুনাফিক নয় বরং এমন সব লোকের সংখ্যা আমাদের মধ্যে অধিক, যারা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে জাহিলিয়াতের মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছে অথবা শিক্ষা, অনুশীলন ও দীনি ব্যবস্থার অনুপস্থিতির কারণে দুর্বল ঈমানের অধিকারী হয়েছে এবং নিজের গুনাহগারীর অনুভূতি থাকা সত্ত্বেও গুনাহগারের ন্যায় জীবনযাপন থেকে নিষ্কৃতি লাভের ক্ষমতা রাখেনা। আমাদের মধ্যে মুনাফিক অবশ্যি আছে কিন্তু তাদের সংখ্যা অল্প। উপরন্তু তাদের বেশীর ভাগ সাধারণ মানুষের মধ্যে নয় বরং আমাদের সমাজের উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে বিরাজমান। একটি যথার্থ ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমাদের সমগ্র আশা-আকাংখা এরই সাথে জড়িত যে, ইসলামের সাথে আমাদের জাতির বিরাট অংশের যে সম্পর্ক আছে তা মুনাফিকের সম্পর্কের পর্যায়ভুক্ত নয় বরং আসলে তারা ইসলামের প্রতি আন্তরিক প্রেম-প্রীতি, ভক্তি-শ্রদ্ধা পোষণ করে এবং তারা শিক্ষা, অনুশীলন ও দীনী সংগঠনের মুখাপেক্ষী। তাই আমরা আশা রাখি, আমাদের সৎ ব্যক্তিরা এই অভাব পূর্ণ করতে সক্ষম হলে সংখ্যা-লঘু মুনাফিকের দল পরাজিত হবে এবং ইনশাআল্লাহ্ এখানে একটি সত্যিকার ইসলামী জীবন ব্যবস্থা তার প্রকৃত কাঠামো ও প্রাণশক্তিসহ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। অন্যথায়, খোদা না করুন যদি এ জাতির অধিকাংশ লোক মুনাফিক হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে আমাদেরকে ইসলামের পুনরুজ্জীবন ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আশা জলাঞ্জলি দিতে হবে। অতপর ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষীণতম আশাও থাকেনা। [তরজমানুল কুরআন, মার্চ-মে ১৯৫১]

সৎ পথে বাধা–বিপত্তি কেন?

প্রশ্নঃ আজ থেকে এক বছর আগে আমি দুনিয়ার সকল প্রকার অসৎ কাজের

সাথে যুক্ত ছিলাম। সেই সঙ্গে দুনিয়ার অনেক সুযোগ–সুবিধাও আমার হাতের মুঠোয় ছিল। আমি কারো কাছে ঋণী ছিলামনা এবং কারো করুণা প্রার্থীও ছিলামনা। বর্তমানে সকল প্রকার অসৎ কর্ম থেকে তওবা করে সৎ কর্মের দিকে মোড় পরিবর্তন করার পর আমি দেখছি, আমার সকল প্রকার সচ্ছলতা খতম হয়ে গেছে। এখন রুটি–রুজি থেকেও আমি বঞ্চিত। প্রশ্ন হচ্ছে, সৎ কর্মশীলদের জন্য দুনিয়া সংকীর্ণ হয়ে যায় কেন? এমন হতে থাকলে মানুষ সৎকর্মের দিকে অগ্রসর হবে কেন? এ অবস্থাটি যদি আমার জন্য পরীক্ষা হয়ে থাকে, তাহলে মাথা মুড়াবার সাথে সাথেই মাথায় শিলাবৃষ্টি হতে থাকলে গন্তব্যস্থলে কেমন করে পৌছবো?

জবাবঃ আপনি যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন তাতে আপনার প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি পোষণ করি। আপনার মনে কষ্ট দিতে আমি চাইনা। কিন্তু, আপনার কথার সঠিক জবাব হলো, আপনি যথার্থই পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। এ মনযিল ভালভাবে অগ্রসর হবার একটি মাত্র পথ আছে। সে পথটি হলো, আপনাকে আল্লাহ্ ও আখিরাতের উপর নিজের ঈমানকে দৃঢ়, মজবুত ও পাকা–পোক্ত করে সবরের সাথে সৎপথে অগ্রসর হতে হবে।

এ ব্যাপারে আপনি যে জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন তার সমাধানকল্পে আমি কতিপয় ইংগিত প্রদান করছি।

বর্তমানে আপনি দেখছেন অসৎ কর্মের পথ সহজ ও সৎ কর্মের পথ কঠিন, এর অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে আমাদের বর্তমান নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থ–রাজনৈতিক পরিবেশের বিকৃতি। এই বিকৃত পরিবেশ এমন অনেক কার্যকারণ সৃষ্টি করে রেখেছে যা অসৎ পথে চলার ব্যাপারে মানুষকে সাহায্য করে এবং সৎ পথ অবলম্বনকারীদের পদে পদে বাধা দেয়। আল্লাহর সৎ বান্দারা একজোট হয়ে যদি এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাবার চেষ্টা করে এবং তাদের প্রচেষ্টায় যদি একটি সঠিক জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে ইনশাআল্লাহ্ সৎ কর্মের পথ অনেক সহজ ও অসৎ কর্মের পথ অনেকাংশে কঠিন হয়ে যাবে। সেই সময়টি আসা পর্যন্ত বর্তমান পরিবেশে যারা নিজেদের জন্য সৎ ও সততার পথ নির্বাচিত করেছে তাদের অবশ্যি দুঃখ–দুর্দশা বিপদ–মুসীবতের সম্মুখীন হতে হবে।

এতদসত্ত্বেও এ কথা সত্য যে, সৎ কর্ম একদিক দিয়ে কঠিন এবং অসৎ কর্ম একদিক দিয়ে সহজ। আপনি যদি কোনো উচ্চ স্থানে উঠতে চান তাহলে যতই উপযোগী পরিবেশ হোকনা কেন, এ জন্যে অবশ্যি আপনাকে

কিছু না কিছু পরিশ্রম করতে হবে। কিন্তু নিম্নস্থানে নেমে আসার জন্য কোনো প্রচেষ্টা ও মেহনতের প্রয়োজন নেই। এ জন্য কেবল হাত-পা একটু ঢিলে করে শরীরটাকে এলিয়ে দিন, তাহলেই একেবারে ভূগর্ভের নিম্নস্থান পর্যন্ত দীর্ঘ পথ কোনো প্রচেষ্টা-মেহনত ছাড়াই অতিক্রম করতে সক্ষম হবেন।

আপনি জিজ্ঞেস করেছেন সৎ কর্মশীলদের জীবন যদি দুর্বিষহ হয়ে উঠতে থাকে, তাহলে মানুষ সৎ কর্মের দিকে অগ্রসর হবে কেন? কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করছি, সৎ কর্মকারীরা যদি দুনিয়ার সকল সুযোগ-সুবিধা ও আরাম-আয়েশ লাভ করতো এবং অসৎ কর্মকারীদের উপর সকল প্রকার আপদ-বিপদ আপতিত হতে থাকতো, তাহলে এমন কোনো নির্বোধ আছে কি, যে সৎ পথ ছেড়ে অসৎ পথ অবলম্বন করতো? তখন তো সাফল্য লাভ করা সহজ হতো এবং ব্যর্থতা হতো কঠিন। পুরস্কার সস্তায় পাওয়া যেতো এবং শাস্তির জন্যে চড়া মূল্য দিতে হতো। বিনা আয়েশে ও বিনা মূল্যে পারিতোষিক লাভ করা যেতো এবং আযাব লাভ করার জন্যে পরিশ্রম করতে হতো।

এরপরও দুনিয়ার এই পরীক্ষাগারে মানুষকে পাঠবার কোনো প্রয়োজন থাকতো কি? সৎ পথ অতিক্রম করার জন্য মখমলের গালিচা বিছিয়ে দেবার পরও কি সৎ ব্যক্তিদের সৎ কর্ম কোনো মূল্য ও মর্যাদা লাভের অধিকারী হতো? আসলে এমনটি হলে জান্নাতের পরিবর্তে জাহান্নামের দিকে যারা অগ্রসর হতো, তারাই অধিক মর্যাদার অধিকারী হতো।

আপনার এ প্রশ্নটি আর এক দিক দিয়েও বিস্ময়কর। আপনি সম্ভবত মনে করছেন মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করার মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার কোনো স্বার্থ রয়েছে। এই ভুল ধারণার কারণে আপনি জিজ্ঞেস করেছেন যে, সৎ পথ যদি দুঃখ কষ্ট, বিপদ ও পরীক্ষায় পরিপূর্ণ থাকে, তাহলে মানুষ এ পথে আসবে কেন? কিন্তু আপনার জানা উচিত, সৎ পথ অবলম্বন করে মানুষ নিজেই লাভবান হয় এতে আল্লাহর কোনো লাভ নেই। পক্ষান্তরে অসৎ পথে চললে মানুষের নিজেরই ক্ষতি, আল্লাহর কোনো ক্ষতি নেই। আল্লাহ্ মানুষের সামনে দুটি পথ রেখে দিয়েছেন এবং তাকে দুটির মধ্য থেকে যে কোনো একটিকে অবলম্বন করার স্বাধীন ক্ষমতা দান করেছেন।

এক. সে এই পার্থিব জীবনের দু'দিনের আরাম-আয়েশকে অগ্রাধিকার দান করে আখিরাতের চিরন্তন আযাব গ্রহণ করতে পারে।

দুই. সে আখিরাতের অসীম অনন্ত আরাম-আয়েশ ও আনন্দ উপভোগের জন্য দীন ও নৈতিক বিধানের অনুসরণ করবে এবং এ ক্ষেত্রে অনিবার্য রূপে যে

সমস্ত দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-মুসীবত আসবে সেগুলো বরদাশত করতে পারে। মানুষ ইচ্ছা করলে প্রথম অবস্থাটাও পছন্দ করতে পারে। সমগ্র দুনিয়ার মানুষ একজোট হয়েও যদি এ ভুল নির্বাচন করে বসে, তাহলে এতে আল্লাহর কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। মানুষের সঠিক ও নির্ভুল পথ নির্বাচনের সাথে আল্লাহর কোনো স্বার্থ জড়িত নেই। তিনি এর মুখাপেক্ষী নন। [তরজমানুল কুরআন, নভেম্বর ১৯৫০]

তাসাউফ এবং শায়খের ধ্যান

প্রশ্নঃ আমি পরিপূর্ণ আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার সাথে আপনার দাওয়াত অধ্যয়ন করেছি। সালাফী হওয়া সত্ত্বেও আমি নিজেকে আপনার ইসলামী আপন্দোলনের একজন নগণ্য খাদেম ও সমর্থক মনে করি। আমার সাধ্য মতো এ আন্দোলনকে প্রচার ও প্রসার করার জন্যেও প্রচেষ্টা চালাই। সম্প্রতি তাসাউফ ও শায়খের ধ্যানে মগ্ন হওয়া সম্পর্কে কতিপয় বিষয় আমার মনে নানান প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে। আপনি অনারব বেদআতকে 'মোবাহ' গণ্য করেছেন। অথচ আপনার এতদ্দিনকার সমস্ত রচনাবলী ছিল এর বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ। ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করাই আমাদের সমগ্র দাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য। খোদা না-খাস্তা যদি আমার কোনো বেদআতকে স্বীকার করে নেই, তাহলে এর অর্থ দাঁড়াবে সমস্ত বেদআতকে এই আন্দোলনের মধ্যে অনুপ্রবেশ করার সুযোগ দেয়া। মেহেরবানী করে আমার এই কথাগুলো সম্পর্কে চিন্তা করে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তাসাউফ ও শায়খের ধ্যানে মগ্ন হওয়া সম্পর্কে আপনার মতামত কি এবং এ ব্যাপারে আসল পন্থাই বা কি, তা জানাবেন। আশা করি, তরজমানুল কুরআনে বিস্তারিতভাবে বিষয়টি আলোচনা করবেন।

জবাবঃ আমার কোনো একটি বাক্য থেকে আপনার মনে যে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে, তা কখনো সৃষ্টি হতো না, যদি আপনি এ প্রসংগে আমার অন্যান্য স্পষ্ট রচনাবলীও পাঠ করতেন। যা হোক, তবু আমি আপনার প্রশ্নগুলোর সুস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত জবাব দিচ্ছি।

১. তাসাউফ কোনো একটি জিনিসের নাম নয়, বরং অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন জিনিস এ নামে আখ্যায়িত হয়েছে। আমরা যে তাসাউফের সত্যতা স্বীকার করি, সেটি এক জিনিস আর যার প্রতিবাদ করি সেটি অন্য জিনিস। আবার যে তাসাউফের আমরা সংশোধন চাই, সেটি এ দুটি থেকে ভিন্নতর অন্য এক জিনিস।

ইসলামের প্রাথমিক যুগের সূফীগণের মধ্যে এক ধরনের তাসাউফের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। যেমন ফুযায়ল বিন ইয়াজ (র), ইবরাহীম আদহাম (র),

মারুফ কারখী (র)। এদের কোনো পৃথক দর্শন ছিলনা, কোনো পৃথক পদ্ধতি ছিলনা। তাঁদের চিন্তা ও কর্ম কুরআন ও সুন্নাহ্ ভিত্তিক ছিল। আর কুরআনের উদ্দেশ্যই ছিল তাঁদের ঐ সব চিন্তা ও কর্মের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আল্লাহকে কেন্দ্র করে এবং একমাত্র আল্লাহর জন্যে।

وَمَا اُمِرُوْا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ - (البينة : ٥)

"নিজেদের দীনকে আল্লাহর জন্যে খালিস করে কেবল তাঁরই দাসত্ব করবে এ ছাড়া আর কোনো নির্দেশ তাদের দেয়া হয়নি" [আল বাইয়্যেনাঃ ৫]

আমরা এই তাসাউফের সত্যতা স্বীকার করি। শুধু সত্যতা স্বীকারই করিনা বরং তাকে জীবন্ত ও পরিব্যাপ্ত করতে চাই।

দ্বিতীয় প্রকারের তাসাউফের মধ্যে গ্রীক দর্শন, বৈরাগ্যবাদ, যরদুশ্‌ত্রীয় মতবাদ ও বেদান্ত দর্শনের মিশ্রণ ঘটেছে। এতে খৃষ্টান ও হিন্দু যোগীদের পদ্ধতি শামিল হয়ে গেছে। শিরক্ মিশ্রিত চিন্তা ও কর্ম এর সাথে সংমিশ্রিত হয়েছে। শরীয়ত, তরীকত ও মারেফত এখানে পৃথক পৃথক বিষয়। তাদের পরস্পরের মধ্যে কমবেশী সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে বরং অনেক ক্ষেত্রে তারা পরস্পরের বিপরীতধর্মী হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে মানুষকে পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফার দায়িত্ব সম্পাদনকারী হিসেবে তৈরি করার পরিবর্তে সম্পূর্ণ ভিন্ন কাজের জন্য তৈরি করা হয়। আমরা এ তাসাউফের বিরোধিতা করি। আমাদের নিকট একে বিলুপ্ত করা আল্লাহর দীন কায়েম করার জন্যে আধুনিক জাহিলিয়াতের বিলুপ্তির ন্যায় সমপর্যায়ের জরুরী বিষয়।

এই দুটি ছাড়া তৃতীয় এক ধরনের তাসাউফ আছে। এতে প্রথম ধরনের তাসাউফের কিছু অংশ এবং দ্বিতীয় ধরনের তাসাউফের কিছু অংশ সংমিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। এই তাসাউফের পদ্ধতিসমূহ এমন কতিপয় মনীষী প্রণয়ন করেন, যাঁরা আলেম ও সদিচ্ছাসম্পন্ন কিন্তু তারা নিজ যুগের প্রধান বিষয়সমূহ ও পূর্ববর্তী যুগের প্রভাব থেকে পুরোপুরি উতরে উঠতে পারেননি। তাঁরা ইসলামের আসল তাসাউফকে বুঝবার এবং তার পদ্ধতিসমূহকে জাহিলী তাসাউফের মিশ্রণমুক্ত করার জন্যে পূর্ণ প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও তাদের মতবাদে জাহিলী তাসাউফের কিছু না কিছু প্রভাব এবং তাদের কার্যবলীতে বহিরাগত কার্যাবলীর কিছু না কিছু প্রভাব রয়ে গেছে। এ সম্পর্কে তাঁদের মনে এ ধারণা জন্মে যে, এগুলো কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা বিরোধী নয়, অথবা কমপক্ষে ব্যাখ্যার মাধ্যমে এগুলোকে বিরোধহীন মনে করা যেতে পারে। উপরন্তু এ তাসাউফের উদ্দেশ্য এবং ফলাফলও ইসলামের উদ্দেশ্য ও তার

প্রয়োজনীয় ফলাফল থেকে কম–বেশী ভিন্ন। মানুষকে সুস্পষ্টরূপে খিলাফতের দায়িত্ব পালন করার জন্যে তৈরি করা তার উদ্দেশ্য নয়। কোরআন –

لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ -

বাক্য দ্বারা যে জিনিসের কথা বিবৃত করেছে তা তৈরি করাও তার উদ্দেশ্য নয়। তার মাধ্যমে এমন লোকও তৈরি হয়নি যে দীনের পূর্ণ স্বরূপকে উপলব্ধি করে তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে চিন্তা করতে এবং তাকে প্রতিষ্ঠিত করা যোগ্যতাসম্পন্ন হতে পারে। এই তৃতীয় শ্রেণীর তাসাউফের আমরা পূর্ণ বিরোধিতা করিনা, আবার পূর্ণ সমর্থনও করিনা। বরং তার সমর্থক ও অনুগতদের নিকট আমাদের আরয হলো, মেহেরবানী করে মহান ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধাকে স্বস্থানে রেখে আপনারা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এই তাসাউফের উপর সমালোচনার দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন এবং একে সঠিক পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করুন। উপরন্তু যে ব্যক্তি এই তাসাউফের কোনো বিষয়কে কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধী দেখার কারণে তার সাথে মতবিরোধ করে, আপনারা তার এই সমালোচনার অধিকার অস্বীকার করতে পারেননা এবং খামখা তার নিন্দাবাদে মুখর হতে পারেননা।

২. শায়খের আকৃতি ধ্যান করা সম্পর্কে আমার মতে দু'দিক দিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমটি হলো একটি কার্য হিসেবে আর দ্বিতীয়টি হলো আল্লাহর নিকটবর্তী হবার একটি মাধ্যম হিসেবে।

প্রথম অবস্থায় এ কার্যটির কেবল বৈধতা ও অবৈধতার প্রশ্ন ওঠে। মানুষ কোন্ নিয়তে এ কার্য করে, তারই উপর এর সিদ্ধান্ত নির্ভর করে। একটি নিয়ত এমন আছে যার পরিপ্রেক্ষিতে একে হারাম বলা ছাড়া গত্যন্তর নেই। দ্বিতীয় নিয়তটি এমন যার পরিপ্রেক্ষিতে কোন ফকীহর পক্ষে একে অবৈধ বলা কঠিন হয়ে পড়ে। এর দৃষ্টান্ত এমনঃ যেমন আমি কোন ব্যক্তিকে একটি অপরিচিত মহিলার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকতে দেখে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি করছো? সে জবাব দিলোঃ 'আমার সৌন্দর্য পিপাসা নিবৃত্ত করছি।' বলা বাহুল্য, আমাকে বলতে হবে যে, তুমি অবশ্যি একটি খারাপ কাজ করছো। অন্য একজনকে একাজ করতে দেখে তাকে জিজ্ঞেস করায় সে বললোঃ 'আমি একে বিয়ে করতে চাই।' এ অবস্থায় আমাকে বাধ্য হয়ে বলতে হবে যে, তোমার এ কাজ অবৈধ নয়। কারণ সে তার এমন একটি কারণ বিবৃত করছে যাকে শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ বলা যেতে পারেনা।

শায়খের চিত্র ধ্যান করার দ্বিতীয় পদ্ধতিটি সম্পর্কে আমার মনে কোনদিন সন্দেহ ছিলনা, আজও নেই যে, এভাবে সম্পাদিত কার্যটি পূর্ণত অবৈধ। আমার মতে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করার ও তা বৃদ্ধি করার উপায় বলে দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল কখনো ত্রুটি করেননি। তাহলে তাঁদের বিবৃত

মাধ্যমের উপরই আমরা নির্ভর করবো না কেন? কেন আমরা এমন মাধ্যম উদ্ভাবন করতে সচেষ্ট হবো, যা সংশয়ে পরিপূর্ণ এবং যার ব্যাপারে সামান্য অসতর্কতা মানুষকে নিশ্চিত ও সুস্পষ্ট গোমরাহীর দিকে পরিচালিত করতে পারে?

প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, অন্যান্য যাবতীয় ব্যাপারে যখন শরীয়তের গন্তব্যে পৌঁছার জন্যে আমরা মোবাহ্ মাধ্যমসমূহ গ্রহণ করার অধিকার রাখি, তখন আত্মশুদ্ধি ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের ব্যাপারে আমাদের কেনই বা ঐ মাধ্যমসমূহ ব্যবহার করার অধিকার থাকবেনা? এ যুক্তি নীতিগতভাবে ত্রুটিপূর্ণ। কেননা, দ্বীনের দু'টি বিভাগ পরস্পর ভিন্ন প্রকৃতির অধিকারী। একটি বিভাগ হলো আল্লাহর সাথে সম্পর্কের আর দ্বিতীয় বিভাগটি হলো মানুষ ও দুনিয়ার সাথে সম্পর্কের। প্রথম বিভাগটির নীতি হলো, এতে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিবৃত ইবাদত পদ্ধতির উপরই আমাদের নির্ভর করতে হবে। এতে কোনো প্রকার কমতি–বাড়তি করার অধিকার আমাদের নেই। কেননা, কুরআন ও সুন্নাহ্ ছাড়া আমাদের নিকট আল্লাহর জ্ঞান ও তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার পদ্ধতির জ্ঞান অর্জন করার তৃতীয় কোন মাধ্যম নেই। এ ব্যাপারে যাবতীয় হ্রাস–বৃদ্ধি বেদআতের শামিল এবং এরূপ প্রত্যেকটি বেদআত গোমরাহীর নামান্তর। যা কিছু নিষিদ্ধ নয়, তা মোবাহ্, এ নীতি এখানে অচল। বরং এর বিপরীত এখানে নীতি হলো, যা কিছু কুরআন ও সুন্নাহ্ ভিত্তিক নয়, তা বেদআত। এখানে কিয়াসের (সদৃশ্য ঘটনা হতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ) মাধ্যমেও যদি কোনো বিষয় স্থিরীকৃত হয়, তাহলেও অবশ্যি কুরআন ও সুন্নাতে তার ভিত্তি থাকতে হবে। বিপরীত পক্ষে মানুষের সাথে সম্পর্ক ও দুনিয়ার সাথে সম্পর্কের দিকটি সুস্পষ্ট মোবাহ্ বিষয়। যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার আনুগত্য করুন। যে সম্পর্কে নিষেধ করা হয়েছে তা থেকে বিরত থাকুন এবং যে বিষয়ে কোনো নির্দেশ দেয়া হয়নি; যদি তার সামঞ্জস্যশীল কোনো বিষয়ে কোনো নির্দেশ পাওয়া যায়, তাহলে তার উপর কিয়াস করুন। অথবা যদি কিয়াসেরও সুযোগ না থাকে, তাহলে ইসলামের সাধারণ নীতি অনুযায়ী মোবাহ্সমূহের মধ্য হতে যে বিষয় ও পদ্ধতিকে ইসলামী ব্যবস্থার মেজায অনুযায়ী পান, তাকে গ্রহণ করুন। এ বিভাগে আমাদেরকে এ আযাদী দান করার কারণ হলো, আমরা যেনো পৃথিবী, মানুষ ও পার্থিব বিষয়াবলী সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণ করার যুক্তি ও তত্ত্বগত উপকরণ কমপক্ষে এতটুকু অবশ্যি অর্জন করি, যার ফলে আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতের নির্দেশনা লাভ করার পর আমরা ভালোকে মন্দ থেকে এবং সত্যকে মিথ্যা থেকে পৃথক করতে পারি। কাজেই এ আযাদী কেবল ঐ বিভাগ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত তাকে প্রথম বিভাগটি পর্যন্ত বিস্তৃত করে, যা কিছু নিষিদ্ধ নয়, তাকে মোবাহ্ মনে করে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক

স্থাপনের ব্যাপারে নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করা অথবা অন্যের কাছ থেকে আহরণ করে তা গ্রহণ করা একটি মৌলিক ত্রুটি এই ত্রুটির কারণে খৃষ্টানরা 'রাহবানিয়াত' আবিষ্কার করে। কুরআনে এর নিন্দা করা হয়েছে। [তরজমানুল কুরআন, জমাদিউল আউয়াল ১৩৭১, ফেব্রুয়ারী ১৯৫২]

ব্যক্তি সমষ্টির দ্বন্দ্ব

প্রশ্নঃ ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত চিন্তাধারা ইসলামের দৃষ্টিতে কতটুকু নির্ভুল? "মধুমক্ষিকা পিপীলিকা ও উইপোকার বিপরীতে মানুষকে সমাজে জীবন যাপনের জন্যে সৃষ্টি করা হয়নি। সে বড় জোর এক ব্যক্তি। সর্বশেষ পর্যায়ে মনে করুন, দলে দলে বিভক্ত হয়ে জীবন যাপন করাই তার প্রকৃতি। ব্যক্তি ও সমাজের দীর্ঘ অবিচ্ছিন্ন সংগ্রামের রহস্য এর মধ্যে নিহিত। অসম্পর্কের এই জটিলতার রহস্য ভেদ করার ক্ষমতা কোনো ধর্মের নেই। কারণ কোনোদিন এ রহস্যের দ্বারোদ্‌ঘাটন করা যাবেনা। কুরআন নিজেই কি একথা বলেনি যে, আমি মানুষকে সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করেছি' সেই সাথে এ কথাও বলেছে যে, 'আমি মানুষকে বড় কষ্টের মধ্যে সৃষ্টি করেছি' (আলবালাদ-৪)। আমার মতে এ আয়াতগুলোর সর্বোত্তাম ব্যাখ্যা হলো, একটি মেশিনারী শারীরিক ব্যবস্থা-হিসাবে মানুষ সৃষ্টির সেরা কিন্তু সমাজের কর্মী হিসেবে সমাজের সাথে সে সর্বক্ষণ দ্বন্দ্বমুখর।

জবাবঃ আপনি যে মতবাদ সম্পর্কে আমাকে মতামত পেশ করার ফরমায়েশ করেছেন, তার রচয়িতা নিজেই ব্যক্তি ও সমষ্টির দ্বন্দ্বের জটিল সমস্যা সমাধানের জন্যে তথা তাকে যথাযথভাবে অনুধাবন করার জন্যে যথার্থ পদ্ধতি অবলম্বন করেননি। তিনি মানুষকে এক প্রকার প্রাণী ধরে নিয়ে সংগঠনপ্রিয় প্রাণী এবং দলপ্রিয় প্রাণীদের মধ্যে মানুষের যথার্থ মর্যাদা নির্ণয়ে ব্রতি হয়েছেন অথচ এ সমস্যাটির দিকে অগ্রসর হবার জন্যে চিন্তার এ সূচনা বিন্দুই গলদ। মানুষ ও প্রাণীর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হলো প্রাণীরা কোনো স্বাধীন বিবেকসম্পন্ন সৃষ্টি নয়। তারা এমন নয় যে অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে চিন্তা-গবেষণা করে নিজেদের জীবনের পথ নিজেরা তৈরি করে। বরং তারা সরাসরি সৃষ্টিগত স্বভাবের অনুগত মধুমক্ষিকা নিজেরাই নিজেদের সুসংগঠিত সমাজ কাঠামো তৈরি করেনি। অনবরত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তারা পর্যায়ক্রমে এই সংগঠনের উন্নতি বিধানও করেনি। বরং তাদের প্রকৃতির মধ্যে এই সংগঠনের বীজ রেখে দেয়া হয়েছে। যখন থেকে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, তখন থেকেই তারা সংগঠনের আকারে বাস করে আসছে দলপ্রিয়, দাম্পত্যপ্রিয় বা একক স্বাতন্ত্রপ্রিয় প্রাণীদের অবস্থাও এই একই পর্যায়ের।

প্রত্যেকেই তাদের প্রকৃতি নির্ধারিত পথে চলছে। এদের মধ্যে কোনো এক জাতের প্রাণীও পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিন্তা-গবেষণা করে নিজেদের জীবন পদ্ধতিতে সামান্যতম পরিবর্তন সাধন করেনি। বিপরীত পক্ষে মানুষের অবস্থা হলো, প্রত্যেকটি মানুষ ইচ্ছা, ক্ষমতা, চিন্তা ও অনুভূতিসম্পন্ন এবং প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে নৈতিক দায়িত্বশীল প্রমাণিত হয়েছে। তার সৃষ্টিগত প্রকৃতির প্রভাব-সীমা অত্যন্ত সীমিত। তার প্রকৃতির মধ্যে অবশ্যি কতিপয় আবেগ ও ঝোঁকপ্রবণতা রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু সেগুলো নিজেদের দাবী পূর্ণ করার জন্য কোনো বিশেষ পথ নির্ধারণ করেনা এবং মানুষকে সেই বিশেষ পথে চলতে বাধ্য করেনা। বরং এ আবেগ ও ঝোঁকপ্রবণতাসমূহ মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তার সম্মুখে নিজেদের দাবী পেশ করে অতপর মানুষ নিজের বুদ্ধি ও চিন্তার মাধ্যমে ঐ দাবী পূরণ করার পথ নির্ণয় করে। এই সংগে মানুষ অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের সাহায্যে নিজের অবলম্বিত কার্যকর পদ্ধতির মধ্যে পরিবর্তন করার এবং পর্যায়ক্রমে তাকে সংশোধিত ও উন্নত করার জন্য প্রচেষ্টা চালাবারও ক্ষমতা রাখে। একারণেই মানুষ নিজের প্রকৃতিগত দাবী অনুধাবন করে প্রথমে ক্ষুদ্র জোড়া নারী-পুরুষের একত্রিত জীবন যাপন থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে পরিবার, গোষ্ঠী, জাতি, সংঘবদ্ধ সমাজ এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনের পর্যায় পর্যন্ত নিজের জীবনকে উন্নত করেছে। এ কারণেই বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে মানুষ নিজের সমাজ জীবনের জন্যে বিভিন্ন কাঠামো গ্রহণ করেছে এবং বারবার ঐ কাঠামোগুলো পরিবর্তন করে আবার নতুন কাঠামো তৈরি করেছে।

মানুষের এই বিশেষ মর্যাদার প্রতি গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তার মধ্যে ব্যক্তি ও সমষ্টির দ্বন্দ্বের যে জটিলতা দেখা যায় তার সমাধানের পথ খুলে যাবে। এ জটিলতার আসল কারণ হলো, একদিকে মানব জাতির প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের একটি স্বতন্ত্র খুদীর অধিকারী। তার মধ্যে বুদ্ধি, জ্ঞান, ইচ্ছ, ক্ষমতা ও ব্যক্তিগত দায়িত্বের অনুভূতি আছে। অন্যদিকে ঐ খুদীর অধিকারী ব্যক্তিবর্গ এমন একটি সমাজ জীবনে অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য, প্রকৃতি নিজে যার পূর্ণাঙ্গ কাঠামো তৈরি করে দেয়নি বরং প্রকৃতিগত আবেগ ও ঝোঁকপ্রবণতার দাবী পূরণ করার জন্য বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন এলাকার লোকেরা বিভিন্ন পদ্ধতিতে নিজেরাই এই কাঠামো তৈরি করেছে এবং ধীরে ধীরে সামাজিক অভিজ্ঞতা, সামষ্টিক ঝোঁকপ্রবণতা ও বাইরের প্রভাবাধীনে এই কাঠামোগুলো ক্রমবিকাশ লাভ করছে। লাখো লাখো কোটি কোটি মানুষের পৃথক পৃথক খুদীর [ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের] এহেন অস্বাভবিক সমাবেশের মধ্যে (যা অনেক ব্যাপারে প্রকৃতি বিরোধী হয়ে যায়) যথাযথ ভারসাম্য ও যথার্থ পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং নিজের উপযোগী স্থান দখল করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। এ জন্যে ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। কারণ এভাবে প্রতিষ্ঠিত ও সম্প্রসারিত সমাজে ব্যক্তির খুদী নিজের উপযোগী

স্থান না পাওয়ার কারণে নিজেকে স্থানচ্যুত অনুভব করে আর সমাজ ব্যবস্থাও ঐ অস্থির খুদীসমূহের স্বাতন্ত্রের কারণে চঞ্চল হয়ে ওঠে। ব্যক্তির বাঁধন আল্‌গা করে দেয়া হলে সমাজ ব্যবস্থা উলট-পালট হয়ে যেতে থাকে আবার সমাজ ব্যবস্থাকে বেশী বিধিবদ্ধ করা হলে ব্যক্তির খুদী হয় ঝিমিয়ে পড়ে নয়তো বিদ্রোহ্‌ করতে উদ্যত হয়।

যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণে মানুষের জন্যে অহী ও নবুয়্যতের নির্দেশনা অপরিহার্য প্রমাণিত হয় এগুলো তাদের অন্যতম। হাজার হাজার বছরের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে, নিজের প্রকৃতির আবেগ, ঝোঁকপ্রবণতা ও দাবী উপলব্ধি করে সেগুলো পূর্ণ করার পদ্ধতি নির্ণয়ের জন্য মানুষ বুদ্ধি, বিবেক, চিন্তা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যে সমস্ত শক্তির অধিকারী সেগুলো ঐ সমস্ত কাজে সাহায্যকারী হলেও যথেষ্ট নয়। ঐ শক্তিগুলোর জোরে মানুষ নিজের জন্য একটি নির্ভুল, ভারসম্যপূর্ণ ও সুষ্ঠু জীবন ব্যবস্থা তৈরি করতে পারেনা। সে তার স্রষ্টার নিকট থেকে জীবন বিধানের মূলনীতি লাভের মুখাপেক্ষী, কর্মের সীমা নির্ধারণ করে দেয়ার এবং সর্বোপরি সে সমস্ত অতিপ্রাকৃতিক সত্যের জ্ঞান লাভের সে মুখাপেক্ষী, যা ছাড়া একটি নির্ভুল জীবন পদ্ধতি প্রণয়ন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ্‌ তাআ'লা তাঁর নবীগণের মাধ্যমে সমাজ ব্যবস্থার যে মূলনীতি, সীমা ও প্রাসংগিক বিষয়ের দিকে আমাদের পথ নির্দেশ করেছেন একমাত্র তারই সাহায্যে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্ভাব্য সর্বাধিক পরিমাণ ভারসাম্য স্থাপন করে এবং ব্যক্তির খুদীর পূর্ণতা বিধানের পথ পরিষ্কার রেখে সর্বাধিক শক্তিশালী সমাজ ব্যবস্থা গঠন করা যেতে পারে।

আপনি কুরআন মজীদের যে আয়াত দুটির বরাত দিয়েছেন আমার উপরের আলোচনায় সেগুলোর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা হয়ে গেছে। বরং আপনি "লাকাদ খালাকনাল ইনসানা ফী আহসানি তাকবীম" আয়াতটির পর যদি "ছুম্মা রাদাদনাহ্‌ আসফালা সাফিলীন, ইল্লাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস্‌ সালিহাত" আয়াতটিও পড়েন, তাহলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয়ে যাবে। [তরজমানুল কুরআন, মার্চ-মে ১৯৫১]

ইসলাম দাস প্রথাকে চিরতরে নিষিদ্ধ করেনি কেন?

প্রশ্নঃ দাস প্রথা সম্পর্কে ইসলামে এমন সব বিধান রয়েছে যা থেকে সন্দেহ হয় যে, এই প্রথাটিকে চিরস্থায়ী করাই ইসলামের উদ্দেশ্য; কিন্তু অন্যদিকে এমন সব বিধান রয়েছে যা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, এটাকে কোনো পছন্দনীয় প্রথা মনে করা হয়নি; বরং দাসদের মুক্তি ও আযাদী দানই অধিক পছন্দনীয়। প্রশ্ন হলো, দাসবৃত্তি যদি অপছন্দনীয় এবং মানুষের আযাদীই

যদি পছন্দনীয় হয়ে থাকে, তাহলে এই প্রথাটিকে চিরতরে নিষিদ্ধ করা হয়নি কেন?

জবাবঃ *দাস প্রথা সম্পর্কে আমার 'তাফহীমাত' (রচনাবলী) ২য় খন্ড এবং 'রাসায়েল ও মাসায়েল' ১ম খন্ডে যা কিছু লেখা হয়েছে সেগুলো পাঠ করলে আপনি অতি সহজে এ প্রশ্নের জবাব পেয়ে যেতেন। দাস প্রথাকে চিরতরে নিষিদ্ধ না করার কারণ হচ্ছে, ইসলাম এ প্রথাটিকে নিছক একটি সাময়িক প্রয়োজন হিসেবে জীবিত রেখেছে। ভবিষ্যতে কোনো সময় শত্রু পক্ষের সাথে যদি যুদ্ধবন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে বিনিময় বা ফিদিয়ার মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদন সম্ভব না হয় এবং ইসলামী রাষ্ট্র ঐ যুদ্ধবন্দীদেরকে ফিদিয়া বা বিনিময় ছাড়া মুক্তি দান করা দেশের স্বার্থবিরোধী মনে করে, তাহলে সেক্ষেত্রে এ প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। সমগ্র দুনিয়ার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাবেন নিছক দু'চারটি ব্যতিক্রম ছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দিয়ে তার বিনিময়ে নিজেদের যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত করারও কোনো সুযোগ ছিলনা। বর্তমানে দুনিয়ায় যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের প্রচলন হলেও তার ভিত্তি কোনো ধর্মীয় অনুশাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় বরং নিছক জাতীয় স্বার্থে এর প্রচলন হয়েছে এবং যে কোনো জাতি যে কোনো সময় একে উপেক্ষা করতে পারে। আজও আমাদের কোনো হঠধর্মী দুশমনের সম্মুখীন হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। তারা যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পারে এবং কোনো শর্তে আমাদের যুদ্ধ বন্দীদের মুক্তি দিতে সম্মত নাও হতে পারে। এক্ষেত্রে আপনি নিজেই চিন্তা করুন, ইসলাম যদি আমাদের জন্যে সর্বাবস্থায় যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিদানের নির্দেশ অপরিহার্য ঘোষণা করতো, তাহলে এ নির্দেশ কি আমাদের জন্যে বিপদ ডেকে আনতোনা? প্রত্যেক যুদ্ধে দুশমনের হাতে কোনো জাতির লোকেরা বন্দী হতে থাকবে আর ঐ জাতি দুশমনের যুদ্ধবন্দীদেরকে মুক্তি দিতে থাকবে, এত বড় ক্ষতি কি কোনো জাতি চিরকাল বরদাশত করতে পারে? অন্যদিকে দুশমন যখন জানতে পারে আমাদের ধর্মীয় অনুশাসনের কারণে যে কোনো অবস্থায়ই আমরা তাদের লোকদের মুক্তি দিতে বাধ্য, তখন সে আমাদের সাথে যুদ্ধবন্দী বিনিময় চুক্তি স্বাক্ষর করতে রাযী হবে কি? কোনো দুশমনও কি এত বড় নির্বোধ হতে পারে?*

এ প্রসংগে আর একটি প্রশ্ন সম্পর্কেও চিন্তা করুন। কোনো ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাগারে বন্দী রাখা অথবা বাধ্যতামূলক শ্রমে (Forced Labour) নিযুক্ত করা এবং আধুনিক যুগের দাস শিবিরে (Concentration Camps) রাখা কোন্ যুক্তিতে দাস জীবনের চাইতে উত্তম হতে পারে? দাস জীবনে এর চাইতে অনেক বেশী আযাদী থাকে। সেখানে মানুষ বিয়ে-শাদীরও সুযোগ পায়। এক

ব্যক্তি সরাসরি এক ব্যক্তির কর্তৃত্বাধীন থাকে। এর ফলে সেখানে মানবিক ব্যবহারের সম্ভাবনা থাকে অধিক। দাস তার প্রভুকে খুশী করে বা ফিদিয়া দিয়ে আযাদীও লাভ করতে পারে। প্রথমে রাশিয়ায় ও জার্মানীতে কেবল যুদ্ধবন্দীদের সাথে নয় বরং নিজের দেশের রাজনৈতিক 'অপরাধীদের' সাথেও যে ব্যবহার করা হয়েছে এবং এখনো করা হচ্ছে সে সম্পর্কে অধ্যয়ন করুন অতপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন! যদি কখনো আমাদের এমন কোনো দুশমনের সম্মুখীন হতে হয় এবং তারা আমাদের যুদ্ধবন্দীদের সাথে এহেন ব্যবহার করতে থাকে, তাহলে এর জবাবে আমাদেরও কি ঐ ধরনের বর্বর ব্যবহার করা উচিত? নাকি ইসলাম আমাদেরকে দাসদের সাথে যে ব্যবহার করার অনুমতি ও নির্দেশ দিয়েছে তা এর চাইতে উত্তম এবং অনেক বেশী মানবিক ব্যবহারের গুণসম্পন্ন? [তরজমানুল কুরআন, জুন–জুলাই ১৯৫২]

কতিপয় নারীকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ হবার কারণ

প্রশ্নঃ গত কয়েকদিন থেকে বন্ধুদের সাথে হারাম সম্পর্কিত একটি বিষয়ের আলোচনা চলছে। নিম্নে সে বিষয়টি উদ্ধৃত করছি। আশা করি, আপনি এর উপর আলোকপাত করে আমাদেরকে বাধিত করবেন।

বিয়ের ব্যাপারে বিভিন্ন মেয়ের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে কেন? একটি মেয়েকে বিয়ে করা যেতে পারে আবার অন্য একটি মেয়েকে হারাম করা হয়েছে। অথচ মানব জাতির সূত্রপাতের প্রথমাবস্থায় এ ধরনের কোনো বিধিনিষেধ দৃষ্টিগোচর হয়না। যেমন হাবিল ও কাবিলের কাহিনী থেকে জানা যায়, এর কারণ কি? এ ধরনের বিয়ে কি শারীরিক অনিষ্টতার কারণ হতে পারে?

আশা করি, আপনি তরজমানুল কুরআনের মাধ্যমে এর জবাব দেবেন। তাহলে অন্যান্য ভাইয়েরাও এ থেকে উপকৃত হতে পারবেন।

জবাবঃ যে সব নারীকে বিয়ে করা হারাম ঘোষিত হয়েছে, তাদের হারাম হবার কারণ শারীরিক অনিষ্টকারিতা নয় বরং নৈতিক ও সমাজিক অনিষ্টকারিতার কারণে তাদেরকে হারামের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। আপনি নিজেই চিন্তা করুন, যে মা নিজের ছেলের ব্যাপারে যৌন আবেগ অনুভব করে, সে কি মা ও ছেলের সম্পর্কের মধ্যে যে পবিত্র আবেগ–অনুভূতি প্রয়োজন তার সাহায্যে ছেলেকে লালন–পালন করতে পারে? অন্যদিকে বর্তমানে মা ও ছেলের মধ্যে যে নিষ্কলুষ ও নির্দোষ অসংকোচ ভাব বিদ্যমান, ছেলে বুদ্ধি–বিবেক ও যৌবনের সীমান্তে পদার্পণ করার পর পূর্বোক্ত অবস্থায় কি মায়ের সাথে তেমন নিষ্কলুষ অসংকোচ ভাব বজায় রাখতে সক্ষম হতো? মা ও ছেলের মধ্যিখানে

যদি চিরন্তন হারামের প্রাচীর না উঠানো হতো, তাহলে কি একই গৃহে পিতা ও পুত্রের মধ্যে রেষারেষি ও হিংসা–বিদ্বেষ সৃষ্টি হতোনা?

ভাইবোনের ব্যাপারটিও অনুরূপ। তাদের মধ্যিখানে যদি চিরন্তন হারামের প্রাচীর দাঁড় করানো না হতো, তাহলে তারা ভাইবোন কি পরস্পরের সাথে নিষ্কলুষ সম্পর্ক স্থাপন ও কামনামুক্ত ভালোবাসা পোষণ করতে এবং সকল সন্দেহের উর্ধ্বে উঠে অসংকোচে মেলামেশা করতে পারতো? এ অবস্থায় ছেলেমেয়ে যৌবনের সীমান্তে পদার্পণ করার পর কি পিতামাতার পক্ষে তাদেরকে পরস্পরের থেকে পৃথক না রাখা সম্ভব হতো? কোনো ব্যক্তিও কি কোনো মেয়েকে বিয়ে করার সময় এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারতো যে, মেয়েটি তার ভাইদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে?

অতপর যদি শ্বশুর ও পুত্রবধূর মধ্যে এবং শ্বাশুড়ী ও জামাতার মধ্যে হারামের প্রাচীর না দাঁড় করানো হতো, তাহলে পিতা ও পুত্র এবং মাতা ও কন্যাকে পরস্পরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বীতা, রেষারেষি ও হিংসা এবং পরস্পরকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা থেকে নিষ্কৃতি দান কেমন করে সম্ভব হতো?

এদিক দিয়ে চিন্তা করলে আপনি বুঝতে পারবেন যে, একটি গৃহ, একটি পরিবার ও একটি সমাজ গন্ডির আওতায় যে সমস্ত পুরুষ ও মেয়ের মধ্যে স্বভাবত নিকটতর ও নিঃসংকোচ সম্পর্ক গড়ে উঠে এবং সামাজিক প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে উঠাই স্বাভাবিক, শরীয়ত কোনো কোনো গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক ও সামাজিক কারণে তাদেরকে পরস্পরের জন্যে হারাম করে দিয়েছে। পিতা–মাতা যদি পুত্র–কন্যার দিক থেকে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে না পারে যে, তাদের মধ্যে কোনো প্রকার যৌন সম্পর্ক নেই, তাহলে পুত্র–কন্যা প্রতিপালিত হতে পারেনা, ভাইদের ব্যাপারে বোনদের ও বোনদের ব্যাপারে ভাইদের মধ্যে যদি যৌন সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বীতার পথ চিরতরে বন্ধ না করে দেয়া হয়, তাহলে একই গৃহে ছেলেমেয়েদের প্রতিপালন সম্ভব নয়। খালা ও ফুফী এবং চাচা ও মামাকে যদি সকল প্রকার সন্দেহের উর্ধ্বে না রাখা যায়, তাহলে বোন নিজের ছেলেমেয়েদেরকে নিজের ভাইবোনদের থেকে এবং ভাই নিজের ছেলেমেয়েদেরকে নিজের ভাইবোনদের থেকে দূরে রাখার চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়বে। [তরজমানুল কুরআন, সেপ্টেম্বর ১৯৫১]

শূকর ও হিংস্র প্রাণীদের গোশ্‌ত হারাম কেন?

প্রশ্ন: কুরআন কতিপয় বস্তুকে হারাম গণ্য করেছে কেন? এ হারাম চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে নাকি অন্য দৃষ্টিতে করেছে? এগুলোর মধ্যে কি অনিষ্টকারিতা আছে? শূকরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করে তাকে কঠোরভাবে

হারাম করেছে কেন? এটি কি অধিক ক্ষতিকর? উপরন্তু হিংস্র পশু ও রক্তকেও হারাম করেছে কেন?

জবাবঃ কুরআন যে সব জিনিস খেতে নিষিদ্ধ করেছে, হতে পারে তাদের হারাম হবার পেছনে পরোক্ষভাবে চিকিৎসাশাস্ত্র সম্মত কোনো অনিষ্টকারিতাও কার্যকরী আছে। কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্মত অনিষ্টকারিতা সেগুলোর হারাম হবার আসল কারণ নয়, বরং আসল কারণ হচ্ছে নৈতিক ও আকীদাগত। অনেক বস্তুকে আকীদাগত কারণে হারাম করা হয়েছে। যেমনঃ

مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ -

(অর্থাৎ যে প্রাণীকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারুর নামে যবেহ করা হয়েছে)। আবার অনেকগুলোর মধ্যে কি পরিমাণ নৈতিক অনিষ্টকারিতা আছে, তার পূর্ণাংগ জ্ঞান আমাদের নেই। তবে নিজেদের পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার কারণে আমরা তার কিছু অংশ জানতে পারি। যেমন, শূকরের ব্যাপারে সমগ্র দুনিয়ার অভিজ্ঞতা হলো, তার গোশ্‌ত অত্যধিক নির্লজ্জতা সৃষ্টির সহায়ক। যে সব জাতি ব্যাপকভাবে শূকরের গোশ্‌ত আহার করে তাদের নৈতিক অবস্থা এর সাক্ষী। দুনিয়ায় সম্ভবত শূকরই এমন একটি পশু যার একটি শূকরীর চতুর্দিক বহু শূকর জমা হয়ে প্রত্যেকের সম্মুখে একের পর এক তার সাথে সংগম করে। এখন আপনি নিজেই দেখুন, এই বিশেষ ধরনের নির্লজ্জতা কোন্ কোন্ জাতির মধ্যে সর্বাধিক বিকাশ লাভ করেছে? যে সমস্ত জাতির বৈঠকী আচারবিধির (Etiquette) মধ্যে এ বস্তুটি শামিল আছে যে, মজলিসে এক ব্যক্তির স্ত্রীকে অবশ্যি অন্য ব্যক্তির পাশে বসতে হবে এবং নাচঘরে নিজের স্ত্রীর সাথে নিজের নাচা ঈর্ষা ও সংকীর্ণমনতার আলামত, তাকে অন্যের সাথে উলঙ্গ নাচার জন্যে এগিয়ে দেয়া উদারমনতার পরিচায়ক, তাদের এই নৈতিক চিন্তার উৎস সন্ধানে বের হলে যদি এমন কোনো পশুর স্বভাবের মধ্যে এই বৃত্তির সাক্ষাত পান যার গোশ্‌ত তারা ব্যাপকভাবে ভক্ষণ করে, তাহলে এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। এভাবে হিংস্র প্রাণীদের ব্যাপারটিকেও আমরা এর উপর কিয়াস করতে পারি। অর্থাৎ তাদের গোশ্‌ত ভক্ষণ হিংস্রতা ও রক্তলোলুপতা সৃষ্টি করে। প্রবহমান রক্ত অথবা জমাট রক্তের ব্যবহারেও হিংস্রতা, নির্মমতা ও পাষন্ডতার সৃষ্টি হওয়া মোটেই অস্বাভিবিক নয়। [তরজমানুল কুরআন, সেপ্টেম্বর ১৯৫১]

এটা কি পদবী বিকৃতি?

প্রশ্নঃ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা আপনার জামায়াতের দাবী। তবে আমার দুঃখ হলো, আপনি এবং আপনার জামায়াত "জামায়াতে আহমদীয়াকে" সব সময় 'মির্যায়ী জামায়াত' অথবা 'কাদিয়ানী জামায়াত' নামে আখ্যায়িত করে

থাকেন। অথচ কাউকে তার নিজের অপছন্দনীয় নামে আখ্যায়িত করা বিশ্বস্ততা বিরোধী।

মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব কাদিয়ানী নিজের জামায়াতের নাম রেখেছেন, 'জামায়াতে আহমদীয়া' এবং এ জামায়াতের সমর্থকগণ নিজেদের 'আহমদী' বলে থাকে। তবে তাদের প্রতিপক্ষগণ গোঁড়ামির কারণে তাদেরকে 'মির্যায়ী' অথবা 'কাদিয়ানী' বলে ডেকে থাকে। এটা কি ইসলাম সম্মত? যদি বিধিসম্মত হয়ে থাকে, তাহলে আপনার জামায়াতের সমর্থকদেরকে 'মওদূদী' বলে আখ্যায়িত করা কি আপনি পছন্দ করবেন? যদি এটা আপনার অপছন্দনীয় হয়, তাহলে আপনি এবং আপনার জামায়াত অন্যদের জন্যে এটা কেন পছন্দ করেন?

আপনার তরজমানুল কুরআনের ১, ৫, ৬ সংখ্যার ৩৫, ৩৬ খন্ডের ১৪৬ পৃষ্ঠায় আছেঃ

"আমি সাধ্যানুযায়ী নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, আমি আমার ভুল স্বীকার করতে কখনো দ্বিধা করিনি এবং ভবিষ্যতেও করবোনা। তবে শর্ত হলো আমার ভুল যুক্তির ভিত্তিতে প্রমাণিত হতে হবে, গালিগালাজে নয়।"

জবাবঃ কোনো জামায়াতকে তার প্রসিদ্ধ নামে স্মরণ করা নাজায়েয নয়, যদি সে নামের সাহায্যে তাকে বেইজ্জতী করার সত্যিই কোনো ব্যাপার না থকে। আহমদী ভদ্র মহোদয়গণ নিজেদের নামে 'আহমদী' পছন্দ করেছেন। অর্থাৎ নিজেদেরকে সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতার সাথে সম্পর্কিত করে থাকেন। কিন্তু সাধারণভাবে তারা 'কাদিয়ানী' নামে খ্যাত হয়ে গেছেন।[১] অর্থাৎ জনসাধারণ তাদেরকে সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতার দেশের সাথে সম্পর্কিত করে থাকে। এতে বেইজ্জতী ও অবজ্ঞার কি সূত্র আছে এবং এটা বিশ্বস্ততারই বা বিরোধী কেনো তা আমি বুঝিনা। যদি এটা বিশ্বস্ততা বিরোধী হয়, তাহলে তো সাধারণের মধ্যে প্রচলিত সমস্ত রীতি-নীতিই বিশ্বস্ততা বিরোধী হয়ে পড়বে।

জামায়াতে ইসলামীর সাথে সম্পর্কিত লোকদেরকে 'মওদূদী' বলতে আমাদের আপত্তি এ কারণে যে, আমাদের মসলক ও জীবন ব্যবস্থাকে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত করাকে আমরা নাজায়েয মনে করি। 'মওদূদী' তো দূরের কথা আমরা 'মুহাম্মদী' নামেও আখ্যায়িত হতে চাইনা। এটা তো ইসলাম। এর প্রতিষ্ঠাতা হওয়ার সৌভাগ্য কোনো মানুষের নেই। এ কারণে কোনো মানুষের নামে এটাকে আখ্যায়িত করা যায়না। যদি আপনি আমাদের

---

১. আমার জানা মতে এ নাম প্রচলিত হওয়ার কারণ হলো, মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ সাহেবের খিলাফতের সূচনায় যখন আহমদী জামায়াত দু'ভাগ হয়ে যায়। তখন কাদিয়ানওয়ালা গ্রুপ 'কাদিয়ানী' আর লাহোরওয়ালা গ্রুপ 'লাহোরী' নামে খ্যাত হয়। সে সময় তাদেরকে খারাপ নামে স্মরণ করার ধারণা কারো মনেই আসেনি।

'নূহী' অথবা 'ইবরাহীমী' বলেন, তখনো আমাদের সে আপত্তি হবে যা 'মওদূদী' বললে হয়। বিপরীত দিকে মীর্যা সাহেব এবং তার অনুগামিগণ নিজেদের মত ও জামায়াতকে স্বয়ং একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত করেছে আর জনগণ সেই ব্যক্তির পরিবর্তে তার দেশের সাথে সম্পর্কিত করা ছাড়া আর বিশেষ কিছু করেনি। এটা এমন কিছু আপত্তিকর নয়। চিশতিয়া সিলসিলাও প্রতিষ্ঠাতার নামের পরিবর্তে তার দেশের সাথে সম্পর্কিত হয়ে খ্যাতি লাভ করেছে। সোহরাওয়ার্দীয়া, সনৌসীয়া, সাত্তারীয়া ইত্যাদি তরীকাগুলোর নামও এভাবেই হয়েছে। এতে সেসব সিলসিলার বেইজ্জতী হয়েছে এমন কথা কেউ বলতে পারবেনা। তবে মীর্যায়ী শব্দটির ব্যবহার আমিও পছন্দ করিনা এবং আমি নিজে কখনো এ শব্দটি ব্যবহার করিনি। কেউ প্রশ্ন করতে গিয়ে শব্দটির প্রয়োগ করে থাকলে জবাব দিতে গিয়ে ঘটনা বর্ণনাক্রমে শব্দটি বলে থাকতে পারি। [তরজমানুল কুরআন, যিলকদ-যিলহজ্জ ১৩৭০, সেপ্টেম্বর ১৯৫১]

তওবা ও কাফ্ফারা

প্রশ্নঃ আমি এমন পরিবেশে প্রতিপালিত হয়েছি, যেখানে উঠাবসার সাধারণ আদব কায়দা থেকে নিয়ে জীবনের বিরাট বিরাট বিষয় পর্যন্ত প্রতিটি ব্যাপারে শরীয়তের আনুগত্য করা হতো। এখন আমি কলেজে পড়ছি। এই আকস্মিক পরিবেশ পরিবর্তনের কারণে আমি অদ্ভুত দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়েছি। আমার দ্বারা অনেক অনৈসলামী কার্য সাধিত হয়েছে। যখনই এই ধরনের কোনো কাজ করেছি, তখনই বিবেক তিরস্কার করেছে এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা চেয়েছি। কিন্তু এরপরও অসৎ প্রভাব বিস্তারকারী পরিবেশের চাপে এবং শয়তানের প্রভাবে ঐ একই কার্য সম্পাদন করেছি। এভাবে বার বার তওবা করে তা ভংগ করেছি। বর্তমানে যদিও আমি নিজেকে নিজের মতো সংশোধন করে নিয়েছি এবং বাহ্যত আশা করি যে, পুনর্বার ঐ গুনাহর কাজটি করবোনা, তবুও বারবার মনে প্রশ্ন জাগে, আমি একাধিকবার তওবা ভংগ করে যে গুনাহ্ করেছি, তা কি মাফ হবে? উপরন্তু তওবা করার কাফ্ফারা কি এবং তওবা ভংগ করা থেকে কিভাবে বিরত থাকা যায়, তাও জানাবেন।

জবাবঃ গুনাহর প্রতিবিধান হলো, তওবা ও সংশোধন। তওবা করার পর মানুষ যতবারই তা ভংগ করুক না কেন, আবার তাকে তওবা করা উচিত এবং নতুন করে সংশোধন প্রচেষ্টা চালানো প্রয়োজন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে, যেমন কোনো ব্যক্তি কোনো পার্বত্য পথে চলতে গিয়ে বারবার পিছলে পড়ে। বলা বাহুল্য, তার গন্তব্যে পৌঁছার একমাত্র উপায় হলো, যতবারই সে পিছলে পড়ুক না কেন, প্রতিবারই তাকে আবার উঠে দাঁড়াবার এবং উপরে আরোহণ

করার চেষ্টা করতে হবে। যে ব্যক্তি পিছলে পড়ে গিয়ে আর উঠেনা এবং যেখানে পড়ে গিয়েছিল হিম্মতহারা হয়ে সেখানেই পড়ে থাকে, সে কখনো গন্তব্যে পৌছতে পারেনা। অনুরূপভাবে নৈতিক উচ্চশিখরে যাত্রাকারী ব্যক্তিও যদি প্রতি পদস্খলনে নিজেকে সামলিয়ে নেয় এবং সত্যপথে দৃঢ়পদ থাকার প্রচেষ্টা জারী রাখে আল্লাহ তাআলা তার পদস্খলনের জন্যে তাকে পাকড়াও করবেননা। উপরন্তু তাকে সাফল্য থেকে বঞ্চিত রাখবেননা। তবে যারা গুনাহ করে গুনাহগারীর স্থানে পড়ে থাকে, তারা অবশ্যি খারাপ পরিণতির সম্মুখীন হবে।

আপনার দিলে নিজের পদস্খলনের জন্যে অবশ্যি লজ্জা ও অনুতাপের অনুভূতি জাগ্রত থাকা উচিত এবং সারাজীবন আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকাও উচিত। কিন্তু এই লজ্জা ও অনুতাপ যেন কখনো আপনাকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না করে। কারণ এ ধরনের নৈরাশ্য আল্লাহ সম্পর্কে কু-ধারণার নামান্তর। এর মধ্যে এ আশংকাও পুরো দস্তুর বর্তমান আছে যে, যখন মানুষের শাস্তির হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের কোনো আশা থাকবেনা তখন শয়তান তাকে ধোকা দিয়ে অতি সহজে গুনাহর জালে আবদ্ধ করবে।

তওবাকে শক্তিশালী করার এবং তওবা ভংগ রোধ করার একটি কার্যকরী ব্যবস্থা হচ্ছে, নফল নামায, নফল রোযা ও নফল সাদ্কার সাহায্য গ্রহণ করা। এ বস্তুগুলো গুনাহর কাফ্ফারা হয় এবং আল্লাহর রহমতকে মানুষের দিকে আকৃষ্ট করে। তাছাড়া এগুলো অসৎ প্রবণতাগুলোর ভালোভাবে মুকাবিলা করার জন্যে আত্মাকে অধিকতর শক্তিশালী করে।

তওবার সাথে যদি কেউ কসম খায় অতপর তা ভংগ করে, তাহলে এ জন্য কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়। অর্থাৎ দশজন মিসকীনকে আহার করাতে হবে বা তিন দিন রোযা রাখতে হবে। [তরজমানুল কুরআন, জুন-জুলাই ১৯৫২]

মেয়েদের সমকামিতা

প্রশ্নঃ আজকাল মহিলা কলেজের বিষময় পরিবেশে মেয়েদের মধ্যে একটি আজব ব্যাধি সংক্রামিত হচ্ছে। দু'টি মেয়ের স্বাভাবিক বন্ধুত্ব, আন্তরিকতা ও ভালোবাসা সীমা ছাড়িয়ে সমকামিতার রূপ পরিগ্রহ করছে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এ কাজ সগীরা বা কবীরা গুনাহের কোন্ পর্যায়ে পড়ে?

জবাবঃ পুরুষের সাথে পুরুষের যৌনাচার যত বড় গুনাহ নারীর সাথে নারীর যৌনাচারও তেমনি পর্যায়ের বড় গুনাহ। নৈতিকতার দিক দিয়ে এ দু'য়ের মধ্যে ধরন ও পর্যায়গত কোনো পার্থক্য নেই। পরিতাপের বিষয়, এই তথাকথিত "ললিত কলা" যা সাময়িকীর মাধ্যমে এবং গল্প ও নাট্যাকারে ঘরে ঘরে পৌছে যাচ্ছে, এই অশ্লীল ছবি ও ফিলম, যেগুলো পুরুষদের মতো মেয়েরাও

স্বাধীনভাবে দেখছে, এই প্রেমমূলক গান, যা রেডিওর সাহায্যে শিশুদের মুখেও উচ্চারিত হচ্ছে এবং পুরুষের এই অবাধ মেলামেশা, যা আমাদের সমাজে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে– এসব কিছু মিলে যুবকদের মতো যুবতীদেরকেও অস্বাভাবিক আবেগ–উত্তেজনায় পাগল করে তুলেছে। বুকের মধ্যে যৌন উত্তেজনার যে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে ফুঁকের পর ফুঁক দিয়ে তার শিখাগুলোকে আরো বেশী লকলকে করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে যে বিকৃতি এতোদিন পুরুষদের মধ্যে পাওয়া যেতো তা একটি সংক্রামক ব্যাধির মতো সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে এবং নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী ও শিক্ষিকাদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। যেসব মহিলা মেয়েদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থা কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছেন তাদের বক্তব্য হলো, আজ মেয়েদের মধ্যে যে বেহায়াপনা, নির্লজ্জতা ও যৌন বিষয় নিয়ে প্রকাশ্য আলোচনা করার সাহস এবং স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক উভয় ধরনের যৌন প্রবণতার প্রকাশ ও ঘোষণা করার দুঃসাহস পাওয়া যায় কয়েক বছর আগে পর্যন্ত তা চিন্তা করাও দুষ্কর ছিল। কোন্ ছাত্রী কোন্ শিক্ষিকার প্রিয়তমা এবং কোন্ মেয়ে অন্য মেয়ের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে– একথা আজ খোলাখুলি আলোচনা হয়। (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন!)

মজার ব্যাপার হলো, যারা স্বজাতিকে এই জাহান্নামের দিকে ঠেলে দিচ্ছে তারা নিজেদের এ পর্যন্তকার প্রচেষ্টার পরিণতির ব্যাপারেও তারা খুশী নয়। তাদের আক্ষেপ হলো, মোল্লাদের বিরোধিতা ও প্রতিবাদ যদি পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করতো, তাহলে প্রগতি আরো ত্বরান্বিত হতো। [তরজমানুল কুরআন, রমযান–শাওয়াল ১৩৭১, জুন–জুলাই ১৯৫২]

একটি বেনামী পত্রের জবাব

প্রশ্নঃ *আমি এক যুবতীকে বিয়ে করার লোভ দেখিয়ে তার সাথে নৈতিকতা বিরোধী সম্পর্ক স্থাপন করি। আমি অত্যন্ত সততার সাথে তাকে বিয়ে করতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু পরে জানলাম, তার পরিবারের সাধারণ মেয়েরা অসচ্চরিত্র ও ব্যভিচারিণী, এমনকি তার মাও। এখন আমার ভয় হচ্ছে, আমি ঐ মেয়েটিকে বিয়ে করার পর সেও অসচ্চরিত্র ও দ্বিচারিণী প্রমাণিত না হয়। আমার এখন কি করা উচিত, তরজমানুল কুরআনের মাধ্যমে জানাবেন।*

জবাবঃ *এটি একটি বেনামী পত্র। হালে পত্রটি আমাদের হস্তগত হয়েছে। সাধারণত বেনামী পত্রের জবাব দেয়া হয়না। কিন্তু এ পত্রটির জবাব দেবার কারণ হলো, আমাদের দুর্ভাগা সমাজে বর্তমানে আমাদের এই প্রশ্নকারীর ন্যায় মানসিকতাসম্পন্ন বহু সংখ্যক যুবক রয়েছে। নিজেরা অসচ্চরিত্র কিন্তু বিয়ে*

করতে চায় কোনো সচ্চরিত্র মেয়ের সাথে। যে পাত্রটি তারা নিজেরা কলুষিত করেছে, তাকে রেখে দেয় অন্যের জন্যে, আর নিজেদের জন্যে এমন একটি পাত্র সন্ধান করে যাকে কেউ কলুষিত করেনি।

প্রশ্নকর্তাকে বলছি, যে মেয়েটিকে আপনি নিজে বিয়ের পূর্বে নষ্ট করেছেন তার জন্যে আপনার চাইতে উপযোগী আর কে হতে পারে? এবং সেও আপনার চাইতে আর কার জন্যে অধিক উপযোগী হতে পারে? আপনি নিজে যখন ব্যভিচারী, তখন আপনার জন্যে অব্যভিচারী মেয়ের প্রয়োজন কেন? যখন সে মেয়েটি বিয়ের পূর্বে আপনাকে তার দেহ সোপর্দ করেছিল, তখনই কি আপনি জানতে পারেননি যে, সে ব্যভিচারিণী? অতপর পরে সে ব্যভিচারিণী প্রমাণিত না হয় এ আশংকা আপনার মনে এখন জাগছে কেন? আপনার কথার অর্থ কি তাহলে এই যে, আপনার সাথে ব্যভিচার করা সচ্চরিত্রতা এব অসচ্চরিত্রতা হচ্ছে কেবল অন্যের সাথে ব্যভিচার করার নাম? আবার তার পরিবারের মেয়েদের সম্পর্কে আপনার আপত্তিও বড়ই অদ্ভুত। ঐ মহিলাবৃন্দ যেমনই হোক না কেনো আপনার ন্যায় সম্মানী ব্যক্তিদের বদৌলতেই তারা ঐ পর্যায়ে পৌছেছে। আপনি এ পথে পরে এসেছেন বলে আপনার পূর্বসূরীদের সম্পাদিত কার্যাবলীকে এতো ঘৃণার চোখে দেখেন কেন? রাগ করবেননা, আপনি সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে এমন পরিবারে পৌছে গেছেন যাদের জন্যে আপনার চাইতে উপযোগী আর কেউ নেই এবং আপনার জন্যে যাদের চাইতে উপযোগী আর কেউ নেই। অন্য কোনো পবিত্র ও নিষ্কলুষ পরিবারকে নষ্ট করার পরিবর্তে আপনি বরং ঐ পরিবারেই থেকে যান যাকে আপনার ন্যায় লোকেরা পূর্বে নষ্ট করেছে এবং যাকে নষ্ট করার মধ্যে আপনারও অংশ আছে।

পরিশেষে প্রশ্নকারীর কুরআনের দু'টি আয়াত শুনে নেয়া উচিত। প্রথম আয়াতটি হচ্ছেঃ

اَلزَّانِىْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً، وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ - (النور: ٣)

"ব্যভিচারী পুরুষ একজন ব্যভিচারী নারী বা মুশরিক নারী ছাড়া আর কারুর সাথে বিয়ে করেনা। আর ব্যভিচারী নারী একজন ব্যভিচারী পুরুষ বা মুশরিক পুরুষ ছাড়া আর কারুর সাথে বিয়ে করেনা। এমনটি করা মু'মিনদের জন্যে হারাম করা হয়েছে।" (সূরা নূরঃ ৩)

এ আয়াতে 'বিয়ে করেনা' অর্থ ব্যভিচারী পুরুষ ব্যভিচারী নারী বা মুশরিক নারী ছাড়া আর কারুর সাথে বিয়ে করার যোগ্যতা রাখেনা এবং ব্যভিচারী নারীর জন্যে যদি কেউ উপযোগী পাত্র হয়ে থাকে, তাহলে সে হচ্ছে ব্যভিচারী

পুরুষ বা মুশরিক পুরুষ, কোনো সৎ মু'মিন তার জন্যে উপযোগী পাত্র হতে পারেনা।

দ্বিতীয় আয়াতটিতে বলা হয়েছেঃ

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ

وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبَاتِ-(النور:٢٦)

"অসচ্চরিত্র মেয়েরা অসচ্চরিত্র পুরুষদের জন্যে এবং অসচ্চরিত্র পুরুষরা অসচ্চরিত্র মেয়েদের জন্যে। আর পাক-পবিত্র মেয়েরা পাক-পবিত্র পুরুষদের জন্যে এবং পাক-পবিত্র পুরুষরা পাক-পবিত্র মেয়েদের জন্যে।" (সূরা নূরঃ ২৬) [তরজমানুল কুরআন, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৫১]

৬

রাজনৈতিক জিজ্ঞাসা

রাষ্ট্র ও সরকারের পার্থক্য

প্রশ্নঃ শরীয়তের দৃষ্টিতে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ব্যবস্থা (আদর্শ প্রস্তাবের ভিত্তিতে) যে মর্যাদা লাভ করেছে এবং রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে আপনি যে পার্থক্য করেন, এই উভয় বিষয় সম্পর্কে আমার মনে প্রশ্ন জেগেছে। আপনার নিজের একটি বাক্য এ বিষয়টি আমার জন্যে আরও জটিল করে দিয়েছে। রাষ্ট্রের সংজ্ঞা আপনি এভাবে দিয়েছেনঃ

State শব্দের সমার্থক শব্দ হচ্ছে রাষ্ট্র। রাজনীতি বিজ্ঞানের পরিভাষায় রাষ্ট্র এমন একটি ব্যবস্থার নাম যে ব্যবস্থা একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ডে বসবাসকারী জনসমষ্টিকে শক্তি প্রয়োগ করে নিজের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখে। (মুসলমান ও বর্তমান রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, ২য় খন্ড, ১০৯ পৃষ্ঠা)

স্টেট বলতে যদি এমন একটি ব্যবস্থাকে বুঝায় যে ব্যবস্থা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রবর্তিত হয়, তাহলে স্টেটের আনুগত্যের অর্থ হবে, বর্তমানে ১৯৩৫ সালের এ্যাক্ট নামে যে প্রচলিত ব্যবস্থা আমাদের উপরে কর্তৃত্বশীল আমরা তারই অনুগত। ইসলামের প্রথম যুগেও কি এ ধরনের পার্থক্য দেখা গেছে?

জবাবঃ রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যকার পার্থক্যকে আপনি মসজিদ ও মুতাওয়াল্লীর মধ্যকার পার্থক্য থেকে সহজে বুঝতে পারেন। কোনো মহল্লার মুসলমানরা একত্রিত হয়ে যদি একটি গৃহকে মসজিদে পরিণত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং এ উদ্দেশ্যে গৃহটি ওয়াকফ করে দেয়, তাহলে সেটি মসজিদে পরিণত হবে। এখন যদি দেখা যায় ঐ গৃহটির আকৃতি মসজিদের মতো নয় এবং ওয়াকফকারীরা সেটিকে মসজিদের মতো করে নির্মাণ করার সংকল্প করেছে, তাহলে যতদিন তার নির্মাণ পদ্ধতিতে কার্যত কোনো পরিবর্তন হবেনা, ততদিন তা তার আসল আকৃতিতেই অবস্থান করবে। কিন্তু এ অবস্থা তাকে মসজিদের তালিকা থেকে খারিজ করে দেবেনা। মহল্লাবাসীরা যে মুতাওয়াল্লীর উপর এ মসজিদ পরিচালনার ভার ন্যস্ত করবে তিনিই কার্যত এটি পরিচালনা করবেন। এখন যদি তিনি নিজের ইচ্ছামত মহল্লাবাসীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই মসজিদে এমন সব কাজ করতে থাকেন, যা মসজিদে সম্পাদিত না হওয়া উচিত, তাহলে একথা বলা ঠিক হবেনা যে, এখানে যেহেতু মসজিদের মতো কোনো কাজ হচ্ছেনা, কাজেই এ গৃহটি মসজিদ নয়। বরং একথা বলাই অধিক নির্ভুল হবে যে, এই মুতাওয়াল্লী যেহেতু এ মসজিদের মধ্যে মসজিদে যে সমস্ত কাজ হওয়া উচিত তার বিপরীত কাজ করছে, তাই এই মুতাওয়াল্লীকে সংশোধন করা কিংবা সরিয়ে দেয়া দরকার।

অনুরূপভাবে এদেশের অধিবাসীরা নিজেদের শাসনতন্ত্রের ভাষায় যখন একথা ঘোষণা করেছে যে, তাদের জাতীয় রাষ্ট্র আল্লাহর বিধান ও নির্দেশের

অনুগত হবে, তখন এদেশটি একটি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে গেছে এবং এর আনুগত্য করা আমাদের জন্যে ফরয হয়ে গেছে। এর গঠনাকৃতি এখনো ১৯৩৫ সালের নক্শা অনুযায়ী অপরিবর্তিত থাকলেও এ বস্তুটি তাকে ইসলামী রাষ্ট্রের তালিকা থেকে খারিজ করে দেয়না। কারণ আমরা তার গঠনাকৃতি পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। যতদিন এ সিদ্ধান্ত কার্যকরী না হয়, ততদিন এর পূর্বের গঠনাকৃতি অপরিবর্তিত থাকলেও এটি একটি বাস্তব অক্ষমতা। মসজিদের মুতাওয়াল্লীর ন্যায় এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনাকারী সরকার যদি ভুল পদ্ধতিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে থাকে, তাহলে একারণে এরাষ্ট্রকে অনৈসলামী রাষ্ট্র আখ্যাদান করার পরিবর্তে আমাদের বলা উচিত যে, এ সরকার একটি ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা করার যোগ্যতা রাখেনা, কাজেই এ সরকারের সংশোধন প্রয়োজন অথবা একে পরিবর্তিত করা উচিত। [তরজমানুল কুরআন, অক্টোবর ১৯৫০]

আদর্শ প্রস্তাবের ব্যাখ্যা

প্রশ্নঃ পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত পাকিস্তানের আদর্শ প্রস্তাবের একটি ধারা নিম্নরূপঃ

"মুসলমানদেরকে যোগ্যতাসম্পন্ন করতে হবে, যাতে তারা ব্যক্তি ও সমষ্টি পর্যায়ে তাদের জীবনকে কুরআন ও সুন্নাতে রসূল নির্দেশিত ইসলামী শিক্ষা ও চাহিদা অনুযায়ী গড়ে তুলতে পারে।"

এ কাজটি মূলত সরকারী প্রশাসনের সাথে সম্পৃক্ত অর্থাৎ সরকার এর জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, আইনগতভাবে সরকারকে বাধ্য করতে, তাছাড়া সরকার গাফলতি, অসহযোগিতা অথবা শত্রুতামূলক পদক্ষেপ নিলে, সে অবস্থায় এ উদ্দেশ্য কার্যকর করার জন্যে শাসনতন্ত্রে কি কি ব্যবস্থা (Provisions) থাকা দরকার। তাছাড়া সরকার এ ব্যাপারে উপেক্ষা, অসহযোগিতা ও শত্রুতামূলক আচরণ করলে তাকে কিভাবে বাধা দেয়া যেতে পারে? সরকারের বিরুদ্ধে একথা আদালতের সামনে পেশ করার জন্যে একজন নাগরিক কি কৌশল অবলম্বন করবে?

জবাবঃ আপনার প্রশ্নগুলোর জবাব দেয়ার আগে দু'টি মৌলিক ভুল বুঝাবুঝির অবসান হওয়া উচিত যার উপর প্রশ্নগুলোর ভিত্ গড়ে উঠেছে।

আপনার প্রশ্নগুলোর মধ্যে প্রথম ভুল ধারণাটি হলো, আপনি আদর্শ প্রস্তাবকে বিভিন্ন খন্ডে বিভক্ত করার উপযোগী মনে করছেন। আপনার ধারণা এর বিভিন্ন অংশের কিছু ভিন্ন ভিন্ন দাবী ও চাহিদা রয়েছে। সেগুলো পূরণ করার জন্যে বর্তমানে যে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজ চলছে তার মধ্যে কতিপয় স্বতন্ত্র আইনগত

ব্যবস্থা নির্দিষ্ট করা উচিত। অথচ প্রকৃতপক্ষে আদর্শ প্রস্তাব অবিভক্ত একটি একক এবং সামগ্রিকভাবে এর প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। এর প্রতিটি ধারা ও উপধারা এই প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে রচিত। দেশের গোটা শাসনতন্ত্র যতক্ষণ না এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি অনুসারে রচিত হবে, ততক্ষণ এর কোনো ধারা বা উপধারা সঠিক অর্থে বাস্তবায়িত করা যাবেনা। যদি এই সম্পূর্ণ প্রস্তাবটি নিজস্ব প্রকৃতি ও প্রাণসত্তাসহ রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের রূপ নিতে না পারে, তাহলে এর একটি ধারা ও তার নিজের অধিকার অর্জন করতে সক্ষম হবেনা।

আপনার প্রশ্নগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় ভুল ধারণাটি হলো, যদি সম্পূর্ণ প্রস্তাবনার ব্যাপারে না হয়, তাহলে অন্ততঃ প্রস্তাবের এ ধারা প্রসংগে আপনি প্রকাশ্যে যা কিছু চিন্তা-ভাবনা করেছেন তা শুধু সংরক্ষণ ও 'তদারকী'র দৃষ্টিকোণ থেকে করেছেন। অথচ আমাদের সামনে আসল প্রশ্ন হলো, আদর্শ প্রস্তাবকে তার সমগ্র শাখা-প্রশাখাসহ প্রবর্তন করা, এর থেকে অথবা এর কোনো ধারা থেকে পলায়নের পথ বন্ধ করা নয়। আদর্শ প্রস্তাব পাকিস্তান রাষ্ট্রকে আদর্শিক রাষ্ট্রের (Ideological State) মর্যাদা দিয়েছে। এ প্রস্তাব অকাট্যভাবে সেই আদর্শও নির্ধারণ করে দিয়েছে যার উপর এই রাষ্ট্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারপর আমাদের করণীয় হলো, নিজেদের দেশের সংবিধান এমন ভাবে তৈরি করতে হবে যাতে যে সরকারই এই প্রস্তাবের অধীনে গঠিত হবে, তারই কাজ হবে এই আদর্শ প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠা করা। যদি এ কাজটি আমরা সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পারি, তাহলে আদর্শ প্রস্তাবের প্রতিটি ধারা উল্লিখিত এ মৌলিক আদর্শানুযায়ী বাস্তবায়িত হবে। এমতাবস্থায় কোনো বিশেষ ধারা সংরক্ষণের জন্যে স্বতন্ত্র ব্যবস্থার প্রয়োজন থাকবেনা, বরং সংবিধান সংরক্ষণের জন্যে সংবিধানে যে রক্ষা ব্যবস্থা থাকে, সেটাই সকল ধারার জন্যে যথেষ্ট হবে।

এসব ভুল ধারণা দূর হওয়ার পর একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, শুধুমাত্র 'গ' উপধারা সংরক্ষণের প্রস্তাব করে কোনো লাভ নেই। এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা আমাদের কোনো সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারবেনা। এর পরিবর্তে আমাদের দেখতে হবে, আদর্শ প্রস্তাবে আমরা যে আদর্শকে দেশের বুনিয়াদ গণ্য করেছি সেটি কি? প্রস্তাবের বিভিন্ন ধারার সাথে এ আদর্শের সম্পর্ক কি এবং সংবিধানে এটাকে সম্পৃক্ত করার উপায় কি? যদি বিষয়টিকে ভালো করে বুঝে নিয়ে সংবিধান প্রণয়নের কাজে সঠিকভাবে সংযোজন করা যায়, তাহলে আমাদের সমগ্র রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা আদর্শ প্রস্তাবের দ্বিতীয় ধারার মতো 'গ' ধারার উদ্দেশ্যও সামগ্রিকভাবে পূর্ণ করবে। এজন্যে ভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ দেখা দেবেনা। কিন্তু এরূপ করা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে আপনি সংরক্ষণের

জন্য যত প্রস্তাবই রাখেন এবং তদারক করার জন্যে যত উপায়ই অবলম্বন করেননা কেন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার সমস্ত কলকব্জা এ উদ্দেশের বিরুদ্ধে চলবে, যা 'গ' ধারায় বর্ণিত হয়েছে।

১. যে Ideology–র উপর ভিত্তি করে আদর্শ প্রস্তাব দেয়া হয়েছে তার স্বীকারোক্তি ও ঘোষণা এই প্রস্তাবনার ভূমিকায়ই দেয়া হয়েছে এবং তা নিম্নলিখিত অংশ ও উপাদান সম্বলিতঃ

'প্রথমত, "সমগ্র জগতে একমাত্র লাশারীক আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত।"

এর অর্থ হলো, স্বয়ং পাকিস্তানের সার্বভৌমত্বও আল্লাহ্ তাআলার জন্যে নির্ধারিত। কোনো বংশ, গোত্র, শ্রেণী, জাতি অথবা পাকিস্তানের গোটা অধিবাসী এই সার্বভৌমত্বের মালিক নয়।

দ্বিতীয়ত, পাকিস্তান রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব আল্লাহ্ তাআলা প্রদত্ত। এ কর্তৃত আল্লাহ্র তরফ থেকে পবিত্র আমানতের (Saered Trust) মর্যাদা রাখে। অন্যভাবে এর অর্থ হলো–এ রাষ্ট্রটি নিজের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সার্বভৌম ক্ষমতার দাবীদার নয়। বরং সে এদেশে আসল সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ্ তাআলার প্রতিনিধি, খলীফা এবং আমানতদার হিসেবে কাজ করে যাবে।

তৃতীয়ত, আল্লাহ্ তাআলা এই কর্তৃত্ব এই দেশের শাসকদেরকে সরাসরি প্রদান করেননি। বরং এর নাগরিকদের মাধ্যেমে প্রদান করেছেন। অন্যভাবে বলা যায়, এই কর্তৃত্বের আমানত এবং খিলাফত ও প্রতিনিধিত্বের আসল ধারক জনগণ। এই ক্ষমতা তাদের মধ্য থেকে এমন একদল লোকের হাতে অর্পণ করবে, যাদেরকে তারা সরকার পরিচালনার জন্যে পছন্দ করবে বা বাছাই করে নেবে। এ জিনিসটি ইসলামী গণতন্ত্রকে এক দিকে পাশ্চাত্য গণতন্ত্র থেকে পৃথক করে দেয় এবং অন্যদিকে পোপদের থিয়োক্রাসি তথা পুরোহিততন্ত্র থেকেও।

চতুর্থত, আল্লাহ্ তাআলা পাকিস্তান রাষ্ট্রকে তার নাগরিকদের মাধ্যমে যেসব ক্ষমতা প্রদান করেছেন তা এ জন্য করেছেন যেনো 'রাষ্ট্র' তা নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে ব্যবহার করে। আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখা সম্পর্কে জ্ঞান কুরআন ও রসূলের হিদায়াতের মাধ্যমে আমরা অর্জন করতে পারি। একারণে এবাক্যের উদ্দেশ্য অবশ্যই এটা যে, পাকিস্তান রাষ্ট্র নিজের প্রাপ্ত স্বাধীন ক্ষমতা কুরআন–সুন্নাত মুতাবেক আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে। এই সীমা অতিক্রম করার অধিকার তার থাকবেনা।

এ হলো সে আদর্শ যার উপর আমাদের রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপনের আমরা সিদ্ধান্ত করেছি। আমাদের শাসনতন্ত্র এর উপর ভিত্তি করে রচিত

হওয়া অপরিহার্য। এটাকে সঠিকভাবে সংযোজন করার নির্ভুল আইনানুগ প্রক্রিয়া হলো, যে শাসনতন্ত্র রচিত হচ্ছে তার চারটে স্বতন্ত্র ধারায় এই মৌলিক বিশ্বাসের উল্লিখিত চারটি অংশকে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করতে হবে।

২. মৌলিক বিশ্বাস নির্ধারণ ও তার ব্যাখ্যার পর উক্ত আকীদার উপর যে ব্যবস্থা গড়ে উঠবে 'আদর্শ প্রস্তাব' তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে। এ ব্যবস্থাটি তিনটি বড় বড় অংশ সমন্বিতঃ

এক. যা দেশের সাধারণ বিষয়াবলীর সাথে সম্পর্কিত।

দুই. যা রাষ্ট্রের মুসলমান সংখ্যাগুরুদের সাথে সম্পর্কিত।

তিন. যা রাষ্ট্রের অমুসলমান সংখ্যালঘুদের সাথে সম্পর্কিত।

আদর্শ প্রস্তাবের ভূমিকায় প্রথমেই একথা ঘোষিত হয়েছে যে, এই তিনটি অংশ সম্পর্কে যে ধরনেরই সাংবিধানিক ব্যাখ্যা সম্পাদিত হোক, তা অবশ্যই সেই আদর্শের ভিত্তিতেই হতে হবে যা ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। এই অংশগুলোর কোনো একটি অংশ সম্পর্কে এমন কোনো শাসনতান্ত্রিক ধারা প্রণয়ন করা বৈধ হবেনা, যা ঘোষিত মৌলিক আকীদার খেলাফ। শাসনতন্ত্র প্রণয়নে যারাই কোনো না কোনো ভাবে অংশ গ্রহণ করছেন একথাগুলো পূর্ণ ঈমানদারীর সাথে খেয়াল রাখা এবং সহকর্মীদেরকে এ রাস্তা থেকে বিচ্যুত না হতে দেয়া তাদের জন্যে অবশ্য কর্তব্য।

৩. রাষ্ট্রীয় সাধারণ বিষয়াবলী সম্পর্কে আদর্শ প্রস্তাবের 'খ' ধারায় এ কথা ঘোষিত হয়েছে যে, "দেশের সংবিধানের ধারাবাহিকতায় "গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সাম্য, সদাচার ও সামাজিক সুবিচারের সেসব নীতি পরিপূর্ণভাবে পালিত হবে, যা ইসলাম আমাদের শিক্ষা দিয়েছে।" অধিকন্তু "চ" ধারায় এ সিদ্ধান্তও ঘোষিত হয়েছে যে, "ভবিষ্যত শাসনতন্ত্রে দেশবাসীকে এমন কতিপয় মৌলিক অধিকারের গ্যারান্টি দেয়া হবে, যার মধ্যে বিশেষ ভাবে এ সব অধিকার শামিল হবে। মর্যাদা ও সুযোগের সমতা; আইনের চোখে সকলের সমান হওয়া; সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিচার; মত, বাক, আকীদা, ঈমান, ইবাদত এবং সমাজের এমন স্বাধীনতা যা আইন ও সাধারণ নৈতিকতার অধীন।"

এসব ব্যাপারে প্রথমে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সাম্য, সদাচার, সহানুভূতি ও সামগ্রিক ন্যায়পরায়ণতার ইসলামী ব্যাখ্যা ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে। তারপর সেগুলোকে শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন অধ্যায়, ধারা-উপধারায় ক্ষেত্র অনুযায়ী সংযোজিত করতে হবে। এসব পরিভাষা দুনিয়ার বিভিন্ন মতাদর্শে পরিদৃষ্ট হয়। তবে প্রত্যেক মতাদর্শে এই শব্দগুলোর প্রায়োগিক অর্থ ভিন্ন ভিন্ন। সমাজতন্ত্রীরা এগুলোকে এক অর্থে ব্যবহার করে। পশ্চিমা গণতন্ত্রের অনুসারীরা ব্যবহার করে

ভিন্ন এক অর্থে। আবার ইসলামে এগুলোর অর্থ সম্পূর্ণ আলাদা। এগুলোর বিভিন্ন অর্থের মধ্যে থেকে আমাদের অনিবার্যরূপে সে অর্থই গ্রহণ করতে হবে, যা পুরোপুরি ইসলামসম্মত এবং সে অর্থ গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে যা আমাদের ব্যাখ্যার পরিপন্থী এবং অন্যদের মতাদর্শে প্রচলিত আছে। উদাহরণ স্বরূপ, অন্যান্য মতাদর্শের মোকাবিলায় ইসলামে গণতন্ত্র স্বেচ্ছাচারী নয় বরং আল্লাহ নির্ধারিত সীমারেখার অনুসারী। একারণে আমাদের পার্লামেন্ট সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন নিয়ে কিংবা সর্বসম্মিলিত ভাবে এমন কোনো আইন প্রণয়ন কিংবা এমন আইন অনুমোদন করতে পারবেনা যা আল্লাহ্ ও রসূলের হুকুমের বিরোধী। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের স্বাধীনতা শুধুমাত্র বৈধ বিষয়াবলীর মধ্যে সীমিত থাকবে। যেসব ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কোনো না কোনো ভাবে মজুদ আছে সেসব ব্যাপারে অবশ্য তাকে কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশিকার আলোকেই সমাধান বের করতে হবে। আমাদের শাসনতন্ত্রের আইন প্রণয়ন অধ্যায়ের সর্বপ্রথম দফায় একথা সুস্পষ্টভাবে লিখিত থাকতে হবে। এর সাথে একটি বিশেষ সময়সীমাও এ উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট হওয়া দরকার, যাতে করে ইংরেজ আমল থেকে আল্লাহ্ ও রসূলের হুকুমের বরখেলাফ যেসব আইন আমাদের দেশে চালু হয়েছে, সেগুলো রহিত অথবা পরিবর্তন করা যায়।

এমনিভাবে মৌলিক অধিকারের ব্যাপারেও অন্যদেরকে আমাদের অন্ধ অনুসরণ করা উচিত নয়। বরং আল্লাহ্ ও রসূলের শরীয়ত দেশের নাগরিকদেরকে যে অধিকার দিয়েছে, তা তাদেরকে দিয়ে দেয়া উচিত। তাদের অধিকারের উপর এমন সব বিধি-নিষেধ আরোপ করতে হবে, যা ইসলামী আইন এবং ইসলামের নৈতিক বিধান তাদের উপর আরোপ করেছে। দেশের নাগরিকদের জন্য যেসব বিষয়ের স্বাধীনতা ইসলাম স্বীকার করেনা সংবিধানে সেসব বিষয়ে নাগরিকদেরকে কিছুতেই স্বাধীনতা দেয়া যেতে পারেনা, যদিও সারা বিশ্ব এ স্বাধীনতা দিয়ে থাকে। আবার ইসলাম যে স্বাধীনতা নাগরিকদের দিয়েছে, তা হরণ করার কোনো সুযোগ আমাদের সংবিধানে থাকতে পারবেনা, দুনিয়ার অন্যান্য শাসনতন্ত্রে এর সুযোগ যতই থাকুক না কেন। যেমন, দেশের কোনো মুসলিম নাগরিক দেশের অভ্যন্তরে অবস্থান করে নিজ ধর্ম পরিবর্তন করবে অথবা দীনের হুকুম-আহকাম অনুসরণ করতে অস্বীকার করবে অথবা অবৈধ ও গর্হিত কাজে প্রকাশ্যে জড়িয়ে পড়বে, কিংবা আল্লাহ্ ও রসূলের হুকুমের ধৃষ্টতাপূর্ণ বিরোধীতা করবে এ স্বাধীনতা ইসলাম তাকে 'দেয়না। সুতরাং ব্যক্তি স্বাধীনতার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অন্যান্য সংবিধানে যে ভাবেই করা হোক না কেন, আমাদের সংবিধানে এমন ধরনের স্বাধীনতা সুস্পষ্ট ভাষায় নিষিদ্ধ হবে। পক্ষান্তরে, বিশ্বের কোনো কোনো

সংবিধানে এমন সুযোগ রাখা হয়েছে, যার ভিত্তিতে সরকার একজন নাগরিকের অপরাধ সাব্যস্ত হওয়া ছাড়াই অথবা আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ না দিয়েই তার সমর্থন করেনা। অতএব আমাদের শাসনতন্ত্রে এর কোনো অবকাশ থাকতে পারেনা।

৪. রাষ্ট্রের মুসলমান নাগরিক সম্পর্কে আদর্শ প্রস্তাবের 'গ' ধারায় উল্লেখ আছে, "ভবিষ্যত শাসনতন্ত্রে মুসলমানদেরকে এমন যোগ্যতাসম্পন্ন করতে হবে যাতে তারা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে নিজেদের জীবনকে কুরআন ও সুন্নাহ্ অনুসারে ইসলামী শিক্ষা ও চাহিদা অনুযায়ী গঠন করতে পারে।" এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে প্রয়োজন হলো–সংবিধানে মুসলমানদের ব্যাপারে রাষ্ট্রের উপর কতিপয় দায়িত্ব সুস্পষ্টভাবে আরোপ করা, যাতে করে এগুলো পালন করার ক্ষেত্রে অবহেলা দেখা দিলে তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ সরকারের এ কর্তব্য হওয়া উচিত যে সে দেশে এমন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করবে যা নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতার প্রবণতা থেকে মুক্ত। এ ব্যবস্থার অধীনে শিক্ষার সকল বিভাগে ইসলামী আদর্শ মৌলিক মর্যাদা লাভ করবে। এ নীতি অনুযায়ী মুসলমানদের কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা গ্রহণ বাধ্যতামূলক হবে।

সে এদেশে সালাত প্রতিষ্ঠা ও যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা করবে এবং নাগরিকদের হজ্জ পালনের ব্যবস্থা করবে। এই সাথে মুসলমানদেরকে ইসলামী বিধানের অনুসারী বানাবে।

সে মুসলমানদের ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনকে এমন সব ত্রুটিমুক্ত করার ব্যবস্থা করবে, যা কুরআন ও সুন্নায় নিষিদ্ধ হয়েছে।

সে সভ্যতা–সংস্কৃতি, সমাজ ও অর্থনীতির সকল বিভাগে ইসলাম নির্দেশিত মূলনীতির অনুসারী হবে এবং সংস্কার সংশোধনের যাবতীয় কর্মসূচীও এই সব মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করবে।

সে সরকারী ব্যবস্থাপনায় অথবা পৃষ্ঠপোষকতায় এমন পদ্ধতি চালু করা থেকে বিরত থাকবে যদ্বারা মুসলমানদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে কুরআন ও সুন্নাহ্ অনুসৃত পথ থেকে সরে যাওয়ার আশংকা থাকে।

৫. আদর্শ প্রস্তাবের 'ঘ' ধারায় অমুসলিমদের সম্পর্কে একথা ঘোষিত হয়েছে যে, "পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে সংখ্যালঘুদের নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন ও কার্যকর করার এবং নিজেদের সংস্কৃতিকে বিকশিত করার যথেষ্ট অবকাশ রাখা হবে।" অধিকন্তু 'ঙ' ধারায় এ নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে যে, সংখ্যালঘু অনুন্নত ও পশ্চাৎপদ শ্রেণীসমূহের বৈধ স্বার্থ সংরক্ষণের যথেষ্ট ব্যবস্থা করা হবে। এই উভয় ধারা অনিবার্যরূপে সে 'ভূমিকার' আওতাধীন যার মধ্যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের মৌলিক অধিকারসমূহ বিশদভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে।

অতএব, এ ব্যাপারে আমরা দুনিয়ার ধর্মহীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর (Secular States) অনুকরণ করতে পারিনা। বরং ইসলামের সঠিক নীতি আমাদের অনুসরণ করতে হবে। ইসলামের শাসনতান্ত্রিক আইনে অমুসলমানদেরকে যেসব অধিকার দেয়া হয়েছে তা আমরা তাদেরকে পুরোপুরি দেবো, যদিও বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্র সংখ্যালঘুদের এমন অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। আমরা তাদেরকে এমন কোনো অধিকার দেবোনা, যা ইসলামী আইনের শব্দাবলী ও প্রাণসত্তার বিরোধী, যদিও দুনিয়ার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ তাদেরকে সে অধিকার দিয়েছে। এ প্রসংগটি যেহেতু উত্থাপিত প্রশ্নের সাথে সম্পর্কহীন, সুতরাং এ বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে পারছিনা এবং এমন আলোচনার প্রয়োজনও হয়না। কেননা–এর আগে এ পত্রিকায় এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে।[১] [তরজমানুল কুরআন, শাবান–যিলকদ ১৩৬৯, জুলাই–সেপ্টেম্বর ১৯৫০]

আইন প্রণয়নে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত

প্রশ্নঃ আপনি সম্ভবত কোথাও লিখেছেন বা বলেছেন যে, ফিকাহ্ ভিত্তিক মাযহাবের ভিত্তিতে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে, তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আইন প্রণীত হবে এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ মাযহাবগুলোর (যেমন পাকিস্তানে হানাফীদের মুকাবিলায়, শাফেয়ী, আহলে হাদীস ও শিয়া প্রভৃতির) জন্যে পারসোনাল ল'–এর ব্যবস্থা থাকবে। আপনার এ কথার অর্থ কি এই যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল তাদের বিশেষ মতের পরিচয় বহনকারী আইন প্রণয়ন করবে? তারা কি তাদের মুজতাহিদ ইমামগণের ইজতিহাদসমূহের ভিত্তিতে আইন রচনা করবে? নাকি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল পূর্বের ইজতিহাদগুলোর পরিবর্তে নিছক কুরআন ও সুন্নাহর নিরপেক্ষ অধ্যয়ন করে যে সব সিদ্ধান্তে পৌঁছবে সেগুলোই আইন হিসাবে গৃহীত হবে? প্রথম অবস্থায় কুরআন–সুন্নাহর পরিবর্তে আইনের উৎস হবে ফকীহ্গণের লিখিত গ্রন্থসমূহ। কিন্তু এ পদ্ধতি সম্ভবত ইসলামী রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিরোধী। দ্বিতীয় অবস্থায় ঐ আইনসমূহের উৎস হবে কুরআন ও সুন্নাহ। কিন্তু বিশেষ ধরনের ফিকাহ্ ভিত্তিক মতের অধিকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ দল তাদের বিশেষ পদ্ধতি পরিহার করে কুরআন ও সুন্নাহ্ অধ্যয়ন করবে এবং তার মধ্যে তাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত চিন্তা, দৃষ্টি–ভংগি এবং মাযহাবী বিদ্বেষ ও মর্যাদাবোধ অনুপ্রবেশ করবেনা, এর কোনো নিশ্চয়তা দান করা যেতে পারে কি?

---

১. দ্রষ্টব্যঃ 'ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার' 'মওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী। 'ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলমানদের অধিকার' মওলানা আমীন আহসান ইসলাহী।

মুজতাহিদ ফকীহগণের উন্নত ও মূল্যবান চিন্তা থেকে ফায়দা হাসিল করা আমার এ সংশয় প্রকাশের উদ্দেশ্য নয়। নিছক কতিপয় প্রশ্ন আমার মনে জেগেছে, এগুলোর সমাধান লাভই মূল উদ্দেশ্য।

জবাবঃ *আমার বক্তব্য কেবল এতটুকুই ছিল যে, দেশের আইন প্রণয়ন ও রচনার ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যে মাযহাবী মতের পক্ষপাতী হবে সেই মতটিই অগ্রাধিকার লাভ করবে। কারণ এটিই কার্যকরী পদ্ধতি। আর সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে মুজতাহিদ ফকীহগণের ফিকাহর উপর নির্ভর করবে, না সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে যাবে, এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আমার ও আপনার কাজ নয়। জনগণের প্রতিনিধিরাই এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। তবুও আমার মতে অবশ্যি এ সম্ভাবনা আছে যে, যতদিন পর্যন্ত দেশে ইসলামী আইনের শিক্ষা এবং ঐ আইনসমূহ বুঝার জন্যে জনগণ পর্যাপ্ত মানসিক ট্রেনিং লাভ না করবে ততদিন অবশ্যি এমন একটি অর্ন্তবর্তীকালের অস্তিত্ব থাকবে যখন জনগণের কার্যক্রমের মধ্যে অস্থিরতা দেখা যাবে। হতে পারে, কখনো হয়তো তারা ফিকাহ থেকে ফায়দা হাসিল করবে এবং তার মধ্যে কোনো দৃঢ়তা থাকবেনা। আবার এও হতে পারে যে, কখনো তারা সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে ফায়দা হাসিল করবে এবং তার মধ্যে কোনো দৃঢ়তা থাকবেনা। 'সাবালকত্বের' যুগ আসার পূর্বে কাজ শুরুর সময় এ অবস্থার সৃষ্টি অনিবার্য। এটা মেনে নিতে হবে। তবে পরবর্তীকালে ইন্‌শাআল্লাহ গভীর জ্ঞান ও শক্তিশালী প্রজ্ঞা ও মননের সৃষ্টি হবে। [তরজমানুল কুরআন, মে–জুন ১৯৫৩]*

৭

কতিপয় অভিযোগ

ও

সংশয়

মাহদী দাবী করার অপবাদ

প্রশ্নঃ মাদ্রাসায়ে আরাবীয়া... -এর অধ্যক্ষ মাওলানা সাহেবের সাথে জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে আলোচনার সুযোগ আমার হয়েছে। তিনি আপনার বিরুদ্ধে মাহদী হওয়ার অপবাদ দিয়েছেন এবং আপনার সাথে তাঁর সাক্ষাতের কথা বলেছেন। এতে উপস্থিত লোকদের মনে কয়েক প্রকার সন্দেহ ঘনীভূত হয়েছে। আপনি কি মাহদী আলাইহিস সালামের আবির্ভাব সম্পর্কে আলামতগুলো নিজের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন? তাদের বারবার তাগীদের পরও কি আপনি লিখিতভাবে এ দাবী অস্বীকার অথবা স্বীকার করার ব্যাপারটি এড়িয়ে গেছেন? মেহেরবানী করে পত্রিকার মাধ্যমে আমার প্রশ্নের সঠিক জবাব প্রদান করবেন।

জবাবঃ মাওলানা... সাহেব এবং তার দলের আলেমগণ আমার বিরুদ্ধে যে প্রপাগান্ডা শুরু করেছেন সে সম্পর্কে আমি অনবহিত নই। তবে এটা আমার জন্য কোনো নতুন অভিজ্ঞতা নয়। বারবার এ ধরনের লোকেরা বিভিন্ন প্রকারের মিথ্যা আমার বিরুদ্ধে রটানোর চেষ্টা করে আসছে। আমি সব সময় ধৈর্যধারণ করেই তাদের মুকাবিলা করে এসেছি। আজ পর্যন্ত আমার অভিজ্ঞতা হলো আল্লাহ তাআলা মিথ্যাকে কখনো বিকশিত করেননা।

উল্লিখিত মাওলানা সাহেব এবং তাঁর সাথীগণ এখানে এসে আমার সাথে যে সব কথা বলেছেন এবং ফিরে গিয়ে যে বিপদ ঘন্টা বাজিয়েছেন এই উভয়ের মধ্যকার পার্থক্য নিয়ে যখন আমি চিন্তা করি, তখন আমি অনুভব করি, এসব লোকের মনে আল্লাহভীতি ও আখিরাতে জবাবদিহির ভয় মোটেই নেই। এরা মনে করেন, এই দুনিয়াটাই সবকিছু, পরবর্তীতে কারো কাছে নিজের কথাবার্তা ও কর্মকান্ডের হিসেব দিতে হবেনা।

আমি সব সময় এই নীতি অবলম্বন করে এসেছি এবং ভবিষ্যতেও এই নীতির উপরই অটল থাকার ইচ্ছা রাখি যে, যাদের মধ্যে আল্লাহভীতি পাইনা এবং যাদেরকে সততা ও বিশ্বস্ততা থেকে বেপরোয়া দেখি, তাদের কথার জবাব কখনো দিইনা। আমি মনে করি, তাদের থেকে প্রতিশোধ নেয়া আমার সাধ্যাতীত ব্যাপার। আল্লাহ তাআলাই তাদের থেকে বদলা নিতে পারেন। আমি আরো মনে করি যে, তাদের মিথ্যাচার খন্ডন করার প্রয়োজন আমার নেই। তাদের পর্দা ইনশাআল্লাহ দুনিয়াতেই উন্মোচিত হবে। সুতরাং তাদের জবাবে আমার কোনো বিবৃতি কোনো কাগজে পাঠিয়ে দেবো এমন আশা আপনি আমার কাছ থেকে করবেননা।

আমার কিতাব 'ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন'-এর কতিপয় বাক্যের ভুল অর্থ করে আমাকে মাহদী হওয়ার দাবীদার গণ্য করা হচ্ছে। এ কিতাবটি

তো আর নতুন কোনো রচনা নয়। আজ থেকে দশ বছর আগে প্রকাশিত হয়েছে। সে সময় থেকে আজ পর্যন্ত বরাবর ছাপা হচ্ছে এবং এখনো যে কোনো জায়গায় আপনি বইটি পেতে পারেন। আপনি নিজেই কিতাবটি দেখুন– দু'চার লাইন কিংবা কয়েকটি প্রবন্ধ নয়, সম্পূর্ণ কিতাবটি পড়ে ফেলুন। আপনি নিজেই জানতে পারবেন, আমি সেখানে মাহ্দী অথবা মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবী করেছি, নাকি যারা দাবী করেছে তাদের দাবীকে খন্ডন করেছি। [তরজমানুল কুরআন, রবিউল আউয়াল–রবিউস সানী ১৩৭০, জানুয়ারী–ফেব্রুয়ারী ১৯৫১]

আরো কতিপয় মিথ্যা অপবাদ

প্রশ্নঃ আল্লাহর দীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠার যে কাজ আমরা নিজেদের সাধ্যানুযায়ী করে যাচ্ছি তাতে আপনার কতিপয় কিতাব যেমন ইসলাম পরিচিতি, ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা ইত্যাদি অনেক সাহায্য করছে এবং এগুলোর চাহিদাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু অন্যদিকে এসব কিতাব বিরোধীদের বিশেষ লক্ষ্যস্থলেও পরিণত হয়েছে। এগুলো থেকে কিছু কিছু বাক্য বাছাই করে তার ভিত্তিতে বিভ্রান্তি ছড়াবার এবং আমাদের বদনাম করার জন্য অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। এমনকি দুনিয়াদার মুফতি সাহেবগণ এসব বাক্যের ভিত্তিতে আমাদের বিরুদ্ধে কুফরী ফতোয়াও জারি করে দিয়েছেন। এ অবস্থায় আপনার কয়েকটি বাক্যই যাবতীয় আলাচনার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে। এই বাক্যগুলো হচ্ছেঃ ১. ইসলাম পরিচিতি, বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ের শেষভাগে আপনি লিখেছেন, "এই পাঁচটি আকীদা, যার উপর ইসলামের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত। এই পাঁচটি আকীদার সারাংশ শুধুমাত্র একটি কালেমার মধ্যেই নিহিত আছে।" তারপর পঞ্চম অধ্যায়ে লিখিত আছেঃ পূর্ব অধ্যায়ে আপনাদের বলা হয়েছে যে, মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঁচটি বিষয়ের উপর ঈমান আনার শিক্ষা দিয়েছেন, অথচ সহীহ হাদীসে পাঁচটি নয়। বরং والقدر خيره وشره এই অংশ সহ ঈমানকে ছয়টি বিষয় সম্বলিত বলে ঘোষণা করা হয়েছে, অভিযোগকারীগণ এদ্বারা এই ত্রুটি বের করার প্রয়াস পেয়েছেন যে, মওদূদী ফিরকা তো (কদর) ভাগ্যের উপর ঈমানই রাখেনা তারা ভালো–মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে হওয়া অস্বীকার করে। তারা কাদরীয়া সম্প্রদায়ভুক্ত, যাদের সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে যে, তারা এই উম্মতের অগ্নিপূজক। এ দলিলের ভিত্তিতে শুধুমাত্র মিথ্যা অপবাদের বেসাতিই চলছেনা, বরং আমাদের প্রকাশ্যে কাফির বলা হচ্ছে এবং আমাদের উপর বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন চলছে। কতিপয় স্থানে জামায়াতে ইসলামীর

সহযোগীদেরকে মসজিদে প্রবেশ করতে বাধা দেয়া হয়েছে। স্বার্থান্বেষী আলেমগণ জনগণের কাছে ওয়ায করে বেড়ায়–খবরদার ! এরাই আমাদের ঈমান চুরি করেছে, এদেরকে যতই কষ্ট দেয়া হবে তা খুব কমই বিবেচিত হবে।

এই অভিযোগের জবাবে আমরা সুস্পষ্টভাবে বলেছি যে, আমরা কদরের উপর ঈমান রাখি। কিন্তু ইসলাম পরিচিতি বইয়ে ঈমানকে শুধু পাঁচটি জিনিস সম্বলিত বলা হয়েছে এবং কারণ হিসেবে বলা হয়েছে তাকদীরের উপর ঈমান আনা আল্লাহর উপর ঈমান আনারই অন্তর্ভুক্ত। আমরা এ জবাবের সমর্থনে মাসয়ালায়ে জবর ও কদর বইখানা পেশ করি। কিন্তু অভিযোগকারীগণ আপনার জবাবের জন্য পীড়াপীড়ি করছেন।

২. দ্বিতীয় অভিযোগ হলো 'ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা' বইতে আপনি

قَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مَعَكُمْ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ.......

এ আয়াতের যে তাফসীর করেছেন, তা সাধারণ মুফাসসিরদের থেকে স্বতন্ত্র। আপনি اِنِّيْ مَعَكُمْ *কে* لَئِنْ اَقَمْتُمْ *এর জবাবে বলেছেন, অথচ সাধারণ তাফসীরকারগণ* اِنِّيْ مَعَكُمْ *কে আলাদা বাক্য বলেছেন।* لئن اقمتم *এর জবাব* لاكفرن عنكم *বলেছেন। আপনি তো কেবলমাত্র* لاكفرن عنكم *এর জবাবই লেখেননি বরং 'ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা' বইয়ে আয়াতের শেষাংশ একেবারে বাদই দিয়েছেন। অভিযোগকারীদের দাবী হলো আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী* انى معكم *কিছুতেই* لئن اقمتم *এর জবাব হতে পারেনা। কেননা, এ দুয়ের মধ্যে "ওয়াকফে জায়েয" আছে। অথচ শর্ত ও জবাবের মধ্যখানে ওয়াকফে জায়েয হতে পারেনা। আমরা এ অভিযোগের কোনো জবাব দিতে গেলে আলেমগণ তৎক্ষণাৎ একথা বলে আমাদের মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করেন যে, আমরা মওদূদী সাহেবের অন্ধ অনুসারী। আমরা ব্যাকরণের নিয়ম লংঘন করেও তার তাফসীর বির রায় (মনগড়া তাফসীর) এর সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন করি। মেহেরবানী করে সুস্পষ্ট করে বলুন, আপনার তাফসীর সঠিক হলে তা কোন্ দলিলের ভিত্তিতে? প্রথম যুগের কোনো মুফাসসির এমন তাফসীর করেছেন কি? যদি না করে থাকেন, তাহলে আপনি কি কারণে এমন নতুন তাফসীর লেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন? বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় এর কোনো নযীর থাকলে সে সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত করবেন।*

৩. 'ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা' বইতে ইবাদতের উদ্দেশ্য আলোচনা করে আপনি যাকিছু বলেছেন তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে যে, আপনি শুধুমাত্র ইবাদতের পার্থিব লাভের দিকটি আলোচনা করেছেন এবং এর উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। পারলৌকিক জীবনের ফায়দার জন্য ইবাদতের আলোচনা আপনি আদৌ করেননি। আর যদি করেও থাকেন, তবু গুরুত্ব কম দিয়েছেন।

আমরা আমাদের জ্ঞানানুযায়ী এর জবাব সুস্পষ্টভাবে দিতে চেষ্টা করি। কিন্তু অভিযোগকারীগণ আমাদের জবাবে পরিতৃপ্ত নন।

যাই হোক, এসব বিষয়ে গ্রন্থকারের ব্যাখ্যা সাধারণভাবে দাবী করা হচ্ছে এবং আমাদের মতেও স্বয়ং আপনার ব্যাখ্যা অধিক ফলপ্রসূ হবে। বরং ঐ কিতাবগুলোর সংশ্লিষ্ট বাক্যগুলোর প্রয়োজনীয় সংশোধন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

পরিশেষে, আপনাকে এ শুভ সংবাদও দিচ্ছি যে, এই কান্ডজ্ঞানহীন বিরোধিতার ঝড় যতই বাড়ছে, আমাদের দীনী দাওয়াতও তার সাথে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন।

জবাবঃ আপনি মালাবারে যে ধরনের বিরোধীতার সম্মুখীন হচ্ছেন, আমরা এখানে তার চেয়ে অনেক বেশী নিকৃষ্ট ও নিম্নমানের বিরোধীতার সম্মুখীন হয়েছি। তবে ধৈর্যসহকারে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে যাওয়া এবং আপন সাধ্যনুযায়ী সরল সঠিক পথ আঁকড়ে ধরা ছাড়া আমাদের জন্য আর কোনো উপায় নেই। যে ব্যক্তি যে উদ্দেশ্যেই আমাদের বিরোধীতা করতে চায়, করুক। কিন্তু পরিশেষে সেই আল্লাহই ফয়সালা করবেন, যিনি আমাদের উদ্দেশ্য ও কাজ সম্পর্কে জানেন এবং তাদের উদ্দেশ্যে ও কাজ সম্পর্কেও অবগত আছেন।

১. 'ইসলাম পরিচিতির' চতুর্থ অধ্যায়ের শেষ ভাগে যেখানে এ কথাটুকু লেখা আছে "এই পাঁচটি আকীদা যার উপর ইসলামের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত" সেখানে আমার পক্ষ থেকে এ ব্যাখ্যা লিখে দিতে হবেঃ

'আমি এখানে ঈমানীয়াতের সংখ্যা বর্ণনা করেছি। এই সংখ্যা কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলোর ভিত্তিতে লেখা হয়েছেঃ

١۔ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ ..... الاية (البقرة : ٢٨٥)

(রুকূঃ ৪০) এবং

٢۔ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ ...... الاية (النساء: ١٣٦)

(রুকূঃ ১৯)। এতে সন্দেহ নেই যে, হাদীসে والقدر خيره وشره কেউ ঈমানীয়াতের মধ্যে গণনা করা হয়েছে। এভাবে মৌলিক আকীদা পাঁচ–এর পরিবর্তে ছয় হয়। কিন্তু ভাগ্যের উপর ঈমান আনা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর উপর ঈমান আনার একটি অংশ বিশেষ। কুরআনে এই আকীদাকে এ ভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে। এ কারণে আমিও এই আকীদাকে তাওহীদের আকীদার ব্যাখ্যায় শামিল করে দিয়েছি। ঠিক এমনিভাবে কোনো কোনো হাদীসে বেহেশত, দোযখ, পুলসিরাত, মীযানকে আলাদা আকীদা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে এগুলো সবই আখিরাতের উপর ঈমানের অংশ ছাড়া

আর কিছুই নয়।

মালাবারের কোনো কোনো আলেম আমার এসব বাক্যের ভুল অর্থ করে অযথা একথা প্রচার করতে শুরু করেছেন যে, আমি তাকদীর অস্বীকারকারী, একথা জেনে আমি দুঃখিত হয়েছি। অথচ যদি তাঁরা সে কিতাবেই "মানব জীবনে তাওহীদ বিশ্বাসের প্রভাব" শিরোনামে লিখিত আলোচনা পড়তেন, তাহলে তারা জানতে পারতেন যে, আমি তাকদীরের ভালো-মন্দ আল্লাহর তরফ থেকে হয়ে থাকে বলে স্বীকার করি। বড়ই দুঃখের বিষয়, লোকেরা অনুসন্ধান ছাড়াই অন্যের উপর ভুল আকীদা আরোপ করে এবং জোর করে তাকে গোমরাহ সাব্যস্ত করার চেষ্টা করে। এ ধরনের মিথ্যা অপবাদের দরুন তারা যে আল্লাহর দরবারে পাকড়াও হবেন, এ ভয় কি তাদের একটুও নেই?

২. وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مَعَكُمْ আয়াতের তাপসীরে আমি "সঙ্গে আছি" কে 'সাহায্য'- এর অর্থে নিয়েছি। এ কারণে আমি বুঝেছি যে, এই সাহায্যের জন্য সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা ইত্যাদি শর্ত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু যদি انى معكم এর অর্থ করা হয়।

انى معكم بالعلم والقدرة فاسمع كلامكم وارى افعالكم

واعلم ضمائركم واقدر على ايصال الجزاء اليكم -

"আমি আমার জ্ঞান ও কুদরতে তোমাদের সাথে আছি, তোমাদের কথাবার্তা শুনি, তোমাদের আমল দেখি, তোমাদের উদ্দেশ্য জানি এবং তোমাদের শাস্তি ও পুরস্কার দেবার ব্যাপারে আমি পূর্ণ ক্ষমতাবান"; তাহলে নিঃসন্দেহে এ বাক্যাংশটুকু নিজেই একটি পূর্ণ বাক্য হবে। এ প্রসংগে যেহেতু দু'টি তাফসীর করার অবকাশ আছে তাই انى معكم এর পরে বিরতি বৈধ কিন্তু অপরিহার্য নয় এবং এ ক্ষেত্রে মিলিয়ে পড়া নিষিদ্ধ নয়।

যারা আমার এই তাফসীরকে তাফসীর "বির রায়" (মনগড়া তাফসীর) বলেন তারা তাফসীর "বির রায়"-এর অর্থ জানেননা। তাফসীর বির রায়-এর অর্থ আগেকার মুফাসসিরদের সাথে মতবিরোধ করা নয় বরং এমন তাফসীর করা যা কুরআন ও সহীহ হাদীসের খেলাফ হয় এবং যা আভিধানিক নিয়ম-নীতিরও বরখেলাফ।

আপনি কিসের উদাহরণ চাচ্ছেন তা আমি বুঝতে পারছিনা। যদি শর্ত ও জবাবে শর্তের মধ্যে অগ্র-পশ্চাত্যের উদাহরণ দরকার হয়, তাহলে তার উদাহরণ অগণিত। স্বয়ং কুরআনে বলা হয়েছে-

قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِىْ مِلَّتِكُمْ (الاعراف : ٨٩)

(আরাফঃ ৮৯) আর যদি শর্ত ও জবাবে শর্তের মধ্যখানে বিরতির উদাহরণ চান, তাহলে এর উদাহরণ পেশ করা আমার কাজ নয়। কেননা, এ ধরনের

কথার সমর্থন কি আমি কখনো করেছি? আমি তো নিজেই বলেছি اِنْ مَعَكُم

–এর পরে বিরতি (ওয়াকফ) সে অবস্থাতেই জায়েয হতে পারে, যখন এটাকে আলাদা বাক্য হিসেবে গ্রহণ করা হবে। কিন্তু যদি এটাকে জবাবে শর্ত রূপে গ্রহণ করা হয় তাহলে বিরতি (ওয়াকফ) জায়েয নয়।

৩. 'ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা' বইতে ইবাদতের ইহলৌকিক নয় বরং নৈতিক ফায়দাকে আমি বেশী গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করেছি। এর কারণ এটা নয় যে, আমি পরকালীন ফায়দার সমর্থন নই। অথবা তাকে কম গুরুত্ব দিয়ে থাকি। বরং এর কারণ হলো– ইবাদতের নৈতিক, সামষ্টিক ও তামাদ্দুনিক উপকারিতা বর্তমান যুগের মানুষের দৃষ্টির অগোচরে চলে গেছে। এগুলো দৃষ্টির আড়ালে চলে যাওয়ার কারণে লোকেরা ইবাদত থেকে গাফিল হতে থেকেছে। এ কারণে আমি এদিকটাকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছি। যে জিনিসটি অব্যক্ত থাকে অথবা যা থেকে লোকেরা গাফিল থাকে, তাকেই প্রকাশ করতে হয়। যা লোকেরা আগে থেকেই জানে তা প্রকাশ করার দরকার হয়না।

পরিশেষে দোয়া করছি আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে সাহায্য করুন এবং ফেৎনাবাজদের চক্রান্ত থেকে আপনাদেরকে হেফাযত দান করুন। নবী মুস্তফা সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন ক্ষেত্রে এ দোয়া পড়তেনঃ

اللّٰهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذبك من شرورهم

আমিও এই দোয়াই করছি। যারা নিছক স্বার্থবাদিতা, গোঁড়ামি ও হিংসার বশবর্তী হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকমের ফিতনা সৃষ্টি করছে এবং যে কল্যাণের জন্য আমরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি তার পথ শুধুমাত্র ব্যক্তিগত হিংসা–বিদ্বেষের কারণে রুদ্ধ করতে চায়, তাদের অনিষ্ট থেকে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই এবং আল্লাহর কাছেই আবেদন জানাই, তাদের ব্যাপারটি যেন তিনিই চুকিয়ে দেন। [তরজমানুল কুরআন, জমাদিউল আউয়াল–রজব ১৩৭০, মার্চ–মে ১৯৫০]

জামায়াতে ইসলামীকে সমূলে উৎখাত করার অভিযান

প্রশ্নঃ আমি আমার .... শহরে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে কাজ করে চলছি। আমার সাথে রয়েছেন আরো কয়েকজন সংগী–সাথী। প্রথম থেকেই ব্যক্তিগতভাবে কিছু লোক বিরোধিতা করছে যার রিপোর্ট আমি জামায়াতের কেন্দ্রে পাঠিয়ে আসছি। কিন্তু বর্তমানে এমন একটি ব্যাপার ঘটে গেছে, যে সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে পথ নির্দেশনা নেয়া অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

গত পরশু থেকে... নামের একজন মাওলানা সাহেব এখানে তাশরীফ

এনেছেন। তিনি এই শহরে নিজের বিশেষ প্রচারপত্র যথেষ্ট পরিমাণে বিলি করেছেন (একটি প্রচারপত্র এই সাথে পাঠিয়ে দেয়া হলো)[১]। তারপর সন্ধ্যায় এক বিরাট জনসমাবেশে তিনি জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে বক্তৃতায় অনেক বিষোদগার করেন। আমি তাঁর কতিপয় বক্তব্য এখানে তুলে ধরছি। এগুলোর প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দিয়ে যথাশীঘ্র আমাকে এগিয়ে চলার পথে সাহায্য করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

উক্ত মাওলানার বক্তব্য নিম্নরূপঃ

১. জামায়াতে ইসলামীর বড় আমীর সাইয়েদ আবুল আ'লা সাহেব না কোনো সনদপ্রাপ্ত আলেম, না কোনো মুফাসসির। শুধুমাত্র নিজের ব্যক্তিগত জ্ঞানের ভিত্তিতে তরজমা ও তাফসীর করে থাকেন। এর নমুনা স্বরূপ 'ইসালামের বুনিয়াদী শিক্ষা'য়

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ -

আয়াতের যে তরজমা করা হয়েছে তা পেশ করেন। 'ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষায়' আয়াতের অনুবাদ করা হয়েছে? "তোমাদের প্রিয় বস্তুসমূহ যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত নেকীর মর্যাদা তোমরা পাবেনা" এ অনুবাদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উক্ত মওলানা সাহেব বলেন, দেখো! তোমাদের সমস্ত ধন–সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় জামায়াতকে না দিলে জামায়াতে ইসলামী তোমাদেরকে নেক ও মুসলমান মনে করেনা। অথচ এর সহজ অর্থ ছিল এই যে, তোমরা নেকীর উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে পারবেনা যদি না নিজেদের প্রিয় বস্তুর কিছু অংশ আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর। অর্থাৎ নেক ও মুসলমান তো তোমরা সব সময়ই আছো যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা বলো আমরা মুসলমান। তবে মুসলমানিত্বে পূর্ণতা তখনই আসবে যখন প্রিয় বস্তুর কিছু অংশ আল্লাহর রাস্তায় কুরবান করে দিবে।

আমি কুরআনের কয়েকটি শাব্দিক অনুবাদে উক্ত মাওলানা সাহেব যে অর্থ করেছেন তাই পেয়েছি। তাহলে আপনার এ অনুবাদের ব্যাখ্যা কি হতে পারে?

২. তিনি আরো বলেন, দেখো! জামায়াতে ইসলামী কুরআনের বিকৃতি ঘটিয়ে নিজের ইচ্ছা মতো তাকে সাজাতে চায়, যা অত্যন্ত জঘণ্য কাজ। তিনি প্রমাণ স্বরূপ তরজমানুল কুরআনের ১২ ভল্যুম, ২ সংখ্যা, সফর মাস মোতাবেক এপ্রিল ১৯৩৮ পৃষ্ঠা ১৩৯ সূরা বাকারার ২৪ রূকূর একটি আয়াত

---

১. এটি দেওবন্দের তিনজন আলেমের ফতওয়া সম্বলিত একটি ছাপানো বিজ্ঞাপন।

পেশ করেন।

উক্ত সাময়িকীটিতে আয়াতটি লিখা আছে এভাবে-

يَاَيُّهَا النَّاسُ ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً ....

অথচ কুরআন মজীদে এভাবে লিখিত আছেঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوا فِى السِّلْمِ كَافَّةً ...

এটা ছিল তার বাস্তব দলিল। বিরোধী লোকেরা এই বিকৃতির দরুন যতোই উত্তেজিত হোক তা অবশ্যি কম। কেননা এটা কুরআনের ব্যাপারে। কুরআন অবিকৃত রাখার জন্য প্রত্যেক মুসলমান সে যতই বেআমল হোক না কেন জান দিতে সদা প্রস্তুত। এমনটা কেন হলো তা আপনার কাছে জানতে চাই।

উক্ত মাওলানা সাহেব বক্তৃতায় আরো বলেন, আমি জামায়াতে ইসলামীকে সমূলে ধ্বংস করার শপথ গ্রহণ করেছি। একাজে যতক্ষণ পর্যন্ত সফলকাম না হবো ততক্ষণ অন্য কাজ করা আমার জন্য হারাম মনে করবো। এই কারণে তিনি কতিপয় আলেমের ফতওয়া ছাপানোর জন্যে পাঠিয়েছেন এবং এগুলোর মাধ্যমেই প্রপাগান্ডা চালিয়ে যাবেন।

জবাবঃ আপনি যে অবস্থার কথা লিখেছেন তা দেশের অন্যান্য জায়গায় বিরাজমান অবস্থা থেকে কিছুমাত্র ভিন্নতর নয়। আমরা এবং আমাদের প্রতিপক্ষ উভয়ই নিজ নিজ আমলনামা তৈরি করে চলছি। যেসব আমলে আমরা আমাদের হিসাবের খাতায় সংযোজন করতে চাই, সেগুলোর জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি। অন্য বাজে কাজে সময় নষ্ট করা আমরা পছন্দ করিনা। অন্যদিকে আমাদের প্রতিপক্ষ আমাদের বিরোধিতা করাকেই যদি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ বলে পছন্দ করে থাকেন, তাহলে তারা অবশ্যই এই কল্যাণকর কাজ বেশী করে করবেন। এক সময় আসবে যখন আমাদের সবার হাতে তার সারা জীবনের কর্মকাণ্ডের তালিকা দেয়া হবে এবং আদেশ করা হবে-

اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا

যে মাওলানা সাহেব জামায়াতে ইসলামীকে সমূলে উচ্ছেদ করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে আপনার এলাকায় ঘোরাফেরা করছেন তাঁর অভিযোগসমূহের সংক্ষিপ্ত জবাব এই ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা বইয়ের যে স্থানটিকে তিনি অভিসম্পাতের লক্ষ্যস্থল বানিয়েছেন, তা "যাকাতের হাকীকত" শিরোনামের অন্তর্গত। আপনি নিজে তালাশ করে দেখতে পারেন।

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ... আয়াতের যে তরজমা আমি করেছি, তা হলো- "যে সব বস্তুর প্রতি তোমাদের মহব্বত আছে সেগুলো আল্লাহর রাহে কুরবান না করা পর্যন্ত তোমরা নেকীর মর্যাদা পেতে পারোনা।" আল্লাহর বন্ধু

হওয়া এবং তাঁর দলে (হিযবুল্লাহ্) শামিল হওয়ার জন্যে আল্লাহর মহব্বতের উপর জান-মাল-সন্তান-সন্ততি, দেশ-জাতি তথা প্রত্যেক বস্তুর মহব্বত বিসর্জন দেয়া জরুরী এ তাৎপর্য আমি এই আয়াত থেকে গ্রহণ করেছি। এর সাথে মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর (র) তরজমা ও ব্যাখ্যার প্রতিও একটু নজর দিন। তিনি তরজমা করেছেন এভাবে- "তোমরা পরিপূর্ণ মংগল কখনো অর্জন করতে পারবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেদের প্রিয় বস্তু ব্যয় না করবে।" আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেনঃ সম্ভবত ইহুদীদের কথা উল্লেখ করে আয়াতটি এ কারণে বলা হয়েছে যে, ইহুদীদের কাছে তাদের রাষ্ট্র খুবই প্রিয় ছিল, যার মোহে তারা নবীর তাবেদার হতে পারছিলনা। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত তারা রাষ্ট্র ত্যাগ করতে পারেনি, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় ঈমানের মর্যাদায় অভিষিক্ত হতে পারেনি। (দেখুন বড় সাইজের হামায়েল শরীফ, মুদ্রিত, ১৩৫৭ হিঃ পৃঃ ৯৭) আমরা তরজমার সাথে মাওলানা থানভীর তরজমার তেমন কোনো পার্থক্য নেই এবং তাঁর ব্যাখ্যার সাথে তাৎপর্যের দিক দিয়েও বিরাট তারতম্য পরিলক্ষিত হয়না, এটা প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই দেখে নিতে পারেন। তারপর অভিযোগকারী আমার তরজমা ও ব্যাখ্যা থেকে যে অর্থ বের করেছেন তার উপর দ্বিতীয় বার দৃষ্টি দিয়ে দেখুন। আমার তরজমা ও ব্যাখ্যা থেকে এ তাৎপর্য কিভাবে বের হলো যে, কোনো ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের সমুদয় ধন-সম্পদ আল্লাহর রাহে জামায়াতে ইসলামীর কাছে সোপর্দ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত জামায়াত তাকে নেক ও মুসলমান মনে করেনা? এভাবে যারা অন্যকে গালমন্দ করার উদ্দেশ্যে নিজের পক্ষ থেকে কথা বানিয়ে অন্যের সাথে সম্পৃক্ত করে তাদের এহেন তৎপরতা স্বতঃই একথা প্রকাশ করে যে, তারা স্বার্থের মোহে বিরোধিতা করে, আল্লাহর ওয়াস্তে নয়।

২. দ্বিতীয় অভিযোগের ভিত্তিতে আমি আপনার উদ্ধৃতি মোতাবেক ১৯৩৮ সালের এপ্রিল সংখ্যা তরজমানুল কুরআন বের করে দেখলাম। আয়াতের উল্লেখ করতে গিয়ে এখানে বাস্তবিকই আমার সাংঘাতিক ভুল হয়ে গেছে। পরিতাপের বিষয় যে, এই ভুলের দরুন অনুবাদেও ভুল হয়ে গেছে। ১৩ বছর আগে এই ভুল হয়। এই দীর্ঘ সময়ে আজ পর্যন্ত ভুলটির উপর না আমার নজর পড়েছে, না কেউ এদিকে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। অভিযোগকারী বুযুর্গের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তিনি কঠোর পরিশ্রম করে আমার ভুল অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন এবং তাঁর মাধ্যমেই এমন মারাত্মক ভুল সম্পর্কে আমি জানতে পেরেছি। আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন, এটা ভুল ছিল, নাকি স্বেচ্ছাকৃত বিকৃতি তাতো তিনিই ভালো জানেন। মোটকথা, আমার ব্যাপারটি তো আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত। অভিযোগকারী বুযুর্গ যদি জনসাধারণকে প্রকৃত বিচারক মনে করেন তাহলে এটাকে জ্ঞাতসারে কুরআন বিকৃতির এ রূপ দিয়ে জনগণের সামনে পেশ

করতে পারেন এবং এভাবে এ থেকে এ পৃথিবীতে যত চান স্বার্থোদ্ধার করতে পারেন, এ স্বাধীনতা অবশ্যি তাঁর আছে।

এবার আপনার প্রেরিত প্রচারপত্রে মাওলানা মাহ্দী হাসান সাহেব মাওলানা এযায আলী সাহেব ও মাওলানা ফখরুল হাসান সাহেবের ফত্ওয়া সম্পর্কে কয়েকটি কথা আরয করতে চাই। ফত্ওয়ায় শুধু ফায়সালা শুনিয়ে দেয়া হয়েছে দলিল-প্রমাণ ছাড়াই। মাওলানা মাহ্দী হাসান সাহেব বলেননি যে, আমার কিতাব ও প্রবন্ধের কোনো কথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের তরীকার খেলাফ। আমি সাহাবায়ে কিরাম ও আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীন সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করিনা। তিনি একথা কোত্থেকে বের করলেন? হাদীসসমূহ সম্পর্কে আমার কি ধারণা যা তাঁর মতে 'ঠিক নয়'। "আমলবিহীন মুসলমানকে আমি মুসলমানই মনে করিনা" একথা আমি কোথায় লিখেছি। অন্য বুযুর্গদ্বয়ও কিছুটা অতিরিক্ত কষ্ট স্বীকার করে সেই বিষ উপস্থিত করেননি যা জামায়াতের পক্ষ থেকে মধুর সাথে মিশিয়ে মুসলমানদেরকে পান করানো হচ্ছে। কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে জামায়াতে ইসলামীর "আসলাফ" (পরিতাপের বিষয় যে, দুই ভদ্রমহোদয় ভদ্রজনোচিত ভাষা প্রয়োগ করার মনমানসিকতা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছেন) সাব্যস্ত করার দলিল প্রমাণের কথাও তারা বলেননি। জামায়াতকে কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের চেয়েও বেশী বিপদজ্জনক মনে করারও কোনো প্রমাণ তারা দেননি। যদি এই সংক্ষেপকরণ নিছক সময়ের স্বল্পতার কারণে হয়ে থাকে, যেমনটি তারা বলেছেন, তাহলে এটা বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, যাদের কাছে দলিল-প্রমাণ ও কারণসমূহ বর্ণনা করার সময় নেই, তারা অপরের উপর এ ধরনের অর্থহীন ও বাজে ফত্ওয়াবাযী করার যথেষ্ট সময় পেয়ে যান। কিন্তু যদি এর কারণ এই হয়ে থাকে যে, এই ভদ্র মহোদয়গণের কাছে নিজেদের ফত্ওয়ার সপক্ষে কোনো যুক্তিসংগত প্রমাণ না থাকায় তারা কেবলমাত্র কয়েক ছত্রের হুকুম জারী করেই প্রতিহিংসার জ্বালা মিটাবার ব্যবস্থা করেছেন, তাহলে এমতাবস্থায় তাদের জন্য আল্লাহর কাছে হেদায়াতের দোয়া করা ছাড়া আমার আর কিছু বলার নেই। যা হোক, আপনি সুযোগ পেলে এই মহোদয়দেরকে আমার এ পয়গাম পৌঁছে দিবেন যে, আমার জামায়াতে ইসলামীর সাথে সম্পর্কিত লোকদের এবং সাধারণ মুসলমানদের আপনাদের উপর এ নৈতিক অধিকার আছে যে, আপনারা নিজেদের ফত্ওয়ার দলিল ও কারণ বর্ণনা করবেন। তাদের যে কথা সত্য হবে তা মেনে নিতে ইন্শাআল্লাহ্ বিন্দুমাত্র দ্বিধা করা হবেনা। আমি আমার নিজের কর্মসীমার মধ্যে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, নিজের ভুল স্বীকার করতে আমি কখনো সংকোচ করিনি এবং ভবিষ্যতেও করবোনা। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হলো, আমার ভুল দলিলসহ প্রমাণ করতে হবে। গালি-গালাজের মাধ্যমে নয়। আর যদি তাদের কোনো ভুল বুঝাবুঝি হয়ে থাকে,

তাহলে তা দলিলসহ দূর করার চেষ্টা করা হবে। তরজমানুল কুরআনের পৃষ্ঠাসমূহ এ ধরনের খেদমতের জন্য প্রস্তুত। যেভাবে মাওলানা হাকীম আবদুর রশীদ মাহমুদ সাহেব গাংগুহীর প্রবন্ধ হুবহু এখানে প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে, তেমনি তাদের ভাষ্যসমূহও কোনরূপ পরিবর্তন ছাড়াই হুবহু সন্নিবেশিত করা হবে এবং তার জবাব দেয়া হবে। প্রচারপত্র বিলিকারীদের হাতে বাজে অস্ত্র তুলে দেবার চেয়ে নিজের পান্ডিত্যে মর্যাদাসহ সামনে এগিয়ে আসা এবং নিজের সব কথা অবাধে ব্যক্ত করে অপরের সব জবাব শুনার জন্যে তৈরী থাকা অধিক ভালো।

অন্যান্য যারা মাঝে মাঝে নিজেদের সভা–সমাবেশে আমার ও জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে কথা বলে থাকেন, তাদের কাছেও আমার উপরোক্ত আরয রইলো। কোথাও তাদের সাথে দেখা হলে আরয করবেন যে, আপনাদের তাকওয়াহ্ ও মর্যাদার দিক থেকে এ পদ্ধতি মোটেও উপযোগী নয়। উত্তম পন্থা হলো, নিজেদের আপত্তি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অবহিত করুন। তাতে তার চিন্তাধারার সংশোধন হয়ে যাবে অথবা আপনাদের বিভ্রান্তি দূর হয়ে যাবে। আমি জানি, তাদের অধিকাংশই জামায়াতে ইসলামীর বইপত্র পুরোপুরি দেখেননি, বরং কিছু সংখ্যক প্রিয়পাত্রের কাছ থেকে শ্রুত কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেছেন, অথবা কিছু লোক খন্ডিতাংশ টুকে টুকে অত্যন্ত চতুরতার সাথে তাদেরকে দেখায় আর এই দুর্বল ভিত্তির উপর তারা কু–ধারণার বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করে ফেলেন। যদি এই মহোদয়গণ নিজ দায়িত্বে ও কর্তব্য অনুধাবন করে কিছুটা নৈতিক হিম্মত সহকারে কাজ করেন এবং আমাদেরকে তাদের অভিযোগগুলো জানান, তাহলে আমরা আমাদের ভূমিকা সম্পর্কে তাদেরকে ভালোরূপে জানাবার চেষ্টা করবো। তবে এটা ঠিক, যারা প্রচারপত্র নির্ভর এবং যাদের পত্র–পত্রিকা অনবরত প্রতিহিংসার আগুন জ্বালিয়ে চলে আমরা তাদেরকে জবাব দেবার প্রয়োজন বোধ করিনা। [তরজমানুল কুরআন, জমাদিউল আউয়াল–রজব ১৩৭০, মার্চ–এপ্রিল ১৯৫১]

বিরোধীদের ফতওয়া

প্রশ্নঃ জামায়াতে ইসলামীর অধীনে প্রতিষ্ঠিত সহযোগী ইউনিট' আমাদের এলাকায় আগে থেকেই ছিল। তবে জামায়াতের নিয়মিত কাজ সবেমাত্র শুরু হয়েছে। জামায়াতের প্রতি জনজোয়ারের স্রোত দেখে আমাদের দেওবন্দ, সাহারানপুর, দিল্লী ও থানাভূনের আলেমগণ যে ফতওয়া প্রকাশ করেন, তা আপনার খেদমতে পাঠিয়ে দিলাম। ওলামায়ে দেওবন্দের একটি ফত্ওয়া, যা বর্তমানে লেখা হচ্ছে, গ্রন্থাকারে প্রকাশ পেলেই পাঠিয়ে দেয়া হবে।

এসব ফতওয়ার ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকা ঠিক নয়। চিন্তা-ভাবনা করে জবাব দেবেন। দেশ বিভাগের পর ভারতের জামায়াতে ইসলামীর সাথে আপনার কি সম্পর্ক এ কথাও লিখবেন। সম্পর্ক কিছু আছে নাকি নেই? ভারতের জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা আবুল লাইস ইসলাহী আসলেই আমীর নাকি শূন্যপদ পূরণের জন্য নামে মাত্র আমীর। অধিকন্তু যদি আপনি কোনো আলেমের সাহচর্য লাভ করে থাকেন, তবে তাও লিখবেন। এসব ফতওয়া সম্পর্কে যদি আপনার আরো কোনো কারণ জানা থাকে, তাহলে তাও লিখবেন, কেন এমন প্রলয়ংকরী ঝড় উঠছে?

জবাবঃ *আপনার প্রেরিত ফতওয়াগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়লাম। এগুলো জবাব দেবার উপযুক্ত নয়। এগুলো কেবল রেখে দেয়া যেতে পারে এবং সে সময়ের অপেক্ষা করা যেতে পারে যখন আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেককে নিজ নিজ কাজের পুরোপুরি প্রতিদান দেবেন। আমি অনেক চেষ্টা করেছি এ ফতওয়াগুলোর মধ্য থেকে আমার ভুল খুঁজে বের করতে। দলিল-প্রমাণ সহ্কারে প্রমাণ করেছেন এমন কোনো ভুল ধরা পড়লে আমি নিশ্চয়ই জবাবদানের পরিবর্তে ভুল স্বীকার করে নিতাম এবং নিজের সংশোধন করতাম। আমার কোনো লেখা বা কর্ম দ্বারা যদি বাস্তবিকই ঐসব মহোদয়দের ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে কিনা সেটাও জানার চেষ্টা করেছি। সে সব ফতওয়ায় যদি এ ধরনের কিছু নজরে পড়তো তাহলে সেটাও শোধরাতে আমি কখনো সংকোচ করতামনা। কিন্তু গভীরভাবে অধ্যয়ন করার পর আমি নিশ্চিত হয়েছি যে, এসব ফতওয়ায় এই উভয় ধরনের কথা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। ফতওয়াগুলো বিকৃতি, মিথ্যাচার, দোষারোপ ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং এগুলো সম্পর্কে মৌন থাকাই আমি ন্যায়সংগত মনে করি। এসব ফতওয়া দেখে যদি কোনো মুসলমান আমার সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করে অথবা আমি যে কল্যাণের আমন্ত্রণ জানাই তা থেকে দূরে থাকে, তাহলে তার দায়-দায়িত্ব বিশেষত ঐসব লোকের উপরই বর্তাবে যারা* مناع للخير *'কল্যাণের পথ রোধকারী' হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন্ উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়েছে তা আল্লাহই ভালো জানেন।*

আপনি বলতে পারেন, তুমি এসব ভুল বর্ণনা ও বিকৃতির পর্দা উন্মোচন করোনা কেন, যা কল্যাণের দিকে আহ্বানের পথে বাধার সৃষ্টি করতে পারে? আমি বলবো, যদি একটি ফতওয়া বা একটি প্রচারপত্র হতো, তাহলে অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও সম্ভবত এসব ভুলের পর্দা উন্মোচন করার চেষ্টা করতাম, যদিও এ ধরনের কাজের প্রতি মনোযোগী হওয়া আমার কাছে বড়ই অপছন্দনীয়। কিন্তু এখানে তো ইন্দো-পাকিস্তানে, সমগ্র উপমহাদেশে চতুর্দিকে ফতওয়া, পুস্তিকা, প্রচারপত্র এবং প্রবন্ধ-নিবন্ধের যেন ভয়া

ফসল জমিতে উৎপন্ন হচ্ছে। এই ফসল উৎপাদনে কমিউনিস্ট, সোশ্যালিস্ট, ফিরিংগী প্রভাবিত নাস্তিক, কাদিয়ানী, হাদীস অস্বীকারকারী, আহলে হাদীস, বেরলভী, দেওবন্দী সবাই যার যার মতে মেহনত করে যাচ্ছে এবং প্রতিদিন তারা নতুন নতুন চারা রোপণ করে চলছে। তাদের এই ফসলকে কেটে শেষ করবে কে? আর কতটুকুই বা করতে পারবে? যদি দুনিয়াতে আমাকে আর কোনো কাজ না করতে হতো, তাহলে এই ফসল কেটে নিঃশেষ করার কাজে আমি নিজের জীবনকাল ব্যয় করতাম। জামায়াতে ইসলামী যদি নিজের উদ্দেশ্য ও কর্তব্য ছিঁকেয় তুলে রাখে, তাহলে সে এ কাজে নিজের শ্রম বিনষ্ট করতে পারে। আমাদের প্রতিপক্ষের কামনা এটাই, আমরা এই বোকামিতে ফেঁসে যাই এবং এই বিবাদ-বিসম্বাদে মত্ত হয়ে পড়ি আর এই সুযোগে ফাসিক-ফাজির লোকদের নেতৃত্বের কাজ নিষ্কন্টক হয়ে যাক। কিন্তু আমরা অপরিপক্ক ও বোকা নই। অমন কাঁচা কাজ আমরা করিনা। আমরা বলি, এটা শয়তানের ফসল। শয়তানই এ ফসল কাটবে। যদি সে নিজে না কাটে, তবে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী শেষ পর্যন্ত সে কাটতে বাধ্য হবে।

আপনার প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত জবাব হলোঃ

১. দেশ বিভাগের পর ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে মুসলিম লীগের মতো জামায়াতে ইসলামীও যথারীতি ভাগ হয়ে যায়। বর্তমানে ভারতীয় জামায়াতে ইসলামীর সংগঠন পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আমরা তাদের দায়িত্বে শরীক নই, তারাও আমাদের দায়িত্বে শরীক নয়।

২. আমি পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর যে ধরনের আমীর, মাওলানা আবুল লাইস ইসলাহী সাহেবও হিন্দুস্তান জামায়াতে ইসলামীর সে ধরনের আমীর। যদি আমি নামেমাত্র কিংবা শূন্যপদ পূরণ করার আমীর না হই, তাহলে তার সম্পর্কে এমন খারাপ ধারণা করার হেতু কি? যদি আমাদের এখানকার নীতির উপর তাদের অথবা তাদের নীতির উপর আমাদের হস্তক্ষেপ করার অধিকার থাকতো, তাহলে তা এ ধরনের খারাপ ধারণা পোষণ করার একটা যুক্তিসংগত ভিত্তি হতে পারতো। কিন্তু দেশ বিভাগের পর আমাদের মধ্যে এ ধরনের সম্পর্ক বহাল আছে একথা কেউ প্রমাণ করতে পারবেনা। এমনকি আমাদের প্রাইভেট পত্রালাপ পর্যন্ত বন্ধ আছে যাতে কেউ ফেতনা সৃষ্টির বাহানা না করতে পারে। পরিতাপের বিষয়, লোকেরা বিরোধিতার কারণে অন্ধ হয়ে মুখ থেকে বিনা প্রমাণে এইসব অমূলক কথা বের করে। তারা এতটুকু চিন্তা করেনা যে, এ ধরনের কথা রচনা করা তো মনের জ্বালা মিটানোর উপায় মাত্র, কিন্তু তা দু'দেশের বর্তমান রাজনৈতিক

অবস্থার প্রেক্ষাপটে শত শত মানুষের জীবনের জন্য একটা মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে।

৩. আমি কোন্ আলেম থেকে ফায়েয হাসিল করেছি এটা একটা অর্থহীন প্রশ্ন। প্রশ্নটা তাকেই করা উচিত যে কোনো ইলমী কাজ করেনি এবং যার ইলমী মান-মর্যাদার মূল্যায়ন করার জন্য মাদ্রাসার সনদ এবং উস্তাদের নাম ছাড়া আর কোনো মাধ্যম নেই। আমি কাজ করে চলছি এবং আমার কোনো কাজ চুপিসারে লুকিয়ে নেই, বরং ছাপা হয়ে সকলের সামনে উপস্থিত। এসব কাজ দেখে সকলেই জানতে পারবে আমি কি পরিমাণ পড়াশুনা করেছি এবং যা কিছু পড়েছি তা কতটা হযম করতে পেরেছি।

৪. আমার ও জামায়াতে ইসলামীর বিরোধিতা বর্তমানে এতো জোরেশোরে কেন শুরু হয়েছে এবং এসব ফতওয়া কি কারণে দেয়া হচ্ছে, তা জানার কোনো উপায় আমার কাছে নেই। যদি এটা আমি জানতামও, তবুও কেউ অভিযোগ করে থাকলে কেন করেছে এ ধরনের প্রশ্ন আসলেই অবান্তর। অভিযোগকারীর অভিযোগ সংগত নাকি অসংগত আমার দেখার বিষয় শুধু সেটা। সংগত অভিযোগ হলে তা মেনে নিই এবং তার যুক্তিসংগত জবাব দিই। আর অযৌক্তিক আপত্তি হলে তা বাতাসে মিলিয়ে যাবার জন্য ছেড়ে দিই। [তরজমানুল কুরআন, জমাদিউল উলা-রজব ১৩৭০, মার্চ-মে ১৯৫১]

রোগের চিকিৎসা

প্রশ্নঃ হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় আপনার চিঠি পেলাম। চিঠিটি আমার মন-মগজে যে প্রভাব বিস্তার করেছে, তা লিখে প্রকাশ করা যায়না। আমি যে চিন্তা-ভাবনার কথা প্রকাশ করেছি তা নিয়ে আমি প্রতিটি দলে প্রবেশ করেছি, কিন্তু প্রত্যেক জায়গা থেকেই নিরাশ হয়ে ফিরে এসেছি। পরিশেষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে, এখন আর কোনো দলেই যোগদান করবোনা। বরঞ্চ ব্যক্তিগতভাবে যতটুকু দীনের খেদমত করা সম্ভব, তা আঞ্জাম দিয়ে যাবো। এ ধারণার বশবর্তী হয়েই স্থানীয় মসজিদে ফযর নামাযের পর তাফসীরে হক্কানী এবং ঈশার পর কাজী সালমান মানসুরপুরীর "রাহমাতুল্লিল আলামীন" ১লা অক্টোবর, ১৯৪৯ থেকে শুনানো শুরু করেছি। এ কাজের দরুন আমার চিন্তা আরো পাকাপোক্ত হয়ে যায়। '৫১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঘটনাক্রমে একজন লোকের মাধ্যমে আপনার "মুসলমান আওর মওজুদাহ্ সিয়াসী কাশমকাশ" গ্রন্থটির তৃতীয় খন্ড[১] পেয়ে যাই। বইটি আমি কয়েকবার পড়ি। এ বই পড়ে আমার চিন্তা-রাজ্যে

---

১. এ গ্রন্থটি বর্তমানে 'উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলমান' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

পরিবর্তন আসে। এখন আমি জামায়াতে ইসলামীর প্রতি মনোযোগ দিয়েছি। এর সাহিত্য অত্যন্ত মনোনিবেশ সহকারে পড়েছি। তারপর মসজিদে খুতবাত (ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা) বইটি শুনানো শুরু করে দিয়েছি। এ কাজ শুরু করার পরই ইতিপূর্বে উল্লিখিত ফিতনাটি দেখা দেয়। এখন এখানে একের পর এক নিত্য নতুন ফতওয়ার আমদানী হচ্ছে। সেগুলোর অনুলিপি আপনার খেদমতে পাঠানো হচ্ছে। এদিকে জামায়াতের সম্মেলন থেকে ফিরে এসে জানতে পারলাম "মওদূদী চিন্তা" সম্পন্ন লোক যদি মসজিদে "খুতবাত" ইত্যাদি পড়ে, তাহলে তাকে লাঠিপেটা করা উচিত বলে গ্রামবাসী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আমার এলাকার জামায়াতের আমীরের কাছে এ বিষয়ে বিস্তারিত পরামর্শ চেয়েছি। তিনি জবাবে পাঠের এই সিলসিলা বন্ধ করে দেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

এই অর্ন্তবর্তী কালে আমি কিছু সংখ্যক বড় বড় আলেমের কাছে চিঠিপত্র লেখালেখিও করি। তাদের চিঠিপত্রের কিছু অনুলিপি পাঠিয়ে দিচ্ছি। বিবরণগুলো সাজানোর জন্য আমি সংখ্যা বসিয়ে দিলাম।

বাস্তব কাজের জন্য সমস্ত পরামর্শ তো স্থানীয় জামায়াত থেকে পেয়েই আসছি। কিন্তু এসব ফতওয়া ও চিঠি–পত্রের বিষয়বস্তু যেহেতু আপনার ব্যক্তিত্ব ও গ্রন্থরাজির সাথে সম্পৃক্ত, তাই এগুলো আপনার কাছে পৌঁছে দিচ্ছি। মেহেরবানী করে আপনি এগুলোর জবাব লিখে দেবেন এবং জবাবগুলো প্রকাশ করার অনুমতি দেবেন।

জবাবঃ হঠাৎ দেওবন্দ সাহারানপুর থেকে শুরু করে মাদ্রাসায়ে আমিনিয়া পর্যন্ত এই প্রচন্ড ঝড় শুরু হবার কারণ আপনার চিঠি থেকে জানতে পারলাম। অন্যান্য কারণও থাকা সম্ভব। তবে আপনার জন্য (এবং সম্ভবত আপনার মতো আরো কিছু লোকের জন্যও) একটি সম্ভাব্য কারণ হলো, দাওয়াত দেবার ব্যাপারে অতি উৎসাহ দেখানো। উৎসাহের আতিশয্যে আপনি নিজে এগিয়ে গিয়ে ইলমের চর্চা, ফতওয়া ও ধর্মীয় নেতৃত্বের বড় বড় আসনে অধিষ্ঠিত লোকদেরকে জামায়াতে ইসলামী ও তার আন্দোলনের দিকে আহ্বান করেছেন। অথচ বারবার এ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। সম্ভবত আপনার মতো কিছু অতি উৎসাহী লোক এসব দীনী কেন্দ্রের চারপাশের জগতে প্রবেশ করে কিছুটা দীন প্রচারের উৎসাহ দেখিয়েছেন এবং তা উল্লিখিত বুযুর্গদের বিস্ফোরিত হওয়ার কারণ হয়েছে। আপনি ভারত বিভাগের আগের জামায়াতের কার্য বিবরণী পড়ে দেখুন। কার্য বিবরণীর একাধিক জায়গায় এর উল্লেখ আছে যে, নেতৃস্থানীয় আলেমদেরকে দাওয়াত দেয়ার জন্য লোকেরা বারবার তাকীদ দিয়েছে এবং আমি সব সময় নিজে শুধু যে এটা

এড়িয়ে যেতাম তাই নয় বরং জামায়াতের সাধারণ সদস্যদেরকেও (যারা নিজেরা এই শ্রেণীর লোকদের সাথে সম্পর্কিত, তারা ছাড়া) তাকীদ দিতাম যাতে ঐ সব আলেমদের কাছে দাওয়াতের উদ্দেশ্যে যাওয়া তো দূরের কথা, তাদের ধারে–কাছেও যেন না যাওয়া হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, লোকেরা আমার এই নিষেধের তাৎপর্য বুঝতে পারেনি ফলে এর বিপরীত ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। কতিপয় লোক আমার উপর উল্টো এ খারাপ ধারণাও পোষণ করছে যে, আমি আত্মম্ভরিতা ও অহংকারের বশবর্তী হয়ে ধর্মীয় আস্তানায় হাযির হতে অস্বীকার করে আসছি। অথচ আমার অবস্থা হলো, উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য প্রতিপক্ষের শিবিরে আমি পায়ে হেঁটে যেতেও রাযী আছি এবং ইনশাআল্লাহ সব সময় এ জন্য তৈরি থাকবো। এসব আস্তানার প্রতি আমার অনীহা এবং অন্যদেরকে দাওয়াতের উদ্দেশ্যে তাদের কাছে যেতে নিষেধ করার কারণ কখনো সেটা ছিলনা, যা লোকেরা খারাপ ধারণার বশবর্তী হয়ে বুঝেছে। বরং এটা ছিল একটি দীনী প্রয়োজন ও কল্যাণকারিতা, যা আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের আলোকে একটি সময় পর্যন্ত খুব ভালো করে বুঝতে পেরেছিলাম।

প্রকৃত অবস্থা হলো, আমাদের সম্মানিত আলেমদের অধিকাংশই জ্ঞান–বুদ্ধির স্বল্পতার কারণে, অথবা শক্তি সামর্থ কম হওয়ার দরুন, কিংবা নিজেদের অযোগ্যতার অনুভূতির কারণে দীন ও দুনিয়ার মধ্যে বিভক্তি মেনে নিয়েছিলেন। এ চিন্তাধারাটি আজ থেকে বহুদিন আগে খৃষ্টানদের মাধ্যমে মুসলমানদের এখানে আমদানী হয়। এর উপর তারা সন্তুষ্ট হয়ে রয়েছেন। তাঁরা বাহ্যত যদিও এটাকে পুরোপুরিভাবে স্বীকার করেননা কিন্তু বাস্তবে তাঁরা স্বীকার করে নিয়েছেন যে, রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং পার্থিব রাষ্ট্রযন্ত্র ও নেতৃত্ব বেদীন লোকদের হাতে থাকবে, তারা ফাসিক–ফাজির অথবা কাফির–মুশরিক যাই হোক না কেন। আর কেবল ধর্মের সীমিত জগতে তাদের সিলমোহর জারি থাকবে। যদিও এই সীমা ধর্মহীন নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের অনবরত কষাঘাতে ক্রমাগত সংকুচিত হয়েই চলেছে। দীন–দুনিয়ার এই বিভক্তি কবুল করার পর এই ভদ্রমহোদয়গণ নিজেদের সমস্ত শক্তি দু'টি কথার জন্য ব্যয় করতে থাকেন। এক. নিজেদের সীমিত ধর্মীয় সাম্রাজ্যের হেফাযত করা, যার বিষয়াবলী ও প্রাসংগিক ব্যাপারে কারো হস্তক্ষেপ তাদের কাছে অসহনীয়। দুই. এমন ধর্মহীন কর্তৃত্বের সাথে যোগসাজশ করা, যারা ধর্মীয় সীমারেখার মধ্যে তাদের ঠিকাদারী জিইয়ে রাখার গ্যারান্টি দেয় এই গন্ডীর বাইরের জগতে তারা যতই যথেচ্ছাচার ফাসিকী ও গোমরাহীকে অবাধে রাজত্ব করার ব্যবস্থা করে দিক না কেন তাতে কোনো দোষ নেই। এ ধরনের জামানত যদি কোনো কর্তৃত্বের পক্ষ থেকে তারা পেয়ে যান তাহলে আন্তরিকতার সাথে তাদের কর্তৃত্বকে সমর্থন

দিতে থাকেন। এমনকি নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েও তার প্রতিষ্ঠা করতে দ্বিধা করেননা। এ তৎপরতার পরিণতিতে যদি কুফরী, নাস্তিকতাবাদ, ফাসিকী ও গোমরাহী সমগ্র রাজনীতি, অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক শক্তিকে পরাভূত করে দীনের ভিত্তিভূমি নাড়িয়ে দেয় এবং উল্লিখিত সীমিত ধর্মীয় তৎপরতার সম্ভাবনাও না থাকে, যার কর্তৃত্ব নিজেদের স্বার্থে সংরক্ষিত রাখার জন্য এসব লোক এ ধরনের কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ে, তাহলেও তাতে তাদের পরোয়া থাকেনা।

এমতাবস্থায় যদি কোনো লোক বা দল দীন ও আহলে দীনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা করে এবং দীন ও দুনিয়ার এই বিভক্তির অবসান ঘটিয়ে জীবনের সমগ্র পরিসরে দীনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা শুরু করে দেয়, তাহলে খুশী হওয়া এবং অগ্রসর হয়ে সহযোগিতা করা অথবা অন্তত এ কাজটি সম্পন্ন হতে দেয়ার পরিবর্তে তাদের আস্তানাসমূহে বিপর্যয় ও হৈ চৈ সৃষ্টি হয়ে যায়। তাদের মনে হঠাৎ আশংকা দেখা দেয় যে, এ ধরনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের হাতে সামান্যতম সম্পদও থাকবেনা, যেগুলো তারা এতো বড় মূল্যের বিনিময়ে রক্ষা করেছিল। এতদসত্ত্বেও যেহেতু ব্যাপারটি ধর্মীয়, সুতরাং কিছু সময় পর্যন্ত তারা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার কথা বরদাশত করতে থাকেন এবং সতর্কতার সাথে চেষ্টা করে যান যাতে এ বিপদটি তাদের কাছ থেকে কিছুটা দূরে থাকে। তারপর এই লোকটি বা দলটির যতোই প্রসার ঘটতে থাকে, তাদের অস্থিরতা ততোই বাড়তে থাকে। এমনকি এক সময় এমন অবস্থা হয় যে, তাদের পবিত্র গন্ডিতে কানাকানি শুরু হয়ে যায় এবং প্রত্যেক আগত ও সমাগত লোকের মনকে তার বিরুদ্ধে একটা না একটা প্ররোচনায় বিষিয়ে তোলার প্রচেষ্টায় তারা রত হয়ে যায়।

কথা যদি এখানেই শেষ হতো, তাহলেও অনেক ভালো হতো। কিন্তু যদি তাদের বিশেষ ভক্তদের মধ্য থেকে কিছু লোক তাদের সংগ ত্যাগ করে এই আন্দোলনে শামিল হতে থাকে অথবা এ আন্দোলনের কিছু অসতর্ক কর্মী বিশেষভাবে তাদের কেন্দ্রসমূহের আশপাশে ঘোরাঘুরি করতে থাকে অথবা কোনো অতি উৎসাহী ব্যক্তি কোনো বড় বুযুর্গকে সরাসরি দাওয়াত দিয়ে বসে, তাহলে ব্যাপার সহ্যের বাইরে চলে যায়। এ পর্যায়ে কোনো কুফরী, নাস্তিক্যবাদ, গোমরাহীর মস্তবড় ফেতনা এবং ফাসিকী ও চারিত্রিক অনাসৃষ্টির বল্গাহীন স্রোতধারাও তাদের দৃষ্টিতে এতোটা গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, সেগুলোর মূলোৎপাটনের চিন্তা এই দীনী আন্দোলনের মূলোৎপাটনের চিন্তা থেকে তাদের কাছে অধিকতর অথবা অন্তত সমান সমান গুরুত্ব পেয়েছে। তারা এবং তাদের সমস্ত ভক্ত-অনুরক্তরা বিশেষভাবে ঐ লোকটির পেছনে লেগে যায়, যিনি এই আন্দোলন চালনার মূল দায়িত্বশীল। চোখে অণুবীক্ষণ যন্ত্র লাগিয়ে দেখতে শুরু করে দেয়,

কোথাও এমন কোনো ছিদ্র মিলে যায় কিনা যাতে করে কুফরী অথবা কমপক্ষে গোমরাহীর ফতওয়া দেয়া যায়, অথবা কোনো কিছু দাবী করার অপরাধ তার মাথায় চাপানো যায়, কিংবা তাকে এবং তার সাথীদেরকে একটি ফের্কর রূপ দিয়ে সাধারণ মুসলমান থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়, অথবা অন্য কিছু করা না গেলেও অন্তত এতোটুকু বদনাম রটানো যায় যাতে সাধারণ মানুষ তাকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করতে থাকে। বিরোধী দৃষ্টিভংগিতে পর্যবেক্ষণকারীগণ আল্লাহর কিতাবে ও রসূলের হাদীসেও যখন এমন বাক্য পেতে পারে যেগুলোকে পূর্বাপর বাক্য থেকে বিচ্ছিন্ন ও উলট-পালট করে সবচেয়ে খারাপ অভিযোগের নিশানা বানানো যায়, তখন অন্য কারোর তো কোনো কথাই নেই। তার লেখা ও বিবৃতির মধ্যে এ ধরনের লোকেরা কোথাও কিছু করতে পারবেনা এটা কখনো হতে পারেনা। যদি সোজা পথে কোনো বস্তু না পায়, তাহলে বাঁকা পথ অবলম্বন করে কিছু না কিছু উদগীরণ করে তার উপর ফতওয়ার রং চড়াতে থাকে (জ্বি হ্যাঁ! এই বক্র পদ্ধতিই বেরেলভী হযরতগণ মওলানা ইসমাঈল শহীদ, মওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী, মওলানা মাহমুদুল হাসান এবং মওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) প্রমুখের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন)।

আমি এই রহস্য সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলাম। এ কারণে প্রথম দিন থেকেই আমি এদের ব্যাপারে খুব সতর্কনীতি গ্রহণ করে আসছি এবং অন্যদেরকেও সতর্কতার পরামর্শ দিয়ে আসছি। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আমাদের সাথী ও সহযোগীরা আমার কথা শুনেননি এবং তারা প্রায় সব ভুলগুলোই করে বসেন, যার কারণে সমস্ত ধর্মীয় কামানগুলোর মুখ একই সাথে আমাদের দিকে তাক করে খুলে দেয়া হয়েছে। যদি আপনারা বাস্তবিকই এই আন্দোলনের শুভাকাংখী হন, তাহলে মেহেরবানী করে আমার উপদেশ গ্রহণ করুন এবং নিম্নবর্ণিত নির্দেশগুলো কঠোরভাবে পালন করতে থাকুনঃ

১. কোনো বড় বুযুর্গকে মৌখিক ও লিখিতভাবে সরাসরি দাওয়াত দেয়ার সাহস কখনোই করবেননা। আপনারা তো কালেমাকে সত্য ও চিরন্তন মনে করে তাদের কাছে দাওয়াত পৌছবার চেষ্টা করছেন এবং এ কালেমার জন্য এসব বুযুর্গকেই যথোপযুক্ত ধারণা করেন। কিন্তু সেখানে এই তৎপরতাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা হয়।

২. জামায়াতের আলেমদের মধ্য থেকে এমন কেউ যেন তাদের কাছে দীনের দাওয়াত দেবার কথা চিন্তা পর্যন্ত না করেন, যিনি স্বয়ং সেই শ্রেণীর সাথে সম্পর্কিত নন। আলেমদের মধ্যে যারা সত্যানুসারী তাদের কাছে পরোক্ষভাবে দাওয়াত পৌছাচ্ছে এবং তারা নিজেরাই ধীরে ধীরে মনোযোগ দিচ্ছেন। কিন্তু এ পোশাকে কোথায় সত্যপ্রিয় হৃদয় লুকিয়ে আছে আর কোথায় তাকওয়ার

ছদ্মাবরণে আত্মপূজা হচ্ছে, তা আমরা কিছুই জানিনা। এ কারণে একজন সত্যনিষ্ঠ মানুষ পাওয়ার আশায় এমন মৌমাছির চাকে হাত দেবেননা, যেখান থেকে শত শত বিপদ সৃষ্টির আশংকা রয়েছে।

৩. বড় বড় খানকাহ্ ও হুজরা থেকে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে তাবলীগ করবেন। তাদের সংরক্ষিত এলাকার কাছে যদি আপনি চলে যান, তাহলে মনে রাখবেন, হঠাৎ বিপদের ঘন্টা ধ্বনি বেজে উঠবে।

৪. এই ভদ্র মহোদয়েরা যদি কোনো কল্যাণকর কাজ করেন, তাহলে সম্ভব হলে তাতে নিষ্ঠার সাথে অংশ গ্রহণ করবেন অথবা অন্তত সে কাজের প্রশংসা করবেন এবং যথাসম্ভব দোষ বের করা থেকে কঠোরভাবে বিরত থাকবেন।

৫. আমার প্রতি সব রকমের প্রশংসা বাক্য আরোপ করা থেকে পুরোপুরি বিরত থাকবেন। আপনারা তো এক-আধটি শব্দ বলেই বিদায় নিয়ে যান। কিন্তু দীর্ঘদিন পর্যন্ত এর ধকল আমাকে পোহাতে হয়। এমনকি নিজের মাথার টুপি পর্যন্ত রক্ষা করা দুষ্কর হয়ে পড়ে। আপনাদের জানা থাকা দরকার যে, ধর্মরাজ্যে "সমস্ত প্রশংসা ঐ সব বুযুর্গদের জন্য নির্দিষ্ট"। ধর্মনিরোপেক্ষ রাজনৈতিক নেতাদের প্রশংসা-স্তুতি তাদের ওখানে যতোই হোক না কেন তাতে কোনো ক্ষতি নেই। বরঞ্চ ঐ নেতাদের মধ্য থেকে কেউ খুব বেশী জনপ্রিয় হয়ে উঠলে স্বয়ং এই বুযুর্গদের মুখ দিয়েও তাদের প্রতি অতিরঞ্জিত প্রশংসার বাক্য বের হয়ে যায়। কিন্তু তাদের আস্তানাসমূহের ভায়া না হয়ে সরাসরি দীনের রাস্তা দিয়ে যে লোকের আগমন হয়েছে তার সমর্থনে একটি সামান্যতম প্রশংসাসূচক বাক্যও তাদের অন্তরকে শেলের মতো বিদ্ধ করে। তাদের এই দুর্বলতার প্রেক্ষাপটে যদি আপনারা এ ধরনের কথা মুখ দিয়ে বের করাটা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেন, তাহলে এটা আমার জন্যও ভালো এবং এই আন্দোলনের জন্যও। আল্লাহর ফযলে আমি কারো প্রশংসার মুখাপেক্ষী নই। যা কিছু করছি তা নিজের ভেতরের কর্তব্যানুভূতির ভিত্তিতে করে যাচ্ছি। মানুষের প্রশংসা ব্যতিরেকে বরং অপবাদ দেয়া সত্ত্বেও ইনশাআল্লাহ্ নিজের কাজ এমনিভাবে করে যাবো।

৬. আমার ব্যক্তিত্বের উপর যে সব আক্রমণ হয়, সেগুলোর প্রতিরোধের দায়িত্ব আপনাদের উপর ন্যস্ত নয়। আমার নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও আপনারা যদি এ থেকে বিরত থাকতে না পারেন, তাহলে মেহেরবানী করে এ ব্যাপারে মধ্যম পন্থা থেকেও কিছু বেশী উদারনীতি গ্রহণ করবেন। বড় জোর এতোটুকুই যথেষ্ট যে, আমার উপর কারো আরোপিত কোনো অপবাদ কিংবা ইলমী অভিযোগ আপন জ্ঞানের পরিধিতে খন্ডন করে দিতে পারেন অথবা আমার কাছ থেকে এর তথ্য জিজ্ঞাসা করে তারপর জবাব দিতে পারেন। বাকী রইলো আমাকে

বেইজ্জতি ও হেয় করার প্রসংগ। এ ব্যাপারে আমার কোনো বন্ধু বা সাথীর মন খারাপ করা উচিত নয়। আমি এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রথমেই মাফ করে দিয়েছি আর আমাদের সমকালীন বুযুর্গানে দীনের জন্য তো এ কাজ আপনা-আপনিই মুবাহ (বৈধ) হয়ে গেছে। তারা যতোই সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট শব্দাবলী প্রয়োগ করে অপরকে জাহেল, আহমক, গোমরাহ এবং দীন ধ্বংসকারী বলুক না কেন সেটা ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য নয়। কিন্তু অপর পক্ষ যদি তাদের বিরাট ভুলও কেউ সম্মান ও ভদ্রতার সাথেই ধরিয়ে দেয়, তাহলে তাতে সে পক্ষ মুর্খ, অভদ্র, হীনমন্য ইত্যাদি অপরাধে অভিযুক্ত হয়। এর স্থায়ী আঘাত তাদের শাগরিদ ও মুরিদদের গায়ে লাগে এবং জীবনভর সে আঘাতে ভুগতে থাকে। তাঁরা হচ্ছেন বিশাল হৃদয়সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। তাঁদের কোনো কথায় মন খারাপ করা উচিত নয়।

এসব নসীহত করার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো যথাসম্ভব ফেতনা-ফ্যাসাদ এড়িয়ে চলা। অন্যথায় প্রকৃতপক্ষে এই বুযুর্গগণের বিরোধিতায় বড় ধরনের কোনো ক্ষতি হওয়া তো দূরের কথা ক্ষতি হওযার যোগ্য কিছু আছে বলেও আমি মনে করিনা। বরং তাদের বিরোধিতা অন্ততপক্ষে এক দিক দিয়ে আমাদের জন্য উপকারীই বটে। আমাদের আন্দোলনের এই সম্প্রসারণের যুগে একদল স্বল্প জ্ঞানী, দুর্বল চরিত্র এবং কাপুরুষ ধরনের লোকের শুধুমাত্র ধর্মীয় আবেগের আতিশয্যে আমাদের সাথে শামিল হয়ে যাওয়ার খুব বেশী আশংকা রয়েছে। তারা প্রকৃতপক্ষে আমাদের কোনো কাজে লাগবেনা। তাদের আগমন প্রতিরোধ করার কোনো উপায়ই আমাদের নেই। কেননা, যে ব্যক্তি আমাদের উদ্দেশ্যের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে এবং নিজেই সহযোগিতা করার ইচ্ছা পোষণ করে, তাকে আমরা কি বলে বাধা দেবো? আমাদের এই সমস্যা আল্লাহর ফযলে ঐ বুযুর্গদের সময় মতো বিরোধিতা করার কারণে সমাধান হয়ে যায়। যারা প্রকৃতপক্ষে আমাদের কাজের যোগ্য, তারা তো ইনশাআল্লাহ আমাদের দিকে আগের চেয়েও বেশী মনোযোগ দেবে। আর যারা এ কাজের যোগ্য নয় অথবা আমাদের জন্য উল্টো দুর্বলতার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে, তাদেরকে বুযুর্গগণ বাধা দিয়ে আটকে রাখবে তাতে আমাদের কাজ আরো বেশী ভালোভাবে চলতে পারবে। কাজের কিছু লোক তাদের বাধায় থমকে দাঁড়িয়ে যাবে, এমনটি বিচিত্র নয়। তবে আমার আশা, তাদের সংখ্যা এমন বেশী কিছু নয় যে, সে জন্য আমাদের বিব্রত হতে হবে। এক সময় তাদের কাছেও সত্য প্রকাশ হয়ে যাবে এবং একটি সঠিক কাজ সম্পাদন হতে দেখে বেশী দিন পর্যন্ত তারা আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারবেনা।

জনৈক কল্যাণকামীর পরামর্শ

প্রশ্নঃ দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চিরাচরিতভাবে নতুন ফিতনার মুখোমুখি হচ্ছে। ফতওয়াবাজি করা ও বদনাম রটানো যে মহলের বিশেষ ঐতিহ্য, তারা তো নিজেদের গোলাবারুদ শেষ করে ব্যর্থ মনোরথ হয়েছে। এবার স্বার্থান্বেষী মহল আমাদের দেওবন্দী গোষ্ঠীকেও এ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। হতে পারে সেখানকার জামায়াতে ইসলামীর কর্মকর্তারা সমালোচনা ও দীন প্রচারের কাজে কিছুটা ভারসাম্যহীন আচরণ করে থাকবে এবং এটা তার প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকবে। সেখানকার এবং এখানকার ফতওয়ার জবাবে সনদপ্রাপ্ত সতর্ক ও সচেতন লোকদের ফতওয়া প্রকাশ পেতে শুরু হয়ে গেছে। পাকিস্তানের আলেম সমাজের বিরাট অংশ দেওবন্দের সাথে যুক্ত। তারা অনিবার্যভাবে সেখানকার ফতওয়া দ্বারা প্রভাবিত হবেন। আন্দোলনের উপর এর খারাপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। অতএব, আপনি সঠিক পদ্ধতিতে অবশ্যই এর প্রতিকার করবেন।

সাহারানপুর দারুল ইফতা থেকে ৩২ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি ফতওয়া প্রকাশিত হয়েছে। ফতওয়াটির শেষ দিকে মাওলানা মুফতী মাহদী হাসান সাহেব সাহারানপুরী এবং মাওলানা ই'যায আলী সাহেবের ফতওয়াও আছে। রিসালায়ে দারুল উলুমের ১ম সংখ্যায় হযরত মাওলানা গাংগুহী সাহেবের পৌত্র হাকীম মাহমুদ সাহেবের একটি দীর্ঘ লেখা রয়েছে। যদিও তিনি অত্যন্ত সতর্কতা সহকারে এবং ভদ্রজনোচিতভাবে লিখেছেন এবং আমার মতে তাঁর বর্ণনারীতি সংযত, তবুও তিনি আন্দোলনকে সাধারণের জন্যে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষতিকর বলেছেন। উত্তেজনাকর ও অসংগত ফতওয়া থেকে এ ধরনের কথা বেশী প্রভাবশালী হয়ে থাকে। কালকে বাটালার একজন বুযুর্গ ... জেলা থেকে আমার কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। বুযুর্গ লোকটির সম্পর্ক হযরত গাংগুহীর সাথে ছিল। তারপর তিনি দেওবন্দের সমস্ত বুযুর্গের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন। তিনি চিঠিতে লিখেছেন, "সাহারানপুর থেকে হযরত এর চিঠি এখন পেলাম। তিনি সঠিক অবস্থা জানার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করে পাঠিয়েছেন যে, একটি ঘটনা ভালো করে জেনে আমাকে লিখবেন। পাকিস্তান থেকে বরাবর চিঠি আসতে থাকে যে, মাওলানা মওদূদী হযরত মাওলানা গাংগুহী এবং হযরত মাওলানা নানুতুবীর নাম নিয়ে নিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়ে থাকেন। দীনের সাথে এসব লোকদের কোনো সম্পর্কই ছিলনা বলে তিনি বলে বেড়ান। বিশেষত সারগোধার বিবৃতির উদ্ধৃতি দেয়া হয় যে, সেখানে নামোল্লেখ করে বিরোধিতা করা হয়েছে।" বাটালার বুযুর্গ সঠিক ঘটনা সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন। আমি তাঁকে জানিয়ে দিয়েছি যে, এটা মিথ্যা দোষারোপ বৈ আর কিছু নয়।

স্বয়ং সাহারানপুরের... হযরতকেও চিঠি লিখেছি। তা সত্ত্বেও আপনি নিজেও এসব অভিযোগ খন্ডন করুন। জবাবের জবাবে জবাব দেবার পদ্ধতি ঠিক নয়। আবার একেবারে মৌন ভূমিকা পালন করলেও মানুষের সন্দেহ দৃঢ় হতে থাকে। এভাবে আসল লক্ষ্য অর্থাৎ ইকামতে দীনের আন্দোলনে ক্ষতি দেখা দেয়। বিশেষত হযরত মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী, হযরত মওলানা ই'যায আলী সাহেব, হযরত মওলানা কারী তৈয়্যব সাহেব, হযরত মাওলানা মুফতি কিফায়েত উল্লাহ্ সাহেব, হযরত মাওলানা হিফযুর রহমান সাহেব, হযরত মাওলানা আহমদ সাঈদ সাহেব, হযরত মওলানা যাকারিয়া সাহেব, মাওলানা হাফিজ আবদুল লতীফ সাহেব প্রমুখদের সাথে চিঠিপত্র আদান-প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে এ পরামর্শ দেয়া দরকার যে, যদি আমার কিংবা জামায়াত সম্পর্কে কোনো ফতওয়া আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়, তাহলে জবাব দেয়ার আগে আমার কাছ থেকে প্রকৃত তথ্য মেহেরবানী করে জেনে নিবেন।

__জবাবঃ__ আপনার আন্তরিক পরামর্শের জন্যে খুবই কৃতজ্ঞ। আপনার পরামর্শানুযায়ী কাজ করতে আমি প্রায় তৈরি হচ্ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ করে আপনার চিঠি পাওয়ার দ্বিতীয় দিনেই একজন লোক আমার কাছে মুফতী সাঈদ আহমদ সাহেবের 'সত্য উদঘাটন' শিরোনামে ছাপানো বিস্তারিত ফতওয়া পাঠিয়ে দেয়। এই ফতওয়ার সাথে ২/৩টি বিজ্ঞাপনও পাঠিয়ে দেয়, যাতে মাওলানা কিফায়াতুল্লাহ, মাওলানা জামিল আহমদ থানভী মাওলানা ই'যায আলী এবং মুফতী মাহদী হাসান সাহেবানের ফতওয়া সন্নিবেশিত হয়েছে। তাই এখন আর এই বুযুর্গদেরকে সম্বোধন করে কোনো লাভ হবে বলে মনে হয়না। কারণ তাঁরা এখন এর অনেক বাইরে চলে গেছেন। মাওলানা কিফায়াতুল্লাহ সাহেবের জন্য আমার সবচেয়ে বেশী আফসোস! কারণ বিগত ৩২ বছর থেকে আমি তাঁর গুণগ্রাহী। সব সময় তাঁকে সম্মান করে এসেছি। পরিতাপের বিষয় তিনিও দলীয় গোঁড়ামির বশবর্তী হয়ে চোখ বুঁজে এই ফতওয়া লিখে দিলেন। বাকী অন্যান্য মহোদয়গণের ফতওয়া পাঠ করে আমি অনুভব করলাম, যে সময় তাঁরা ফতওয়া লিখছিলেন, সে সময় আল্লাহভীতি ও আখিরাতের কাঠগড়ায় জবাবদিহির অনুভূতি সম্ভবত তাঁদের ধারে-কাছে ঘেষতে পারেনি। বিশেষত মুফতী সাঈদ সাহেবের ফতওয়ায় তো সত্যের অপলাপের এমন ঘৃণ্য উদাহরণ পাওয়া যায়, যা দেখলে ঘৃণায় গা রি রি করে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে আমি এসব বুযুর্গ সম্পর্কে অত্যন্ত ভালো ধারণা পোষণ করতাম। কিন্তু বর্তমানে তাঁদের এসব ফতওয়ার হিড়িক দেখে আমি অনুভব করছি, বেরেলভী মহলের ফতওয়াবাজ ও কাফির উপাধি দানকারী মৌলভীদের থেকে তাঁদের স্থান

কিছুমাত্র উর্ধ্বে নয়।

এ ধরনের লেখার জবাব আমি কখনো দেইনা, তা আপনি জানেন। সুতরাং এসব ফতওয়ার জবাবে এখান থেকে কিছু লেখা হবে এবং তাতে কথা বেড়ে যাবে এরূপ আশংকা আপনি করবেননা। তবে এর সাথে এটাও আমার নীতি নয় যে, আমাকে কেবল উত্ত্যক্তই করা হবে আর আমি তা মাথা পেতে বরণ করে নিতে থাকবো। এমন পন্থা না ঐ কাজের সম্মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা আমি করে যাচ্ছি, না এ পদ্ধতি সত্যিকার অর্থে দীনেরই কোনো কল্যাণ সাধন করতে পারে। এই মহোদয়গণ যদি সততা ও ন্যায়পরায়ণতার হাতিয়ার নিয়ে আক্রমণ করতেন এবং আমার অথবা জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলন ও নিয়ম-কানুনের মধ্যে এমন কোনো দোষের কথা বলতেন, যা বাস্তবিকই তাদের দলিল দ্বারা প্রমাণিত হতো, তাহলে অবশ্যই আমি তাঁদের কাছে মাথা নত করতাম এবং নিজের ভুল স্বীকার করে নিজকে সংশোধন করে নিতাম। কিন্তু তাঁরা মিথ্যার অস্ত্র ব্যবহার করেছেন এবং আক্রমণে মূর্খতার পন্থা অবলম্বন করেছেন। সুতরাং আমি তাঁদের সাথে সে আচরণই করবো, যা একজন ভদ্রলোকের করা উচিত অর্থাৎ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا "যখন তারা কোনো বাজে বেহুদা বিষয়ের কাছ দিয়ে অতিক্রম করে, তখন শরীফ লোকের মতোই অতিক্রম করে।" (সূরা ফুরকানঃ ৭২)

দেওবন্দ ও সাহারানপুরের এসব ফতওয়াবাজি এই দু'টি শিক্ষায়তনের সাথে সম্পৃক্ত লোকদের উপর খারাপ প্রভাব ফেলবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে আল্লাহর নীতি অনুযায়ী পরীক্ষা জরুরী। বর্তমানে সমস্ত দেওবন্দী ও সাহারানপুরী গ্রুপের জন্যে পরীক্ষার সময় উপস্থিত। দেখতে হবে, তাদের মধ্যে কতজন লোক সত্যপূজারী আর কতজন ব্যক্তিপূজারী। যারা সত্যপূজারী ইনশাআল্লাহ্ তারা আমাদের সাথে থাকবেন এবং ভবিষ্যতেও আমাদের কাছে আসতে থাকবেন। আর যারা ব্যক্তিপূজা ও দলীয় গোঁড়ামির অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ, তারা আমাদের থেকে আলাদা হয়ে যাবেন এবং ভবিষ্যতেও আমাদের সাথে চলবেননা। আমাদের শুধুমাত্র প্রথম প্রকার লোকের প্রয়োজন। দ্বিতীয় প্রকারের লোকদের থেকে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। তারা আলাদা হয়ে গেলে তো আমরা আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জ্ঞাপন করবো। আর ভবিষ্যতে আমাদের থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে তো আরো শুকরিয়া আদায় করবো।

হাকীম মাহমুদ সাহেব গাংগুহীর রচনা তরজমানুল কুরআনে ছাপার জন্যে এসে গেছে। জবাবসহ প্রকাশ হতে যাচ্ছে। ভবিষ্যতেও ঐ দলের কেউ যদি আমার কিংবা জামায়াতে ইসলামীর উপর কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক সমালোচনা করেন, তাহলে সেটা বিনা দ্বিধায় প্রকাশ করা হবে এবং জবাব উপযোগী কথার জবাও দেয়া হবে। [তরজমানুল কুরআন, জমাদিউল উলা-রজব ১৩৭০, মার্চ-মে ১৯৫১]

অজ্ঞতা নিয়ে অভিযোগ

প্রশ্নঃ[১] আপনার কিতাবের কতিপয় বক্তব্য সম্পর্কে আমার সন্দেহ রয়েছে। এ প্রসংগে কয়েকটি প্রশ্ন পাঠালাম। জবাব দিয়ে নিশ্চিন্ত করবেন।

১. আপনার নিম্নলিখিত লেখা থেকে বুঝা যায় আপনি তাক্‌দীরকে ঈমানের অংগ মনে করেননাঃ

"আমার মতে প্রতি ক্ষেত্রে তাকদীর ঈমানের অংগ নয়" [তাকদীরের হাকীকত] অথচ্ আলেমগণ তাকদীরকে ঈমানের অংগ বলে স্বীকার করেছেন। যেমন–

امنت بالله وملئكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت -

২. আপনি ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন বইতে লিখেছেনঃ "নামায একটি ট্রেনিং আসল ইবাদত নয় বরং আসল ইবাদতের জন্যে তৈরি করে"। আল্লামা এনায়েতুল্লাহ্ আল–মাশরিকীও এ আকীদা পোষণ করে থাকেন যা ইসলামের সম্পূর্ণ বিরোধী। নামায আসল ইবাদত কেন নয়, তা জানাবেন?

৩. হযরত ইমাম মাহ্দী আলাইহিস সালাম ও হযরত মসীহ্ আলাইহিস সালামের উর্ধ্বারোহণ বা অবতরণ সম্পর্কে আপনি কি আকীদা পোষণ করে থাকেন?

৪. মসীহ্ ও মাহ্দী আলাইহিমাস সালাম কি একই সময় অবতরণ করবেন, নাকি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ইসলাম প্রচার করবেন?

৫. ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ উভয়ে কি একই অস্তিত্বে অবতরণ করবেন নাকি ভিন্ন ভিন্ন অস্তিত্বে?

৬. যদি তারা একই সময় অবতরণ করেন, তাহ্লে তারা নিজেদের আমীর কাকে বানাবেন? তাঁদের মধ্যে কে দ্বিতীয় জনের কাছে বাইয়াত গ্রহণ করবেন এবং কেন?

৭. মসীহ্ আলাইহিস সালাম কি আল্লাহ্র নবী হিসেবে অবতরণ করবেন? যদি নবী হিসেবে আসেন, তাহ্লে তাঁর উপর অহী নাযিল হওয়া জরুরী কিনা? তিনি কোন্ আকীদার তাবলীগ করবেন? ইসলামের নাকি ঈসায়ী মতবাদের?

৮. মসীহের হায়াত–মউত সম্পর্কে আপনার আকীদা কুরআন–হাদীসের আলোকে প্রকাশ করবেন। এমনিভাবে তাঁর উর্ধ্বারোহণ ও অবতরণ সম্পর্কেও।

---

[১]. প্রশ্নগুলো সপ্তম শ্রেণীর একজন ছাত্রের নাম দিয়ে পাঠানো হয়।

কেননা, আপনি মসীহ ও মাহ্দীকে অস্বীকার করছেন বলে আপনার লেখা থেকে আমাদের সন্দেহ হচ্ছে।

জবাবঃ *আপনার চিঠি পেয়েছি। আপনার প্রশ্নগুলোর উপর কিছু বলার আগে আপনাকে এ উপদেশ দেয়া জরুরী মনে করি যে, প্রথমত নিজের দুনিয়া ও আখিরাতের চিন্তা বাদ দিয়ে পরের ভালো-মন্দের খোঁজে আত্মনিয়োগ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তবুও অন্যের আকীদার খোঁজ-খবর নেয়ার যদি আপনার এতই আগ্রহ হয় অথবা অন্যের সম্পর্কে মত প্রতিষ্ঠা করা যদি একান্তই অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তাহলে আপনার অন্তত এতোটুকু জেনে রাখা দরকার যে, কারো সম্পর্কে অনুসন্ধান ছাড়াই ভালো অথবা মন্দ ধারণা পোষণ করা খুবই খারাপ। আজকাল এমন অনেক পেশাদার লোক পাওয়া যায়, যারা অযথা কোনো লোভের বশবর্তী হয়ে অথবা নিছক ঈর্ষাকাতর হয়ে অপরের বদনাম করার অভিপ্রায়ে বিভিন্ন ধরনের প্রচারপত্র প্রকাশ করছেন। এসব প্রচারপত্রের মাধ্যমে সব ধরনের ভুল ও ক্রটিপূর্ণ কথা অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে তারা আল্লাহ্র বান্দাদেরকে ধোকা দেয়ার চেষ্টা করছেন। এসব প্রচারপত্র দেখে এবং তাদের ভ্রান্ত উদ্ধৃতি পাঠ করে কারো সম্পর্কে মন্তব্য করার পরিবর্তে যেসব মূল বই-পুস্তক আপনার নিজের পড়া উচিত যেগুলোর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজের চিন্তাধারা ব্যক্ত করেছে।*

এ উপদেশের পর আপনার প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত জবাব পেশ করছিঃ

১. আপনি আমার তকদীরের হাকীকত বইয়ের যে অংশের উদ্ধৃতি দিয়ে তাকদীরকে ঈমানের অংগ মনে না করার অভিযোগ আমার উপর আরোপ করেছেন, সে অংশ আমার লিখিত বাক্য নয়। বরং যে ব্যক্তির প্রশ্নাবলীর জবাব দেবার জন্যে আমি এই বই লিখেছি তার বাক্য। আপনার এ প্রশ্ন থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, আপনি হয়তো নিজে আমার বইটি পড়েননি, নয়তো এতোটুকু অবগতিও আপনার নেই যে, কোনো লেখক নিজের লেখার মধ্যে যে বাক্য দুটি কোটেশানের মধ্যে বর্ণনা করেন, তা লেখকের নিজস্ব নয় বরং অন্যের বাক্য এবং তা উদ্ধৃতি হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যদি আপনি নিজে বইটি না পড়ে থাকেন বরং কোথাও শুনে সে অংশের উদ্ধৃতি দিয়ে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে থাকেন, তাহলে আপনি নিজেই চিন্তা করে দেখুন আপনার এ ধরনের কাজের মাধ্যমে আপনি কত বড় অন্যায় করেছেন। আর যদি আপনি নিজে বইটি পাঠ করা সত্ত্বেও একথা না বুঝে থাকেন যে, ঐ বাক্যটি আমার নয় বরঞ্চ সে প্রশ্নকর্তার বাক্য যার জবাব দিতে গিয়ে আমি বাক্যটির উল্লেখ করেছি, তাহলে আপনি নিজেই বলুন এই পর্যায়ের যোগ্যতা ও

বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতা নিয়ে এতো বড় জটিল বিষয় সম্পর্কে অন্যদের আকীদার ভ্রান্তি ও বিশুদ্ধতার ফায়সালা দেবার প্রয়োজনীয়তা আপনার দেখা দিল কেন?

২. দ্বিতীয় প্রশ্নে আপনি আমার প্রণীত "ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন বইয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে যে অসম্পূর্ণ অংশের উল্লেখ করেছেন, তা ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন বইয়ে নেই। বরঞ্চ সেটা আছে আমার "ইসলামী ইবাদতের মর্মকথা" বইয়ে। এ ধরনের ভুল উদ্ধৃতি দেয়ার কারণে বুঝা যায় যে, আপনি আমার কোনো কিতাব আদৌ পাঠ করেননি। বরঞ্চ আমার বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডাকারীদের কাছ থেকে কিছু শুনে নিজে আমার অপরাধের ফর্দ তৈরি করেছেন। "আল্লামা এনায়েতুল্লাহ খান মাশরিকীও এ আকীদা পোষণ করতেন" আপনার এ কথাও এই রহস্যই উদঘাটন করে যে, আপনি মাশরিকী সাহেব সম্পর্কেও কিছুই জানেননা এবং আমার সম্পর্কেও আপনি নেহাত অজ্ঞ। মেহেরবানী করে আমার উক্ত কিতাবটি কোথাও থেকে জোগাড় করে নিজে পড়ুন। ঐ বইয়ের ৬ থেকে ১৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়লে আমি কি বলতে চাই তা আপনি জানতে পারবেন। মাশরিকী সাহেব কি বলেন, তাও আপনি জানতে পারবেন।

৩. আপনার ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের সঠিক জবাব হলোঃ মাহদীর আবির্ভাব ও মসীহের (আ) অবতরণ সম্পর্কীয় সমগ্র হাদীস একত্র করলে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম মাহদীর আবির্ভাব ও মসীহ বিন মরিয়মের (আ) অবতরণ, একই সময়ে হবে। তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি হবেন। মুসলমানদের আমীরও ইমাম মাহদীই (আ) হবেন। মসীহ (আ) সে সময় একটি স্বতন্ত্র শরীয়তসম্পন্ন একজন নবীর মর্যাদা বিশিষ্ট হবেননা, বরং শরীয়তে মুহাম্মদীর অনুসারী হবেন এবং ইমাম মাহদীর মোকতাদী হয়ে নামায আদায় করবেন।

৪. আপনার ৮ম প্রশ্নের জবাব হলো- মসীহের (আ) হায়াত-মউত সম্পর্কে আমার লিখিত তাফসীর তাফহীমুল কুরআনে বিশুদ্ধ বিবরণসহ লিখেছি। দয়া করে সূরায়ে আলে ইমরানের ৬ষ্ঠ রুকূ এবং সূরায়ে নিসার ২২ নং টীকা পড়ে নিবেন। "তুমি মসীহ ও মাহদীকে (আ) অস্বীকার করছো একথা তোমার লেখা থেকে সন্দেহ করা হয়" আপনার একথা প্রমাণের জন্যে উদ্ধৃতির প্রয়োজন। আমার যে লেখায় আপনি এ তথ্য লাভ করেছেন, সে লেখাটি যদি আপনি চিহ্নিত করে দিতেন তাহলে সেটা হতো আপনার খুবই মেহেরবানী। তাছাড়া যদি খারাপ মনে না করেন, তাহলে লেখাগুলো আপনি নিজে পড়েছেন নাকি কারো কাছে শুনে লিখে দিয়েছেন তাও বলে দিবেন।

মনে কিছু করবেননা, প্রশ্নগুলো প্রকৃতপক্ষে জবাব পাওয়ার উপযোগী ছিলনা। তবে কতিপয় স্বার্থান্বেষী আলেমের মিথ্যা দোষারূপের পরিপ্রেক্ষিতে সরলমনা জনসাধারণের মনে যে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে শুধু তার অপনোদন করার উদ্দেশ্যেই জবাব দিলাম। [তরজমানুল কুরআন, জমাদিউল আউয়াল–রযব ১৩৭০, মার্চ–মে ১৯৫১]

আলেমদের জন্যে সমকালীন জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজনীয়তা

প্রশ্নঃ আমি সাহারানপুরের মাযাহিরুল উলুম মাদ্রাসা থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত। আমার আকীদা দেওবন্দ ও মাযাহিরুল উলুমের আলেমদের সাথে সম্পৃক্ত। তবে সাথে সাথে আমি মনের দিক থেকে যথেষ্ট উদার। যেখানে যেটাকে আমি ভালো মনে করি, সেটাকে যথাসম্ভব অংশগ্রহণ করার প্রবণতা আমার আছে। এ কারণেই জামায়াতে ইসলামীর সাথে আন্তরিক সম্পর্ক রাখি। কাওসার পত্রিকা এবং সাহিত্য অধ্যয়ন করে যাচ্ছি। মাওলানা আবুল লাইস[১] সাহেবের জীবন নিকট থেকে দেখেছি। উলামায়ে দেওবন্দ ও আপনার মধ্যে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব সম্পর্কেও আমি অবহিত আছি। এ দ্বন্দ্বের কারণে আমার মন বড় উচাটন। আমি তরজমানুল কুরআনের সে সংখ্যাটি পড়েছি যে সংখ্যায় হাকীম গাংগুহী সাহেবের অভিযোগের জবাব আপনি নিজে এবং মাওলানা আমীন আহসান সাহেব দিয়েছেন। সংখ্যাটি পড়েই হযরত ওস্তাদ মুফতী সাহেবের খেদমতে জবাবী লেখাটাসহ লিখলাম যে, আমি মনে করি বর্তমানে একমাত্র জামায়াতে ইসলামই হিযবুল্লাহ (আল্লাহর দল)। তাদের সাথে কাজ করতে মনে আবেগের সৃষ্টি হয়। কিন্তু সাথে সাথে এ কথাও জানলাম যে, এ জামায়াতের সাথে আপনাদের প্রবল বিরোধিতা। সুতরাং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বিরোধী যেসব ধারণা মাওলানা মওদূদী পোষণ করেন, সেগুলো তাঁর কিতাব থেকে উল্লেখ করে দিবেন। অতএব, তিনি 'সত্য উদঘাটন' নামীয় রেসালাহখানা পাঠিয়ে দেন। আমি এই রেসালাহ পাঠ করেছি।

এই রেসালায় এমন কতিপয় বাক্য আছে, যেগুলো সম্পর্কে আমিও সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠি। সুতরাং আমি 'তানকীহাত' (ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব) নামীয় কিতাবটি জোগাড় করে মুফতী সাহেবের বর্ণিত বাক্য পেয়ে যায়। কিন্তু সেই বাক্য দ্বারা আপনার উদ্দেশ্য কি বর্তমানে এটাই আমার জিজ্ঞাস্য। কোনো ভাবে সময় করে আপনি এর জবাব দিন যাতে আমার

---

১. জামায়াতে ইসলামী হিন্দের তৎকালীন আমীর।

ও আমার ২/৩ জন সাথীর সন্দেহ দূর হয়ে যায়। এক্ষণে আমার সামনে 'তানকীহাত' আছে। যে বাক্যগুলো সন্দেহপ্রবণ করে তোলে, সেগুলো হলোঃ

১. "কুরআনের জন্যে কোনো তাফসীরের প্রয়োজন নেই। যিনি অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করেছেন এমন একজন উঁচু শ্রেণীর প্রফেসরই যথেষ্ট" (পৃষ্ঠাঃ ১৯৩)। গোটা বক্তব্য উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। এই বাক্যের তাৎপর্য কি তা পরিষ্কার করে বলবেন। তাফসীর অপ্রয়োজন বলতে কোন্ ধরনের তাফসীর উদ্দেশ্য? সেটা কি ইসরাঈলী তাফসীর? নাকি জাল হাদীসের তাফসীর?

২. "কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তবে সে শিক্ষা তাফসীর ও হাদীসের প্রাচীন ভান্ডার থেকে নয়" (পৃষ্ঠাঃ ১১৪)। এই বাক্যকে পূর্বাপরের সাথে মিলানো হোক কিংবা আলাদা করা হোক বাহ্যত এর তাৎপর্য এটাই মনে হয় যে, কুরআনে হাকীম ও হাদীসে নববীর শিক্ষা মুফাসসির ও মুহাদ্দিসগণের শিক্ষা থেকে গ্রহণ করা যাবেনা। বরং কুরআন ও হাদীস থেকে সরাসরি অর্থ গ্রহণ করা হবে। যদি তাৎপর্য এটাই হয়, তাহলে আপনি জানেন যে, সাহাবাগণও সরাসরি তাৎপর্য গ্রহণ করার অনুমতিপ্রাপ্ত ছিলেননা। তারাও রসূলের তাফসীরের মুখাপেক্ষী ছিলেন। কোনো কোনো সাহাবা অপর কোনো সাহাবা থেকে আয়াতের তাৎপর্য শিখে নিতেন। তাহলে আজকের দিনে আগেকার মুফাসসিরদের তাফসীর ব্যতিরেকে কুরআনের তাৎপর্য কিভাবে গ্রহণ করা যায়? আপনি যদিও এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্বোধন করেছেন, কিন্তু কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা বাধ্যতামূলক বলার পর হাদীস-তাফসীরের প্রাচীন অফুরন্ত ভান্ডার ব্যতিরেকেই কুরআন-হাদীসের তাৎপর্য গ্রহণ করতে তাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়েছে। শিশু কি পিতা-মাতার সাহায্য ব্যতিরেকে নিজে নিজেই বুলি শিখতে পারে? দৃশ্যত যেটা পরিষ্কার মনে হয় যদি বাক্যের তাৎপর্য সেটাই হয়, তাহলে সংশোধন না করলে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

৩. "সে এখন পর্যন্ত 'শামী' ও 'কানযুদ্ দাকায়েকে' লিখিত ফিকহী আইন-কানুন তুর্কী জাতির জন্যে প্রয়োগ করতে বারবার চেষ্টা করে চলছে।" শামী ইত্যাদি ফিকাহের কিতাবসমূহে ইসলামী কানুন আপনার ধারণা মতে লেখা নেই কি? এটা কি ইসলামের ফকীহদের নিজেদের বানানো কানুন যা কুরআন ও হাদীস বিরোধী? যাহোক, এ সম্পর্কে আপনার মত কি? তবে ঐ সব কিতাবে অবশ্যই এমন কতিপয় মাসয়ালা ইসলাম বিরোধী নয়। ঐসব কিতাবে প্রাসঙ্গিক বিষয় ছাড়া মুসলমানদের সংগঠন ও একতা ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা কি ব্যাপকভাবে নেই? যদি থেকে থাকে, তবে ত্রুটি কি আছে?

আশা করি, কষ্ট স্বীকার করে জবাবদানে আশ্বস্ত করবেন।

জবাবঃ আমি আপনার কাছে খুবই কৃতজ্ঞ। কেননা আমার যেসব বাক্য আপনার মনে সন্দেহের সৃষ্টি করেছে, সেগুলো বুঝার জন্যে আপনি স্বয়ং আমাকেই জিজ্ঞাসা করেছেন। সত্যানুরাগীদের এটাই নিয়ম, তাঁরা বক্তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য প্রথমে বক্তার কাছেই জিজ্ঞাসা করেন, নিজে একটা অর্থ স্থির করে নিয়ে তার উপর ফতওয়াবাজি করেননা।

প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা আমার উদ্দেশ্য কি? একথাগুলো বুঝতে আপনি এবং আপনার মতো অন্যদের যে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে, তার প্রকৃত কারণ হলো আপনার কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ, তাদের সিলেবাস এবং তাদের মধ্যে গোমরাহী সৃষ্টি হওয়ার মৌলিক কারণ সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত নন্। আপনার এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নিজেদের দীনী মাদ্রাসার চোখে দেখে থাকেন। আপনারা মনে করেন আপনাদের মাদ্রাসায় কোনো একজন মাওলানা সাহেব যেভাবে সহজে বায়জাভী, জালালাইন এবং তিরমিযী পড়াতে পারেন, সেভাবে কলেজসমূহেও পড়াতে পারবেন। এ কারণেই আমার হাদীস-তাফসীরের পুরানো ভান্ডারের পরিবর্তে কলেজেরই কোনো অভিজ্ঞ অধ্যাপকের সাহায্য নেয়ার প্রস্তাবনার কথা আপনার কাছে খুবই আশ্চর্যজনক মনে হয়েছে। কিন্তু আমি আপনাদের দীনী মাদ্রাসার ন্যায় কলেজ-ইউনিভারসিটি সম্পর্কেও সম্যক অবগত আছি। আমি জানি সেখানে কি ধরনের মানসিক পরিবেশ বিরাজমান। এসব বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ কোন্ চিন্তাধারা ও দর্শনের আবহাওয়ায় লালিত-পালিত হচ্ছে। আমি স্বয়ং তাদের এমন সব গ্রন্থ পড়েছি, যেগুলো ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার শিকড় পর্যন্ত মানুষের মস্তিষ্ক থেকে উপরে ফেলে এগুলো মানুষের মন-মগজে মানব ও সৃষ্ট জগত সম্পর্কে এমন একটি নাস্তিক্যবাদী চিন্তাধারা সরাসরি প্রবেশ করিয়ে দেয়, যাকে মানুষ একটি সম্পূর্ণ যুক্তিগ্রাহ্য দর্শন মনে করতে থাকে। আমি কুরআনের তাফসীর, হাদীসের ব্যাখ্যা এবং ফিকাহের প্রাচীন কিতাবসমূহও পাঠ করেছি। আমি জানি নব্য যুগের শিক্ষার্থীদের মন-মগজে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের যে কাঁটা বিদ্ধ হয়ে আছে সেসব কিতাবে এ কাঁটা উঠানোর কেবলমাত্র কোনো উপকরণ যে নেই তা নয় বরং এসমস্ত কিতাবের সর্বত্র এমন সব জিনিস পাওয়া যায় যা নব্য শিক্ষিতদের মনে আরো বেশী সংশয়ের সৃষ্টি করে দেয়। অনেক সময এ কারণে একজন সন্দেহপ্রবণ লোক সন্দেহের সীমারেখা অতিক্রম করে অস্বীকার ও অজ্ঞতার স্তর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আমি এটাও জানি যে, এসব আধুনিক শিক্ষায়তনে সেকেলে ধরনের দীনিয়াতের শিক্ষকগণ প্রাচীন পদ্ধতিতে পড়ানো ভান্ডার থেকে দীনের শিক্ষা দিয়ে নিজেরাও উপহাসের পাত্র হচ্ছেন এবং দীনকেও উপহাসের পাত্র

বানাচ্ছেন। এসব জিনিস আমার দৃষ্টিতে এসেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতেই আমার দৃষ্টিভংগি হলো– যতোক্ষণ পর্যন্ত এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যে কুরআনের এমন তাফসীর, হাদীসের এমন ব্যাখ্যা তৈরি না হবে, যার মধ্যে শিক্ষার্থীদের মনে সৃষ্ট সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত কোনো নির্দিষ্ট কিতাব সিলেবাসের অন্তর্ভূক্ত না করে এমন শিক্ষক খুঁজে নিয়োগ করা প্রয়োজন যারা কুরআন–হাদীসেও গভীর পান্ডিত্যের অধিকারী এবং আধুনিক জ্ঞান–বিজ্ঞানেও সমান পারদর্শী। তাফসীরের কোনো কিতাব পড়ানোর পরিবর্তে সরাসরি কুরআনের দরস দেয়া এবং হাদীসের কোনো শরাহ্ পড়ানোর পরিবর্তে সরাসরি নবীর হাদীসের শিক্ষা দেয়া উচিত যাতে করে ছাত্র–ছাত্রীদের সেসব আলোচনার সম্মুখীন হতে না হয়, যা তাদের জন্যে প্রথমত অনিবার্যরূপে বিব্রতকর হয়ে থাকে।

বর্তমানে তো কলেজের পরিবেশ ও পরিস্থিতি আগের চেয়ে অনেক ভালো। কিন্তু যে সময় আমি "তানকীহাতের" উল্লিখিত "আমাদের শিক্ষা পদ্ধতির মৌলিক ত্রুটি" এবং "মুসলমানদের জন্যে নতুন শিক্ষা পলিসি ও কর্মপদ্ধতি" এই প্রবন্ধ দুটি লিখি (অর্থাৎ ১৯৩৬ সাল), সে সময়ে তো দীনের প্রতি প্রকাশ্যে উপহাস করা হতো। "নিগার" পত্রিকা কলেজ–ইউনিভার্সিটির ছাত্র–ছাত্রীদের মধ্যে নাস্তিক্যবাদ অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে প্রচার করতে থাকতো। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন সংক্রামক ব্যাধির মতো যুব সমাজের মধ্যে অনুপ্রবেশ করছিল। আপনাদের ধর্মীয় মাদ্রাসার শিক্ষক ছাত্র কারো এ অবস্থা সম্পর্কে কোনো অনুভূতি ছিলনা। এ ব্যাধির কারণসমূহের প্রতিকার ও প্রতিবিধানের জন্য তাঁরা একটি মুহূর্তও ব্যয় করেননি। আমি দীর্ঘদিন পর্যন্ত রাতের নিদ্রা হারাম করে এসব বিষয়ের উপর চিন্তা–গবেষণা করেছি। সমকালীন শিক্ষাবিদদের সামনে তাদের শিক্ষানীতির বিশদ আলোচনা করে আমি তাদের সামনে এমন সব কারণ সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছি, যেগুলো ছিল নাস্তিক্যবাদের ভয়াবহ তরংগের মূল উদ্গাতা। এর সাথে সাথে আমি তাদেরকে এ কথাও বলেছি যে, যদি আপনারা এই নাস্তিক্যবাদ সৃষ্টিকে সত্যিই বাধা দিতে চান, তাহলে আপনাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় এসব সংশোধন করুন। এ প্রসংগে কলেজের জন্যে যথোপযোগী দীনী সিলেবাস প্রণয়নের প্রশ্ন যখন আমার সামনে দেখা দেয়, তখন আমি আমার সাধ্যমত কুরআনের তাফসীর, হাদীসের ব্যাখ্যা এবং ফিকাহ্ ও কালাম (তর্কশাস্ত্র) বিষয় সম্বলিত জ্ঞান ভান্ডারের উপর দৃষ্টি দিলাম। উর্দু, আরবী কিংবা ইংরেজীতে এমন একটি কিতাব আমার নজরে পড়েনি যাকে ঐসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যে প্রস্তাব করা যায়। সে সময়ের কথা বাদই দিলাম, আমি আজও এই মুফতীয়ানে কেরামকে জিজ্ঞেস করছি, এমন একটি মাত্র কিতাবের নাম বলুন যেটা ঐসব প্রতিষ্ঠানের ছাত্র–ছাত্রীদের হাতে নিশ্চিন্তে তুলে দেয়া যায়।

পরিশেষে এ জটিল সমস্যার সমাধান আমার দৃষ্টিতে এটাই যে, মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে হাতে গোনা যে কয়জন এমন লোক আছেন যারা কলেজে শিক্ষারত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ইসলামী শিক্ষাদানের যোগ্যতা রাখেন, তাদেরকে কতিপয় কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে দীনী শিক্ষাদানের জন্যে নিয়োগ করার ব্যবস্থা করা উচিত। তারপর তাদের শিক্ষাদানের বদৌলতে যে কাফেলা তৈরি হয়ে বের হবে তাদের মধ্য থেকে এমন শিক্ষক তৈরি হওয়ার আশা করা যায় যাদেরকে অন্য প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ করা যাবে এবং তারা কলেজের উপযোগী সিলেবাসও তৈরি করতে পারবেন।

আমার এ ব্যাখ্যার পর আপনি তানকীহাতের এ দু'টি প্রবন্ধ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আবার একবার পড়ুন। এরপর আপনি অনুমান করতে পারবেন যে, আজ পনের বছর পর এই প্রবন্ধের যে প্রতিদান দেওবন্দ ও মাযাহিরুল উলুমের দারুল ইফতা থেকে আমি পেয়েছি তা কোন্ পর্যায়ের ইলম, দূরদর্শিতা ও আল্লাহভীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। আমি অবাক হই, এসব লোক যদি ব্যাপারটি বুঝতে অসমর্থ হন, তাহলে এগুলোর উপর মন্তব্য করতে তাদেরকে কে বাধ্য করেছে, তাও আবার ফতওয়ার আকারে?

এবার তৃতীয় বাক্যটি প্রসংগে। এই বাক্য থেকে আপনার মনে যে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে এবং দেওবন্দ ও মাযাহিরুল উলুমের মুফতীগণ যে সন্দেহ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন তার জবাব স্বয়ং সে প্রবন্ধেই পাওয়া যেতো যার মধ্যে এই বাক্যটি আছে। তবে প্রয়োজন ছিলো মনোযোগ দিয়ে পড়ার। যদি আপনার কাছে 'তানকীহাত' থেকে থাকে, তাহলে "তুরস্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্ব" শিরোনামের লেখাটি বের করে দেখুন। তাতে কি 'ইসলামী ফিকহের কোন্ কিতাবগুলো নির্ভরযোগ্য এবং একটি রাজ্যে কোন্ ফিকাহর কিভাবে চালু হওয়া উচিত' বিষয়ের উপর আলোচনা করা হয়েছে নাকি বর্তমানে তুরস্কে নাস্তিকতা, ধর্মহীনতা এবং পাশ্চাত্যের অন্ধানুকরণ প্রসারতার কারণ কি এর উপর আলোচনা করা হয়েছে? কোনো লেখা পড়ে তার বিষয়বস্তু বুঝার সামান্য সমর্থনও যদি কেউ রাখে, সে এক নজরেই বুঝবে যে, আমার এ লেখার আসল বিষয়বস্তু দ্বিতীয়টি, প্রথমটি নয়। একটি বিষয়বস্তু নিয়ে কথা বলতে গিয়ে প্রসংগত অন্য বিষয় সম্পর্কিত একটি বাক্য যদি আমার কলম দিয়ে লেখা হয়ে যায়, তাহলে ঐ বাক্যটির উপর ভিত্তি করেই দ্বিতীয় বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমার মতামত কি এ চূড়ান্ত ফয়সালা করা আপনাদের জন্যে কিভাবে জায়েয হতে পারে? আরো দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো, আপনারা এমন সব বাক্য দ্বারা আমার অভিমতও উদ্ভাবন করেন যার খন্ডন আমার অনেক লেখার মাধ্যমে করা হয়েছে। আপনি যদি এটা জানতে চাইতেন যে, ফিকাহর ব্যাপারে আমার মত কি এবং সালাফদের ফিকহী কিতাব সম্পর্কে আমার রায় কি, তাহলে

ফিকহী বিষয়বস্তুর উপর লিখিত আমার লেখাসমূহ আপনার দেখা উচিত ছিল। অন্য কিছু না পড়লেও 'ইসলমী কানুন' 'ইসলামী আইন' নামে প্রকাশিত পুস্তিকাটি অন্তত পড়ে নিতেন। তাতে আপনার সেসব সন্দেহের অপনোদন হয়ে যেতো, যেগুলোর প্রাসাদ তানকীহাতের শুধুমাত্র একটি বাক্যের উপর তৈরি হয়েছিল।

যদি আপনি খারাপ মনে না করেন, তাহলে এ প্রসংগে আমি একটি কথা আরয করবো। সম্মানিত আলেমগণ দীনী ইলমে যতই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হোন না কেন, দু'টি বিষয়ে কিন্তু তাঁরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

১. নিকট অতীতে বিভিন্ন মুসলিম দেশে ইসলাম ও পাশ্চাত্য ভাবধারার মধ্যে কি কি ধরনের দ্বন্দ্ব সংঘাত হয়েছে আর এই দ্বন্দ্বে প্রত্যেক জায়গায় ইসলামের পরাজয় এবং পাশ্চাত্যবাদের বিজয় ও প্রসারের কারণ কি? তাছাড়া এহেন দুঃখজনক পরিণতির প্রকাশ মুহূর্তে স্বয়ং উলামা ও দীন রক্ষাকারীগণ নিজেদের ভুল ও ত্রুটি সম্পর্কে কতটুকু সাবধান ছিলেন, এ বিষয়ে তাদের ধারণাই নেই।

২. তারা এটাও জানেননা যে, দুনিয়ার আধুনিক সমাজে যদি আমরা একটি উন্নত ধরনের ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা খাঁটি ইসলামী নীতির ভিত্তিতে পরিচালনা করতে চাই, তাহলে আমাদের কি কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে? এসব সমস্যার সমাধানে পূর্ববর্তীদের পরিত্যক্ত ইলমী সম্পদ আমাদের কতটুকু পরিমাণ কাজে লাগতে পারে এবং এই পরিমাণের অতিরিক্ত কাজ আমাদের ইজতেহাদ ছাড়া কেন চলতে পারেনা?

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ দুটি বিষয়ে যদি তাদের বর্তমান অবচেতন অবস্থা না হতো, তাহলে আমার অনেক কথা বুঝতে তাঁদের বর্তমান জটিলতার সম্মুখীন হতে হতোনা। আরো দুঃখজনক ব্যাপার হলো, তাঁরা নিজেদের জ্ঞানের এই অভাব অনুভব করে জ্ঞান বৃদ্ধি চেষ্টা করার পরিবর্তে উল্টো এমন একজন লোকের উপর ক্রু হয়ে বসে আছেন যে একদিকে এই অভাব দূর করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত এবং অন্যদিকে দীনকে এমন ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে নিমগ্ন, যা এই ত্রুটির কারণে হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হওয়ার আশংকা রয়েছে। তাদের এরূপ আচরণের পরিণাম কি হবে তা আল্লাহই ভাল জানেন। রাশিয়ার তুর্কিস্তানের পরিণতি এই হয়েছে যে, কমিউনিস্টরা এ ধরনের আলেমদেরকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করে এমন সব সংশোধনবাদীদেরকে খতম করে দিয়েছে যারা কমিউনিস্টদের মুকাবিলায় একটি সফল দীনী আন্দোলন চালাতে সক্ষম ছিলেন। তারপর জনগণকে নিজ প্রভাব বলয়ে বশীভূত করে তাদের মাধ্যমেই সকল আলেমকে খতম করে দিয়েছে। আলেমদের সাথে সাথে স্বয়ং দীনেরও জানাযা পড়া হয়েছে। বর্তমানে সেই করুণ পরিণতির পুনরাবৃত্তি এখানে দেখা যাচ্ছে।

যারা খৃষ্টান ও কাফিরদের মুকাবিলায় এখানে দীনের পতাকা সমুন্নত রাখতে সক্ষম, আলেমদের একটি বিরাট দল তাঁদের মুকাবিলায় ফিরিংগী বে–দীনদের শক্তি বৃদ্ধিতে নিয়োজিত রয়েছেন। আল্লাহ্ না করুক, যদি ইসলাম বিরোধী শক্তি এসব আলেমের সহায়তায় এই লোকদের খতম করতে সফলকাম হয়, তাহ্লে পরবর্তীতে যে পরিণতি সামনে আসবে তা প্রত্যক্ষ করতে আমরা তো থাকবোনা, কিন্তু এসব উলামায়ে কিরাম এবং তাদের ভবিষ্যত বংশধরগণ স্বচক্ষেই অবলোকন করবেন যে, তারা নিজেদের হাতে নিজেদের স্বার্থে এবং এই দীনের স্বার্থে কেমন করে মারণাস্ত্র নির্মাণ করেছেন। [তরজমানুল কুরআন, জমাদিউস সানী ১৩৭১ হিজরী, মার্চ ১৯৫২]

মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানীর ফতওয়া

প্রশ্নঃ মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী সাহেব "মুসলমান বে–আমল হলেও ইসলাম থেকে খারিজ নয়" শিরোনামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন এই পুস্তিকায় আপনার অভিমতকে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সম্পূর্ণ বিরোধী এবং সহীহ্ হাদীস সুস্পষ্ট আয়াতের পূর্ণ পরিপন্থী বলে প্রমাণ করা হয়েছে। খারেজী ও মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের আকীদার মতো আপনিও আমল ঈমানের অংশ হওয়ার সমর্থক। আপনি নিজের এ আকীদাকে শাফেয়ী ও মুহাদ্দিসগণের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। অথচ শাফেয়ী ও মুহাদ্দিসগণের মতে আমল ঈমানের অংশ ও মূল্যায়নকারী নয় বরং ঈমানের পরিপূরক ও সম্পূরক। মেহেরবানী করে এ সম্পর্কে আপনার আকীদা বিস্তারিতভাবে লিখে তরজমানুল কুরআনে প্রকাশ করে দিবেন। তিনি আপনার নিম্নবর্ণিত বাক্যগুলো দলিল হিসেবে পেশ করেছেনঃ "আর থাকে তাদের কথা, যারা সারা জীবন কখনো একথা মনেও করেনা যে, তাদের উপর হজ্জ ফরয করা হয়েছে। তারা সারা দুনিয়ায় সফর করে বেড়াচ্ছে। ইউরোপ যাবার পথে হেজাযের উপকূলও অতিক্রম করে, সেখান থেকে মক্কার দূরত্ব মাত্র কয়েক ঘন্টার। তারপরও হজ্জ করার ইচ্ছা পর্যন্ত তাদের মনে জাগেনা। এমতাবস্থায় তারা কখনো মুসলমান থাকতে পারেনা। যদি তারা নিজকে মুসলমান বলে, তবে তাদের এ বলা মিথ্যা। আর যে তাদেরকে মুসলমান মনে করে সে কুরআন সম্পর্কে অজ্ঞ।" (খুতবাত পৃষ্ঠা ১৮০)

২. "তাতে বুঝা গেল যে, যাকাত ব্যতীত নামায, রোযা ও ঈমানের শাহাদাত সবই নিস্ফল। কোনো জিনিসের উপরই নির্ভর করা যায়না।" (খুতবাত পৃষ্ঠাঃ ১২৬)

৩. যারা ইসলামের এই দুটি রোকনের (অর্থাৎ নামায ও যাকাত) বিরোধিতা করে, তাদের ঈমানের দাবী করাটাই মিথ্যা। (খুতবাত পৃষ্ঠা ১২৯)

৪. "কুরআনের আলোকে কালেমায়ে তাইয়্যেবার ঘোষণা অর্থহীন যদি মানুষ নামায ও যাকাত আদায় না করে। (খুতবাত পৃষ্ঠা ১৩২)

এ উদ্ধৃতিগুলো খুতবাতের (ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা) ৭ম সংস্করণ থেকে দেয়া হলো।

জবাবঃ মূল বইয়ের ইবারত ভালোভাবে না পড়ে নিজে বইয়ের বিষয়বস্তু ও লেখা সম্পর্কে জ্ঞাত না হয়ে শুধুমাত্র কতিপয় লোকের সংগ্রহ করা উদ্ধৃতির উপর ভিত্তি করে গ্রন্থ প্রণেতার একটি অভিমত নিজেই নির্ধারণ করে নিয়ে এবং তা প্রচার করে মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী সাহেব তো একটি যুলুম করলেন। মাওলানা সাহেবের এই পুস্তিকাটি পাঠের পর আপনি নিজে না 'খুতবাত' পাঠ করেছেন, না আমার অন্য কিতাবের সাহায্যে আমার মতামত সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েছেন; বরং তাৎক্ষণিকভাবে জবাবদিহির জন্যে আমাকে তলব করে দ্বিতীয় বার যুলুম আপনি করলেন। আমার কিতাব "খুতবাত" আপনার নাগালের বাইরে ছিলনা। আপনি শুধু এ কিতাবটি দেখলে এই বাক্যগুলোর আশেপাশেই মাওলানার অভিযোগের জবাব পেয়ে যেতেন। তারপর আমার কিতাব "তাফহীমাত ২য় খন্ড" আপনার শহরের জামায়াতে ইসলামীর পাঠাগারে আপনি সহজেই পেতে পারতেন। এই কিতাবটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারতেন আমি কি খারেজী ও মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের সমমনা, নাকি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের?

এ ধরনের অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্যে আমাকে জিজ্ঞেস না করার কথা আমি বলছিনা। আমি শুধু এটাই আরয করতে চাই যে, যেসব অভিযোগের ব্যাপারে অনুসন্ধান আপনি নিজেই সামান্য কষ্ট স্বীকার করলে করতে পারেন, সেগুলো নিয়ে অযথা চিঠিপত্র আদান-প্রদান করে সময় কেন ব্যয় করা হবে?

খুতবাতের যেসব বাক্যকে কেন্দ্র করে মাওলানা আমাকে মু'তাযিলা ও খারেজী বানিয়েছেন, সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করার আগে একথা জানা থাকা দরকার যে, এই কিতাবটি ফিকাহ এবং ইলমে কালামের কিতাব নয়। ফতওয়াবাজি করার প্রবণতা নিয়ে কিতাবটি লেখা হয়নি। বরং আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহর আনুগত্যের জন্যে উৎসাহিত করা এবং নাফরমানী করা থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে লিখিত এটি একটি উপদেশমূলক কিতাব। ইসলামের শেষ সীমা যা অতিক্রম না করলে মানুষ ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত হয়না তা এই কিতাবে আলোচিত হয়নি। বরং এতে সাধারণ মুসলমানদেরকে দীনের আসল উদ্দেশ্য বুঝাতে এবং একনিষ্ঠতার সাথে আনুগত্য করার ব্যাপারে উৎসাহিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ ধরনের কিতাবে

জনগণকে আমার একথা বলা কি উচিত ছিল যে, যদিও তোমরা নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত কিছুই আদায় কর না, তবুও তোমরা মুসলমানই থাকবে। মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী সাহেবের ফতওয়াবাজি করার বাসনা থাকলে তো তিনি স্বীয় বাসনা অবশ্যই পূর্ণ করবেন। কিন্তু ফতওয়া দেয়ার আগে যে বিষয়কে কেন্দ্র করে ফতওয়া দেয়া হচ্ছে, সে বিষয়টি ভাল করে বুঝে নেয়া তো তাঁর উচিত ছিল।

তারপর যদি মাওলানা সাহেব লোকদের পেশকৃত উদ্ধৃতিসূহের উপর নির্ভর না করতেন বরং কিতাব বের করে বাক্যের পূর্বাপর আলোচনাও দেখে নিতেন, তাহলে আমি আশা করি না যে, তিনি এগুলোর ব্যাপারে অভিযোগ করার সাহস করতেন। উদাহরণ স্বরূপ হজ্জের সম্পর্কে আমার সেই বাক্যটির কথাই ধরুন যেটা আপনি সর্বপ্রথম উল্লেখ করেছেন। 'খুতবাত' বইতে এই বাক্যের আগে এ আয়াতটি উল্লেখ করা হয়েছেঃ

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِينَ -(ال عمران:٩٧)

"বান্দার উপর আল্লাহর হক হলো, যে বাইতুল্লাহ পর্যন্ত যাওয়ার ক্ষমতা রাখে সে তার হজ্জ করবে। আর যে অমান্য করবে, তার জানা থাকা উচিত আল্লাহ বিশ্বজাহান থেকে মুখাপেক্ষাহীন।"

তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছেঃ "যে ব্যক্তি বাইতুল্লাহ পর্যন্ত যাওয়ার পথ খরচ ও যানবাহন পায়; অথচ সে হজ্জ করলোনা এ অবস্থায় তার মৃত্যু ইহুদী অথবা নাসারার মৃত্যু সমতুল্য।" তারপর এ বিষয়বস্তুর উপরই আরেকটি হাদীস উল্লেখ করার পর হযরত উমরের (রা) এ উক্তিটি বর্ণনা করা হয়েছে যে, "যে ব্যক্তি সামর্থবান হওয়া সত্ত্বেও হজ্জ আদায় করেনা, আমার মনে চায় তার উপর জিজিয়া লাগিয়ে দিই। সে মুসলমান নয়, সে মুসলমান নয়।" এগুলো বর্ণনা করার পর মাওলানা সাহেবের পুস্তিকা থেকে আপনার উদ্ধৃত বাক্যাংশ লিখেছি। এবার আপনি বলুন এই বাক্যসমূহকে কেন্দ্র করে খারেজী ও মু'তাযিলী হওয়ার যে ফতওয়া মাওলানা সাহেব জুড়ে দিলেন তা কার কার গায়ে গিয়ে পড়ে? তাহলে আমি কি মাওলানা সাহেবকে এতোটা আল্লাহ ভীতিহীন ধরে নেব যে, এ সব কিছু পড়ার পরও তিনি মুফতীর ভূমিকায় এ ধরনের তীরন্দাজী করার দুঃসাহস করছেন?

এমনিভাবে নামায ও যাকাতের ব্যাপারেও আপনি আমার যে সব বাক্য মাওলানার পুস্তিকা থেকে উল্লেখ করেছেন, তার আগে–পরে আমি হযরত আবু বকরের সর্বজন পরিচিত কর্মতৎপরতারও উল্লেখ করেছি যে, তিনি যাকাত

অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন। এর সাথে অনেকগুলো আয়াতের উল্লেখ করেছি যার মধ্যে একটি হচ্ছে,

فَإِنْ تَابُوْا وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ

এই পূর্বাপর আলোচনার প্রতি দৃষ্টি ফিরানোর পরও আমার এসব বাক্যকে কেন্দ্র করে মাওলানা সাহেবের কলম দিয়ে খারেজী ও মু'তাযিলা হওয়ার যে ফতওয়া লেখা হয়েছে, তা কি আপনি সঠিক মনে করতে পারেন? [তরজমানুল কুরআন, জমদিউল উখরা ১৩৭১, মর্চ ১৯৫২]

জামায়াতে ইসলামী এবং ওলামায়ে কিরাম

প্রশ্নঃ জামায়াতে ইসলামী এবং হক্কানী আলেমগণের মধ্যকার বিরোধ দুঃখজনক পর্যায়ে পৌছে গেছে। এতে আসল কাজের গতি–প্রকৃতিতে খুব বেশী বিরূপ প্রভাব পড়বে। এটাকে মামুলী ব্যাপার মনে করা যায়না। ধর্মীয় দলগুলোর মধ্যে জামায়াতে ইসলামীকে আহলে হাদীসগণ (যারা সংখ্যায় কম) সুনজরে দেখেন এবং বৈধতার সীমা পর্যন্ত একাত্মতা প্রকাশ করে থাকেন। আর দ্বিতীয় দলটি হচ্ছে হক্কানী আলেমদের। এরা দেওবন্দের সাথে সম্পৃক্ত (অর্থাৎ বেরেলভীদের তুলনায়) তারা সংখ্যায় অধিক। যদি এই বিশাল দলের ছোট–বড় সকল নেতাই জামায়াতের অনুসৃত নীতিকে অবজ্ঞা করে, তাহলে জনগণের মধ্যে কি পরিমাণ অনীহার সৃষ্টি হবে এবং মূল উদ্দেশ্য থেকে সরে এসে জামায়াতে ইসলামীর লোকেরা কোন্ সাম্প্রদায়িকতার বিপদে নিমজ্জিত হয়ে যাবে তা গভীর মনোনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করা দরকার। এতদসত্ত্বেও এখনো মতবিরোধের সূচনা মাত্র। ইতিমধ্যে বেরেলভীদের পক্ষ থেকে বিপদ সংকেত দেয়া হয়েছে। আহলে দেওবন্দের উস্তাদবৃন্দের পক্ষ থেকে ২/৪টি প্রচারপত্র ছাপানো হয়েছে। এগুলোর তদন্ত করে দেখা যেতে পারে। ভুল বুঝাবুঝির অবসানও ঘটানো যেতে পারে। কিছু সময়ের জন্য উদ্দেশ্য অর্জনের রাজনীতি বন্ধ করে হলেও জামায়াতকে ইসলামের খাতিরে সাধারণ মুসলমানের খারাপ ধারণা দূর করা উচিত।

আমার জানা মতে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে সম্ভবত 'কাওসার' পত্রিকায় ঐ সব অভিযোগের কিছুটা পর্যালোচনা সংক্ষেপে করা হয়েছে। স্বতন্ত্রভাব এগুলোর জবাবদানের প্রতি মনোযোগ দেয়া হয়নি। সময়ের প্রয়োজনে জবাবদানে বিলম্ব করা আমার ধারণায় আদৌ ঠিক নয়। বাক্যকে পূর্বাপর বক্তব্য থেকে বিচ্ছিন্ন করা এবং মনগড়া বড় বড় অভিযোগ ও আপত্তিগুলো তো প্রায়

১. "তারপর যদি তারা তওবা করে এবং নামায কায়েম ও যাকাত প্রদান করে, তাহলে তারা তোমাদের দীনী ভাই।"

সামনে এসে গেছে। বস্তুত যদি অভিযোগগুলো জামায়াতের সাথে সম্পর্কিত হয়, তাহলে এগুলোর সংখ্যানুক্রমিক যথার্থ জবাব জামায়াতের পক্ষ থেকে আসা উচিত।

আর যদি এগুলো আপনার নিজের সম্পর্কে হয়ে থাকে, তাহলে আপনি ব্যক্তিগতভাবে সুন্দর প্রক্রিয়ায় সেগুলোর জবাব দিতে পারেন। তাতে একজন সুস্থ মানসিকতাসম্পন্ন লোককে বারবার প্রশ্নোত্তরের কষ্ট বরদাশত করতে হয়না।

এ সমস্ত নিশ্চিত বিশ্লেষণের পরও যদি কোনো গোঁড়া প্রকৃতির লোক যত্রতত্র প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে থাকেন, তাহলে সে সময় আপনার জবাব দেয়ার কোনোই দায়িত্ব থাকবেনা। আপনি নিজের কাজে ব্যস্ত থাকবেন এবং জামায়াতের সকলের প্রতিও এই নির্দেশ থাকবে যে, ব্যাপক বিশ্লেষণ ছাড়া তারাও অভিযোগ ও জবাবদান থেকে বিরত থাকে। আর আসল বিষয়ে আল্লাহ্ তাআলার উপর সোপর্দ করতে হবে।

প্রশ্নগুলো প্রায় নিম্নরূপ। আপনি নিজেই মেহেরবানী করে এগুলোর জবাব লিখবেনঃ

১. যে মুসলমান জামায়াতে ইসলামীতে শামিল হয়নি, তার ইসলাম ও ঈমান সম্পর্কে আপনার মতামত কি? সে ইসলামে শামিল এবং মুসলমান আছে কি নেই?

২. কবীরা গুনাহগার মুসলমান সম্পর্কে নির্দেশ কি?

৩. সালফে সালেহীনদের (সাহাবা, তাবেয়ীন, ওয়ালী আল্লাহ্, সুফী, দরবেশ, উলামা আহলে সুন্নাত) সম্পর্কে জমহুরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত যা কিছু আকীদা পোষণ করেন, তার সবগুলো আপনি স্বীকার করেন কি? নাকি জমহুরের (অধিকাংশের মত) সাথে কিছুটা মতপার্থক্য করেন? যদি মতপার্থক্য করে থাকেন, তবে পার্থক্যগুলো বর্ণনা করবেন।

৪. নিজের মুজাদ্দিদ ও মাহদী হওয়া সম্পর্কে কি মত পোষণ করেন? ভবিষ্যতে যদি আপনি মুজাদ্দিদ ও মাহদী হওয়ার দাবী করেন, তাহলে সেটা ঠিক হবে নাকি ভুল?

৫. আপনি কি অতীত আলিমগণের গবেষণা ও ইজতিহাদের উপর নিজের গবেষণাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন নাকি নিজের উদ্ভাবনাকে তাদের ইজতিহাদের মুকাবিলায় তুচ্ছ মনে করেন?

জবাবঃ বর্তমান অবস্থায় জামায়াতে ইসলামী ও সম্মানিত আলেমদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ইসলামী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর, আপনার এ ধারণা সম্পূর্ণ ঠিক। এ কারণে আমিও খুবই চিন্তিত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমার অথবা জামায়াতের দায়িত্বশীলদের কিংবা গোটা জামায়াতের কি দায়িত্ব

আমি আজ পর্যন্ত তা বুঝতে সক্ষম হইনি। আমাদের প্রকাশনাসমূহ দেখুন। আমাদের বক্তৃতা-বিবৃতিসমূহ সম্পর্কে সাধারণ শ্রোতাদেরকে জিজ্ঞেস করুন। আমাদের তৎপরতার রিপোর্ট নিয়ে খোঁজ করে দেখুন। কোথাও এমন কিছু জিনিস পাওয়া যায় কিনা যা আলেমদের কোনো দলের জন্য সত্যিকার অর্থে উত্তেজনাকর বলা যেতে পারে? আমরা কি কখনো কোনো দলকে অপবাদ ও নিন্দাবাদের লক্ষ্যস্থল বানিয়েছি? কারো বিরুদ্ধে বিপদ ঘন্টা বাজিয়েছি? কারো বিরুদ্ধে ফতওয়াবাজি করেছি? কারো বিরুদ্ধে প্রচারপত্র বিলি করেছি? আমরা যদি কারো সাথে কখনো মতবিরোধ করেও থাকি, তবে সেটা ছিল ইলমী পর্যায়ের, যুক্তি-প্রমাণসহ, দীনের খাতিরে, আদব-কায়দা ও মান-সম্মান বজায় রেখে। কোনো বিষয়ে যে সীমা পর্যন্ত যার সাথে মতবিরোধ ছিল আমাদের কথা তার সাথে সে পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকতো। আমাদের এমন কোনো লেখা অথবা বিবৃতি কেউ চিহ্নিত করতে পারবেনা, যা এ থেকে ভিন্ন ধরনের। আহলে হাদীস হোক কিংবা দেওবন্দী বা বেরেলভী আমরা এসব দলের কারো উপর অথবা তাদের মত ও আকীদার উপর কিংবা তাদের বুযুর্গদের উপর কখনো কোনো ধরনের আক্রমণ করিনি। বাস্তবিকই কোনো ধরনের আক্রমণ করার খেয়াল পর্যন্ত আমাদের মনে আদৌ জাগেনি। তারপর দীনের যে তাফসীর ও ব্যাখ্যা আমরা আজ পর্যন্ত পেশ করে আসছি এবং যে জিনিসের প্রতি আমরা দুনিয়াবাসীকে আহ্বান জানাচ্ছি, তার মধ্যেও এই মহোদয়গণ প্রকৃতপক্ষে কোনো ত্রুটি দেখাতে পারবেননা। আসলেই গোমরাহীর কোনো জিনিসও তারা চিহ্নিত করতে পারবেননা। এ দ্বন্দ্বটা একপক্ষীয় নাকি দ্বিপক্ষীয় এবং এর কোনো দায়-দায়িত্ব আমাদের উপরও আরোপ হতে পারে কিনা তা আপনি নিজেই বিবেচনা করুন?

পরিতাপের বিষয়, এই ভদ্রলোকদের মধ্যে পরিবেশ ও পরিস্থিতির আন্দাজ পর্যন্ত নেই। এ সময় দীনদার লোকদের পারস্পরিক বিরোধ দীনের জন্য যে কত ক্ষতিকর এবং এতে নব্য গোমরাহের দল যে কত উপকৃত হয়, সে বোধটুকুও তাদের নেই। তারা নিজেদের দলীয় গোঁড়ামি থেকে মুক্ত হয়ে এক মুহূর্তের জন্যও এটা বুঝতে চেষ্টা করেনা যে, এ সংকটাবস্থায় জামায়াতে ইসলামী দীনের কি খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে এবং এ পর্যায় থেকে জামায়াতের কাজ বন্ধ হলে দীনের ময়দানে এত বড় ফাটলের সৃষ্টি হবে যা জোড়া দেয়ার মতো অন্য কোনো সাংগঠনিক ও সচেতন দলই বর্তমান নেই। আল্লাহ না করুক, যদি জামায়াতে ইসলামী নিজের কাজে সফলকাম না হয়, তাহলে সমগ্র উপমহাদেশে ইউরোপের নতুন আলোর ঝলকানিতে বিমোহিত মুসলমানদের বংশধরদেরকে নাস্তিক্যবাদ ও খোদাবিমুখ আন্দোলন থেকে বাঁচানোর মতো কোনো সাংগঠনিক শক্তি থাকবেনা এবং শুধু আলেমগণ এ খেদমত সম্পন্ন

করতে পারবেননা। এ কথাটির হয় তারা পরওয়া করেনা অথবা এ সম্পর্কে তারা সচেতনই নন যে, আমাদের দেশকে একটি ইসলামী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করতে এবং এখানকার ক্ষমতার মসনদে ধর্মনিরপেক্ষতার স্থলে দীনকে আসীন করার জন্য জামায়াতে ইসলামীর প্রচেষ্টাসমূহ কি গুরুত্ব রাখে, তাদের অকৃতকার্যতায় এখানে কমিউনিজম অথবা সোশ্যালিজমের বিজয়কে প্রতিরোধ করা একা আলেমদের আয়ত্তাধীন কাজ নয়। ঐ সব ফতওয়াবাজ মহোদয়দের এ বিষয়ে হয় অনুভূতি নেই অথবা তাদের দৃষ্টিতে জামায়াতের এসব তৎপরতার কোনো মূল্য নেই। এসব সুধীজনেরা এ তথ্য সম্পর্কেও অজ্ঞতায় রয়েছেন যে, এই উপমহাদেশে দীর্ঘদিন আপ্রাণ চেষ্টার পর এমন একটি আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে, যে দীনের অংশবিশেষ নয় বরং গোটা দীনকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিজয়ী করতে চায় এবং এমন একটি জামায়াত গঠিত হয়েছে, যে নতুন–পুরাতন উভয় পদ্ধতির শিক্ষিত লোকদেরকে এই মহান উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ, সুসংগঠিত ও বিপ্লবী রূপে তৈরি করছে। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, তাদের দলীয় একগুয়েমি এমন একটি আন্দোলন ও জামায়াতের মূল্যায়ন সঠিকভাবে করতে বাধা দিচ্ছে। কুফরী, গোমরাহী ও খোদাদ্রোহিতার এই সংকট মুহূর্তে এই আন্দোলনের সাথে সহযোগিতা করার পরিবর্তে আন্দোলনকে ধ্বংস করার চেষ্টা করা দুনিয়া ও আখিরাতে একটি মস্তবড় মুসিবত নিজের মাথায় ধারণ করারই নামান্তর, একথাটা তারা কখনো ধীরস্থিরভাবে বুঝার চেষ্টা করেননি।

এই ভদ্র লোকেরা নিজেদের ফতওয়া, লেখা ও বিবৃতিসমূহে বারবার মানুষকে জামায়াতে ইসলামীর বই–পুস্তক ও সাহিত্য পাঠ না করার জন্যে তাকিদ করবে এবং অবিরত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা এই সাহিত্য পড়েছেন কি পড়েননি তা আমার জানা নেই। তবে এরা এদেশে ইসলাম ও মুসলমানদের এবং স্বয়ং নিজেদের প্রভাবিত ধর্মটি দলগুলোর সাথে জ্ঞাতসারে হোক কিংবা অজ্ঞাতসারে বাস্তবিকই এক সাংঘাতিক শত্রুতা করে যাচ্ছেন। যদি তাদের এ প্রচেষ্টার ফলে আমাদের আধুনিক শিক্ষিত বংশধররা জামায়াতে ইসলামীর সাহিত্যসম্ভার পড়া থেকে বিরত থাকেন তাহলে আপনারা এমনকি সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন যার সাহায্যে এসব লোককে তাদের ভাষা ও পরিভাষায় দীন বুঝানো যেতে পারে এবং আধুনিক যুগের পথভ্রষ্টতা থেকে বাঁচানো যেতে পারে। তাদের প্রচারে যদি ধর্মীয় শ্রেণী, বিশেষত আরবী মাদ্রাসার ছাত্র এবং মাদ্রাসা থেকে শিক্ষাপ্রাপ্তগণ এই সাহিত্য অধ্যয়ন থেকে বিরত থাকেন, তাহলে আমাকে বলুন, এখানে এমন আর কোন্ সাহিত্য আছে যা মানুষকে নির্ভেজাল ইসলামী দৃষ্টিভংগিতে আধুনিক যুগের বিষয়াবলী বুঝাতে পারে এবং আধুনিক শিক্ষিত লোকদের সাথে পাল্লা দিয়ে কথা বলার যোগ্য করে তাদেরকে গড়তে পারে? এ দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি প্রসংগটির উপর নজর দেন, তাহলে স্পষ্ট অনুমান

করতে পারবেন যে, এসব ভদ্র লোকের পক্ষ থেকে আমাদের সাহিত্যের যে বিরোধিতা চলছে, তা কত বড় অপরিণাম দর্শিতা এবং এর পরিণতি কত মারাত্মক।

তারপর এদিক থেকেও কিছুটা অনুমান করুন, ঐ হযরতদের বিরোধিতা সত্ত্বেও যারা আমাদের সাহিত্য অধ্যয়ন করেন, তারা এই ফতওয়া ও বিবৃতিদাতা আলেমগণকে বরং গোটা আলেম সমাজকে কি দৃষ্টিতে দেখবে এবং দীনের পতাকাবাহীদের সততাকে কি পরিমাণ সন্দেহের চোখে দেখতে থাকবে! মুসলমানদেরকে দীনের জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলাই আমাদের এ যাবতকার প্রয়াস। দীন সম্পর্কে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন লোকদের হাতে মানুষের লাগাম অর্পণ না করা পর্যন্ত জীবন ব্যবস্থা কখনো ঠিক হতে পারেনা একথা তাদের মন-মগজে প্রবেশ করাবার চেষ্টা আমরা করে যাচ্ছি কিন্তু আপনি আমাকে বলুন, জনসাধারণ ও আধুনিক শিক্ষিত লোকেরা যখন একদিকে এ সাহিত্যগুলো দেখবে এবং অপরদিকে দেখবে বড় বড় প্রখ্যাত আলেমগণ এসব সাহিত্যের কি কি ধরনের বিরোধিতা করছে, তখন তাদের মধ্যে আলেমদের সম্পর্কে ভালো ধারণা সৃষ্টি করার আমাদের প্রয়াস কতটুকু সফলতা লাভ করবে! আপনি নিজে যেহেতু আলেম সমাজের সাথে সম্পর্ক রাখেন, সেজন্য আপনার কাছে আমি একথাগুলো আরয করছি। আপনি এ কথাগুলো ঐ সম্মানিত মহোদয়দের কাছে পৌছে দিন যারা অযথা আমাদের বিরোধিতা করে আসছে। আপনার সাধ্যমত তাদেরকে বুঝতে চেষ্টা করুন।

এবার আপনার চিঠিতে লিখিত প্রশ্নাবলীর দিকে মনোযোগ দিচ্ছিঃ

১. প্রথম প্রশ্নটি সম্পর্কে আমার সর্ব প্রথম জিজ্ঞাস্য হলো এ প্রশ্নের অবতারণা হলো কিভাবে? যে ব্যক্তি জামায়াতে ইসলামীতে শামিল হয়নি, সে মুসলমান নয়। একথা আমরা কখনো কোথাও বলেছি কিংবা লিখেছি কি? যদি আমার অথবা জামায়াতে ইসলামীর দায়ীত্বশীলদের তরফ থেকে কখনো এমন কোনো কথা বলা বা লেখা হয়ে থাকে, তাহলে তার উদ্ধৃতি পেশ করা হয়না কেন? প্রকৃতপক্ষে এ প্রশ্নটি সৃষ্টির ক্ষেত্রে আমাদের ভুলেরও কোনো দখল নেই। বরং এটা আমাদের প্রতিপক্ষদের তথাকথিত "সৎ উদ্দেশ্য"-এর ফলশ্রুতি মাত্র। সাধারণ মুসলমানদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে যেভাবেই হোক ক্ষেপিয়ে তোলাই তাদের ইচ্ছা। "জামায়াতে ইসলামী তোমাদের মুসলমান মনে করেনা", মুসলমানদেরকে একথা বলার চেয়ে তাদেরকে উত্তেজিত করার জন্য অধিক কার্যকর হাতিয়ার আর কিছুই হতে পারেনা। আগেও সংস্কারকামীদের বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থাপত্রটি প্রয়োগ করা হয়েছে। আর আজ সেটাই আমাদের বিরুদ্ধেও প্রয়োগ করা হচ্ছে।

কিন্তু আমি কেবলমাত্র নেতিবাচক জবাব দিয়েই ক্ষ্যান্ত হবোনা। আজ আমি এ প্রশ্নের কোনো নতুন জবাবও দেবোনা যাতে করে কেউ একথা বলার অবকাশ না পায় যে, এবার তিনি এ দোষ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার অভিপ্রায়ে এটা অস্বীকার করছেন। জামায়াতে ইসলামী যখন সংগঠিত হয়, সে সময়ের প্রেক্ষাপট পেশ করছি। যদি আপনার কাছে তরজমানুল কুরআনের ফাইল থাকে, তাহলে মেহেরবানী করে ১৩৬০ হিজরী সনের রবিউল আওয়াল (মে ১৯৪১) সংখ্যা বের করে দেখুন, সেখানে নিম্নবর্ণিত কথাগুলো আপনি পেয়ে যাবেন।

'জামায়াতে ইসলামী'র নাম শুনে কারো এ ভুল ধারণা যেন না হয় যে, এ জামায়াতের বহির্ভূত লোকদেরকে আমরা অমুসলমান মনে করে থাকি। আমরা যে কারণে এ নাম ধারণ করেছি তার বর্ণনা উপরে করা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে যে জামায়াতের নীতিতে ইসলাম থেকে কোনো জিনিস কমও নেই অতিরিক্তও নেই, যার আকীদা ইসলামেরই আকীদা, এবং যার কর্মপদ্ধতি নবীদের শিখানো পদ্ধতির অনুরূপ, সেই জামায়াতের নাম 'জামায়াতে ইসলামী' ছাড়া আর কি হতে পারে? কিন্তু আমরা কখনো কাউকে বাধ্য করিনা এবং এরূপ বাধ্যবাধকতার অধিকার আমাদের নেই যে, ঈমান শুধুমাত্র এই জামায়াতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং এ জামায়াতের বহির্ভূত লোক মু'মিন নয়। বরং যদি কেউ এই জামায়াতের বিরোধিতা করে, তখনও নিছক বিরোধিতার ভিত্তিতে আমরা তাকে মু'মিন নয় বলতে পারিনা। বরং এটাও সম্ভবত যে, একজন লোকের ঈমান আমাদের চেয়েও বেশী মজবুত, কিন্তু কোনো ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে সে সৎ উদ্দেশ্যেই আমাদের বিরোধিতা করছে। আমাদের নীতি ও কর্মপদ্ধতি হুবহু ইসলাম মোতাবেক রাখতে আমরা সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করে যাচ্ছি যাতে করে কোনো নেককার ও মু'মিন ব্যক্তি আমাদের থেকে পৃথক থাকার কোনো অজুহাত না পায়। এ পন্থায়ই সমস্ত ঈমানদার লোক একই ব্যবস্থাপনায় শামিল হতে পারে। কিন্তু আমাদের এই আকাংখাকে একটি অর্জিত বাস্তবতা করে নিয়ে আমরা কখনো ফিতনায় পতিত হবোনা। মুসলমানদের মধ্যে একটি ফের্কা হওয়া থেকে আমাদের অবশ্যই বাঁচতে হবে। আমরা আল্লাহর কাছে এমন বাড়াবাড়ি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি, যা আমাদের কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণের সেবক বানিয়ে দেয়।"

তারপর আমি সাধারণ মুসলমানদেরকে কাফির বানিয়ে চলছি এ দোষ যখন ভারতবর্ষে প্রথমবার আমার উপর দেয়া হলো এবং কোনো কোনো বিদগ্ধজন সরাসরি আমাকে "জাতীয় কাফির নির্মাতা" খেতাবে ভূষিত করলেন, তখন আমি আমার এক লেখার মাধ্যমে পুনরায় আমার অবস্থা ব্যক্ত করি। এ নিবন্ধটি সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর ১৯৪১-এর সংখ্যায় তরজমানুল কুরআনে

ধারাবাহিকভাবে 'সংশয়ের অপনোদন' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। নিবন্ধটির কথাগুলোও প্রনিধানযোগ্য।

"আমার আসল উদ্দেশ্য দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের জন্য নেককার লোক বাছাই করা। মুসলমানদের কুফরী ও ঈমান নিয়ে আলোচনা করা উদ্দেশ্য নয়। মুসলমানদের বর্তমান ঈমান ও নৈতিক অবস্থার যে সমালোচনা আমি করেছি তদ্বারাও আমার কেবল একথাই বলা উদ্দেশ্য ছিল যে, আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়ার দৃষ্টিতে মুসলমানদের মধ্যে কি কি ত্রুটি রয়েছে। এই মহান কাজের জন্য মুসলমানদের গোটা জনগোষ্ঠী থেকে কোন্ ধরনের লোক যুৎসই ও যথোপযোগী। জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রে রোকন হওয়ার জন্য দুই শাহাদতকে শর্ত গণ্য করার উদ্দেশ্যও শুধু এই যে, যারা এ কাজের জন্য নিজকে পেশ করবে, তারা সঠিক আকীদাসম্পন্ন লোক এবং তারা জাহিলিয়াতের মিশ্রণ নিয়ে আসছেনা, যা দুর্ভাগ্যবশত মুসলমানদের অভ্যন্তরে ঢুকে গেছে। অধিকন্তু আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়ার কাজ শুরু করার আগে তারা যেন আরেকবার নিজেদের ওয়াদা ও শপথকে মজবুত করে নেয় এবং নওমুসলিমের আবেগসহ অগ্রসর হতে পারে। আমার এ উদ্দেশ্য লোকেরা বুঝতে পারেনি এবং কতিপয় সুচতুর লোক ইচ্ছা করেই এর ভুল ব্যাখ্যা ছড়িয়ে দেয়। এ কারণে যে সব বুযুর্গের আমার লিখিত নিবন্ধ সবিস্তারে অধ্যয়ন করার সুযোগ হয়নি এবং যাদের কাছে আমার কথা অন্যদের বিকৃতির মাধ্যমে পৌঁছে গেছে, তারা এ ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে আছেন যে, "আমি মুসলমানদেরকে ঈমান ও ইয়াকীন থেকে শূন্য" ঘোষণা করছি এবং তাদেরকে দীনের পরিসর থেকে বাইরে ধাক্কা দিয়ে পুনরায় ভিতরে আসার আহবান জানাচ্ছি। এবং যে তোপের মুখ কুফরীর দিকে তাক করা ছিল, তা এখন আহলে ঈমানের দিকে তাক করতে যাচ্ছি। আল্লাহ সাক্ষী, আমি এসব কথা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।"

আজ থেকে দশ বছর আগে এসব ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছিল। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত বারবার এগুলোর পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে, কিন্তু ঐ সব লোকের সততা ও সাহসের প্রশংসা করুন যারা এসব সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত নিজেদের এই অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করেই চলছে যে, এই লোকটি মুসলমানদেরকে অমুসলমান প্রতিপন্ন করে থাকে এবং জামায়াতে ইসলামী নিজের পরিসর বহির্ভূত কোনো ব্যক্তির ইসলাম ও ঈমানকে স্বীকার করেনা। আমরা প্রতিটি মসজিদের প্রত্যেক ইমামের পিছনে সাধারণ মুসলমানের সাথে একত্র হয়ে যে নামায আদায় করি, তা কি তাদেরকে কাফির মনে করেই করে থাকি? একথাটা আল্লাহর বান্দারা একবারও চিন্তা করে দেখেনা?

২. আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবও নতুন করে না দিয়ে কয়েক বছর আগে একটি জবাবই উদ্ধৃত করছি। তরজমানুল কুরআনের নভেম্বর ও ডিসেম্বর,

১৯৪৫ সংখ্যায় একজনের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে আমি প্রথমে বলেছিলাম, কুফর দু'রকমের। একটি হলো তত্ত্বগত। এ ধরনের কুফরী করলে মানুষ আল্লাহর কাছে মু'মিন থাকেনা। দ্বিতীয় প্রকার হলো, বাহ্য দৃষ্টিতে এর ভিত্তিতে একজন মানুষকে জাতি বহির্ভূত গণ্য করে ইসলামী সমাজ থেকে বয়কোট করা জায়েয। তারপর প্রথম প্রকার সম্পর্কে আমি লিখেছিলামঃ

"নাফরমানী তথা আল্লাহর হুকুম অমান্য করা ঈমানের বিপরীত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু শুধুমাত্র নাফরমানী দ্বারা তা যতো বড়ই হোক না কেন ঈমান অস্বীকার করা যেতে পারেনা। কাফিরদের মতো মু'মিনরাও বড় বড় গুনাহ করতে পারে। তবে কাফির ও মু'মিনের ঈমান গুনাহে লিপ্ত হবার মুহূর্তে চলে যায়। কিন্তু সাময়িকভাবে আচ্ছাদিত অজ্ঞতার পর্দা ও প্রবৃত্তির দৌরাত্ম্য যখন তার থেকে দূরীভূত হয়ে যায়, তখন সে লজ্জিত হয়, আল্লাহর কাছে শরমিন্দা হয়, আখিরাতের শাস্তির ভয়ে ভীত হয় এবং ভবিষ্যতে এমন অবৈধ কাজে লিপ্ত না হওয়ার জন্য সচেষ্ট থাকে। এমন ধরনের পাপ যতো বড়ই হোক না কেন, তা মানুষকে কাফির বানায়না। শুধুমাত্র গুনাহগার বানায় এবং তওবা তাকে ঈমানের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। অপরদিকে, কাফিররা নিজেদের কুফরী তৎপরতা ও জীবন পদ্ধতিকে নিজেদের জন্য যথাযথ, মর্যাদার ও সঠিক মনে করে। আল্লাহ এ কাজকে হারাম ঘোষণা করেছেন, কিন্তু এরা তার কোনো পরওয়াই করেনা। দাম্ভিকতা সহকারে তারা এ কাজ বারবার করে থাকে। লজ্জা ও অনুশোচনার লেশমাত্র তাদের নেই। এই প্রকারের গুনাহ ঈমান হরণের অনিবার্য কারণ। এ কাজ স্বতই কবীরাহ গুনাহ যদিও সাধারণত এরূপ করাকে সগীরাহ মনে করা হয়। এই উভয় প্রকারের গুনাহকে একই পর্যায়ভুক্ত করা এবং তাতে সমভাবে কুফরীর ফতওয়া দেয়া সম্পূর্ণ ভুল। এ ধরনের প্রান্তিকতাও কবীরাহ গুনাহের শামিল। প্রথম শতাব্দী থেকে আজ পর্যন্ত খারেজী বা মুতাজিলা সম্প্রদায় ব্যতীত আর কেউ এই মত প্রতিষ্ঠা করেনি।"

তারপর দ্বিতীয় ধরনের কুফরী সম্পর্কে আমি লিখেছিলামঃ "এ সম্পর্কে জেনে রাখা উচিত যে, ইসলামী শরীয়ত এ ধরনের কুফরী ফতওয়া দেয়াকে কারো জন্যে খেলনায় পরিণত করেনি। যেমন কোনো ব্যক্তিকে ফাঁসি দেয়ার জন্যে শর্ত হলো– ইসলামী বিচার ব্যবস্থা উপস্থিত থাকতে হবে এবং বিচারক স্বাধীনভাবে সমস্ত সাক্ষ্য ও সামগ্রিক অবস্থার উপর উত্তম রূপে চিন্তা করে পূর্ণ অনুসন্ধানের পরই 'এই লোকটির জন্যে মৃত্যুদন্ড অপরিহার্য এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে। তারপরই তাকে হত্যা করা যাবে। এমনিভাবে একটি লোককে মনস্তাত্ত্বিক ফাঁসি অর্থাৎ ফাকির বলে ঘোষণা দেয়ার জন্যও শর্ত হলো, একজন শরয়ী বিচারক নিযুক্ত করতে হবে, আরোপিত কুফরী অভিযোগের ব্যাপারে পূর্ণ অনুসন্ধান চালাতে হবে, তার নিজের বর্ণনা গ্রহণ করতে হবে, তার কথা ও

কার্যাবলীকে যাচাই-বাছাই করে দেখতে হবে এবং সাক্ষ্যসমূহের উপর চিন্তা-ভাবনা করার পর এ ব্যক্তি মুসলিম সমাজ থেকে বিচ্যুত হয়ে দূরে নিক্ষিপ্ত হওয়ার উপযোগী কিনা সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।"

চিন্তা করুন! এ ধরনের সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন বর্ণনার পরও যারা আমাকে দোষারোপ করে আমি কবীরাহ্ গুনাহ্কারীদেরকে খারিজীদের মতো কাফির গণ্য করি, তারা কত বড় মিথ্যা কথা বলে বেড়ায় এবং একথা প্রচার করে কত বড় বিপদের মুখে নিজেদেরকে নিক্ষেপ করে। মজার ব্যাপার হলো, আজ আমার উপর যারা দোষারোপ করছেন, তাদের নিজেদের হাত পূর্বের এবং পরের অনেক মুসলমানের বিরুদ্ধে কুফরী ফতওয়াদানে কলুষিত। তাদের স্বহস্তে লেখা অনেক কুফরী ফতওয়া লিখিত আকারে বর্তমান আছে। তারা আমার এমন কোনো লেখা পেশ করতে পারবে কি যার মধ্যে আমি কাউকে কখনো কাফির বলেছি?[১]

৩. আপনার তৃতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে আমার জিজ্ঞাসা, এ প্রশ্ন কোত্থেকে সৃষ্টি হলো? পরলোকগত বুযুর্গদের সম্পর্কে আমার ধারণা জমহুর আহলে সুন্নাত থেকে ভিন্নতর এরূপ সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার মতো আমার কোনো লেখা বাস্তবিকই পেশ করা যাবে কি? এ অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য আমার কোনো কোনো লেখা পেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু সেগুলো পূর্বাপর থেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং সেগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বিকৃতি ঘটিয়ে আমার বক্তব্যের সম্পূর্ণ উলটো অর্থ করা হয়েছে। আসলে যখন আমি একদিকে এসব ইচ্ছাকৃত বিকৃতিগুলো দেখি, যা আমাকে জোরপূর্বক অপরাধী বানানোর জন্য করা হয়েছে এবং অপরদিকে ঐসব বিকৃতিকারীদের জুব্বা, পাগড়ী ও তাকওয়ার ডামাডোল দেখি, তখন তাদের সম্পর্কে পরিশেষে কি অভিমত পোষণ করবো তা আমি বুঝিনা। আফসোস, তাদের জন্যে যারা নিজেরাই নিজেদের ইজ্জত ধরেনা। এই উপমহাদেশের হাজার হাজার লোক আমার রচিত গ্রন্থরাজির নিয়মিত পাঠক। এসব পাঠক যখন এসব ফতোয়াবাজীতে আমার বিরুদ্ধে অমূলক অভিযোগ দেখবে, তখন তাদের দৃষ্টিতে ঐ মনোদয়দের মর্যাদা কতটুকু থাকবে এ কথাটুকুও তারা কিছুমাত্র চিন্তা করেনা। আমি শুধু আপনাকে নয় বরং যাদের কাছে এ অভিযোগ পৌঁছেছে, তাদের সকলকে এ পরামর্শ দিচ্ছি, কেবলমাত্র প্রতিপক্ষের পেশকৃত অংশ বিশেষের উপর নির্ভর করবেননা, বরং আমার যেসব বাক্যের উদ্ধৃতি দেয়া হয়, সেগুলো আমার আসল কিতাবের পূর্বাপরের সাথে মিলিয়ে দেখুন। তারপর আপনারা নিজেরাই জানতে পারবেন যে, এ সব অভিযোগের রহস্য কোথায়?

---

১. *নির্বাচিত রচনাবলী ২য় খণ্ডে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।*

৪. আপনার চতুর্থ প্রশ্নের জবাব এর আগে তরজমানুল কুরআনে একাধিকবার দেয়া হয়েছে। যদি সেসব জবাব আপনার দৃষ্টিতে পড়তো, তবে এ প্রশ্ন করার প্রয়োজন হতোনা। যাই হোক, আজ এ প্রশ্নের কোনো নতুন জবাব দেবার পরিবর্তে কয়েক বছর আগে যে সময় এ অভিযোগের সূচনা হয়, সে সময় যে জবাব দিয়েছিলাম তাই উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

১৯৪১ সালে সর্বপ্রথম মাওলানা মানাযির আহসান গিলানী সাহেব আমার ব্যাপারে ক্ষীণভাবে এ সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। 'সন্দেহ নিরসন' নামক নিবন্ধে আমি এ ব্যাপারে আরজ করেছিলাম।

"আমার সাহসিকতাসুলভ বাক্য দ্বারা সম্ভবত আপনার ধারণা হয়ে থাকবে যে, আমি নিজকে বিরাট কিছু মনে করি এবং বিরাট মর্যাদার আশা পোষণ করি। অথচ আমি যৎসামান্য যা কিছু করছি তা শুধুমাত্র নিজের গুনাহ মাফ পাবার জন্যই করছি। আমার মূল্য আমি ভালো করেই জানি। বিরাট মর্যাদা তো দূরের কথা, যদি কেবলমাত্র শাস্তি থেকে রেহাই পাই, তাহলে সেটাই হবে আমার আশাতীত পাওনা।" [তরজমানুল কুরআন, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর ১৯৪১ ইং]

তারপর সে সময়েই মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী সাহেব আমার কোনো একটি বাক্য থেকে এ অর্থ বের করেন যে, আমি মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবীদার। অথচ আমি সে বাক্যে আমার নগণ্য প্রচেষ্টাসমূহকে দীনের সংস্কার ও নবজাগরণের প্রচেষ্টা বলে অবহিত করেছিলাম। আমি তার এই নগ্ন অভিযোগের জবাবে আরজ করেছিলামঃ

"কোনো কাজকে জাগরণ ও সংস্কারমূলক কাজ বলা দ্বারা একথা অনিবার্য হয়না যে, যে ব্যক্তি ঐ সংস্কারমূলক কাজ করে তাকে মুজাদ্দিদ উপাধিতেও ভূষিত হতে হবে। শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হওয়া তো তার চেয়েও বড় কথা। ইট দিয়ে দেয়াল তৈরি করা অবশ্যই স্থাপত্য কর্ম। কিন্তু তাই বলে কি যে ব্যক্তি কতিপয় ইট জোগাড় করে দেবার কাজ করলো, তাকেও ইঞ্জিনিয়ার বলতে হবে? তারপর ইঞ্জিনিয়ারও সাধারণ নয় একেবারে নিজ শতাব্দীর ইঞ্জিনিয়ার? এমনিভাবে কেউ যখন নিজের কাজকে সংস্কারমূলক কাজ কিংবা সংস্কারমূলক প্রচেষ্টা বলে আর বাস্তবেও সেটি সত্য দীনের সংস্কারের উদ্দেশ্যেই করা হয়, তখন তা হয় একটি বাস্তব ঘটনার প্রকাশ মাত্র। তার অর্থ এই নয় যে, সে ব্যক্তি মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবী করছে এবং সে বর্তমান শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হতে চায়। অবশ্য সংকীর্ণমনা লোকেরা যৎসামান্য কাজ করেই উচ্চাসনের দাবী করে থাকে। বরং দাবীর আকারেই তারা কাজ করার সংকল্প করে। কিন্তু কাজ করার পরিবর্তে দাবী করবেন, কোনো বুদ্ধিমান জ্ঞানী লোক থেকে এমনটি আশা করা যায়না। ভারতবর্ষে এবং দুনিয়ার অন্যান্য জায়গায় অনেক লোক দীনের

সংস্কারমূলক কাজ করে যাচ্ছেন। স্বয়ং (অভিযোগকারী) মাওলানা সাহেবকেও আমরা তাঁদের মধ্যে গণ্য করে থাকি। আমি আমার সাধ্যানুযায়ী এ খেদমতে অংশগ্রহণের চেষ্টা করেছি এবং বর্তমানে কতিপয় দীনের সেবক সমন্বয়ে একটি দল গঠন করে এ জন্য প্রচেষ্টা চালাতে চাচ্ছি। আল্লাহ্ তাআলা যাঁর কাজে এমন বরকত দান করেন যে তাঁর মাধ্যমে সত্যিই দীনের সংস্কার হয়, তিনিই আসল মুজাদ্দিদ। মানুষের নিজের দাবী বা কাউকে মুজাদ্দিদ নামে স্মরণ করা আসল জিনিস নয়। বরং আসল জিনিস হলো মানুষের এমন কাজ করে আপন মালিক রাব্বুল আলামীনের কাছে পৌঁছে যাওয়া যাতে তাঁর কাছে মুজাদ্দিদ হওয়ার মর্যাদা লাভ করা যায়। আমি মাওলানা সাহেবের জন্য এ জিনিসটিরই দোয়া করি। ভালো হতো, তিনিও যদি অন্যদের দোয়া করতেন, আল্লাহ্ যেন তাদের দ্বারা দীনের এ ধরনের মহৎ খেদমত সম্পন্ন করান। আমি দেখে অবাক হই যে, কেউ কেউ ইসলমী শব্দাবলীকে অযথা ভীতিপ্রদ করে তুলেছে। বিশ্বে যখন কেউ রোমানদের শ্রেষ্ঠত্বের পুনরুজ্জীবনের দাবী নিয়ে এগিয়ে আসে, তখন রোমান জাতীয়তাবাদের পূজারীরা তাকে স্বাগত জানায়। কেউ বৈদিক সভ্যতার সংস্কারের সংকল্প নিয়ে অগ্রসর হয় আর হিন্দু জাতীয়তাবাদের পূজারীরা তাকে আন্তরিক সমর্থন জানায়। কোনো ব্যক্তি গ্রীক শিল্পকলার পুনরুজ্জীবনের প্রেরণা নিয়ে এগিয়ে আসে, শিল্পানুরাগীরা তাকে সাহস যোগায়। সংস্কারমূলক কাজের মধ্যে শুধু কি আল্লাহ্র দীনের সংস্কারটাই এমন একটি অপরাধমূলক কাজ, যার নাম করতেও মানুষ লজ্জাবোধ করে আর কেউ এ কাজের ধারণা প্রকাশ করতেই আল্লাহপূজারীরা তার বিরুদ্ধে লেগে যায়?" [তরজমানুল কুরআন, ডিসেম্বর ১৯৪১, জানুয়ারী- ফেব্রুয়ারী ১৯৪২]

এই সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দানের পরও আমাদের বুযুর্গানে দীন দীন তাদের প্রোপাগান্ডা থেকে বিরত হননি। কারণ আমার গায়ে কোনো দাবীর অভিযোগ সেঁটে দেয়াই হচ্ছে মুসলমানদেরকে আমার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার একটি অন্যতম অস্ত্র। কাজেই "এ লোকটি ইমাম মাহ্‌দী হওয়ার দাবীদার" এ সন্দেহ ১৯৪৫-৪৬ সালে অবিরত ধারায় দিকে দিকে ছড়ানো হয়। তরজমানুল কুরআনের জুন ১৯৪৬ সংখ্যায় এ প্রসংগে আমি লিখেছিলামঃ

"যে সব মহোদয় এ ধরনের সন্দেহ প্রকাশ করে আল্লাহ্র সরল-সহজ বান্দাদেরকে জামায়াতে ইসলামীর সঠিক দাওয়াত থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করছেন আমি তাদেরকে এমন এক বিপজ্জনক শাস্তি দেয়ার ফয়সালা করেছি যা থেকে তারা কিছুতেই রেহাই পাবেনা। আর সে শাস্তিটা হলো এই যে, ইনশাআল্লাহ্ আমি সব ধরনের দাবী থেকে নিজকে মুক্ত রেখে আমার প্রভুর সামনে হাযির হয়ে যাবো। তারপর দেখবো এই হযরতগণ আল্লাহ্র সমীপে

নিজেদের এসব অমূলক সন্দেহের এবং এগুলো প্রচার করে লোকদেরকে সত্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখার কি কৈফিয়ত পেশ করেন।"

যদি এসব লোকের অন্তরে আল্লাহ্‌ভীতি ও আখিরাতের বিশ্বাস থাকতো, তাহলে আমার এই জবাবের পর পুনরায় কখনো তাদের মুখে এ অভিযোগ আসা সম্ভব হতোনা। কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে, আজ কত নির্ভীকভাবে সেগুলো নতুন করে আবারো ছড়ানো হচ্ছে। তরজমানুল কুরআনের সাম্প্রতিক সংখ্যাগুলোতে এ সম্পর্কে যা কিছু লেখা হয়েছে তা দেখেও তাদের মুখে এসব অভিযোগ করতে সামান্য বাধেনি। আখিরাতের ফয়সালা তো আল্লাহ্‌র হাতে। কিন্তু আমাকে বলুন, এ ধরনের কর্মকান্ডে দুনিয়াতেই আলেমদের ইজ্জত প্রতিষ্ঠার আশা করা যায় কি?

মজার ব্যাপার হলো, আমার প্রণীত "ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন", গ্রন্থের কোনো কোনো বাক্যের উপর এ সন্দেহগুলোর ভিত রাখা হয়েছে এবং যার কোনো কোনে উদ্ধৃতি বিভিন্নভাবে রং চড়িয়ে লোকদের সামনে পেশ করে তাদেরকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। অথচ তার মধ্যেই আমার এ কথাগুলো রয়েছেঃ

"নবী ছাড়া দাবী করে নিজ কাজের সূচনা করার মর্যাদা আর কারো নেই। তাছাড়া তিনি কি কাজের জন্য আদিষ্ট হয়েছেন, তাও নবী ছাড়া আর কারো নিশ্চিতভাবে জানা থাকেনা। মাহ্‌দী হওয়া দাবীর ব্যাপার নয়। বরং কাজ করে দেখাবার ব্যাপার। যারা এ ধরনের দাবী করেন এবং এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন আমার মতে তারা উভয়ই নিজেদের জ্ঞানের স্বল্পতা ও মানসিক নিম্নমানের প্রমাণ দেন।"

আজ যারা আমার সেই বইয়ের উদ্ধৃতি পেশ করেন, তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, আমার কিতাবের ঐ বাক্যগুলো কি তাদের নজরে পড়েনি? নাকি জ্ঞাতসারেই তারা সেগুলো গোপন রাখছেন?

৫. আপনার শেষ প্রশ্নটিও নতুন নয়। এর আগেও আমি কয়েকবার এসব প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি এবং জবাবও দিয়েছি। কাজেই এ প্রশ্নটিরও কোনো নতুন জবাব দেয়ার পরিবর্তে আগেকার একটি জবাবই তুলে দিচ্ছিঃ

আমি সমস্ত বুযুর্গানে দীনকে সম্মান করি, কিন্তু তাঁদের মধ্যে কাউকে পূজা করিনা এবং নবী ছাড়া কাউকে মাসুমও (বেগুনাহ্) মনে করিনা। আমার নীতি হলো আমি অতীত বুযুর্গদের দৃষ্টিভংগি ও কার্যাবলীর উপর মুক্তভাবে গবেষণা ও পর্যালোচনার দৃষ্টি দিই। তাতে যা কিছু সত্য ও চিরন্তন দেখতে পাই তা অকপটে সত্য বলি আর যেগুলো কুরআন–হাদীস অথবা কর্মপন্থাগত দিক থেকে ঠিক মনে করিনা সেগুলোকে নির্দ্বিধায় বেঠিক বলে দিই। আমার মতে, নবী ছাড়া অন্য কারো মত বা কৌশলের মধ্যে ভুল পাওয়া গেলে তাতে তাঁর মর্যাদা ও বুযুর্গী কমে যাওয়াটা অনিবার্য নয়। এ কারণে আগেকার বুযুর্গদের কোনো কোনো

মতের সাথে আমার মতভেদ থাকা সত্ত্বেও আমি তাঁদের বুযুর্গী ও মর্যাদা স্বীকার করি এবং তাদের সম্মান আমার অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি বুযুর্গী ও নিস্পাপ হওয়াকে সমার্থক মনে করে এবং 'যিনি বুযুর্গ তিনি ভুল করেননা' আর 'যিনি ভুল করেন তিনি বুযুর্গ হতে পারেননা' এমনটি মনে করে, সে আসলে কোনো বুযুর্গের কর্ম পন্থা ও মতকে বেঠিক বলার অর্থ মনে করে ঐ বুযুর্গদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন এবং তার কাজের স্বীকৃতি না দেয়। তারপর তারা এখানেই ক্ষ্যান্ত হয়না বরং আরো সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, সে নিজেকে তাদের চেয়ে বড় মনে করে। অথচ তাত্ত্বিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে একে অপরের সাথে মতবিরোধ করার ফলে এটা অনিবার্য হয়ে পড়েনা যে, যার সাথে মতপার্থক্য করা হয়, তাঁর তুলনায় নিজকে বড় ও উত্তম মনে করা হচ্ছে। ইমাম মুহাম্মদ (র) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র) অনেক ব্যাপারে স্বীয় উস্তাদ ইমাম আবু হানীফার সাথে (র) মতবিরোধ করেছেন। আর দৃশ্যত এ মতপার্থক্যের অর্থ হলো, বিরোধপূর্ণ ব্যাপারে তাঁরা নিজেদের রায়কে সঠিক এবং ইমাম আবু হানীফার (র) রায়কে ভুল মনে করেছেন। কিন্তু তাতে কি এ কথাও অনিবার্য হয়ে পড়ে যে, এই উভয় বুযুর্গ ইমাম আবু হানীফার (র) তুলনায় নিজেদেরকে উত্তম মনে করতেন?" [তরজমনুল কুরআন, জুন ১৯৪৬]

আশা করি আমার এসব বক্তব্য থেকে আপনি আমার নীতি সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত হয়েছেন। আপনি এ নীতির সাথে একমত হবেন অথবা নিজেও এ মত গ্রহণ করবেন, এটা জরুরী নয়। কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য, এখানে গোমরাহীর কি বিষয়টা আছে? পূর্ববর্তী বুযুর্গদের মধ্যে কারো সাথে মতপার্থক্য করে পেশকৃত আমার কোনো রায়কে আপনি রদ করে দিতে পারেন এবং যার সাথে আমার মতবিরোধ হয়েছে তার রায়কে প্রাধান্য দিতে পারেন। বরং দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে যদি আমার মত গুরুত্বহীন এবং তাঁর মতের প্রাধান্য প্রমাণিত হয়, তাহলে আমি নিজেই আমার মত প্রত্যাখ্যান করবো। কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য, যখন আমি কুরআন ও হাদীসের দলিলের ভিত্তিতে একটি মত পেশ করি এবং কুরআন-হাদীসের দলিলের ভিত্তিতেই অন্য একটি রায় গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হই, তখন শুধু নিজের মত পেশ করার কারণে আমি কোন্ দোষে অভিযুক্ত হই? আমি পরবর্তী যুগের লোক নিছক এ কারণেই আমার রায় কেন অনিবার্যভাবে গুরুত্বহীন হবে আর আগের প্রত্যেক বুযুর্গদের রায় শুধুমাত্র পূর্ববর্তী হওয়ার কারণে কেন গুরুত্বপূর্ণ হবে? দু'চার শতাব্দী পরে জন্মলাভ করা এমন কোনো অন্যায় নয়, যে কারণে এ যামানার লোকদের রায় অবশ্যই কম ওজনের এবং অধিকতর কম মর্যাদার হবে। আবার ২/৪ শতাব্দী আগে জন্মলাভ করা এমন কোনো পূর্ণতার গুণসমন্বিত নয়, যে কারণে সে যুগের লোকেরা

পাক–পবিত্র ও ক্রটিমুক্ত গণ্য হবে এবং তাদের প্রতিটি মত প্রাধান্য পাওয়ার মৌলিক অধিকার লাভ করবে।

কোনো কোনো অজ্ঞ লোক পূর্ববর্তী বুযুর্গদের কারো মত ও পথের সাথে প্রত্যেকটি দ্বিমত প্রকাশকে "উম্মতের প্রথম লোকদেরকে পরবর্তী লোকেরা অভিশাপ দেবে" হাদীসের সাথে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করে। যতোই শিষ্টাচার ও ভদ্রতা সহকারে এ মতবিরোধ প্রকাশ করা হোক এবং যতোই গুরুত্বসহকারে বুযুর্গগণের খেদমত ও মর্যাদার স্বীকৃতি দেয়া হোক না কেন তার কোনো পরোয়াই তারা করেনা। জানিনা, এরা হাদীসটির অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞ কিনা আর নাকি লা'নত শব্দটির তাৎপর্যই তারা বুঝেনা? অথবা কি জেনেশুনেই শুধুমাত্র অন্যদেরকে অভিশপ্ত এবং জনগণকে উত্তেজিত করার অভিপ্রায়ে রসূলের বাণীকে ভুল অর্থে প্রয়োগ করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে? তবে কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি কখনো এ ভুল করতে পারেননা। জ্ঞানগর্ভ গবেষণায় এক ব্যক্তির যুক্তিভিত্তিক মতপার্থক্যকে তিনি 'লা'নত' শব্দের সমার্থক মনে করতে পারেননা। যদি একাজ লা'নত হয়, তাহলে আজকে আমাদের মাঝে বিরাজিত মত ও গবেষণার ক্ষেত্রে যতো মতবিরোধিতা আছে, তার সবগুলোর অবসান হওয়া উচিত। এগুলোর প্রকাশ হারাম হওয়া প্রয়োজন। কারণ সমকালীনদের ব্যাপারেও 'লা'নত' করা জায়েয নয়।

এ ব্যাপারে আরো দু'টি কথার ব্যাখ্যা করা যথার্থ মনে করি যদিও আপনি এ প্রসংগে প্রশ্ন করেননি। অবশ্য সেগুলো একদিক থেকে আপনার প্রশ্নের সাথে সম্পর্কিতও বটে।

প্রথমত, ফিকহী মাসায়েলে যখন আমি হানাফী মাযহাবের গৃহীত কথার বিপক্ষে কখনো কোনো মত প্রকাশ করি, তখন সে মতটিকে নিজের ফতওয়ার মর্যাদা দিয়ে প্রকাশ করিনা, বরং একটি প্রস্তাব হিসেবেই উপস্থাপন করি। উদ্দেশ্য হলো, সমকালীন আলেমগণ এ প্রস্তাবটির ব্যাপারে চিন্তা–ভাবনা করবেন। যদি আমার মত যুক্তি–প্রমাণসহ নির্ভরযোগ্য হয়, তাহলে আমার প্রস্তাব অনুযায়ী ফতওয়ায় পরিবর্তন আসবে। আমার মতে এরূপ যুক্তিভিত্তিক পরিবর্তন–পরিবর্ধন হানাফী মাযহাবের নীতির খেলাফ নয়। হানাফী মাযহাবে এরূপ করার অবকাশ আছে। এ সম্পর্কিত দলিলসমূহ আমি "স্বামী–স্ত্রীর অধিকার" বইতে বর্ণনা করেছি। নীতিগতভাবে আমি একথাও স্বীকার করি যে, যে কোনো আলেম বা তত্ত্বজ্ঞানী লোকের প্রস্তাবের ভিত্তিতে ফতওয়া হতে পারেনা। ফতওয়া একটি আইনানুগ বিবরণ। আর শরীয়তের ব্যবস্থাপনায় আইনের মর্যাদা শুধু সে নীতিই পেতে পারে যার উপর ইজমা হয়ে গেছে অথবা যা অধিকাংশ আলেম স্বীকার করে নিয়েছেন। সুতরাং একটি প্রস্তাব যতক্ষণ পর্যন্ত শরীয়া বিশেষজ্ঞগণ ঐক্যবদ্ধভাবে অথবা তাঁদের অধিকাংশ গ্রহণ না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত সেটা

আইনের মর্যাদা পাবেনা এবং তার উপর ফতওয়াও দেয়া যাবেনা। এ কথাও আমার ইসলামী আইন পুস্তিকায় বর্ণনা করেছি। আমার এ নীতিগত পন্থা বুঝার পর এখন আমাকে বলুন, যদি কোনো ব্যক্তি দীনী কল্যাণার্থ কোনো ফিকহী বিষয়ে ফতওয়ার পরিবর্তন প্রয়োজন মনে করে এবং একজন লোক প্রস্তাব হিসেবে পন্ডিত ব্যক্তিবর্গের চিন্তার জন্য তা দলিলসহকারে পেশ করে, তাহলে সেটা কি বাস্তবিকই কোনো অন্যায়? তাতে কি সত্যিই দীনের মধ্যে কোনো ফিতনার সৃষ্টি হয়ে যায়?

দ্বিতীয়ত, ফিকহী বিষয়ে আমি এক দেশদর্শী কথাকে পছন্দ করিনা। তবে যদি কোনো বিষয়ে হানাফী মাযহাবের ফায়সালার উপর আমার সন্তুষ্টি না আসে, তাহলে চার মাযহাবের দলিলসমূহের প্রতি দৃষ্টি দিই। আমার সামর্থ অনুযায়ী সেগুলো যাচাই-বাছাই করার পর সেগুলোর মধ্য থেকে কোনো একটিকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি। কখনো এ পদ্ধতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চার মাযহাব বহির্ভুত কোনো ফতওয়াকে প্রাধান্য দেয়া কদাচিত হয়ে থাকতে পারে। যদি এরূপ কখনো হয়েই থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রেও উম্মতে মুহাম্মদীর কোনো না কোনো মুজতাহিদের রায়কেই গ্রহণ করা হয়েছে। নিজস্ব একক রায় খুব কমই পেশ করা হয়েছে, যদিও একক রায় আমার মতে হারাম নয়। কিন্তু আমি মনে করি, এ ধরনের মতামতের জন্য খুব জোরালো দলিলের প্রয়োজন। পূর্ববর্তী কোনো ইমাম বা মুজতাহিদ সাথে দ্বিমত করে কোনো ফিকহী মাসয়ালা বা রায় প্রকাশ করার সুযোগ আমার খুব কমই হয়েছে। কেনো নির্দিষ্ট মাযহাবের অন্ধ অনুসরণ না করার নীতিটি আমার নিজস্ব বিষয়। গালি-গালাজের পরিবর্তে কুরআন-হাদীসের আলোকে একে গুনাহ প্রমাণ না করা পর্যন্ত আমি এ নীতি পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত নই। [তরজমানুল কুরআন, যিলকদ-যিলহজ্জ ১৩৭০, সেপ্টেম্বর ১৯৫১]

উলামায়ে কিরামের খেদমতে

পাকিস্তানে প্রচারের জন্য ভারত থেকে আনা একটি প্রচারপত্র আমাদের হস্তগত হয়। প্রচারপত্রটির ভাষা এরূপঃ

হযরত মাওলানা মাদানীর সতর্কবাণী

এটা সাহারানপুর জেলার গাংগুহী আশরাফুল উলূম মাদ্রাসার মুদাররিস মাওলানা মৌলভী আবদুল হামীদ বুলন্দ শহরী কর্তৃক হযরত মাওলানা সাইয়েদ হোসাইন আহমদ মাদানী (র) সাহেবকে লিখিত চিঠির উদ্ধৃতি। নিম্নে শুধু ঐ অংশটুকুর উল্লেখ করা হলো, যা জামায়াতে ইসলামী নামক দলের সাথে সম্পর্কীত।

"মওদূদীবাদ যখন থেকে গাংগুহীতে ফিতনার আকার ধারণ করেছে, তখন থেকে তাদের সম্পর্কে এ ধারণা সৃষ্টি হয়। মত বিনিময় এবং তাদের প্রকাশিত পত্র পত্রিকার মাধ্যমে কিছু কিছু খন্ডন দেয়া হয়েছে। এরা সাহাবাদেরকে পর্যন্ত সীমালংঘনকারী বলে থাকে হযরত আলী (রা), ইবনে উমর (রা) এবং হযরত আয়েশাকে (রা) "এহইয়ায়ে তাবলীগে দীন" বইতে সীমালংঘণকারী বলে আখ্যায়িত করেছে। সঠিক পন্থা প্রবন্ধে মওদূদী সাব নিজে বলেনঃ আমি অতীত ও বর্তমান সময়ের ব্যক্তিত্বের মধ্যস্থতায় নয় সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ্ থেকে দীন বুঝতে চেষ্টা করেছি। অধিকন্তু তিনি হযরত হাজী (রা) ও হযরত মুজাদ্দিদে আরফে ছানী (র) সম্পর্কে লিখেছেন, এ সমস্ত বুযুর্গ প্রাথমিক জীবনে তো ভালো কাজ করে গেছেন। কিন্তু জীবনের শেষ ভাগে মুসলমানদেরকে তারা এমনি বিষাক্ত খাদ্য ভক্ষণ করান যারা বিষক্রিয়া থেকে আজ পর্যন্ত মুসলমানগণ নিরাপদ হতে পারেনি। তাসাওউফের উপরও এমন ধরনেরই সমালোচনা করেছেন। জনৈক গাংগুহীবাসী এখানকার অন্যদেরকে আবু সাইদের (র) মাযারে যেতে বাধা দিয়ে বলে, এটাতো পাথরে ঘেরা একজন সন্ন্যাসীর সমাধি মাত্র। মওদূদীবাদের একটা পরিচিত বাকধারা। দেওবন্দ ও মাযাহিরুল উলূমে তো কুরবানীর মেষ তৈরি হচ্ছে, এসব কথা আলেমদের বিশেষত অতীত ও বর্তমান সময়ের বুযুর্গদের উপর বিরাট কটাক্ষ। মোট কথা, বিস্তারিতভাবে পরে আপনাকে অভিহিত করবো। বর্তমানে এসব কথা তুলে ধরার উদ্দেশ্য হলো আমরা কি প্রকাশ্যে তাদের জবাব দেব? বিশেষত গাংগুহীর সাথে আমার একটি সম্পর্ক রয়েছে। অধিকন্তু সেখানকার আশরাফুল উলূম মাদ্রাসার আমি খেদমতে নিয়োজিত আছি। রাত-দিন অহরহ এসব অসহনীয় কথার মুখোমুখি হতে হয় যার জবাব দিতে বাধ্য হই। বিস্তারিত জবাব দানে সুখী করবেন।" ১

ইতি-আবদুল হামীদ বুলন্দশহরী

জবাবঃ নবী-রসূলগণ ছাড়া সাহাবায়ে কিরাম, ওলীয়ে কামিল কিংবা হাদীস, ফিকাহ্ ও কালাম শাস্ত্রের ইমামগনের কেউ (মা'সুম) নিষ্পাপ নয়। সকলেই ভুল করতে পারেন। তবে তাঁদের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে কুরআন-হাদীসে অনেক সাক্ষ্য রয়েছে। তাঁদের কার্যাবলী ও তাকওয়া ও জ্ঞানবত্তার নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বিবরণ জাতির কাছে এত বেশী আছে যে, বর্তমান যুগের অংশ তার তুলনায় এক দশমাংশও হবেনা। তাঁদের সমালোচনা কেবল ইলম ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের সমপর্যায়ের লোকেরাই করতে পারে। আমাদের যুগের দেউলিয়ারা, যাদের কাছে না ইলম আছে, না তাকওয়া আছে,

---

১ ইবারতের যাবতীয় ভুল-ভ্রান্তি ও অসংলগ্নতাসহ হুবহু প্রচারপত্রটি থেকে এখানে পত্রস্থ করলাম এতে আমাদের কোনো দোষ নেই।

তাদের এ সম্পর্কে কথা বলার কি অধিকার আছে? নিজেদের দুর্ভাগ্যের প্রকাশ ছাড়া তাদের মুখ খোলার আর কোনো সার্থকতা নেই। আল্লাহ্ তাআলা তাদের প্রশংসায় বলেনঃ

١. مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ

অন্যত্র আছেঃ

٢. وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِيْ قُلُوْبِكُمْ ......(الحجرات : ٨)

আরো আছেঃ

٣. كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ..........

আরো আছেঃ

٤. وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا........

আর এই কমবখ্ত তাদের শানে প্রলাপ বকছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

اتقوا الله فى اصحابى لا تتخذوهم من بعدى غرض -

"আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর, আমার পর আমার সাহাবীদেরকে অভিশাপের লক্ষ্যস্থল করোনা।"

তিনি আরো বলেছেনঃ

خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم -

আর এই বদবখ্ত তাদের শানে খারাপ কথা বলছে। এটা তার দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি হতে পারে? এসব খবীসদের সাথে কথাবার্তা ও তর্ক বহছ করা নিজেদের সময়ের অপচয় করারই নামান্তর। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে ও তাদেরকে হেদায়াত করুন। আমীন!

দারুল উলূম ও মাযাহিরুল উলূম অথবা এগুলোর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকারীদের কিংবা ছাত্র ও শিক্ষকমন্ডলীর বিরুদ্ধে কেবল গোমরাহ এবং আহলে ইসলাম ও আহলে সুন্নাতের বিরোধীরাই এ ধরনের কথাই বলে থাকে। [১]

নঙ্গে আসলাফ হোসাইন আহমদ
দারুল উলূম, দেওবন্দ
১৩ যিলহজ্জ, ১৩৬৯ হিঃ
প্রচারকঃ
মৌলভী সাইয়েদ শফিকুর রহমান
আলী-কেল্লাহ্ এরিয়া, সাহারানপুর,
জিদ্দত বারকী প্রেস, মুরাদাবাদ থেকে মুদ্রিত

১. বিজ্ঞাপনের বাক্যগুলো হুবহু ছাপানো হলো।

আমাদের আরয

এসব প্রচারণা এমন ধরনের যে, এগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিলে মনে বড় ব্যথা লাগে। তরজমানুল কুরআনের পাঠকবর্গ সাক্ষী যে, এ ধরনের প্রচারপত্র, খবর ও প্রবন্ধ কখনো তরজমানের পাতায় স্থান পায়নি। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, কিছু সংখ্যক অজ্ঞ মুরীদ ও অন্ধ শাগরিদ বর্তমানে এমন বুযুর্গদেরকে এ কদর্য মাঠে নামিয়েছে যারা নিজেদের জ্ঞান-গবেষণা তাক্ওয়া ও রূহানী নেতৃত্বের দিক থেকে পাক-ভারতের ধর্মীয় জগতে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত। এ কারণে গত সংখ্যায়ও এদিকে মনোযোগ দিতে বাধ্য হয়েছি। এবং এ সংখ্যায়ও দ্বিতীয় বার অভিমত ব্যক্ত করছি। এ ব্যাপারে আমাদের পক্ষ থেকে এটাই শেষ নিবেদন। আল্লাহ্ যেন এরপর তরজমানের পাতাকে পুনরায় এ ধরনের কদর্য প্রোপাগান্ডার জবাবদিহি করতে বাধ্য না করেন।

[এক]

মওলানা হোসাইন আহমদ সাহেবের বক্তব্যে সর্বাধিক দৃষ্টি কটু হলো তার ভাষা। সম্ভবত মওলানা নিজের জন্যেও এ ধরনের ভাষাই যোগ্য মনে করেন। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে আমরা এতোটা ভালো ধারণা পোষণ করি যে, এমন ধরনের ভাষা প্রযোগ করা আমরা তাঁর মর্যদার অবমাননাকর মনে করি। কোনো ব্যক্তি বা দলের সাথে মতবিরোধ হওয়া খারাপ কিছু নয়। মতবিরোধ সাংঘাতিক ধরনেরও হতে পারে। মতবিরোধ যতো বড়ই হোক তার সমালোচনা ভদ্রজনোচিত ভাষায়ও করা যায়। কিন্তু যার সাথে বিরোধ তার বিরুদ্ধে খবীস, দুশ্চরিত্র, অপাংক্তেয়, দেউলিয়া ইত্যাকার কটু ও অশালীন শব্দাবলী একজন বুযুর্গ হয়ে প্রয়োগ করা তো দূরের কথা একজন সভ্য লোকের পক্ষে এরূপ ভাষা ব্যবহার করা নিজের মর্যাদারও খেলাফ। বুযুর্গ লোকটি আবার এমন অসাধারণ যে, তিনি এই উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মর্যাদার আসনে সমাসীন আছেন। যার কাছে শত সহস্র লোক শুধুমাত্র দীনের তালীমের জন্যই ভিড় জমায় না, আত্মশুদ্ধির জন্যেও গিয়ে থাকেন। জাতির অভিভাবক, শিক্ষক ও নেতা যখন এ ধরনের কথা বলতে অভ্যস্ত হয়ে যান, তখন তাঁর কাছে নৈতিক ও সাংস্কৃতিক শিক্ষা গ্রহণকারী শিষ্যগণের সম্পূর্ণরূপে মানবতা বিবেচিত হওয়াটা কিছুমাত্র বিচিত্র নয় এবং জাতির মধ্যে পরস্পরের প্রতি মর্যাদাবোধ বিন্দুমাত্র বাকী না থাকাটাও অস্বাভাবিক নয়।

اذا كان رب البيت بالطبل ضاربًا
فلا تلم الاولاد فيه على الرقص

"যখন গৃহকর্তা তবলা বাজায়, তখন গৃহের ছেলেরা নাচলে তিরস্কার করোনা।"

জাতীয়তাবাদ ও কংগ্রেসের প্রতি তাঁর সমর্থনের উপর আমরাও কোনো এক

সময় তাঁর সমালোচনা করেছিলাম একথা যদি মাওলানার স্মরণ না থাকে, তাহলে আমরা তাঁকে মনে করিয়ে দিচ্ছি। সে সমালোচনা আমাদের গ্রন্থসমূহে (ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ এবং মুসলমান ও বর্তমান রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, ২য় খন্ড) এখনও বর্তমান আছে। আমাদের এসব সমালোচনামূলক বাক্যগুলো দেখে তাঁর মুরীদ ও শিষ্যগণ নিজেরাই মন্তব্য করুন যে, উভয় ভাষার মধ্যে পার্থক্য কতটুকু! যদি ধরে নিই ১০/১২ বৎসর পর এর বদলা নেয়া জরুরী ছিল, তাহলে

جزاء سيئة سيئة مثلها

"খারাপের বিনিময় খারাপের অনুরূপই হয়ে থাকে" এ নীতির ভিত্তিতে প্রতিশোধ নেয়া যেতো। কিন্তু এই সীমা লংঘন করা হযরতের জন্য কোন্ আইনে সিদ্ধ হলো?

[দুই]

দ্বিতীয় কথাটি যা প্রথম কথাটির চাইতেও দুঃখজনক, তা হলো তিনি অপরের দীন ও আকীদা সম্পর্কে মত প্রকাশ করতে গিয়ে চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন। একটি কাল্পনিক প্রশ্ন তার সামনে তুলে ধরা হয়নি বরং একটি জামায়াতের নাম উল্লেখ করে সে জামায়াতের বিরুদ্ধে কতিপয় অপবাদ দেয়া হয়। কুরআনের تَنَابَزُوْا بِالْأَلْقَابِ আয়াতের দিকে নযর না দিয়ে 'মওদূদীরা' এবং 'মওদূদীবাদ' শব্দ প্রয়োগ করে যে দলের উল্লেখ করা হয়েছে তিনি সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেননা। তিনি খুব ভালো করেই জানেন যে, উপমহাদেশের হাজার হাজার মুসলমান জামায়াতে ইসলামীর সাথে জড়িত এবং লাখো লাখো লোক জামায়াত দ্বারা প্রভাবিত। তিনি এটাও খুব ভালো করে জানেন যে, এই দলের দৃষ্টিভংগি কোথাও চুপিসারে লুকিয়ে নেই, বরং ছাপা হয়ে লিখিতভাবে মওজুদ আছে। এতদসত্ত্বেও মাওলানা সাহেব একজন প্রশ্নকর্তার আরোপিত সূত্রে উল্লেখ বিহীন অমূলক অপবাদ কোনো প্রকার প্রমাণ ব্যতিরেকেই হুবহু গ্রহণ করেন। এগুলোর একটি অশোভন জবাব সম্ভবত এটা জেনেই তিনি প্রশ্নকর্তার কাছে অর্পণ করেন যে, তাঁর অনুসারীগণ এই প্রশ্নোত্তরগুলো প্রচারপত্র আকারে বিলি করবে। যে দল সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে তারা সাহাবায়ে কিরাম (রা) এবং অন্যান্য বুযুর্গ সম্পর্কে বাস্তবিকই কি লিখেছে, কোন্ প্রেক্ষাপটে লেখা হয়েছে, তাদের অন্যান্য লেখাসমূহ কি সাক্ষ্য দেয়, তারা ঐসব বুযুর্গ সম্পর্কে কি ধারণা রাখে, এ সব ব্যাপারে অনুসন্ধান করে দেখার তিনি প্রয়োজনও বোধ করেননি। তিনি একথাও জানা দরকার মনে করেননি যে, এ দলের কোনো কোনো ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত করে যে সব কথা প্রশ্ন আকারে লেখা হযেছে সেসব কথা আসলেই কে বলেছে? সে দলের মধ্যে তার অবস্থান কোথায়? তার কোনো কথা গোটা দলের চিন্তা-ভাবনার প্রতিনিধিত্ব করে কি না? ধরে নিলাম, এ দলের পুস্তক পুস্তিকাসমূহ অনুসন্ধান করার সময় সুযোগ

তাঁর ছিলনা, তবুও এ প্রসংগে মতামত অবশ্যই ব্যক্ত করতে হবে, এমন পরামর্শ তাঁকে কোন্ ডাক্তার দিলেন? আমার জিজ্ঞাস্য,ধর্মীয় নেতৃত্বের এমন দায়িত্বপূর্ণ মসনদে বসে একজন মুত্তাকী আলেমের এ রূপ নীতি গ্রহণ করা কি বাঞ্ছিত? তাকওয়া ও সততা কি এ জিনিসেরই নাম? এ আচরণই কি সেই আত্মশুদ্ধি যা দ্বারা হযরত নিজেই সৌভাগ্যবান এবং অন্যদেরকেও ভাগ্যবান বানিয়ে যাচ্ছেন? এ জবাবটি লেখার সময় মাওলানা সাহেবের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লামের এ বাণীটি স্মরণে ছিল কি?

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فِسْقٌ

"মুসলমানদেরকে গালি দেয়া পাপ" এবং

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ ؟

"প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের জানমাল ও মান-ইজ্জত সমানই।" জবাব লেখার সময় মুহূর্তের জন্যেও কি হযরত চিন্তা করেছেন যে, আপনাদের এবং আমাদের সকলকেই একবার মরতে হবে এবং আপন প্রতিপালকের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে? সে কাঠগড়ায় যদি প্রশ্নকর্তার অপবাদগুলো নিছক মিথ্যা ও অমূলক প্রমাণিত হয়ে যায়, তাহলে তিনি এর পরিণতি থেকে কি দিয়ে নিষ্কৃতি পাবেন?

[তিন]

মাওলানা এবং তাঁর সমগোষ্ঠীর অন্যান্য মহোদয়গণ ইদানিং জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে যাদের লেখা প্রকাশিত হয়েছে, একথাটা একেবারেই ভুলে গেছেন যে, কোনো ব্যক্তি বা দলের আকীদা ও মতামত সম্পর্কে কোনো রায় প্রকাশ কিংবা প্রতিষ্ঠা করা সত্যিকারভাবে ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিক নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তার বা তাদের সমস্ত কিংবা অধিকাংশ লেখাসমূহ স্বয়ং পাঠ করে নেবেন। শুধুমাত্র শোনা কথার উপর ভিত্তি করে অপরকে গোমরাহ এবং গোমরাহকারী ঘোষণা করে দেয়া অথবা কতিপয় গুণগ্রাহীর পেশকৃত উদ্ধৃত বক্তব্যের ভিত্তিতে মত প্রতিষ্ঠা করা এবং সে মত ছাপিয়ে দেয়া অথবা কাউকেও নাযেহাল করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে তার কিতাবগুলোর ছিদ্রান্বেষণে মত্ত হয়ে যাওয়া যাতে তাকে কোথাও অভিশপ্ত করার এবং তার উপর অপবাদ আরোপ করার অবকাশ মিলে যায়, অথবা কোনো ব্যক্তির কতিপয় বাক্যের এমন অর্থ ও নির্যাস বের করা, যা স্বয়ং সেই ব্যক্তির অন্যান্য অনেক বাক্যই খন্ডন করে দেয়, কোনো আল্লাহভীরু লোকের কাজ হতে পারেনা। যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শুধুমাত্র দুনিয়া ও দুনিয়ার জীবন, তার জন্যে এ ধরনের ভূমিকা পালন করা সম্ভব। কিন্তু যাদের আল্লাহ্ ও পরকালের কিছুমাত্র চিন্তা আছে, তাদের এ ধরনের তৎপরতায় লিপ্ত হওয়া সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

আমাদের বিরুদ্ধে এই মহোদয়গণের সমস্ত লেখা আমি অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে পড়েছি। এগুলোর পূর্ণ পর্যালোচনা করার পর আমি এর মধ্যে যা কিছু পেয়েছি তা হলোঃ

১. কোনো কোনো জায়গায় আমাদের আসল বাক্য উল্লেখ করার পরিবর্তে নিজেদের বানানো মনগড়া ভাবার্থ নিজ ভাষায় উল্লেখ করে সেগুলো আমাদের ঘাড়ে চাপানো হয়েছে। যে সব স্থানে আমাদের বাক্য আমাদের ভাষায় উল্লেখ করলে অপবাদকারী নিজের অপবাদ প্রমাণ করতে পারবে না, এমনসব জায়গায় এ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে।

২. কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের কতিপয় বাক্যকে একটি ধারাবাহিক বর্ণনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে তা থেকে নিজের মন মতো তাৎপর্য বের করা হয়েছে। অথচ যে কিতাবের কতিপয় বাক্যের উপর ঐসব তাৎপর্যের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে যদি সে কিতাবটি বা সংশ্লিষ্ট নিবন্ধটি সম্পূর্ণ পড়া হতো, তাহলে ফল এর সম্পূর্ণ বিপরীত হতো। এতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মুফতী সাহেব শুধুমাত্র কারো দেখানো কতিপয় চিহ্নিত বাক্য দেখেই ফত্ওয়া দিয়েছেন নয়তো সম্পূর্ণ নিবন্ধ পাঠ করে জ্ঞাতসারেই অপবাদ দিয়েছেন।

৩. কোনো কোনো স্থানে আমাদের বাক্যের মধ্যে খোলাখুলিভাবেই বিকৃতি ঘটানো হয়েছে কোথাও অগ্র–পশ্চাতে নিজেদের শব্দাবলী সংযোজন করা হয়েছে। আবার কোথাও একটি বাক্যকে ঐসব বাক্য থেকে আলাদা করা হয়েছে যা প্রকৃত বক্তব্য প্রকাশ করে থাকে। এ ধরনের বিকৃতি সম্ভবত এটা মনে করেই করা হয়েছে যে আমাদের আসল প্রকাশনাসমূহ যারা পড়েছে তাদের কাছে বিবৃতিকারীর সামন্য পরিমাণ মর্যাদা না থাকলেও অন্তত যারা এ ব্যাপারে একেবারে কিছুই জানে না, তারা ধোকায় পড়ে যাবে।

৪. কোনো কোনো স্থানে আমাদের বাক্য ঠিকভাবেই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য বুঝার আদৌ চেষ্টা করা হয়নি এবং সম্পূর্ণ কুধারণার বশবর্তী হয়ে আমাদের বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত বিকৃত অর্থ করা হয়েছে। অথচ আমাদের কাছে জিজ্ঞেস করলে আমরা নিজেদের বক্তব্যের সঠিক তাৎপর্য বলে দিতে পারতাম এবং আমাদের বক্তব্যের উদ্দেশ্য কি ছিল তা আমাদের অন্যান্য লেখাসমূহ দ্বারা প্রমাণ করে দিতে পারতাম। বলা বাহুল্য, একটি বাক্য যদি দুই বা ততোধিক অর্থবহ হয়, তাহলে স্বয়ং লেখক যে অর্থ বর্ণনা করবে এবং তার অন্যান্য বাক্যাবলী যার সাক্ষ্য দিবে শুধুমাত্র সে অর্থই নির্ভরযোগ্য হবে। প্রতিপক্ষের বর্ণিত অর্থ হবে পরিত্যাজ্য।

৫. কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো সূত্র উল্লেখ ছাড়াই একটি আকীদা অথবা মতবাদ কিংবা অন্যায়ের সাথে আমাদেরকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। অথচ আমরা বারবার সুস্পষ্ট ভাষায় তা থেকে মুক্ত হওয়ার কথা ব্যক্ত করেছি। আমাদের

লেখা থেকে কখনো এই অপবাদ প্রমাণ করা যাবেনা। এসব অপবাদের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক না থাকার কথা বারবার প্রকাশ করা সত্ত্বেও জোরপূর্বক গোমরাহ, বদ্ আকীদাহ্ এবং অপরাধী বানানোর চেষ্টা করা কোন্ ধরনের সততা, একথা ভেবে আমরা আশ্চর্য হই!

৬. কতিপয় স্থানে আমাদের বিরুদ্ধে এমন সব অভিযোগ করা হয়েছে, যেগুলোর যুক্তিগ্রাহ্য জবাব আমাদের লেখাসমূহে বর্তমান আছে। যদি এসব লেখা না পড়েই তারা এই অভিযোগ উত্থাপন করে থাকে, তাহলে এটা একথার প্রমাণ যে, মহোদয়গণ অন্যের বিরুদ্ধে দোষারোপ করার ব্যাপারে খুবই আগ্রহী, কিন্তু তাদের মতামত সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত নয়। যদি জবাবী দলিল সম্পর্কে অবহিত হওয়া সত্ত্বেও ঐসব অভযোগ পুনঃ উত্থাপিত হয় এবং জবাবী দলিল দ্বারা মুকাবিলা না করা হয়, তাহলে এটা হবে ঝগড়াটে স্বভাবের সুস্পষ্ট আলামত।

৭. কতিপয় ক্ষেত্রে আমাদের আন্দোলন অথবা আমাদের মতামত কিংবা কোনো বিশেষ ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভংগির উপর একটি সামগ্রিক রায় প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের লেখা থেকে এর সমর্থনে কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করা হয়নি। এ রায়ের ভিত্তি কি তাও বলা হয়নি। এরূপ ভিত্তিহীন রায় প্রদান করা যাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে দুনিয়ায় তাদের রায়ের আঘাত থেকে কে বাঁচাতে পারবে?

৮. কোনো কোনো জায়গায় সমস্ত অভিযোগের সারকথা এই দাঁড়ায় যে, মতে আমরা কোনো ফিক্হী মাস্য়ালার বর্ণনায় অথবা কোনো কালামী (আকীদাগত) মাসয়ালার ব্যাখ্যায় ভুল করেছি। কিন্তু তা এমন অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করা হয়েছে যেন (নাউযুবিল্লাহ) আমরা দীনকে একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছি। অথচ ইলমী মাসয়ালায় ভুল করা দুনিয়ার কোনো বিরল ঘটনা নয় আর প্রত্যেক ভুলই অনিবার্যরূপে গোমরাহী নয়।

৯. কতিপয় ক্ষেত্রে এমন সব বিষয় কেন্দ্র করে বিরোধিতা ও ফত্ওয়াবাজি করা হয়েছে, যেগুলোর মধ্যে মত-পার্থক্য করার অবকাশ রয়েছে এবং উভয় পক্ষের কাছেই নিজেদের মতের সমর্থনে শরয়ী দলিল প্রমাণ বর্তমান আছে। এ ধরনের বিরোধপূর্ণ মাসয়ালাকে ইল্মী গবেষণার বিষয়বস্তু বানানো যেতো। কিন্তু এগুলোকে কেন্দ্র করে বিরোধিতার ঝড় উঠানো এবং ফত্ওয়াবাজি করার অভ্যাস করা কোনো জ্ঞানবান লোক থেকে আশা করা যায়না।

এই হযরতগণের, বিরোধীতাপূর্ণ লেখার যে পর্যালোচনা আমরা উপরে উল্লেখ করলাম, তার প্রতিটি অংশের উদাহরণ তাদের লেখা থেকেই আমরা পেশ করতে পারবো। তাঁরা যখন চাইবেন, তখন এগুলোর নজির তাদের খেদমতে হাযির করা হবে। এর আগে সোশ্যালিষ্ট, কাদিয়ানী, হাদীস

অস্বীকারকারী, বেরেলভী এবং মুসলিম লীগের মহোদয়গণ এ ধরনের বাড়াবাড়ি আমাদের উপর করেছিলেন। কতিপয় তর্কবাগীশ আহলে হাদীসও এ ঘোড়া রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। এ পদ্ধতিতে আমাদের বিরুদ্ধে গণরায় সৃষ্টি করার জন্যে কতিপয় সংবাদপত্র ও সাময়িকী বছরের পর বছরব্যাপী স্বতন্ত্র কর্মপন্থা অবলম্বন করে। কিন্তু যাদের কর্মপদ্ধতিতে লজ্জা-শরম ও আল্লাহ্‌ভীতি তিরোহিত হওয়ার আলামত পাওয়া যায়, তারা দৃষ্টি আকর্ষণ করার উপযুক্ত বলে আমরা মনে করিনা। দেওবন্দ ও মাযাহিরুল উলূমের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে আমরা এখনো সেই কাতারে শামিল মনে করিনা। তাঁরা নিজেদেরকে এতোটা অধঃপতিত প্রমাণ করবেন এ আশা আমরা করিনা। এ কারণেই আমরা তাদের জন্যে এতোটা সময় ব্যয় করছি। আল্লাহ্‌ না করুন, যেদিন আমরা তাদের পক্ষ থেকে উচ্চাশা হতে বঞ্চিত হবো, সেদিনের পর থেকে ইনশাআল্লাহ্‌ তাদের সহস্র নিবন্ধ ও লাখো প্রচারপত্রের একটি জবাবও এ পক্ষ থেকে দেয়া হবেনা।

[চার]

এটা বড়ই বিস্ময়কর যে, আমাদের বিরোধিতায় কেবল দেওবন্দের আলেমগণই নন, অন্যান্য মহলের আলেমগণও যে কথাগুলো বারবার কাট-ছাঁট করে ও বড় আকারে সামনে এনে পেশ করছেন, সেগুলোর প্রায় সবই এমন, যেগুলো আমরা কোনো আলোচনার প্রসংগে কিংবা প্রশ্নের জবাবে দিয়েছিলাম। বরং এমন এমন কথা খুঁড়ে বের করে আনা হচ্ছে যা তরজমানুল কুরআনের পুরানো ফাইলের মধ্যে বছরের পর বছর পড়ে ছিল। স্বয়ং আমাদেরও স্মরণে ছিল না যে, এগুলো আমাদের কলম থেকে বের হয়েছে। এসব বস্তাবন্দী হয়ে থাকা কথার মধ্যে সম্ভবত একটি কথাও এমন নেই, যার প্রচার আমরা বিশেষ ভাবে করেছি। অথবা সে কথা গ্রহণ করার জন্যে লোকদেরকে দাওয়াত দিয়েছি। কিংবা আমরা সে কথাকে বারবার উল্লেখ করেছি। কিন্তু আমাদের এসব বিরোধী আলেমগণ নিজেদের ফত্ওয়া, প্রবন্ধ ও প্রচারপত্রসমূহে একথাগুলো এমনভাবে উল্লেখ করছেন যেন আমাদের উঠা-বসা, আহার-নিদ্রা এসব বিষয়ের মধ্যে কেন্দ্রীভূত। এগুলোর উল্লেখ ও বর্ণনার মধ্যে আমরা নিজেদের জীবনকাল শেষ করেছি আর এগুলোর প্রচারণায় আমরা দিবা-নিশি মত্ত আছি। অপরদিকে, যেসব চিন্তাধারার প্রচারণার জন্যে আমরা বছরের পর বছরব্যাপী বাস্তবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, যেসব জিনিসের কথা আমরা বারবার লিখছি এবং বলে আসছি, কথা গ্রহণ করার জন্যে আমরা দুনিয়াবাসীকে দাওয়াত দিচ্ছি, যে জিনিসটি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় আমরা দীর্ঘদিন যাবত নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে আসছি আর যে জিনিসকে নিশ্চিহ্ন করার অভিপ্রায়ে আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করছি, সেগুলো এসব হযরতের লেখার মধ্যে কোথাও বা আদৌ উল্লেখ নেই। আর কদাচিত কেউ উল্লেখ করলে অবহেলার সাথে এর প্রতি একটু ইশারা করে

দিয়েই শেষ করে দিয়েছেন। এসব মহোদয়দের মধ্য থেকে কেউ সামান্য কষ্ট স্বীকার করে আমাদের বলে দিবেন কি এই উদ্দেশ্যমূলক বাছাইয়ের মধ্যে কি কল্যাণ কামিতা আপনাদের সামনে আছে? কুরআনের আলোকে যে নীতি আমরা বুঝি তাহলো মানুষ যে কাজের চিন্তা বেশী করে, যে কাজে সে অধিক সময় মগ্ন থাকে সে কাজের মাধ্যমেই তাকে যাচাই করতে হয়। এই প্রধান চিন্তা ও অধিক নিমগ্নতা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে কদাচিত ঘটে যাওয়া ভুল তওবাহ্ ছাড়াও মাফ হতে পারে। যেমনঃ

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ -

"ভালো কাজ মন্দ কাজকে অপনোদন করে দেয়।" কিন্তু কি অদ্ভুত ব্যাপার, আমাদের বর্তমান যুগের বুযুর্গানে দীন একটি দলের সাময়িক খন্ডকালীন ও অস্থায়ী কাজগুলোকে এ অভিপ্রায়ে বাছাই ও পাকড়াও করছেন যে, তার স্থায়ী দাওয়াত, দিবা-নিশির ব্যস্ততা এবং তার প্রধান্য লাভকারী চিন্তাধারাকে এগুলোর মাধ্যমে অর্থহীন করে দেবেন। এসব কর্মকান্ড দেখে মন স্বতঃই আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে যে, তিনি আখিরাতের আদালতের সমগ্র ক্ষমতা স্বহস্তে রেখেছেন। আল্লাহ্ না করুন, যদি কিছুমাত্র ক্ষমতা-ইখতিয়ার এই হযরতদের হাতে অর্পণ করা হতো, তাহলে না জানি কোন্ দাঁড়িপাল্লায় তারা আল্লাহর সৃষ্টিকে ওজন করতেন এবং সামান্য তুচ্ছ কথার জন্যে মানুষের সারা জীবনের সমস্ত কর্মকান্ড বাজেয়াপ্ত করে দিতেন।

এই মহোদয়গণের বিশেষ প্রচেষ্টা হচ্ছে, এমন সকল কথাই যে কোনো ভাবে আমাদের ঘাড়ে চাপাতে হবে যার সাহায্যে আমাদের বিরুদ্ধে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তোলা যায়। যেমন বলা হয়ঃ 'জামায়াতে ইসলামীর লোকেরা সাধারণ মুসলমানদেরকে কাফির বলে থাকে' এবং 'নিজেদের ছাড়া বাকী সকলকেই কাফির মনে করে।' 'কবিরাহ গুনাহ করলে ঈমান রহিত হয়ে যায় বলে দাবী করে।' 'সাহাবীদের বেইজ্জতি করে।' 'বুযুর্গানে দীন বিশেষত সুফিয়ায়ে কিরামদের সমালোচনা করে।' 'তাদের আমীর মুজাদ্দিদ ও মাহ্দী হওয়ার দাবীদার এবং ভবিষ্যতে আরো কিছু হতে চায়' ইত্যাদি। এসব অভিযোগের প্রমাণ যোগাড় করতে যা কিছু পরিশ্রম করা হচ্ছে এবং হাজার হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী নিবন্ধ থেকে যে কঠোর পরিশ্রমের সাথে শব্দ বেছে বেছে আমাদের ধারণাসমূহের এমন একটি ফিরিস্তি তৈরি করা হচ্ছে, এসব ভদ্রমহোদয়ের মাধ্যমে স্বয়ং আমরাও প্রথমবার জানতে পারি। অন্যের দৃষ্টি থেকে তারা গোপন থাকতে চায় কিন্তু আমাদের দৃষ্টি থেকে তারা গোপন নয়। আমরা তাদের এই শিল্পকারিতার মূল্য অবশ্যই দিই। কারণ আমরা প্রত্যেক শিল্পকারিতার মূল্য দিয়ে থাকি, যদি তা সিঁধে চুরি এবং গাঁট কাটার শিল্পকারিতাও হয়। তবে আমরা শুধু এতটুকু জানতে চাই যে, নিজের দুনিয়া ও আখিরাতের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে পরিশেষে একাজে গলদঘর্ম হওয়ার হেতু কি? আপনারা অবশ্যই

লোকদেরকে ভর্ৎসনা ও নিন্দা করার কারণসমূহ খুঁজে খুঁজে বের করবেন, যদি তাতেও কাজ না হয়, তাহলে নিজেদের পক্ষ থেকে কিছু সংযোজন করে অপরাধের পাত্র ভরপুর করে দেবেন– এ নীতি কি কুরআন হাদীস সমর্থিত, নাকি সালফে সালেহীনের অনুসৃত নীতিসম্মত, জবাব দেবেন কি?

[পাঁচ]

আরো একটি কথা, যা কিছুমাত্র কম বিস্ময়কর নয়। কথাটি হলো, আমাদের ব্যাপারে কতিপয় বুযুর্গের বিগত কয়েক বছরব্যাপী দৃষ্টিভংগির পরিবর্তন। অথচ আমাদের দৃষ্টি ভংগি ও ধ্যান–ধারণা বছরের পর বছরব্যাপী আগে যেমন ছিল আজও তেমনই আছে। আমাদের যেসব লেখার কারণে আজ আমরা পথভ্রষ্ট, বিপথগামী বরং বদ্‌বখ্‌ত ও খবীস পর্যন্ত হয়ে গেছি, সেগুলো অনেক আগেই প্রকাশিত হয়েছিল যখন আমরা এসব বুযুর্গের দৃষ্টিতে অন্তত পথভ্রষ্ট ও পথভ্রষ্টকারী ছিলামনা।

১৯৪৫ সনের প্রথম দিকে লায়ালপুর জেলার অন্তর্গত রেওয়াজআবাদের 'আন্‌জুমানে ইসলাহিল কুর্‌রা' –এর পক্ষ থেকে আমাদের সম্পর্কে জনাব মাওলানা মুফতী কিফায়াতুল্লাহ সাহেবের খেদমতে একটি ব্যাখ্যা চেয়ে পাঠানো হয়। মাওলানা সাহেবের পক্ষ থেকে এর যে জবাব পাওয়া যায় তার ভাষা ছিল নিম্নরূপঃ

"মওদূদী সাহেবের লেখাসমূহ অধিকাংশই সঠিক। তাঁর আন্দোলনে বাহ্যত কোনো ভুল বা পথভ্রষ্টতা নেই। শুধু একথা ভাববার বিষয় যে, বর্তমান যুগে এ আন্দোলন উপকারী ও ফলপ্রসু হওয়ার ক্ষেত্রসমূহ অনুকূলে আছে কি নেই এবং এই আন্দোলনকারী লোকটি বাস্তবধর্মী নাকি শুধুই কথার ফুলঝুরি ছড়ান।"

বারাবাংকী জেলার আরেকজন লোক সে সময়েই মাওলানা সাহেবের কাছে জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে একটি প্রশ্ন পাঠিয়েছিলেন। যার জবাবে তিনি বলেছিলেনঃ

মওলানা আবুল আ'লা মওদূদীর দৃষ্টিভংগি নীতিগতভাবে তো সঠিক, কিন্তু আজকের দিনে বাস্তবধর্মী নয়। যেমন কেউ বললোঃ শরীয়তের শাস্তি বিধান জারী হওয়া উচিত। একথা নীতিগতভাবে তো ঠিক। কিন্তু এ যুগে চোরের হাত কাটা ব্যভিচারীকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করার আদেশ জারী করা কার্যত অসম্ভব। কারণ অনৈসলামী শাসনব্যবস্থা এর প্রতিবন্ধক। এতদ্‌সত্ত্বেও যদি কেউ তাঁর জামায়াতে শামিল হয়ে সাধ্যানুযায়ী ইসলামী খেদমতে আনজাম দেয়, তাহলে সেটা কোনো ক্ষতিকর নয়।"

আজ এই মাওলানা কিফায়াতুল্লাহ্‌ সাহেবই অন্য একটি ফত্‌ওয়া জারী করেছেন, যা সাহারানপুর থেকে প্রকাশিত একটি প্রচারপত্রে এভাবে সন্নিবেশিত হয়েছেঃ

"মওদুদী জামায়াতের অফিসার মৌলভী আবুল আ'লা মওদূদীকে আমি চিনি। সে কোনো নির্ভরযোগ্য সুপরিচিত আলিমের শিষ্য নয় এবং ফয়েযপ্রাপ্তও নয়। তার দৃষ্টি নিজের অধ্যয়নের ব্যাপকতার কারণে যদিও সুদূরপ্রসারী তবুও তাতে দীনী প্রবণতা ক্ষীণ এবং ইজতিহাদী প্রভাব প্রকট। এ কারণেই তার প্রবন্ধ ও লেখাসমুহে প্রখ্যাত উলামা বরং সম্মানিত সাহাবীদের সম্পর্কেও অভিযোগ এসেছে। সুতরাং মুসলমানগণের এ আন্দোলন থেকে দূরে থাকা উচিত। তাদের সাথে মিলমহব্বত, সম্পর্ক ও একাত্মতা না রাখা উচিত। তার লেখাসমূহ বাহ্যত খুবই আকর্ষণীয় এবং ভালো মনে হয়। কিন্তু এগুলো সেকথা হৃদয়ে গেঁথে দেয়, যা মন-মেযাজকে স্বাধীনচেতা করে তোলে এবং বুযুর্গানে ইসলাম সম্পর্কে খারাপ ধারণার সৃষ্টি করে।"

এই '৪৫ সালেরই শেষ দিকে মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী সাহেবকে জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি এভাবে জবাব দেনঃ

"মওলানা মওদুদীর চিন্তাধারা অনেক লেখা ও পত্র-পত্রিকা ইত্যাদিতে প্রকাশিত হচ্ছে। এগুলো মনোযোগ সহকারে দেখার মতো এতো সময় আমার নেই। তার লিখিত যেসব প্রবন্ধ আমার নযরে পড়েছে, সেগুলোর বাস্তবায়ন বর্তমন অবস্থায় অসম্ভব। আল্লাহই ভালো জানেন!"

"বর্তমান যুগে এবং এই পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে এসব বিষয়ের যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে তদনুযায়ী আমাদের উপর শরয়ী দায়িত্ব বর্তাবে কি বর্তাবেনা তা আমি বুঝতে পারছিনা।"

আরেকজন লোক যিনি সে সময় ফিরোজপুর ঝরকায় সহকারী তহসিলদার ছিলেন, তিনি জামায়াতে ইসলামীর সমস্ত বইপত্র মাওলানা সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দেন। তিনি তাঁর কাছে এসব প্রকাশনা অধ্যয়ন করে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের নীতি এবং জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত এ দু'টির কোন্‌টি সত্য ও সঠিক, একথা জানার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। বিশেষ করে "একটি গুরুত্বপূর্ণ ফত্ওয়ার" দিকে গুরুত্ব সহকারে মনোযোগ আকর্ষণ করে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এই প্রচারপত্র পড়ে চাকরির প্রতি আমার মনে অনীহার সৃষ্টি হয়েছে, এমতাবস্থায় আমি কি করবো সে সম্পর্কে আপনার পরামর্শ কামনা করি। মুজাফফর নগর জেলার হোসাইনআবাদ থেকে মাওলানা সাহেবের নিজ হাতে লেখা এর যে জবাব (৩০ শে যিলহজ্জ, ৬৪ হিঃ) পাওয়া যায়, তার ভাষা ছিল এরূপঃ

"মুহতারাম! আমি এতো ব্যস্ত ও অবসরহীন ব্যক্তি যে, প্রতিদিন চিঠিপত্র দেখা সম্ভব নয়, কিতাব দেখা এবং জবাব লেখা তো দূরের কথা! মওদূদী সাহেবের অবসর আছে, যা ইচ্ছা করেন লেখেন, যখন ছাপাতে চান ছাপিয়ে দেন।

জমিয়াতুল উলামা রাজনীতিতে যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছে তা করেছে সাধ্যানুযায়ী أَهْوَنُ الْبَلِيَّتَيْنِ 'দুটি মুসীবতের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম মুসীবতটির' উপর ভিত্তি করে বর্তমান পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে যে শক্তি ও সামর্থ আমাদের আছে, তার উপরই জমিয়তের কর্মতৎপরতা নির্ভরশীল। মওদূদী সাহেব যে দর্শন উপস্থাপন করছেন, তা দেখা এবং এর উপর সমালোচনা ও পর্যালোচনা করা অথবা এর জবাব লেখার প্রয়োজনীয়তা আমরা বুঝিনা। আর বুঝলেও অবসর নেই। মওদূদী সাহেব এবং তাঁর সমর্থকগণ নিজেদের কর্মসূচী নিয়ে তৎপর হোন। আমরা তাদের মুকাবিলা করবো না এবং তাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রোপাগান্ডাও করবোনা। তার কর্মপদ্ধতি শরীয়তসম্মত এবং ইসলাম ও মুসলমানদের জন্যে উপকারী একথা যদি আমাদের মনে এসে যায়, তাহলে আমরাও তার অনুসারী হয়ে যাবো। অন্যথায় কুরআনের ভাষ্য لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا - অনুযায়ী আমরা অক্ষম হবো।

দ্বিতীয়ত আপনি স্বীয় চাকরি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন। আমি যতটুকু বুঝি তাতে যখন হালাল উপায়ে অন্য পদ্ধতি আপনার জন্যে গ্রহণ করা সম্ভব, তখন এই চাকুরী পরিত্যাগ করা উচিত। যদিও সেই 'গুরুত্বপূর্ণ ফত্ওয়া' আমার নযরে পড়েনি, তবুও আপনি যে বিষয়বস্তুর বর্ণনা করেছেন তাতে সঠিকের কাছাকাছি মনে হয়। আপনার বন্ধু-বান্ধবদের হুকুম আমি বুঝতে পরছিনা যদিও তাঁরা আলেম।"

ঠিক পাঁচ বছর পর আজ ১৩৬৯ হিজরীর যিলহজ্জ মাসের সে-ই মাওলানা হোসাইন আহমদ সাহেবই আমাদের সম্পর্কে ঐ মত প্রকাশ করেছেন, যা এ প্রবন্ধের সুচনায় উল্লেখ করা হয়েছে। প্রশ্ন হলো-মতামতের ক্ষেত্রে এই বিপ্লবের এবং চিন্তা-ভাবনার এই পরিবর্তনের কারণ কি? তার পর থেকে অদ্যাবধি যদি আমাদের পক্ষ থেকে কোনো নতুন গোমরাহী প্রকাশ পেয়ে থাকে, যা থেকে সে সময় পর্যন্ত আমরা দূরে ছিলাম, তাহলে দয়া করে সে গোমরাহী সম্পর্কে আমাদের অবশ্যই অবহিত করবেন। অথবা যদি ঐ হযরতগণ সে সময়ে যে সমস্ত কিতাব পড়ার সময় পাননি, এখন সেগুলো পাঠ করার অবকাশ পেয়ে থাকেন এবং এগুলো অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পাঠ করার পর আমাদের গোমরাহী সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েছেন তাহলে অন্তত একথাটিও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে দিন। আর যদি ব্যাপার ভিন্নতর হয় বরং এসব ফতওয়া ও লেখালেখির মূল কারণ হলো জামায়াতে ইসলামীর অগ্রযাত্রার ফলে তাদের নিজেদের প্রভাব বলয়ের লোকদের হারাবার আশংকা তাদের পেরেশান করে তুলেছে এবং ছুটে যাওয়া লোকদের ঠেকানোর জন্যে তারা মরিয়া হয়ে লেগেছেন। মূলত, এ চিন্তাই সোশ্যালিস্ট, মুসলিম লীগার, বেরেলভী, কাদিয়ানী, আহলে হাদীস ও হাদীস অস্বীকারকারীদেরকে আমাদের বিরোধিতায় উদ্বুদ্ধ করে রেখেছে। বে-আদবী মাফ করবেন, এ ধরনের চিন্তা ভাবনা আহলে হকের জন্যে শোভনীয় নয় এবং

এরূপ চাতুর্য তাদের মর্যাদার জন্যে অবমাননা বৈকি! এ ধরনের চিন্তা তো দোকানদাররাই করে থাকে। প্রতিপক্ষ দেকানদার যেন তার দোকানের গ্রাহক ও খরিদ্দারদেরকে ভাগিয়ে নিতে না পারে, এ চিন্তাই তারা করে। বরঞ্চ সম্ভবত কোনো ভদ্র দোকানদার যদি তার মধ্যে সামান্য খোদাভীতিও থেকে থাকে, এতটুকু অধঃপতিত হতে চায়না যে, শুধুমাত্র গ্রাহক ধরে রাখার নিমিত্তে প্রতিযোগী দোকানদারের মালের দোষ বর্ণনা করতে থাকবে। যাই হোক, নিজের মর্যাদা নিরূপণ করা ঐসব মহোদয়ের আপন কাজ। আর আমরা! আলহামদুলিল্লাহ্! আমরা দোকানদার নই, নই কারো ব্যবসায়ের প্রতিযোগী। যে জিনিস আমরা কুরআন ও হাদীসের সত্য হিসেবে পাই সেটাই আল্লাহর সৃষ্টিজগতের সামনে পেশ করে আসছি। যে এটাকে সত্য মনে করবে, গ্রহণ করে নেবে, এটাই তার জন্যে মংগলজনক। যে সত্য মনে করবেনা, সে তা বর্জন করবে, তার ব্যাপার তার আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত। সারা বিশ্ব এটা গ্রহণ করে নিলেও আখিরাতের ফায়দা ছাড়া এ থেকে আমাদের আর কোনো প্রতিদান চাওয়ার নেই। আর যদি সারা জগত এটাকে বর্জন করে তাহলে তাতেও আমাদের কোনো ক্ষতি নেই।

[ছয়]

যারা নিজেদেরকে আহলে হক মনে করেন এবং যাদের মধ্যে দুনিয়ার সাথে আখিরাতেরও কিছুটা চিন্তা বাবস্তবিকই আছে এমন সমগ্র আলেম সমাজের কাছে পরিশেষে আমরা তিনটি কথা পরিষ্কারভাবে বলে দিতে চাইঃ

১. প্রথমত আমরা এখন ফাসিকী ও গোমরাহীর সেই কর্তৃত্ব খতম করার কাজে নিয়োজিত আছি, যা জ্ঞান ও চিন্তা, নৈতিকতা ও সমাজিকতা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং অর্থনীতি ও রাজনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর দীনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কাজেই আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা উৎসর্গীকৃত। আপনাদের মধ্যে যদি কিছুটা আন্দাজ অনুমান করার ক্ষমতা থেকে থাকে, তাহলে বাহ্য নিদর্শনাবলীই আপনাদেরকে বলে দিবে যে, বর্তমানে দীনের সাহায্যকারী কোন্ সক্রিয় ও সংগঠিত শক্তিটি আছে যাকে ফাসিকী ও গোমরাহীর সমগ্র শক্তি তাদের আসল প্রতিপক্ষ মনে করে এবং তার বিরুদ্ধে নিজেদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করছে। সমাজতন্ত্রীদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তারা নিজেদের জন্যে সমগ্র উলামা সম্প্রদায়কে অধিক বিপজ্জনক মনে করে নাকি জামায়াতে ইসলামীকে? হাদীস অস্বীকারকারীদের লেখাগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিয়ে দেখুন, আহলে হাদীস ও হাদীসের সমর্থক অন্যান্য সকলের বিরুদ্ধে তাদের রাগের মাত্রা অধিক নাকি জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে? কাদিয়ানীদের নিজস্ব সংবাদপত্র ও সাময়িকী আপনাদেরকে বলে দিবে জামায়াতে ইসলামীকে তারা বেশী ভয় করে নাকি তাদের অন্যান্য বিরোধীদেরকে? পাশ্চাত্য মানসিকতার পতাকাবাহীদের লেখা বিবৃতিসমূহ এবং যাবতীয় বস্তুব কলা-কৌশলই

আপনাদের সামনে সাক্ষ্য দিবে যে, তারা জামায়াতে ইসলামীকে নিয়ে অধিক বিব্রতবোধ করছে নাকি অবশিষ্ট সমগ্র ধর্মীয় সম্প্রদায়কে নিয়ে? এসব শক্তির সাথে যখন আমরা দ্বন্দ্বে লিপ্ত, তখন আপনাদের ওজন কোন্ পাল্লার দিকে ধাবিত হচ্ছে, তা আপনাদের খুব ভালো করে জানা দরকার। আপনারা ঝগড়া করতে চান তো মনের ঝাল মিটিয়েই করুন। তবে নিজেদের পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করবেন। যদি আল্লাহর দরবরে আপনাদেরকে জিজ্ঞসাবাদ করা হয় এবং সেখানে প্রশ্ন করা হয় যে, যখন আনুগত্য ও অবাধ্যতা এবং হিদায়াত ও গোমরাহীর মধ্যে লড়াই চলছিল তখন তোমরা কাকে কার উপর প্রধান্য দিয়েছিলে? সে সময় আপনারা নিজেদের এসব ফত্ওয়া, লেখা ও অভিযোগসমূহ দলিল হিসেবে পেশ করে যদি মুক্তি পাওয়ার আশা করে থাকেন এবং আমাদের ভুলত্রুটিসমূহ গণনা করে এই যুদ্ধক্ষেত্রে বিরাজমান দু'দলের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে আমাদেরই শাস্তি পাওয়া উচিত বলে আপনারা প্রমাণ করতে পারেন, তাহলে বিসমিল্লাহ বলে আপনাদের এ তৎপরতা চালিয়ে যান এবং এর কিছুটা কখনো অবশিষ্ট থাকলে তাও সম্পূর্ণ করে ফেলুন!

২. দ্বিতীয়ত, আত্মকেন্দ্রিকতার কারণে নয় বরং সত্যের ভিত্তিতে আপনাদের কেউ প্রকৃতই আমাদের উপর অসন্তুষ্ট হলে মুখ খোলার পূর্বে আমাদের সাহিত্যগুলো নিরপেক্ষ ও পরিচ্ছন্ন মন নিয়ে পাঠ করা উচিত। সাহিত্য পাঠের পর এ ব্যাপারে সঠিক মত প্রতিষ্ঠা করে নিন যে, আমাদের মর্যাদা কি এমন একটি দলের মতো যার সাথে শুধুমাত্র মতপার্থক্য করা যায়, নাকি এমন দলের মতো যার বিরোধিতা করা জরুরী, আর নাকি এমন দলের মতো উপরোল্লিখিত রণক্ষেত্রের দু'দলের মধ্যে এ দলটির বিরোধিতায় আপনাদের দ্বন্দ্বমুখর থাকা অধিকতর সঠিক? যেহেতু এ সময় দ্বন্দ্ব আছে এবং একটি চূড়ান্ত ফয়সালায় পৌছা ব্যতীত এর অবসানও হওয়ার নয়, এ কারণে বিভিন্ন বিষয়ের উপর নিজেদের অভিযোগপূর্ণ বিবৃতিগুলো সংকলন করার আগে আপনাদের এ সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, আমাদের কৃত ও অকৃত সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও আমাদের তুলনায় যারা এখানে ফাসিকী ও গোমরাহী ছড়াচ্ছে, তারাই কি আপনাদের কাছে অধিকতর সহনীয় নাকি আমরা এতোটা অসহনীয় হয়ে গেছি যে, আমাদের মুকাবিলায় সমাজতন্ত্রী, কাদিয়ানী, হাদীস অস্বীকারকারী ও পশ্চিমা সভ্যতার পতাকাবাহী সবাইকে আপনারা বরদাশ্ত করতে পারেন?

তৃতীয়ত, এটা আমাদের সার্বক্ষণিক ঘোষণা এবং আজও আমরা এর উপর প্রতিষ্ঠিত আছি যে, যে সব কথা আল্লাহর কিতাব ও রসূলের হাদীসের খেলাফ প্রমাণিত হবে, তা থেকে আমরা বিনা দ্বিধায় প্রত্যাবর্তন করবো। আমাদের সাথে মতপার্থক্য পোষণকারী মহোদয়গণ যদি কেবলমাত্র ফিতনা সৃষ্টিতে তৎপর হতে না চান বরং মত পার্থক্যের সুরাহা চান, তাহলে তাদের জন্যে সঠিক পন্থা

হলো, আমাদের উপর তাদের যত অভিযোগই থাকুক, সেগুলো এক জায়গায় সংখ্যানুক্রমে লিখে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন, এ পথটি খোলা আছে। ইনশাআল্লাহ্‌ আমরা তাদের লেখা হুবহু অক্ষরে অক্ষরে ছাপিয়ে দেবো এবং জবাবদানে তাদেরকে আশ্বস্ত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করবো। আর যদি তারা স্বয়ং নিজেদের কোনো সংবাদপত্র এবং সাময়িকীতে নিজেদের অভিযোগগুলো প্রকাশ করা পছন্দ করেন, তাহলে আমরা শর্তসাপেক্ষে জবাব দিতে প্রস্তুত আছি। প্রথম শর্ত হলো, প্রতিদিনের এই নিন্দাবাদ বন্ধ করে নিজেদের সমস্ত অভিযোগ একই সময় একত্রিত করবেন। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, আমরা যেভাবে তাদের অভিযোগসমূহ হুবহু প্রতিটি অক্ষর ছাপিয়ে জবাব দেব, তেমনি তাঁরাও আমাদের জবাবগুলো হুবহু প্রতিটি অক্ষর উদ্ধৃত করে তারপর নিজেদের ইচ্ছামত ব্যবহার করবেন। [তরজমানুল কুরআন, শাবান ১৩৭০, জুন ১৯৫১]

কতিপয় আকর্ষণীয় প্রশ্ন

প্রশ্নঃ নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উপর আলোকপাত করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশে আবদ্ধ করবেন।[১]

১. আপনার জামায়াত পাকিস্তানে না এলে ইসলামী আন্দেলন অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে যেতো। আপনি কি এ ধারণার সাথে একমত?

২. পঞ্চায়েত ব্যবস্থা কোনো জামায়াতের আমীরকে যদি 'সালেহ' (সৎ) প্রতিনিধি হিসেবে প্রস্তাব না করতে পারে, তাহলে সে জামায়াতের সদস্যগণ কিভাবে তাকে 'সালেহ' বলে গণ্য করতে পারে?

৩. কোনো শিয়া (যিনি তিন খলীফার শাসনামলকে অনৈসলামী ঘোষণা করেছেণ) নিজের আকীদার উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে আপনার আন্দোলনে শামিল হতে পারবে কি?

৪. একজন সৎ প্রতিনিধি কি নিজের পক্ষে ভোট দিতে পারবে? পারলে দলিল কি?

৫. আপনার প্রস্তাবিত পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় পরিষদের ভেতরে বাইরে ওয়াদা ও প্রতিজ্ঞার যে হিড়িক এবং একজোট হয়ে বসার যে পদ্ধতি, খিলাফতে রাশিদার যুগে কি এমনটি ছিল? নাকি সমকালীন খলীফা জনগণের জন্যে নিজের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি মনোনীত করতেন?

৬. ভারতে হরদমছে কুফর ও ধর্মত্যাগ চলছে। এমতাবস্থায় পাকিস্তানের কি তলোয়ারের জোরে ভারত দখল করে আপনার প্রস্তাবিত সৎ নেতৃত্বের

---

১. কিছু শাব্দিক পরিবর্তন সহ এ প্রশ্নগুলোই জামায়াতে ইসলামীর বিভিন্ন সাথী পেয়েছেন। এগুলো সবই রিবওয়া ডাকঘর (কাদিয়ানীদের কেন্দ্রস্থল) থেকে পাঠানো হয়েছে। মনে হয় একটি পরিকল্পনা নিয়ে একাজ করা হচ্ছে।

ভিত্তিতে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা কি কর্তব্য নয়? এ অবস্থায় বর্তমান অর্থনৈতিক বিষয়গুলো ইসলামী পতাকা বুলন্দ করার পথে নিশ্চয়ই প্রতিবন্ধক প্রমাণিত হতে পারবেনা?

৭. আপনি অহী ও ইলহামের দাবীদার নন। বরং ইসলামী রাষ্ট্রে আপনার মতে অহী ও ইলহামের অবকাশ পর্যন্ত নেই। এমতাবস্থায় শুধুমাত্র কতিপয় দলিলের ভিত্তিতে আপনি নিজেই কেমন করে নিশ্চিত হলেন যে, আপনার আন্দোলনই সঠিক অর্থে দীনের মেযাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং নেতৃত্ব পরিবর্তনের প্রকৃত ধ্যান-ধারণা আপনার জামায়াত ছাড়া কোথাও পাওয়া যেতে পারেনা? হতে পারে অন্য জামায়াত সঠিক মতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আপনার সমস্ত ভিতটিই ভুল বুঝার উপর দাঁড়িয়ে আছে।

জবাবঃ আপনার প্রশ্নের ধরন দেখে কিছুটা অস্বস্তি অনুভব করেছিলাম। কিন্তু আপনি যেখান থেকে এই পত্র লিখেছেন সেখানকার নাম যখন পড়লাম, তখন আপনার প্রশ্নের যতটুকুই যুক্তিগ্রাহ্য পেয়েছি ততটুকুই অনেক বেশী বলে মনে হয়েছে।

আপনার প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত জবাব নিম্নরূপঃ

১. জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানে কোথাও বাইরে থেকে আসেনি। বরং এখানে প্রথম থেকেই ছিল। তবে এর কেন্দ্র এখানে স্থানান্তরিত হয়েছে, যেমন অন্যান্য আরো কতিপয় দলের কেন্দ্র স্থানান্তরিত হয়েছে। এই জামায়াত ছাড়া এখানে ইসলামী আন্দোলনের প্রকাশ পাওয়া অথবা অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনার পরিসমাপ্তি ঘটতো এমন কোনো দাবী আমরা করিনি। আমরা যা বুঝি তা শুধু এই যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এ দেশকে কার্যত ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্যে এমনি একটি আন্দোলন ও দলের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয় ছিল। আলহামদুলিল্লাহ! জামায়াতে ইসলামী এ প্রয়োজন অনেকাংশে পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে। যদি এ জামায়াত প্রথম থেকেই সংগঠিত না হতো, তাহলে ফাসিকী ও গোমরাহীর শক্তিসমূহ পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্র বানানোর প্রয়াসী কোনো জামায়াত সংগঠিত হওয়ার সুযোগ দেবার সম্ভাবনা খুব কমই ছিলো।

২. 'কোনো জামায়াত'-এর আমীরের নাম কোনো পঞ্চায়েতের সামনে পেশ করা হয়েছে অথবা হয়নি এবং অনুপযুক্ততার কারণে তা রদ করে দেয়া হয়েছে, এ ধরনের কোনো কথা আপনি অবগত হয়েছেন কি? যদি এমন কিছু আপনার গোচরীভূত হয়ে থাকে তাহলে আমাকেও জানিয়ে অবশ্যই উপকৃত করবেন। আর যদি সেটা একটা নিছক কল্পনা হয়ে থাকে, যা আপনি স্বস্থানে বসে করছেন, তাহলে এ সম্পর্কে আমার কাছে প্রশ্ন করার পরিবর্তে নিজের চিন্তা-পদ্ধতির সংশোধন করা উচিত। না জেনে-শুনে আপনার এ ধরনের অনুমান করা মূলত কোনো ভাল কাজ নয়। আপনি আপনার অনুমান এমন একজন লোকের কাছে

পেশ করছেন যে প্রকৃত অবস্থা জানে।

৩. জামায়াতে ইসলামীর আকীদা ও লক্ষ্য উদ্দেশ্য জামায়াতের গঠনতন্ত্রে লেখা আছে। এই আকীদা ও উদ্দেশ্য গ্রহণ করে জামায়াতের নিয়ম–পদ্ধতি অনুযায়ী যে কোনো ব্যক্তি জামায়াতে ইসলামীতে শামিল হতে পারে।

৪. একজন সৎ প্রতিনিধির নিজের সপক্ষে ভোট প্রদান করা ইসলামের দৃষ্টিতে পছন্দনীয় কাজ নয়। তবে বর্তমান যুগে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে মানুষ বাধ্য হয়ে যেসব অপছন্দনীয় কাজ করে তার মধ্যে এটি একটি। এ ধরনের অপছন্দনীয় কাজ এমন মারাত্মক পর্যায়েরও নয়, যে জন্য নির্বাচনের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকে আলাদা থাকাকে সঠিক মনে করা যায়।

৫. আমি বুঝতে পারছিনা, আমাদের প্রস্তাবিত পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় ওয়াদা ও শপথের হিড়িক কোথায়? জনগণ যখন পঞ্চায়েতের সদস্য হয়, তখন আমরা তাদের কাছ থেকে শুধুমাত্র একটি ওয়াদা নিই আর পঞ্চায়েতের জন্যে নির্ধারিত প্রতিনিধির কাছ থেকে একটি শপথ গ্রহণ করা হয়। এরূপ শপথ ও ওয়াদার ব্যাপারে হিড়িক শব্দটির প্রয়োগ কিভাবে ঠিক হতে পারে? খিলাফতে রাশিদার কোনো প্রক্রিয়ার অনুপস্থিতি সে প্রক্রিয়াটি নাজায়েয কিংবা অনৈসলামী হওয়ার দলিল নয়। আপনার কাছে এ প্রক্রিয়া নাজায়েয হওয়ার কোনো দলিল থাকলে তা বর্ণনা করবেন। খুলাফায়ে রাশিদীনের যদি একটি জায়েয কাজ করার প্রয়োজন না হতো, তাহলে তাঁরা সেটা করতেননা। আমাদের প্রয়োজন হলে তা আমরা করতে পারি।

খিলাফতে রাশিদার যুগে একজোট হয়ে বসার প্রক্রিয়া ছিল কিনা আপনার এ প্রশ্নটি একটি আজব প্রশ্ন। আপনি এ প্রশ্নটির ব্যাপারে পুনর্বার চিন্তা করে দেখবেন। সত্যিই এ প্রশ্নটি করার মতো ছিল কি?

সমকালীন খলীফা কখনো কখনো পরামর্শের জন্যে তাদেরকেই তলব করতেন।[১]

৬. পাকিস্তানের প্রথম কর্তব্য হলো, সে নিজের রাষ্ট্র সীমার মধ্যে ইসলামী হুকুম জারী করবে এবং গোমরাহী ও ধর্মদ্রোহিতার আন্দোলনের মূলোৎপাটন করবে। অন্য কোনো দেশের মযলুম মুসলমানদের সাহায্যে এগিয়ে আসা তৎপরবর্তী কর্তব্য। আর সে কর্তব্যও শর্ত সাপেক্ষ। শক্তি থাকলে সাহায্য করতে হবে। অন্যথায় এটা জরুরী নয়। কোনো কাফির সরকারের সাথে সে ইসলামের দুশমনই হোক না কেন, মুসলিম দেশের প্রয়োজনবোধে চুক্তি করাও নিষেধ নয়। এ কাজ যদি নিষেধই হতো, তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হোদাইবিয়ার সন্ধি কেন করলেন?

---

১. খিলাফতে রাশিদার যুগে মজলিসে শূরা কিভাবে গঠিত হয়েছিল, তার উপর আমার "ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন" বইতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

৭. যে কুরআন ও হাদীস সম্ভবত আপনার মতে 'কতিপয় যুক্তি' মাত্র এবং তা একজন মুসলমানের আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যে যথেষ্ট নয়; আমি কিন্তু সে কুরআন-হাদীস চর্চা করেই নিশ্চিত হয়েছি যে, জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলন ইসলামের মেযাজের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। যদি আমরা এই আন্দোলনের দাবীর সাথে একাত্ম হয়ে সঠিক কাজ করতে সক্ষম হই, তাহলে নিশ্চিতভাবেই এর মাধ্যমে সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। অন্যান্য দল সম্পর্কে আমার যে মত সেটাকে আপনি ইচ্ছা করলে ভুল বলতে পারেন, কিন্তু আমি যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে মত প্রতিষ্ঠা করি এবং যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতেই মত পরিবর্তন করি।

অহী তো এখন আমার কাছে আসতে পারেনা। আর ইলহাম! এটা অপরিহার্য নয়। হলে তো ভালো। না হলে আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাত আমাদের পথ নির্দেশনার জন্যে নিঃসন্দেহে যথেষ্ট।

[তরজমানুল কুরআন, শাবান ১৩৭০, জুন ১৯৫১]

তবলীগ জামায়াতের ভূমিকা ও আমাদের কথা

প্রশ্নঃ কিছুকাল আগে শুক্কুরে তবলীগ জামায়াতের একটি বিরাট ইজতিমা হয়ে গেল। এই জলসায় পাকিস্তান ও ভারতের তবলীগ জামায়াতের আমীর জনাব মওলানা ইউসুফ সাহেব (মরহুম মওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস সাহেবের ছেলে ও গদ্দিনশীন) নিজে তশরীফ এনেছিলেন। এ উপলক্ষে সম্মেলন গাহের সীমার মধ্যেই শুক্কুরের জামায়াতে ইসলামী নিজেদের একটি বইয়ের দোকান দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যবস্থাপকদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাতে তাদের কোনো আপত্তি আছে কিনা জানার ব্যবস্থা করা হয়। তাদের একজন দায়িত্বশীল বুযুর্গ বলেন, এতে আপত্তি করার কি আছে! আপনারা সানন্দে আপনাদের বুকস্টল লাগান। তারপর বুকস্টলের জন্যে জায়গাও নির্ধারিত হয়ে গেল। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় শুক্কুরের জামায়াতে ইসলামীর আমীর ফযলে মুবীন সাহেব যখন সেখানে গিয়ে বুকস্টল লাগানোর জন্যে ইনতিজাম শুরু করলেন, তখন হঠাৎ তাঁকে এ কাজ করতে নিষেধ করা হলো। কারণ জিজ্ঞাসা করলে একজন দায়িত্বশীল জবাবে বললেনঃ "আমাদের মজলিসে শূরার সিদ্ধান্ত হয়েছে আমরা আপনাদেরকে বইয়ের দোকান দেবার অনুমতি দেবনা এবং আপনাদের কোনো ধরনের সহযোগিতাও গ্রহণ করবোনা। কারণ, আপনারা একটি রাজনৈতিক দল।" এ জবাব এবং কর্মপদ্ধতি তো রীতিমতো বিস্ময়কর! তবে আরো বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, সেখানে অন্যান্য কয়েকটি বুকস্টল ছিল। সেগুলোর উপর ঐ ভদ্রলোকদের কোনো আপত্তি ছিলনা। কিন্তু জামায়াতে ইসলামীর ব্যাপারে তাঁরা চাচ্ছিলেন, সভাস্থল থেকে এক মাইলের মধ্যে যেন তাদের বুকস্টল নজরে না পড়ে।

এ ঘটনার প্রেক্ষিতে ১১ এপ্রিল সিন্ধু প্রদেশের উত্তরাঞ্চলের জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডঃ সলীমুদ্দীন, শুক্কুর শহরের আমীর জনাব ফযলে মুবীন এবং জামায়াতের রোকন মৌলভী কুরবান আলী তবলীগ জামায়াতের মওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের খেদমতে হাযির হয়ে আরয করেন, "এ পর্যন্ত তো আমরা মনে করে এসেছি যে, তাবলীগ জামায়াত ও জামায়াতে ইসলামী উদ্দেশ্যের দিক থেকে এক ও অভিন্ন; শুধু কর্মপদ্ধতি ভিন্ন। কিন্তু আমাদের সাথে যে আচরণ করা হলো, তা এতদিন দীনের খেদমতকারী দুটি দলের মধ্যে যে পারস্পরিক আন্তরিকতা ও সহযোগিতা বজায় ছিল এবং হামেশা থাকা উচিত, তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। আপনি কি সত্যিই আমাদেরকে একটি রাজনৈতিক দল মনে করেন?" এ কথায় হযরতজী (মওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব, এ নামেই তাঁকে স্মরণ করা হয়ে থাকে) বললেনঃ

"আমি বুকস্টল ইত্যাদির ঘোর বিরোধী। মানুষের পকেট থেকে পয়সা বের করে নেবার একটি ফন্দি হিসেবে লোকেরা বই লেখে। বই লেখার এই ইলম এ সমস্ত দোষ-ত্রুটি সৃষ্টি করেছে। ঝগড়া-ফ্যাসাদের মূল এটাই। বই লেখা, সংবাদপত্র ছাপানো এবং এ ধরনের কাজ করার আমি ঘোর বিরোধী। প্রকৃতপক্ষে এসব জিনিস মুসলমানদেরকে বে-আমল বানিয়েছে। এগুলো মেহনতের বিকল্প হতে পারেনা।"

হযরতজীর এই ইরশাদ শুনে আমাদের বিস্ময় দ্বিগুণ হয়ে যায়। কারণ, প্রথমত হযরতজী যদি বুকস্টলের এতোই বিরোদী হবেন, তাহলে জামায়াতে ইসলামী ছাড়া অন্যদের বুকস্টল সভাস্থলে কেন সহ্য করা হলো? দ্বিতীয়ত, বই ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশ এবং মূল্য দিয়ে এগুলোর ক্রয় করার গুনাহ তো দেওবন্দ, সাহারানপুর ও থানাভুনের বুযুর্গগণও করে থাকেন। বরং স্বয়ং তবলীগ জামায়াতের কতিপয় বুযুর্গও এই গুনাহে লিপ্ত রয়েছেন। তাহলে এটা কেমন কথা যে, একই কাজ তারা করলে খেদমতে দীন আর অন্যেরা করলে তা শুধু পয়সার স্বার্থ? তারপর 'একরামুল মুসলেমীন'-এর এই আযব চিত্র আমাদের দারুণ বিস্মিত করে। ফাসিকী ও শালীনতা বিরোধী নষ্টামির পতাকাবাহীদের বিরুদ্ধে মুখ খোলা তো 'ইকরামুল মুসলিমীনের খেলাফ, কিন্তু দীনী খেদমতে নিয়োজিত একটি জামায়াতে কাজ ও উদ্দেশ্যকে প্রকাশ্যে হেয় করা এবং তার নিয়তের উপর পর্যন্ত আক্রমণ করা পুরোপুরি 'ইকরামুল মুসলিমীন!'

তারপর হযরতজী বললেনঃ আপনারা তো ক্ষমতা চান। আপনারা এমন জিনিস চান যা মারদুদ-প্রত্যাখ্যাত। রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হুকুমতের নবুয়্যত পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি তা অগ্রাহ্য করেন, প্রত্যাখান করেন এবং বন্দেগীর নবুয়্যত গ্রহণ করেন। হুকুমত ও শাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তন সাধিত হলে ইসলামী যিন্দা হয়ে যাবে, আপনাদের এ ধারণা

সম্পূর্ণ ভুল।"

উপস্থিত লোকদের একজন

كلمة الحق عند سلطان جابر

"জালেম বাদশাহর সামনে সত্য কথা বলা।" এর অর্থ কি প্রশ্ন করেন। জবাবে তিনি বলেনঃ এটা সে সময়ের জন্যে যখন সমগ্র সমাজ ঠিক হয়ে যাবে; শুধুমাত্র সরকারের মধ্যে খারাপী দেখতে পাওয়া যাবে। সে সময় সত্য কথা বলা ঠিক হবে যাতে করে যে ত্রুটি এখন শুধু সরকার পর্যন্ত সীমিত আছে তা অগ্রসর হতে না পারে। বর্তমানে এ সুযোগ নেই।

কথোপকথনের এক পর্যায়ে হযরতজী আরো বললেনঃ "বর্তমানে যারা ক্ষমতাসীন আছেন, তারা আপনাদের চেয়ে ভাল। ঈমানে, কাজে-কর্মে, কলা-কৌশলে এবং যোগ্যতায় তারা আপনাদের চেয়ে উত্তম। তাদের পরিবর্তে আপনারা কাদেরকে ক্ষমতায় বসাবেন?"

এখন প্রশ্ন হলো, এই দলটি সম্পর্কে কি নীতি অবলম্বন করা উচিত? প্রশ্ন এ কারণে দেখা দিয়েছে, যদি দু'চার জায়গয় এ ধরনের তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়, তবুও উভয় জামায়াতের মধ্যে আন্তরিকতা ও সহযোগিতার যে সম্পর্ক এখন পর্যন্ত বজায় আছে, তার মধ্যে যেন ফাটল না ধরে। কাজেই এ ব্যাপারে জামায়াতের কর্মীদের সামনে সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা উচিত।

জবাবঃ জামায়াতে ইসলামীর কতিপয় দায়িত্বশীল কর্মী আমাদের কাছে এই রিপোর্ট পাঠিয়েছেন। এটা পড়ে বাস্তবিকই মনে বড় ব্যথা পেলাম। স্বয়ং মওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের উপস্থিতিতে তবলীগ জামায়াতের মজলিসে শূরার এই ফয়সালা করা এবং মওলানা সাহেবের সেটাকে সমর্থন করায় প্রতীয়মান হয় যে, এটা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির বিরোধিতা নয় বরং একটি সামষ্টিক প্রয়াস। আফসোস ও পরিতাপ করা ছাড়া আমরা আর কি করতে পারি!

যাই হেক, জমায়াতে ইসলামীর কর্মীদের এজন্য মন খারাপ করা উচিত নয়। এখন না হলেও কোনো সময় ইনশাআল্লাহ আমাদের এই ভাইয়েরা নিজেদের কর্মপদ্ধতির ভুল অনুধাবন করতে পারবেন যে, দীনের খেদমতের উদ্দেশ্যেই দুই বা ততোধিক দল স্ব স্ব প্রক্রিয়ায় কাজ করতে পারে। তারা পরস্পরের কর্মপদ্ধতির ব্যাপারে মতবিরোধও করতে পারে। কিন্তু একথাটা আমরা বুঝতে পরছিনা যে, তাদের কোনো একটি দল এই ময়দানে কেবলমাত্র নিজেকেই দেখতে চায় কেন? অপরের অস্তিত্ব তার কাছে অসহ্য হয় কেন? দীনের খেদমত তো কোনো ব্যবসা নয় যে, এক খাদেম অন্যকে নিজের প্রতিযোগী মনে করবে। প্রতিযোগিতা তো দোকানদারীর মধ্যে হয়ে থাকে। দোকানদারী হিসেবে যদি আমরা এ কাজ করে থাকি, তাহলে আমাদের উপর এবং আমাদের এ কারবারের উপর সহস্র বার অভিসম্পাত। আর যদি এটা

আন্তরিকতার ভিত্তিতে দীনের খেদমত হয় তাহলে আমাদের প্রত্যেকেরই খুশী হওয়া উচিত যে, এ কাজ একাকী আমরাই করছিনা, অন্যরাও এ কাজে তৎপর। সুতরাং কেউ যদিও আমাদের প্রতিযোগী মনে করে দূরে নিক্ষেপ করার চেষ্টা করে, তাহলে আমাদের তাকে প্রতিযোগী মনে না করা এবং বার বার তার কাছে আসা-যাওয়া করা উচিত, যতোক্ষণ না আল্লাহ মনোভাব পরিবর্তিত করে দেন।

এ কথাও আমরা বুঝতে পারছিনা, কি কারণে যে, কতিপয় আলেম, সরকারী কর্মকর্তা এবং অন্যান্য দল তাদের প্রভাবিত এলাকায় জামায়াতে ইসলামীর সাহিত্য যেন না পৌঁছতে পারে তজ্জন্য দীর্ঘদিন যাবত চেষ্টা করে আসছেন। কোথাও এগুলোর পঠন-পাঠন নিষিদ্ধ হয়েছে। কোথাও লাইব্রেরী ও পাঠাগারে এগুলোর আগমন বাধা পাচ্ছে। কোথাও সে সব লোকদেরকে মাদ্রাসা থেকে চাকরিচ্যুত করা হচ্ছে, যাদের কাছে এসব সাহিত্য পাওয়া গেছে। কোথাও লোকেরা যেন এই সাহিত্যের সাথে আদৌ পরিচিত না হতে পারে সে জন্য নানান প্রক্রিয়ায় কাজ করা হচ্ছে। বরং কোথাও তো একথা বলাও হচ্ছে যে, জামায়াতে ইসলামীর কোনো কিছু শুনা পর্যন্ত যাবেনা। আমাদের আশ্চর্য লাগে যে, চোখ-কান বন্ধ করার এই কৌশল কি কারণে করা হচ্ছে? আমাদের মনে তো এমন চিন্তাই আসেনা যে, আমাদের সাথে সম্পৃক্ত লোকেরা অন্যদের বই পড়া থেকে কিংবা কথা শুনা থেকে বিরত থাকুক। জামায়াতের কর্মী ও সহযোগিরা সব ধরনের বই-পুস্তক পড়ে থাকে। প্রত্যেকের কথা খোলা মন ও খোলা কানে শোনে। এই সংগঠনের লোকেরা দুনিয়ার সব কিছু পড়ুক ও শুনুক এ প্রচেষ্টা স্বয়ং জামায়াত করে যাচ্ছে, যাতে করে তারা দূরদর্শী হতে পারে এবং অত্যন্ত ভাল করে মত প্রতিষ্ঠা করার উপযোগী হয়। জামায়াতের বিরুদ্ধে যেসব দলের পক্ষ থেকে যা কিছুই লেখা হয়, তার সবগুলোই জামায়াতের মধ্যে স্বাধীনভাবে পড়া হয়। কিন্তু আমাদের অন্যান্য ভাইদের কি হয়েছে যে, তাঁরা আমাদের ব্যাপারে চোখ-কান বন্ধ করার নীতিকে প্রাধান্য দিচ্ছেন? তাঁরা আমাদের ভূমিকার শক্তিমত্তা ও তাদের ভূমিকার দুর্বলতা অনুভব করতে পারছে, এটা কি তারই প্রকাশ্য স্বীকারোক্তি নয়? এর পরিষ্কার অর্থ কি এটা নয় যে, নিজেদের প্রভাব বলয়ে অবস্থানকারী লোকদেরকে তারা অন্ধকারে রাখতে চায় এবং তারা একথা মনে করে যে, এই লোকেরা যতক্ষণ তাদের নির্মিত সংরক্ষিত আশ্রয় শিবিরে অবস্থান করবে, কেবল ততক্ষণই তাদের প্রভাব বলয়ে থাকবে? কিন্তু যেসব লোক নিজেদের উস্তাদ, পীর ও নেতাদের তৈরি করা প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে রাযী হয়, তারা এ কথা চিন্তা করেনা যে, উত্তম ও মজবুত অবস্থান গ্রহণকারী ব্যক্তি কেন এ ভয় করতে যাবে যে, অন্যের যুক্তি-প্রমাণ শুনে তার প্রভাব বলয়ে অবস্থান গ্রহণকারী লোকের টলটলায়মান হবে?

মওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব সম্পর্কে আমরা এই খারাপ ধারণা

পোষণ করিনা যে, তিনি আমাদের দাওয়াত ভাল রূপে পড়ার পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, "আমরা নিছক শাসন ক্ষমতা চাই"। আমাদের ধারণা, তিনি নিজেই এমন দূর্গে আটকা পড়েছেন যা ধর্মীয় ধারণায় লালিত হওয়া ব্যক্তিদের আশেপাশে সাধারণভাবে তৈরি করা হয়। এই দূর্গে অবরুদ্ধ হওয়ার ফলে আমাদের কোনো বই তিনি পড়েননি অথবা পড়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। কেবলমাত্র শোনা কথার উপর ভিত্তি করেই তিনি আমাদের দাওয়াতের এই অদ্ভুত সারাংশ বের করেছেন। যদি তিনি একজন আন্তরিকতা সম্পন্ন শুভাকাংখীর অনুরোধের প্রতি মনোযোগ দেয়া উপযুক্ত মনে করেন, তাহলে তাঁর কাছে অনুরোধ করছি, যদি মত প্রকাশ করা একান্ত জরুরী হয়ে পড়ে, তাহলে মত প্রকাশের আগে যে বিষয়ে মত প্রকাশ করেত চান, সে সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে নেয়া উচিত। আর যদি আপনার ততটুকু অবকাশ না থাকে, তাহলে অসম্পূর্ণ তথ্যজ্ঞানের ভিত্তিতে মত প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকাই আপনার জন্যে ভালো। (তরজমানুল কুরআন, রজব-শাবান ১৩৭১, এপ্রিল-মে ১৯৫১)

দারিদ্র প্রদর্শনের দাবী

প্রশ্নঃ আপনারা বর্তমান ক্ষমতাসীন শাসক ও ধনিক সম্প্রদায়ের কঠোর সমালোচনা করেন। কারণ, তারা মুখে 'ইসলাম ইসলাম' চিৎকার করে জনসাধারণ ও দরিদ্র শ্রেণীর প্রতি সহানুভূতির বুলি আওড়ায়, কিন্তু তাদের কথার সাথে কাজের কোনো মিল নেই। কাজেই (আপনারাও যখন একটি ইসলামী সমাজ গঠন করার জন্যে প্রচেষ্টা চলাচ্ছেন) অন্যথায় বর্তমান ধনিক সমাজ ও ক্ষমতাসীন শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আপনাদের সমালোচনা অর্থহীন।

আমি জানি, নিজের বৈধ উপার্জন থেকে নিজের আরাম-আয়েশের সামগ্রী সংগ্রহ করা ও সুখাদ্য খাওয়ার অনুমতি ইসলাম দেয়। কিন্তু যে সমাজে চতুর্দিকে অনাহার, অর্ধাহার, দারিদ্র ও নিঃসহায়তা বিরাজমান, সেখানে বিশেষ করে একজন আহবায়কের কি উত্তম পোশাক পরিধান করা, সুখাদ্য খাওয়া এবং একটি আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন করা সাজে? রসূলুল্লাহ (স) ও তাঁর সাহাবাগণ যখন ইসলামী আন্দোলন পরিচালনায় ব্যস্ত ছিলেন, তখন তাঁরাও কি এ নীতির অনুসারী ছিলেন? আপনাদের কতিপয় সদস্যের অনেকটা বিলাসবহুল জীবন যাপন দেখে আমার মনে এ প্রশ্ন জেগেছে।

মেহেরবানী করে আমার সংশয় দূর করার চেষ্টা করবেন।

জবাবঃ জানিনা, আপনি জাময়াতে ইসলামীর কোন্ লোকদেরকে দেখেছেন এবং তাঁদের জীবনে বিলাসিতার কি চিহ্ন দেখেছেন। তাই যতক্ষণ আপনি কোনো ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে তার বিলাসিতার ধরন যথাযথ উল্লেখ না করবেন, ততক্ষণ আপনার প্রশ্নের সঠিক জবাব দেয়া আমার পক্ষে কষ্টকর।

তবে আপনি সাহাবায়ে কিরাম ও রসূলুল্লাহর (স) জীবনের বরাত দিয়েছেন। তাঁদের সম্পর্কে আমি আপনাদের নিশ্চয়তা বিধান করতে পারি যে, তাঁরা কখনো নিজেদের জীবনে কৃত্রিম দারিদ্র সৃষ্টি করার চেষ্টা করেননি এবং দর্শকরা তাঁদের ফকিরী দেখে শাবাশ দেবেন কখনো নিছক এ উদ্দেশ্যে নিজেদের মনে নিম্নমানের পোশাক, বাসস্থান ও খাদ্যের ব্যবস্থা করেননি। তাঁরা সবাই একটি স্বাভাবিক, সরল, অনাড়ম্বর ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাপন করতেন। তাদের নীতি এই ছিল যে, তাঁরা শরীয়ত নিষিদ্ধ বস্তুগুলো থেকে দূরে অবস্থান করতেন। হালাল উপার্জন করতেন এবং খোদার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালনার ব্যাপারে অবিচল থাকতেন। এ ব্যাপারে দারিদ্র ও অনাহারের সম্মুখীন হওয়া বা আল্লাহ তাআলার নিয়ামত লাভ করা– সবই তাঁদের নিকট সমান ছিল। জায়েয পদ্ধতিতে যখন ভালো পোশাক পরা যায়, তখন জেনে–বুঝে খারাপ পোশাক পরা এবং হালাল পদ্ধতিতে যখন ভালো খাদ্য পাওয়া যায়, তখন জেনে–বুঝে খারাপ খাদ্য খাওয়া তাদের নীতি ছিলনা। তাঁদের মধ্য থেকে যাঁরা খোদার পথে প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাবার সাথে সাথে পর্যাপ্ত পরিমাণ হালাল উপার্জন করতেন, তাঁরা ভালো খাবার খেতেন, ভারো পোশাক পরিধান করতেন এবং পাকা বাড়ীতেও থাকতেন। সচ্ছল লোকদের ইচ্ছাকৃতভাবে অসচ্ছল অবস্থায় জীবন যাপন করা রসূলুল্লাহ (স) কখনো পছন্দ করেননি। বরং তিনি নিজেই তাঁদেরকে বলতেনঃ আল্লাহ তাআলা তোমাদের পোশাক, খাদ্য ও সওয়ারীর উপর তাঁর নিয়ামতের প্রভাব দেখা পছন্দ করেন।

যারা নিজেদের জন্যে আল্লাহর সমস্ত নিয়ামতকে বৈধ মনে করে এবং অন্য লোকদের ভালো খাবার ও ভালো পোশাকও তাদের চোখে বিঁধেনা, কিন্তু আল্লাহর দীনের কর্মীদের অনাড়ম্বর পোশাক, আহার মামুলি বাসস্থান এবং ফার্নিচারও তাঁদের চোখে কাঁটার মতো বিঁধে এবং তারা এই লোককে সর্বাধিক দারিদ্রপীড়িত অবস্থায় দেখতে চান। এই লোকদের মানসিকতা মোটেই বুঝে আসেনা। সম্ভবত তারা মনে করেন, আল্লাহর নেয়ামতগুলো একমাত্র তাদের জন্যে, যারা আল্লাহর কাজ করার পরিবর্তে নিজের কাজ করে। আর আল্লাহর কাজ যারা করে তারা আল্লাহর কোনো নিয়ামতের হকদার নয়। অথবা সম্ভবত তাদের মন–মস্তিষ্কে সন্যাসীদের জীবনের চিত্র অংকিত হয়ে গেছে এবং তারা দীনদারীর সাথে সাথে সন্যাসবাদকেও অপরিহার্য গণ্য করেন। তাই স্বচ্ছল অবস্থা সম্পন্ন দীনদারদেরকে দেখে তারা অবাক হয়ে যান।

এই মানসিকতা সম্পন্ন লোকেরা জামায়াতের বহু লোকের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে থাকেন, কিন্তু সবচাইতে বেশী আপত্তি তাদের আমার বিরুদ্ধে। অথচ এ ব্যাপারে আমার দৃষ্টিভংগি আপত্তিকারীদের দৃষ্টিভংগি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আমার মতে, যে সমস্ত বৈধ সুযোগ–সুবিধা মানুষকে দীনের কাজ

উত্তমরূপে ও বেশী পরিমাণে সম্পাদন করার যোগ্যতাসম্পন্ন করে, তা কেবল জায়েযই নয় বরং তদ্বারা উপকৃত হওয়া উত্তম এবং তা বর্জন করা কেবল নির্বুদ্ধিতাই নয় বরং দরবেশী প্রকাশ করার নিয়তে করলে রিয়াকারী হিসেবে গণ্য হবে। আপনি নিজেই চিন্তা করুন, এক ব্যক্তি গাড়ীতে করে কম সময়ে যদি বেশী কাজ করতে পারে,তাহলে সে গাড়ী ব্যবহার করবেনা কেন? যদি সে সেকেন্ড ক্লাসে আরামে সফর করে পরদিন গন্তব্যস্থলে পৌঁছার সাথে সাথেই কাজ শুরু করতে পারে, তাহলে কেন থার্ড ক্লাসে উঠে সারা রাত্রির বিনিদ্রা ও ক্লান্তি মাথায় নিয়ে পরদিন গন্তব্যস্থলে পৌঁছে কাজ শুরু করার পরিবর্তে ঐ দিনটা ক্লান্তি দূর করার জন্যে নষ্ট করবে? যদি সে গরমে বৈদ্যুতিক পাখা লাগিয়ে বেশী চিন্তামূলক কাজ করতে পারে, তাহলে কেন ঘামে ডুবে নিজের শক্তির বিরাট অংশ নষ্ট করবে? এই সুযোগ–সুবিধাগুলো কি সে কেবল এই ভেবে ত্যাগ করবে যে, আল্লাহর সমস্ত নিয়ামত তো কেবল যারা শয়তানের কাজ করে তাদের জন্যে আর যারা আমাদের কাজ করে তাদের জন্যে নয়? এই নিয়ামতগুলো বৈধ উপায়ে সংগ্রহ করার ক্ষমতা রাখা সত্ত্বেও খামখা এগুলো ত্যাগ করে কাজের ক্ষতি করা কি নির্বুদ্ধিতা নয়? আপত্তিকারী কি এ কথাই বলতে চান যে, শয়তানের সিপাহী বিমানযোগে চলবে আর আল্লাহর সিপাহী গরুর গাড়ীতে চড়ে তার মোকাবিলা করবে? নাকি তিনি বলতে চান যে, কাজ হোক বা না হোক আমরা কেবল তাঁকে আনন্দ দান করার জন্যে নিজেদেরকে ফকীর বানিয়ে রাখবো? [তরজমানুল কুরআন, এপ্রিল–মে ১৯৫২]

জামায়াতে ইসলামীর রুকনিয়াত লাভের মাপকাঠি

প্রশ্নঃ জামায়াতে ইসলামীর একটি সদস্য শাখার আমীর রিপোর্ট দিয়েছেন যেঃ

... সাহেব অনেক দিন থেকে অত্যন্ত তৎপরতার সাথে কাজ করছেন। রুকন হওয়ার যোগ্য। দীর্ঘদিন যাবত তাঁর রুকন হওয়ার দরখাস্ত পড়ে আছে। তার ব্যক্তিগত জীবন শরীয়তসম্মত। তবে দোকানের আসল হিসাব তিনি পেশ করেননা। কারণ ইনকামটেক্সওয়ালারা টেক্স এতো বেশী ধার্য করে, যদি আসল বিক্রি দেখানো হয়, তাহলে সমস্ত, আয় ইনকামটেক্স দিয়েই শেষ হয়ে যায়। এ ত্রুটি ছাড়া আর কোনো আপত্তিকর জিনিস তার মধ্যে নেই। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট শাখা জামায়াতে ইসলামীর আমীরের রিপোর্ট নিম্নরূপঃ

"প্রার্থী একজন অত্যন্ত নেককার যুবক। জামায়াতে ইসলামীর কাজে তার যথেষ্ট অবদান আছে এবং তিনি এ কাজে বেশ তৎপর। শুধুমাত্র 'জাল হিসাব' প্রসংগটি তার সম্পর্কে আমাদের জন্য পেরেশানীর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদি

সঠিক হিসাব পেশ করা হয়, তাহলে বিক্রয় কর ও আয় কর হিসেবে কেবলমাত্র লাভই নয় বরং পুঁজিরও কিছু অংশ দিতে হয়। এমতাবস্থায় তিনি নেহাত অনন্যোপায় হয়েই নকল হিসাব পেশ করেন। অপরদিকে, যে ব্যক্তি জেনে-বুঝে মিথ্যা কথাকে সঠিক বলে পেশ করে, তাকে রুকন হিসেবে কিভাবে গ্রহণ করা যায়। যেহেতু এটা একটা একক ঘটনা নয় এজন্যে আমার এবং শাখা মজলিসে শূরার পথ নির্দেশের জন্য এই দরখাস্তটি আপনার খেদমতে পাঠিয়ে দেয়া হলো। এ ধরনের পরিস্থিতিতে আমরা কি পদক্ষেপ গ্রহণ করবো এ ব্যাপারে আমাদের পরামর্শদান করবেন।

জবাবঃ আমরা এই জামায়াত এজন্যে গঠন করিনি যে, একেক জন একেকটি অক্ষমতার ভিত্তিতে দীন ও নৈতিকতার একেকটি নীতি ভংগ করতে থাকবে। যদি আমরা এমনটিই করতে চাই, তাহলে এই জামায়াত গঠন করার কি প্রয়োজন ছিল? আমাদের লক্ষ্য ছিল এমন লোকদের সংগঠিত করা, যারা সততা ও বিশ্বস্ততার উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং মিথ্যা ও অবিশ্বস্ততার শক্তির কাছে পরাভূত হওয়ার পরিবর্তে সেগুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হবে। আমরা যদি জামায়াতের আইন-শৃংখলা এমনিভাবে ঢিলা করে দিই এবং যেসব অবিশ্বস্ত কাজ করতে লোকেরা বাধ্য হয়, তা করার অনুমতি দিয়ে দিই, তাহলে এ জামায়াতেও দুর্বল চরিত্রের লোকের সমাবেশ হবে এবং তাদের দ্বারা কোনো সংশোধনমূলক কাজ করা যাবেনা। আমরা জানি, বিক্রয় কর ও আয় কর কিভাবে সমস্ত ব্যবসায়ী লোকদেরকে মিথ্যাচারী বানিয়েছে। আমরা এটাও জানি, সরকারী কর্মচারীদেরকে ঘুষ দিয়ে এ ব্যাপারে অদ্ভুত যাবতীয় অসুবিধা অতি সহজে দূর করা যায়। এটাও আমাদের জানা আছে, যদি কেউ ঘুষ না দেয় এবং নকল হিসাবও না রাখে, তাহলে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিত্যাগ করা ছাড়া তার আর কোনো গতি থাকেনা। এতদসত্ত্বেও আমরা আমাদের কোনো রুকনকে না ঘুষ দিতে অনুমতি দিতে পারি, আর না জাল হিসাব রাখতে। তৎপরিবর্তে তার কাজ হবে, সে ব্যবসায়ী লোকাদের মধ্যে নৈতিক অনুভূতি সৃষ্টির চেষ্টা করবে, তাদেরকে সংগঠিত করবে এবং তাদের সমন্বয়ে নিয়মতান্ত্রিক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করবে। আর যদি এ ধরনের সংস্থা আগে থেকেই প্রতিষ্ঠিত থেকে থাকে, তাহলে তাদের সবাইকে সংগঠিত করে এই মর্মে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ব্যবস্থা করবে যে, কেউ সরকারী অফিসারকে এক পয়সাও ঘুষ দিতে পারবেনা এবং কেউ মিথ্যা হিসাবও রাখবেনা। যদি সরকারী কর্মচারিগণ প্রতিশোধমূলকভাবে তাদের প্রকৃত ও সঠিক হিসাবকে ভুল সাব্যস্ত করে তাদের বিক্রি অথবা আয়কে কাল্পনিকভাবে অতিরিক্ত ধার্য করে এবং তার উপর অধিক কর আরোপ করে, তাহলে কেউ যেন সেই করের এক কপর্দকও পরিশোধ না করে। যদি এ ধরনের

বাহুল্য কর আদায়ের জন্যে কারো দোকানের মালের নিলাম ডাকা হয়, তাহলে সে নিলাম ঘোষণায় কেউ যেন সাড়া না দেয়। যতক্ষণ পর্যন্ত এ ধরনের সংস্থা সংগঠিত না হবে, আমাদের রুকনগণকে ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষতি স্বীকার করেই কাজ করে যেতে হবে। কারণ নিরানব্বই জন অবিশ্বস্ত লোকের মাঝে একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি কখনো শান্তির সাথে জীবন যাপন করতে পারেনা। কিন্তু যদি সবাইকে বা অন্তত অধিকাংশকেই বিশ্বস্ততা ও সততার উপর সংগঠিত করা যায় তাহলে সকলের জন্যে হালাল রুযী খাওয়া সম্ভব হবে এবং সরকারী কর্মচারীদের বাড়াবাড়িরও অবসান হবে। [তরজমানুল কুরআন, রমযান ১৩৭০, জুলাই ১৯৫১]

ইসলামের পথে চলা এবং ডাকা থেকে বিরত করার আবদার

প্রশ্নঃ আপনার আন্দোলন দ্বারা আমি ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। আমার একজন বোন আপনার জামায়াতে শামিল হয়েছে। সে একেবারে বদলে গেছে। ওয়ায নসীহত, তসবীহ, নামায নিয়ে সদা ব্যস্ত থাকে। আপনার লেখা কুরআনের তাফসীর ঘরের লোকদেরকে জোর করে শুনায়। শিক্ষিতা হওয়া সত্ত্বেও ধ্যান-ধারণার দিক থেকে সে আর আধুনিক যুগের মেয়ে নয়। সাদা রঙের আড়ম্বরহীন পোশাক পরে। যেদিন মনে চায় রোযা রাখে। তার এরূপ চালচলনে আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়েছি। আত্মীয়দের মধ্যে যারা শোনে, তারা রাত-দিন ওয়ায শুনার ভয়ে তার সাথে ছেলে বিয়ে দেবার ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করে। গত পরশু আমার খালাম্মা এসেছিলেন, তাঁকেও সে এসব ওয়ায নসীহত শুনিয়ে দিয়েছে। তাঁকে আপনার সেখানকার একটি ক্যালেন্ডার ও কতিপয় বই-পুস্তক দিয়েছে। গতকাল ছিলো রোববার। আমরা বেড়াতে বের হয়েছিলাম। তাকে অনেকবার বলা হলো, কিন্তু সে বের হলোনা। এ পরিবেশে সম্পূর্ণ অলী আল্লাহর মতো জীবন-যাপনের অবকাশ কোথায়? এ পরিস্থিতিতে তাকে বিয়ে দেয়া সম্ভব নয় এবং তার ধারণার পরিবর্তন করা আমার অথবা কারো সাধ্যের বাইরে। যদি তাকে কিছু কড়া কথা বলা হয়, তাহলে সে দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। বলুন! আমি কি করবো?

জবাবঃ এ ব্যাপারে আমি অসহায়। আপনার বোনকে ইসলাম থেকে তওবা করানোর ব্যাপারে আপনি নিজেই চেষ্টা করে দেখুন! [তরজমানুল কুরআন, শাবান-রমযান ১৩৭২, মে-জুন ১৯৫৩]

দীন প্রতিষ্ঠার পথে সঠিক চিন্তা ও দৃষ্টিভংগি

প্রশ্নঃ আল্লাহ্ তাআলা যে চিন্তাধারা ও প্রক্রিয়ায় আপনাকে দীন প্রতিষ্ঠার দাওয়াত পেশ করার তাওফীক দান করেছেন, তার দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণ শক্তি ও

অনুভূতি সম্পন্ন কোনো ঈমানদার লোক একমত না হয়ে থাকতে পারে না। একদিকে যুগের চাহিদার প্রতি পূর্ণ নযর রাখা হয়েছে এবং অন্যদিকে ইসলামী দাওয়াতের মেযাজকে যথাযথ মর্যদা দেয়া হয়েছে। সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যে এ দু'টি জিনিসই মৌলিক গুরুত্বের অধিকারী। কিন্তু এ কাজের সাথে পরিপূর্ণ একাত্মতা থাকা সত্ত্বেও বারবার মনে প্রশ্ন জাগে যে, দীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে যে পূর্ণ সাহচর্যগুণ, উন্নত চরিত্র গঠন প্রক্রিয়া এবং চুম্বক শক্তির মতো প্রভাব বিস্তার কারী উন্নত গুণাবলী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে ছিল, তার কোনেটাই পুনরায় কারো পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়। রসূলের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্ব, ইলহাম ও অহীর নির্দেশনা লাভ, সেই সাথে ফায়দা ও উপকার প্রত্যাশী মনের গভীর মনোযোগ ও আকর্ষণ সাহাবীদের জামায়াতের প্রতিটি ব্যক্তির অন্তরে সুদৃঢ় প্রত্যয়ের আগুন ও আন্তরিকতার চিরন্তন আবেগ সৃষ্টি করে দিয়েছিল। ফলে তাদের জীবনের প্রতিটি বিভাগ থেকে তাদের দাওয়াত ও জীবন উদ্দেশ্যের প্রেমরস উপচিয়ে পড়তো। আজকের দিনে যখন সেই পবিত্র সাহচর্য নেই, নির্ভুল নেতৃত্ব নেই, যাদেরকে সম্বোধন করা হচ্ছে তাদের নেই সে যোগ্যতা ও গুণবলী এবং আজকের দিনের অন্যায়-অপকর্মে মনমানসিকতা ও চিন্তা-ভাবনা যখন সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত, তখন একনিষ্ঠ ও নির্ভীক মুজাহিদদের সে জামায়াত সংগঠিত হতে পারে কি? এমনটি আশা করা দুঃসাধ্য।

একাজ ফরয হবার ব্যাপারটি আমি অস্বীকার করছিনা। এ চেতনাবোধ নিয়ে আমি সে কাজ করেও চলছি। কিন্তু এর ফলাফলও কি সে রকমই হবে? এ কথা আমার জন্যে খুবই উদ্বিগ্নের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাবছি, এ কাজের জন্যে সে ধরনের মনন ও হৃদয়বৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব কোথায়? সে ধরনের নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য তো কারো মধ্যে নেই, সে ধরনের আনুগত্য করার শক্তিও তো কেউ রাখেনা। ইকামতে দীনের কাজে নিয়োজিতদের জন্য কিছু ওয়াদা তো অবশ্যই রয়েছে, কিন্তু তারও একটা নির্দিষ্ট মাপকাঠি আছে। একটি বিশেষ পর্যায়ের ঈমান, বিশ্বাস ও আন্তরিকতা এবং আপন উদ্দেশ্যের প্রতি প্রেম ও তার প্রশিক্ষণের জন্য তেমনি একটি সাহচর্যেরও দরকার। যদি এ জিনিসগুলোর সমাবেশ না ঘটে তাহলে কুরআনের রাজনৈতিক নিরিখে একটি দল সংগঠিত হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের সেই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রাণশক্তি প্রভাবিত দলের সৃষ্টি হতে পারবেনা, যে তার জীবন পদ্ধতির সঠিক প্রতিনিধিত্ব করতে পারে এবং যাকে সাহায্য ও প্রতিষ্ঠা লাভের ওয়াদাসহ খায়রে উম্মাত, সর্বোত্তম জাতি ও যমীনে আল্লাহর খলীফা হওয়ার খেতাব ভূষিত করা হয়েছে।

সুতরাং ইসলামী আন্দোলনের কাজ যদিও চালু আছে এবং আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে অনেক কিছুর পরিবর্তনও সাধিত হচ্ছে, কিন্তু যে পূর্ণাংগ ঈমানের দুর্বার আকর্ষণ, যে জীবন্ত বিশ্বাসের প্রদর্শন এবং উদ্দেশ্যের প্রতি আন্তরিকতার যে প্রভাব সাহাবাদের ঈমান লাভের পরপরই অনুভূত হয়েছিল, তা আমাদের

এখানে দীর্ঘদিন পরও মর্যাদা ও পর্যায় অনুসারে আমি দেখতে পাইনি, দু'-একটা ব্যতিক্রম ছাড়া। এর কারণ সঠিক প্রশিক্ষণ ও পবিত্র সাহচর্যের স্বল্পতা অথবা এ কাজের মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণদাতা ও পবিত্রাত্মা ব্যক্তিত্বের অভাব। তবে কারণ যাই হোক উপরোল্লিখিত দ্বিধা-সন্দেহ এতে আরো ঘনীভূত হয়।

আর একটি কথা আমার উদ্বিগ্নের কারণ হয়েছে। তাহলো অন্য একটি দীনী আন্দোলন, যে ঘটনাক্রমে যুগচিন্তা ও যুগের দৃষ্টিভংগির অধিকারী নয়, কিন্তু সে এমন কতিপয় ব্যক্তিত্বকে সামনে এনেছে যাদের দ্বারা হৃদয় কোনো না কোনো পর্যায়ে প্রভাবিত হয়ে থাকে। যে কাজ সঠিক মানদন্ডে পরিচালিত হচ্ছে তার মধ্যে কাংখিত প্রাণশক্তির উদ্ভব হচ্ছেনা কিন্তু অন্যদিকে আর একটি সীমিত পর্যায়ের আন্দোলনের মধ্যে তার কিছুটা লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছে, এ জটিল প্রশ্নের সমাধান এখনো আমি করতে পারিনি। হাদীসে আল্লাহর যে যিকিরের নির্দেশ রয়েছে সম্ভবত সে যিকির করার অভ্যাস না হওয়াতে এই অভাব সৃষ্টি হয়েছে। এতদসত্ত্বেও এর কোনো সন্তোষজনক সমাধান পাইনি। এ কারণে আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি। অন্তরে এই দাওয়াতের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় কিভাবে জন্ম নিবে এবং এর উপর ঈমান কিভাবে প্রাণবন্ত হবে? এখনো পর্যন্ত এর কৌশলগত দিকটি বুঝতে পারিনি। উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো যদি গুরুত্বপূর্ণ বলে আপনার কাছে বিবেচিত হয়, তাহলে মেহেরবানী করে সবিস্তারে জবাব দেবেন।

জবাবঃ *আমাদের সম্মানিত সাথী যে ধরনের উদ্বেগের কথা প্রকাশ করেছেন মাঝে-মধ্যে আমাদেরকে অনুরূপ অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়। বিভিন্ন স্থানে তা দূর করার চেষ্টাও করা হয়েছে। রসায়েল ও মাসায়েল ১ম খন্ডের ৪৬৯-৪৭৭ পৃষ্ঠায় এর একটি সংক্ষিপ্ত জবাব আপনি পেতে পারেন। তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকায়ও 'কুরআনের ভংগি, শিরোনামেও এর ব্যাখ্যা করতে গিয়েও এর কতিপয় দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তরজমানুল কুরআনে বিগত দিনে যেসব সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যেও এর কোনো কোনো অংশ আলোচিত হয়েছে। যদি কেউ এগুলো মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করেন, তাহলে তিনি অনেকটা মানসিক সন্তুষ্টি হাসিল করতে পারবেন বলে আশা করি।*

কিন্তু আমি মনে করি, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এই মানসিক সংশয়ের নিয়মিতভাবে প্রতিকার ও চিকৎসা না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এর পুরোপুরি নিরসন সম্ভব নয়। এ হতাশার সূচনা কোথেকে প্রথমত সে তথ্যে অনুসন্ধান করুন।

এর সূচনা সম্ভবত এখান থেকে যে, আপনি যখনই 'ইকামতে দীনের' কথা চিন্তা করেন তখনই নবুয়্যতী আমল তার সমস্ত উজ্জ্বলতা ও সজীবতাসহ

আপনার সামনে ভেসে ওঠে। আর আপনার মন ভেঙে যেতে থাকে এ ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, সে মহান পথ-প্রদর্শক ও অসাধারণ কর্মী বাহিনী কোথায়, যাদের হাতে সে সময় এ মহান কাজ সম্পন্ন হয়েছিল? আমার অনুরোধ, কিছুক্ষণের জন্যে আপনি এ চিন্তার সূচনা বিন্দুতে ফিরে যান এবং অন্য কোনো প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করার অথবা অগ্রসর হওয়ার আগে আপন মনের পর্যালোচনা করে চিন্তা করুন যে, এ প্রশ্ন আপনার মনে জাগ্রত হওয়ার সাথে কোন্ ধরনের ঝোঁক-প্রবণতা আপনার প্রবৃত্তিকে তার দিকে টানতে শুরু করে? আপনি গভীরভাবে চিন্তা করলে নিজেই অনুভব করতে পারবেন যে, এখানে দুটি প্রবণতার আকর্ষণ প্রবল।

একটি, প্রবণতা হলো নিরাশ হয়ে যাও। এখন না সে পথ-প্রদর্শক আছে, না সে কর্মী বাহিনী তৈরি হওয়া সম্ভবপর আর না এ কাজ এখন হতে পারে। সুতরাং ইকামতে দীনের চিন্তা পুরোপুরি বর্জন করাই শ্রেয়। যে কাজ হওয়া সম্ভবপর নয়, তার পেছনে ঘুরে লাভ কি? দীনের আংশিক খেদমতসমূহের মধ্য থেকে কোনো একটি বেছে নাও, ভালো-মন্দ যতটুকুই হোক করে যাও। আমি নিজের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের আলোকে বলছি, এটা হলো সর্বপ্রথম প্রবণতা যা এ ক্ষেত্রে মানুষের সামনে ভেসে ওঠে। আমি দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলছি, একজন নেককার মুসলমানকে ইকামতে দীনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হতে কোনো উপায়ে বিচ্যুত করার এটা হলো শয়তানের প্রথম প্রতারণা। এ কারণে সামনের দিকে কোনো কথা চিন্তা করার আগে প্রথম পদক্ষেপেই এই প্রতারণার সাথে আপনার পরিচয় হওয়া উচিত। যদি আপনার ইচ্ছা ও আকাংখা সৎ ও মহৎ হয়, তাহলে দীপ্ত শপথ ও পূর্ণ চেতনাসহ প্রথমত নিজের মন-মস্তিষ্ক থেকে এ প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার মূলোৎপাটন করে দিন।

দ্বিতীয় যে প্রবণতটা সামনে আসে তা হলো, কাজটা তো নিঃসন্দেহে জরুরী ও ফরয। কিন্তু এর জন্যে পথ-প্রদর্শক ও কর্মী বাহিনীর মধ্যে এমন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলী থাকা প্রয়োজন, যার বদৌলতে নবুয়্যতী আমলে কাজ বাস্তবায়িত হয়েছিল। সুতরাং প্রথমত সেরূপ চরিত্রবান হতে হবে এবং সে ধরনের লোক তৈরি করতে হবে। তারপর একাজে মনোযোগী হতে হবে। প্রথম প্রতারণা থেকে নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত লোকদেরকে অভিশপ্ত শয়তান এই দ্বিতীয় প্রতারণার ফাঁদে আবদ্ধ করে ফেলে। শয়তান যখন দেখে, লোকটি এ উদ্দেশ্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে গেছে, কিছুতেই সে তা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে রাযী নয়, তখন তাকে চিন্তার পরিবর্তে কর্মের একটি ভ্রান্তপথে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। সে লোকটিকে বলেঃ তুমি নদী পার হয়ে যে লক্ষ্যস্থলে পৌছতে চাও, সেটা তো নিঃসন্দেহে কাংখিত গন্তব্যস্থল। কিন্তু হে নির্বোধ! সাঁতার শেখা ছাড়া তুমি নদী কেমন করে পার হবে? প্রথমত নদীর বাইরে শুকনা ডাঙায় সাঁতার শেখার জন্য

ভালো করে প্রশিক্ষণ নাও। তারপর নদীতে পা রাখো। এমনিভাবে সে দরদী উপদেশদাতা সত্যিই মানুষকে নির্বোধ বানিয়ে ছাড়ে। যারা তার জালে আবদ্ধ হয় তারা সকলেই শুধুমাত্র নিজেরাই ডাঙায় সাঁতার শেখার কসরত শুরু করে দেয় না, বরং যাদেরকে তারা নিজেদের সাথে করে নিয়ে যেতে চায়, তাদেরকেও ডাঙায় বসে সাঁতার শেখানোর ব্যাপারে অত্যন্ত তৎপর ও সচেতন দেখা যায়। কিন্তু এর ফল দাঁড়ায় এইযে, ঐ অভিজ্ঞ লোকদের অধিকাংশের সারা জীবনেও নদীতে নামার সাহস হয় না। যদি কখনো নামেও, তখন পায়ের তলায় মাঠির নাগাল না পেয়ে হয় ডুবে যায় অথবা নদীর খরস্রোতে ভেসে যায়। কেননা, নদীর বাইরে ডাঙায় সাঁতারানোর ফলে যে অভিজ্ঞতা সৃষ্টি হয়, তা নদীর স্রোতের প্রথম ধাক্কায়ই বিলীন হযে যায়।

এর উদাহরণের জন্য দূরে কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন নেই। নিজের দেশের একদল আলেমের পরিণতি অবলোকন করুন এই আলেমগণ ফিকাহ্ ও হাদীস শিক্ষাদানের আসন ছেড়ে এবং আত্মশুদ্ধির খানকাহ্ থেকে বের হয়ে দেশীয় রাজনীতির গভীর নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এই নেকী ও পরহেযগারীর প্রতীক পবিত্রআগণের আগমনের বরকতে নদীর গতিধারা বদলে যাওয়া এবং আবর্জনা দূর হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এর পরিবর্তে দেখা গেলো, নিজেরাই এই আবর্জনায় আকণ্ঠ ডুবে গেলেন এবং নদীর গতিধারা পরিবর্তনের পরিবর্তে তারা নিজেরাই নদীর গতিধারায় ভেসে চললেন। আপনি এই বুযুর্গদের তালিকার উপর একবার দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন। কত বিপুল সংখ্যক খ্যতিমান অভিজ্ঞ আলেম রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করলেন। কিন্তু এই আলেমগণের সকলেই তাদর নিজেদের গৌরবান্বিত শাগরিদ ও খলীফাগণ সমেত হয় ডুবে গেছেন নতুবা স্রোতের সাথে ভেসে চলেছেন। এ পর্যবেক্ষণকে আজ কোনো চক্ষুষ্মাণ ব্যক্তি মিথ্যা বলতে পাববে?

আমি চাই আপনি শয়তানের এই প্রতারণাটিকেও ভালো করে জেনে নিন। যদি সত্যিই আল্লাহর রাস্তায় কিছু করার ইচ্ছা থাকে তা হলে শয়তানের সৃষ্টি প্রতিটি খট্কা থেকে নিজের অন্তঃকরণকে মুক্ত না করে এক কদমও অগ্রসর হবেননা। অন্যথায় এ খট্কা রাস্তার প্রতিটি বাঁকে আপনার মধ্যে দুর্বলতা সৃষ্টি করতে থাকবে এবং আপনার মাধ্যমে অনেক সাথীদের মধ্যেও এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে।

যদি মানুষ এই দুটি প্রবণতার ভ্রান্তি সম্পর্কে শুরুতেই সচেতন হয়ে যায়, তাহলে আত্মশুদ্ধি ও প্রশিক্ষণের যে পদ্ধতিকে আমি প্রাধান্য দিয়েছি সে নিজেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাকে প্রধান্য দেবে। কিন্তু এ পথে কিছুদূর অগ্রসর হতেই একের পর এক এমন দুটি রাস্তা আসে যার প্রতিটিতে পৌঁছেই মানুষের মনে ডানে অথবা বামে মোড় দেয়ার ইচ্ছা জাগে। মোড় না নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর

হতে থাকলেও তার মনে এই খটকা সৃষ্টি হয় যে, সে ঐসব মোড়ের কোনো একটা মোড়ের পথ ধরলো না কেন। বরঞ্চ অনেক সময় তার মনে হয় ফিরে গিয়ে ঐ মোড়ের মধ্যে কোনো একটি মোড়ের পথ অবলম্বন করি। আমার ইচ্ছা, আপনি নিজের রাজ্যে কিছুটা প্রথম থেকে সফর শুরু করুন এবং এর প্রত্যেকটি মোড়ের আকর্ষণ অনুভব করে কিছুটা পর্যালোচনা করে দেখুন, সেদিকে কি আছে এবং এমন কি জিনিস আছে, যা সেদিকে আকর্ষণ করে থাকে?

একটি মোড়ে এসে মানুষের মনে বারবার এ ধারণার জন্ম হতে থাকে যে, এ কাজের জন্যে আত্মশুদ্ধি অবশ্যই জরুরী। আত্মশুদ্ধির জন্যে মক্কা ও মদীনায় যে প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছিল, তা তেমন পরিষ্কার ও সুসংবদ্ধ নয়। পরবর্তী যুগে যে বুযুর্গগণ এসব তরীকাকে মযবুত করেছেন তারা হলেন সুফীয়ায়ে কিরাম। তাঁরা সকলেই ছিলেন বুযুর্গানে দীন, একথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং এ কাজের জন্যে যে পরিশুদ্ধির প্রয়োজন তা লাভ করার জন্যে তাসাউফের প্রসিদ্ধ তরীকাসমূহের মধ্য থেকে কোনো একটি অবশ্যি গ্রহণ করতে হবে। নতুন জীবনধারায় অভ্যস্তদের মধ্যে সম্ভবত এটা কম হতে পারে কিন্তু পুরাতন ধর্মীয় পরিবেশে যারা চোখ মেলেছেন তাদের সকলকে এই মোড়ের আকর্ষণ কম-বেশী প্রভাবিত করে থাকে। যারা এই আকর্ষণ অনুভব করেন, তাদের সকলের কাছে আমার আরয মেহেরবানী করে এ স্থানে অবস্থান করে ভালো করে চিন্তা-ভাবনা ও অনুসন্ধান করুন এবং কিছুটা মুক্তভাবেই করুন। বাস্তবিকই কি যেসব বুযুর্গের কাছ থেকে তাসাউফের এ তরীকা প্রচলিত হয়ে আসছে ব্যপক ও পূর্ণাংগ অর্থে ইকামতে দীন তাদের লক্ষ্য ছিল? সুফীবাদের সাহিত্যে কি এর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়? কোথাও এ কথার কোনো সন্ধান ও চিহ্ন পাওয়া যায় কি যে, এ উদ্দেশ্যেই কর্মী বাহিনী তৈরি করার আভিপ্রায়ে তাঁরা এসব তরীকা গ্রহণ করেছিলেন? এ তরীকায় তৈরি হওয়া মানুষেরা কখনো এ কাজ করেছেন কি? আর করে থাকলে এই তরীকা সে কাজের জন্যে উপকারী প্রমাণিত হয়েছে কি?

তারপর প্রথম যুগের আত্মশুদ্ধির পদ্ধতি সুসংবদ্ধ ছিল কি ছিল না, সে দিকে দৃষ্টি না দিয়ে আমরা কুরআন ও নবীর জীবন চরিতের মধ্যে যেসব আদর্শ কার্য পদ্ধতি পাই আপনি নিজেই সেগুলোর সাথে পরবর্তীতে পাওয়া সূফীবাদী তরীকার তুলনা করে দেখুন। এই উভয়ের মধ্যে কি বিরাট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না? তবে এ আলোচনায় জড়িয়ে পড়বেন না যে, সুফীবাদী তরীকায় যে বিভিন্ন জিনিস পাওয়া যায়, তা মুবাহের পর্যায়ভুক্ত নাকি হারামের? আলোচনা শুধু এটা যে, কুরআন ও হাদীসে আত্মিক ও নৈতিক ব্যধির চিকিৎসার জন্য যে ব্যবস্থাপত্র দেয়া হয়েছে সুফীগণ সে ব্যবস্থাপত্র হুবহু ব্যবহার করেছেন কিনা? না সে ব্যবস্থাপত্রের কোনো অংশ কম আবার কোনো অংশ বেশী ব্যবহার করেছেন,

আর নাকি কোথাও নতুন অংশ সংযোজন করেছেন? তাসাউফের কোনো মস্তবড় প্রবক্তা আজ প্রথম অবস্থার দাবী সম্ভবত করতে পারবেন না। অতএব দ্বিতীয় অবস্থাই মানতে হবে এবং প্রকৃতপক্ষে এটিই বিরাজ করছে। এখন প্রশ্ন হলো, অংশসমূহের পরিমাণে কম-বেশী ও নতুন বাড়তি অংশ সংযোজনের ফলে ব্যবস্থাপত্রের প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়েছে কি না? যদি পরিবর্তিত হয়ে থাকে, তাহলে এটা সে উদ্দেশ্যের জন্যে কিভাবে উপকারী হতে পারে, যে জন্যে স্বয়ং চিকিৎসক ও তাঁর প্রত্যক্ষ ছাত্ররা নিজেদের ব্যবস্থাপত্র তৈরী করেছেন? যদি কেউ বলেন, এসব বিভিন্ন সংস্কার ও সংযোজনের পরও ব্যবস্থাপত্রের প্রকৃতি বদলায়নি, তাহলে আমি বলবো, বিজ্ঞানের ইতিহাসে এটা একটা বিরল ঘটনা (বরং সম্ভবত একটা অলৌকিক ঘটনা) যে ব্যবস্থাপত্রের অংশ সমুহের পরিমাণে কম-বেশী ও বিভিন্ন নতুন সংযোজনা সত্ত্বেও ব্যবস্থাপত্রের মেযাজ যেমন ছিল তেমনই রয়ে যায়।

আশা করি, যদি কোনো ব্যক্তি অনুসন্ধান ও গবেষণার ক্ষেত্রে অতিশয় ভক্তি শ্রদ্ধা ও উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া গোঁড়ামির আশ্রয় না নেয় এবং ধীরস্থির মস্তিষ্কে মুক্ত মনে চিন্তা করে, তাহলে সে এ ব্যাপারে পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে যাবে যে, ইকামতে দীনের জন্যে আমাদের এমন আত্মশুদ্ধি নীতির উপরই নির্ভর করতে হবে, যা কুরআনে এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাতে পাওয়া যায়। সে পদ্ধতি যদি সুসংবদ্ধ না হয়ে থাকে, তাহলে এখন তাকে সুসংবদ্ধ করতে হবে।

যে ব্যক্তি পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে এই মোড় পরিত্যাগ করে সামনের দিকে অগ্রসর হয়, সে কিছুদূর অগ্রসর হতেই অন্য একটি জায়গায় মানসিক পেরেশানির সম্মুখীন হয়। সীরাত লেখকগণ সাহাবীদের যুগের মনীষীদের যে চিত্র অংকন করেছেন তা তার দৃষ্টি সমক্ষে আবর্তিত হতে থাকে। যেহেতু অংকিত চিত্রের সাথে হুবহু মিলে যায় এমন ব্যক্তিত্ব কোথাও নযরেই পড়ে না, সুতরাং এ কাজ কেমন করে হবে? একথা ভেবে তার মন পুনরায় নৈরাশ্যে ভরে ওঠে। এ স্থানে পৌঁছে মানুষ প্রত্যেক দিকে দৃষ্টি দেয় যাতে করে কোথাও এমন রাস্তা পেয়ে যায় যেখানে গেলে নিজের কাংখিত ব্যক্তিত্ব মিলে যায়। অনেক সময় এখানেই শয়তান তাকে পুনরায় পরামর্শ দেয় যে, এ স্থান থেকেই পিছনে ফিরে যাও অথবা নিরাশ হয়ে এখানেই বসে পড়। এ পর্যায়ে অবস্থান করেও মানুষকে ভালো করে চিন্তা করতে হবে এবং ধীরস্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করে একটি মত প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে আরয করছি, এ পর্যায়ে মানুষে যা কিছু দুশ্চিন্তা ও পেরেশানির সম্মুখীন হয়, তা দু'টি মৌলিক সত্য থেকে গাফিল হয়ে যাওয়ার ফলে হয়ে থাকে। এই দুটি মৌলিক সত্য যদি মানুষ উপলব্ধি করতে পারতো, তাহলে তার মনে স্বস্তি বিরাজ করতো

এবং সে সামনের রাস্তা পরিষ্কার দেখতে পেতো।

প্রথম মৌলিক সত্যটি হলো, যেসব ব্যক্তিত্বের নমুনা সে সন্ধান করছে, তারা একদিনে নিজে নিজেই তৈরি হয়নি। তাদেরকে তৈরি করা হয়েছে বলেই তারা তৈরি হয়েছে। বছরের পর বছর ধরে তৈরি হয়েছে। নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধান চালালে আপনি জানতে পারবেন, এসব ব্যক্তিত্ব তড়িৎগতিতে হঠাৎ সৃষ্টি হয়নি। বরং কুরআন ও সুন্নাহর হিদায়াত মুতাবেক ইকামতে দীনের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থেকে এবং জাহিলিয়াতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ধীরে ধীরে তাঁরা এ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হন, যার চিত্র সীরাত গ্রন্থরাজিতে অবলোকন করে আজ আপনি বিস্ময়াবিভূত। ব্যক্তিত্ব তৈরির সে পদ্ধতি অনুসরণ করলে আজও সে ফল লাভ না করার কোনো কারণ নেই। এ হুবহু একই ফল লাভ না হোক, সেই ধরনের এবং পর্যায়ের ফল অবশ্যই লাভ করাযাবে। তবে শর্ত হলো, ধৈর্য সহকারে এ পদ্ধতির অনুসরণ অনুশীলন করতে হবে এবং যথার্থভাবে বুঝে চিন্তা, বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার সাথে তা করতে হবে।

দ্বিতীয় যে সত্যটি না বুঝার কারণে এই পেরেশানীর সম্মুখীন হতে হয় তা হলো, কাযীর গরু খাতায় এক রকম, গোয়ালে অন্য রকম। অর্থাৎ কেতাবী ব্যক্তিত্ব ও মাঠে–ময়দানের ব্যক্তিত্বের মধ্যে অনেক তফাত। কাগজের পাতায় অতীতের একটি আদর্শ যুগের যে ছবি আঁকা হয়, রক্ত–মাংসের দুনিয়ায় হুবহু সেই একই চিত্র কখনো সৃষ্টি করা যায় না। সুতরাং যে ব্যক্তিকে এই কাল্পনিক দুনিয়ায় থাকতে হয়না বরং বাস্তব দুনিয়ায় কিছু করতে হয় তার এই কল্পনা বিলাসে নিমজ্জিত হওয়া উচিত নয় যে, রক্ত মাংসের মানুষ কখনো মানবসুলভ দুর্বলতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং সমগ্র আদর্শিক পরিপূর্ণতার প্রতীক হতে পারবে। আপনি পূর্ণতার সীমাকে দৃষ্টির আড়াল হতে দেবেন না। সে পর্যন্ত নিজে পৌঁছতে এবং অন্যকে পৌঁছানোর প্রচেষ্টাও অব্যাহত রাখুন। কিন্তু যখন বাস্তবে আল্লাহর রাস্তায় কাজ করতে এবং হাজার হাজার লোককে কাজে লাগাতে হয়, তখন কুরআন ও সুন্নাত মুতাবেক দীনের দাবী ও চাহিদার মধ্যম সীমা আপনার দৃষ্টিতে রাখতে হবে, যে মধ্যম সীমায় আপনার সাথীদের প্রতিষ্ঠিত হলে আল্লাহর রাহে কাজ করার জন্যে যথেষ্ট হবে এবং যার নিচে নেমে যাওয়া কাম্য হবে না। এ মধ্যম সীমা মনগড়া হতে পারবে না। আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতই হতে হবে এর উৎস। তবে সে সীমা বুঝা এবং দৃষ্টিতে রাখা অবশ্যই জরুরী। এটা ছাড়া মানুষ কোনো বাস্তব কাজ করতে পারেনা। প্রথম যুগে যেসব লোক আল্লাহর কাজে আত্মনিবেদিত ছিলেন, তাঁরা সকলেই না সমান সমান ছিলেন। না তাদের মধ্যে কেউ মানবসুলভ দুর্বলতা থেকে মুক্ত ছিলেন। আজও যাদের হাতে এ কাজ আঞ্জাম পাবে তারা সর্ববিধ দুর্বলতা থেকে মুক্ত হবেননা। জামায়াত ব্যবস্থাটি সত্যনিষ্ঠ ও বিজ্ঞানসম্মত হতে হবে এবং এর মধ্যে এমন

শক্তি ও যোগ্যতা থাকতে হবে, যাতে করে লোকেরা এতে শামিল হয়ে সত্য দীনের বেশী বেশী খেদমত করতে পারে এবং কর্মক্ষেত্রে তাদের দুর্বলতা প্রকাশ হওয়ার সুযোগ কম থাকে। এ জামায়াত ব্যবস্থার এ বৈশিষ্ট্য অবশ্যি থাকতে হবে।

এসব জটিলতামুক্ত হবার পর মানুষের মনে আবার এই দ্বিধা থেকে যায় যে, সে যেসব সাথীদের সাথে একত্র হয়ে ইকামতে দীনের-কাজ করছে, তারা প্রত্যাশিত মানদন্ডের অনেক নিচে অবস্থান করছে এবং তাদের মধ্যে এখনো অনেক বিষয়ে বহু ত্রুটি পাওয়া যায়। আমি আমার কোনো সাথীকেও এই পেরেশানি থেকে মুক্ত পাইনি এবং আমি নিজেও এথেকে মুক্ত নই। কিন্তু আমি বলছি, যদি এই পেরেশানি আমাদের নিজেদের এবং আমাদের সাথীদের ত্রুটিসমূহ দূর করতে উৎসাহিত করতো এবং এমন সব সঠিক উপায় উপকরণের সন্ধান ও প্রয়োগে বাধ্য করতো, যেগুলোর সাহায্যে এসব ত্রুটি দূর হয়ে যায়, তহেলে এ পেরেশানিকে মুবারকবাদ জানাই। এক্ষেত্রে পেরেশানির বিলুপ্তি নয় বরং বৃদ্ধিই জরুরী। কেননা, আমাদের সমগ্র নৈতিক ও আত্মিক উন্নতি এই পেরেশানি থেকে সৃষ্ট বেদনা ও ব্যাকুলতার উপর নির্ভরশীল। যেদিন এ পেরেশানি খতম হয়ে যাবে এবং আমাদের যা কিছু হওয়া বাঞ্চনীয় ছিল, তা আমরা হয়ে গেছি–এ ভেবে আমরা স্বস্থানে নিশ্চিন্ত হবো সেদিন আমাদের উন্নতি বন্ধ হয়ে যাবে এবং অবনতি শুরু হবে। কিন্তু যদি এই পেরেশানি আমাদের মধ্যে নৈরাশ্য ও পলায়নি মনোবৃত্তি সৃষ্টি করে, তাহলে এটা পেরেশানি নয়, শযতানের প্ররোচনা। যখনই শয়তানের এই প্ররোচনা অনুভূত হবে, তখনই 'লা–হাওলা ওয়া লা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহি' পড়ে নিজের কাজে মগ্ন হয়ে যেতে হবে। যদি আপনি সত্যিকার ভাবেই আল্লাহর কাজ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে থাকেন, তাহলে ভালো করে বুঝে নিন যে, এমন ধরনের প্ররোচনা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা ব্যতিরেকে আপনি কিছুই করতে পারবেননা। আপনার সামনে জামায়াতে ইসলামীর প্রশংসনীয় কাজকে মূল্যহীন করে তুলে ধরা এবং তাকে গুরুত্বহীন করে পেশ করা ছাড়া এ সময় শয়তানের জন্য আর কোনো প্রিয়তর কাজ নেই। আর এই সংগে জামায়াতের অথবা তার কর্মীদের প্রতিটি দুর্বলতাকে বাড়িয়ে–চাড়িয়ে দেখানোই তার কাজ যাতে করে আপনি কোনো না কোনো ভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে পড়েন। [তরজমানুল কুরআন, সফর ১৩৭১, নভেম্বর ১৯৫১]

সমাপ্ত

শতাব্দী প্রকাশনীর সেরা বই

মাওলানা মওদূদী রহ. -এর

রাসায়েল ও মাসায়েল (১-৭ খণ্ড)
Let Us Be Muslims
ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান
ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলিক রূপরেখা
ইসলামী দাওয়াত ও তার দাবি
সুন্নাতে রসূলের আইনগত মর্যাদা
ইসলামী অর্থনীতি
আল কুরআনের অর্থনৈতিক নীতিমালা
ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব
ইসলামে মৌলিক মানবাধিকার
কুরআনের দেশে মাওলানা মওদূদী
কুরআনের মর্মকথা
সীরাতে রসূলের পয়গাম
সীরাতে সরওয়ারে আলম (৩-৫ খণ্ড)
সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা
আন্দোলন সংগঠন কর্মী
ইসলামী আন্দোলনের সঠিক কর্মপন্থা
ইসলামী বিপ্লবের পথ
ইসলামী দাওয়াতের দার্শনিক ভিত্তি
জাতীয় ঐক্য ও গণতন্ত্রের ভিত্তি
ইসলামী আইন
আধুনিক নারী ও ইসলামী শরীয়ত
গীবত এক ঘৃণিত অপরাধ
ইসলামী ইবাদতের মর্মকথা
জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য ইতিহাস কর্মসূচী
প্রশ্ন জিজ্ঞাসার জবাব ১ম খণ্ড

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর

আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়
দাওয়াতে দীনের গুরুত্ব ও কৌশল
কুরআন রমজান তাকওয়া

অধ্যাপক গোলাম আযম -এর

ইসলামের পুনরুজ্জীবনে মাওলানা মওদূদীর অবদান
Political Thoughts of Maulana Maudoodi

নঈম সিদ্দিকী -এর

মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.
নারী অধিকার বিভ্রান্তি ও ইসলাম
ইসলামী আন্দোলন অগ্রযাত্রার প্রাণশক্তি

আব্বাস আলী খান -এর

জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস (সংক্ষিপ্ত)
মাওলানা মওদূদীর বহুমুখী অবদান
আলেমে দীন মাওলানা মওদূদী

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান -এর

নতুন শতাব্দীতে নতুন বিপ্লবের পদধ্বনি
আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম

সাইয়েদ সাবিক -এর

ফিকহুস্ সুন্নাহ্ ১ম খণ্ড
ফিকহুস্ সুন্নাহ্ ২য় খণ্ড
ফিকহুস্ সুন্নাহ্ ৩য় খণ্ড

আবদুস শহীদ নাসিম -এর

কুরআন পড়বেন কেন কিভাবে
আল কুরআন আত্ তাফসির
কুরআনের সাথে পথ চলা
জানার জন্য কুরআন মানার জন্য কুরআন
কুরআন বুঝার প্রথম পাঠ
কুরআন পড়ো জীবন গড়ো
আল কুরআনের দু'আ
কুরআন ও পরিবার
সিহাহ সিত্তার হাদীসে কুদসী
রসূলুল্লাহর আদর্শ অনুসরণের অংগীকার
ইসলামের পারিবারিক জীবন
আসুন আমরা মুসলিম হই
গুনাহ্ তাওবা ক্ষমা
যাকাত সাওম ইতিকাফ
আপনার প্রচেষ্টার লক্ষ্য দুনিয়া না আখিরাত?
শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি
কুরআন হাদীসের আলোকে শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চা
বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষানীতির রূপরেখা
ঈদুল ফিতর ঈদুল আযহা
আধুনিক বিশ্বে ইসলামী আন্দোলন ও মাও.মওদূদী
বিপ্লব হে বিপ্লব (কবিতা)
হাদীসে রাসূলে তাওহীদ রিসালাত আখিরাত
হাদীস পড়ো জীবন গড়ো
সবার আগে নিজেকে গড়ো
এসো জানি নবীর বাণী
এসো এক আল্লাহর দাসত্ব করি
এসো চলি আল্লাহর পথে
এসো নামায পড়ি
নবীদের সংগ্রামী জীবন ১ম খণ্ড
নবীদের সংগ্রামী জীবন ২য় খণ্ড
সুন্দর বলুন সুন্দর লিখুন
উঠো সবে ফুটে ফুল (ছড়া)
মাতৃছায়ার বাংলাদেশ (ছড়া)
আল্লাহর রসূল কিভাবে নামায পড়তেন?-অনূদিত
ইসলামী বিপ্লবের সংগ্রাম ও নারী-অনূদিত
রসূলুল্লাহর বিচার ব্যবস্থা-অনূদিত
ইসলাম আপনার কাছে কি চায়?-অনূদিত
ইসলামের জীবন চিত্র-অনূদিত
যাদে রাহ্-অনূদিত

শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট
ঢাকা-১২১৭, ফোনঃ ৮৩১১২৯২